দুই বাংলার কিশোর গল্প

সম্পাদনা

প্রণব সেন ও হান্নান আহসান



ডেল্টা ফার্মা □ কলকাতা

DUI BANGLAR KISHORE GALPA
A collection of stories
Edited by: Pranab Sen & Hannan Ahsan
Rs. 125.00

প্রকাশক
স্বপন সাহা
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ
কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৬০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অক্ষর বিন্যাস
আই. ই. আর. ই
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
এস সি অফসেট
৩৯বিং, নারকেলডাঙা মেন রোড
কলিকাতা-৫৪

দাম ১২৫ টাকা মাত্র

ভূমিকা

গল্প সংকলন গ্রন্থ কম নেই, তবু 'দুই বাংলার কিশোর গল্প' গতানুগতিক হয়নি, এ দাবি আমাদের। ছোট পড়ুয়াদের ভাল লাগবে এমন গল্পই বাছা হয়েছে। রূপকথা, ভূত, হাসি, গোয়েন্দা, রহস্য, রোমাঞ্চ—পাঁচমিশেল গল্প দুই মলাটে বন্দী হল। 'দায়সারা' শব্দটি প্রতিনিয়ত মনে হয়েছে। সজাগ দৃষ্টি ছিল, তাই এ গ্রন্থ পড়ে ঐ মন্তব্য কেউ করবে বলে মনে হয় না।

দুই বাংলা, পরিসর ছোট নয়। গল্পকারও কম নেই, যাদের গল্প স্থান পেল, যাদের পেল না, আমাদের শ্রদ্ধা সবার প্রতি। একই কথা ওপার বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মোটকথা, আমরা চেষ্টা করেছি লেখকের সেরা গল্প বাছতে। এখন এ গ্রন্থ যারা পড়বে, তাদের ভাল লাগলেই আমাদেরও ভাল লাগবে। ভাল লাগার তো শেষ নেই, দেখা যাক।

'দুই বাংলার কিশোর গল্প' বেশ স্বাস্থ্যবান। তাই পরিশ্রমও কম হয়নি। ডেল্টা ফার্মার স্বপন সাহার প্রচেষ্টা ভোলা যাবে না। প্রেস, বাইন্ডার্স সবার প্রতি আমাদের অভিনন্দন রইল।

প্রণব সেন
হান্নান আহসান

লিখেছেন

এপার
বাংলা



প্রেতাত্মার উপত্যকা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কঙ্কাবতী আর রঙ্কুলাল দুই পিঠোপিঠি ভাইবোন। ছোটবেলা থেকেই ওরা কথায়-কথায় মারামারি করত, আবার আধঘণ্টা পরেই গলাগলি ভাব। রঙ্কুলালই আগে এসে কথা বলত। কারণ, দিদিকে না হলে তার একদণ্ডও চলে না। যেমন, আধ ঘণ্টা পরেই হয়তো এসে বলত, 'কেন মিছেমিছি আমাকে চটিয়ে দিস? জানিস তো 'রাগ চণ্ডাল। আর আমরা, ছেলেরা, তো একটু মারকুট্টে হয়েই থাকি। তা তোর লাগেনি তো?' তারপর ফিসফিস করে বলত, 'দিদা তেঁতুলের আচার বানাচ্ছে, আমি দেখে এসেছি। দুপুরে যখন রোদে দেবে

তখন মজাসে এক খাবলা তুলে নিয়ে আসব। ওঃ!' বলেই জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু চেটে নিত।

ব্যস, আচারের নাম শুনে কঙ্কাবতী মুহূর্তে গলে জল। বিষ্ণু যেমন নারদের গান শুনে জল হয়েছিলেন প্রায় সেই রকমই আর কি! তারপর ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ করবার ইশারা করে ফিসফিস করে বলত, 'হ্যাঁ, দুপুরে, দিদা ঘুমুলে। এখন তো গরমের ছুটি। তোরও ইস্কুল নেই, আমারও নেই।'

এসব ওদের ছেলেবেলার কাহিনী। এখন ওরা দু'জনেই বড় হয়েছে। শুধু বয়সে নয়, বিদ্যেতেও। লেখাপড়ায় দুজনেই তুখোড়। দু'জনেই ইউনিভার্সিটিতে প্রোফেসারি করছে। তবে ওদের বিষয় এক নয়। রঙ্কুলাল পড়ায় ফিজিক্স অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান, আর কঙ্কাবতী পড়ায় জুওলজি অর্থাৎ প্রাণিবিজ্ঞান। শুধু পড়ায়ই না, দু'জনেই নিজের-নিজের বিষয়ে গবেষণা করে দেশবিদেশে নাম করেছে। প্রায়ই ওদের ডাক পড়ে দূর-দূরান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। ইউরোপের নানা দেশে, আমেরিকায়, কানাডায়, এমন কী দক্ষিণ আমেরিকার অনেক ছোটখাটো রাজ্যেও। আর, মজা, বেশির ভাগ সময়েই ওরা দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে এবং একই জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। এক জায়গায় না হলেও অন্তত কাছাকাছি জায়গায় , যাতে বক্তৃতা শেষ হলে দু'জনে একসঙ্গে আশপাশের জায়গাগুলো বেড়িয়ে আসতে পারে।

এই রকমই সেবার ওদের ডাক পড়েছিল উরুগুয়ে ইউনিভার্সিটিতে।

নতুন ইউনিভার্সিটি। উরুগুয়ের কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেছিলেন যে খেলাধূলায়—বিশেষ করে ফুটবল খেলায় ওঁদের ছেলেদের যেমন নামডাক, লেখাপড়ায় তেমনটা হয়নি। দেশকে বড় করতে হলে সব দিক দিয়েই তো তাকে তুলতে হবে। হলই বা সমস্ত দেশটা এই এতটুকু, বাহাত্তর হাজার বর্গমাইলের সামান্য একটু বেশি। সমস্ত দেশের জনসংখ্যা একত্র করলে কলকাতা শহরের অর্ধেকও হবে না। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? তাই রাজধানী মন্টেভিডিও শহরে তাঁরা একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন এবং প্রায়ই দেশবিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে সেখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা করছেন। এই সূত্রেই এবার ডাক পড়েছে রঙ্কুলাল আর কঙ্কাবতীর। দু'জনকেই অন্তত পক্ষে গোটা-দশেক করে বক্তৃতা দিতে হবে।

যথাসময়ে নীল আকাশে পাখা মেলে ওদের প্লেন ভেসে চলল এবং যথাসময়ে মণ্টেভিডিওর এয়ারপোর্টে নেমেও পড়ল।

নতুন জায়গা। এর আগে ওরা এসব অঞ্চলে আর আসেনি। সমুদ্রের ধারে আধুনিক কেতায় সাজানোগোছানো সুন্দর শহর। ইউনিভার্সিটির বাড়িটিও

সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে তৈরি হয়েছে। ক্লাস করতে-করতেই সর্বদা সমুদ্র চোখে পড়ে। এসব জায়গায় বসে পড়াশোনা করতেও যেমন ভাল লাগে, পড়াতেও তেমনি।

দেখতে-দেখতে রঙ্কুলাল আর কঙ্কাবতী দু'জনেরই দশ-দশটা বক্তৃতা দেওয়া শেষ হল। সবাই তারিফ করল ওদের বক্তৃতার, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা। ওরা অবশ্য বক্তৃতা দিয়েছিল ইংরেজিতেই, কিন্তু সেসব বক্তৃতা সঙ্গে-সঙ্গে দোভাষীদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় বুঝতে কারও কোনও অসুবিধা হয়নি। তারপর দিন-দুই ধরে চলল খানাপিনা এবং এটা-ওটা-সেটা। উরুগুয়ে ইউনিভার্সিটি দরাজ হাতে ওদের বেশ মোটা অঙ্কের একটা করে সম্মানদক্ষিণাও দিয়ে দিলেন।

রঙ্কুলাল বলল, "দিদি, দেশে ফিরবার আগে এ-দেশটা একটু ঘুরে দেখবি না?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, দেখব না মানে? আবার কবে এদেশে আসব তার ঠিক নেই। একেবারেই আসব কি না কে জানে?"

স্থানীয় ট্যুরিস্ট অফিসই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ওদের ছাত্রছাত্রীরা, যারা ইতিমধ্যেই ওদের ভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদেরও কেউ-কেউ বলল, "আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

ওদের মধ্যে দু'চারজন বেশ ইংরেজি বলতে পারত। কিন্তু সকলের জায়গা তো হবে না। কঙ্কাবতী বলল, "দু'জন যেতে পারো। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।" আর-একটি মেয়ে বেশ চালাক-চতুর। সে বলল, "আমি ঠিক জায়গা করে নেব। আমি তো বেশ রোগা!" তারপর একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "ওর মতো হোঁতকা নই। তা ছাড়া আমি ইংরেজিও জানি। আপনাদের সাহায্য করতে পারব।"

রঙ্কুলাল বলল, "নিয়ে নাও দিদি, ওকেও। স্থানীয় ভাষা না জানার অসুবিধেটা যে সময়-সময় কীরকম বিপজ্জনক হয় তা সেবার কর্ণাটকের ভেতরকার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম। শহরে তেমন অসুবিধে না হলেও একটু ভেতরে গিয়ে দেখি সেখানকার লোকেরা কেউ না বোঝে ইংরেজি, না হিন্দি। বোঝে শুধু স্থানীয় ভাষা। অগত্যা ইশারা-টিশারায় মনের কথা প্রকাশ করতে হয়েছিল। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার।" বলেই রঙ্কুলাল তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে ঘাড়টা একটু দুলিয়ে নিল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ও-ও চলুক।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। ট্যুরিস্ট অফিস থেকে পাওয়া গেল, একখানা বড় গাড়ি।

সমুদ্রের ধার দিয়ে সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। ধারে-ধারে ছোট-ছোট পাহাড়, বোধহয় চুনা পাথরের। সেগুলিকে পাশ কাটাবার জন্য রাস্তা মাঝে-মাঝে এঁকেবেঁকে চলেছে সাপের মতো। মোটর ছুটেছে দ্রুতবেগে। সবারই চুল উড়ছে বাতাসে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মন-মেজাজও সবার ভাল।

হঠাৎ সেই রোগা ছাত্রীটি, তার নাম রেজিনা, ড্রাইভারকে কী বলল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি থামালে কেন?"

"আসুন, একটু কফি খেয়ে নেই। এখানকার কফি খুব নামকরা। আপনাদের ভাল লাগবে, শরীরটাও তাজা লাগবে। সামনেই ওই যে একটা স্টল রয়েছে।"

সত্যি, দু'চার কিলোমিটার পর-পরই রাস্তার ধারে সাজানোগোছানো একটা করে স্টল ওদের চোখে পড়ছিল। ওখানে চা, কফি ও অন্যান্য পানীয় তো আছেই, তা ছাড়াও কিছু চকোলেট জাতীয় খাবার সাজানো আছে, সাজানো আছে হরেকরকম ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজ।

শেষের দুটি অবশ্য ওদের কাজে লাগবে না। কেননা, ওখানকার ভাষা এখনও ওদের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। তবে দু'চারটে সাধারণ কথা ওরা এর মধ্যেই শিখে নিয়েছে।

দেখা গেল, সঙ্গী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রেজিনাই সবচেয়ে চটপটে। চোখেমুখে কথা বলে বটে, কিন্তু ওই সবচেয়ে কাজের।

সবাই এক কাপ করে কফি খেয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। সত্যি, রেজিনা ঠিকই বলেছিল, কফি খেয়ে শরীর-মন দুটোই বেশ তরতাজা লাগছে।

ড্রাইভার এবার গাড়ি ঘুরিয়ে সমুদ্র থেকে দূরে আর-একটা রাস্তা ধরছিল। রেজিনা বলল, "গাড়ি ঘোরাচ্ছেন কেন? আমরা তো সেই দু'হাজার বছর আগেকার রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছি, যা নাকি সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে।" তারপর কঙ্কাবতীদের দিকে ফিরে বলল, "দেখলে আপনারা সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন। অনেকটা মায়া-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মতো। আপনাদের ইণ্ডিয়াতেও শুনেছি মহেন্‌জো-দরোতে এ-রকম পাওয়া গেছে! তবে তা বোধহয় আরও অনেক পুরনো।"

রঙ্কুলাল সুযোগ পেয়ে মহেন্‌জো-দরো সম্বন্ধে একটু জ্ঞানদান করার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কঙ্কাবতী ধমক দিয়ে বলল, "এখন থাম্ তো! দ্যাখ, সমুদ্র কেমন থেকে-থেকে রং পালটাচ্ছে! ও কী, জলের মধ্যে ওটা কী মাথা উঁচু করে রয়েছে?"

উত্তর দিল ফের রেজিনাই, "ও একটা স্পঞ্জের স্তূপ। এখানকার সমুদ্রের জলে প্রচুর স্পঞ্জ দেখা যায়। অনেক সময় সমুদ্রের পাড় ঘেঁষেও জমে থাকে ওগুলি জলের ওপর মাথা বার করে।"

কঙ্কাবতী বিজ্ঞের মতো বলল, "হ্যাঁ, স্পঞ্জ তো নানা আকৃতির হতে পারে। আসলে কিন্তু ওরাও একরকম সামুদ্রিক প্রাণী, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারে না। ওদের সারা গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। তার ভিতর দিয়ে সমুদ্রের জল ক্রমাগত ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই জলে থাকে নানারকম খুদে-খুদে সামুদ্রিক পোকা, সেই পোকাগুলোই হচ্ছে ওদের খাদ্য। সমুদ্রের স্রোতই সরবরাহ করার ভার নিয়েছে সেই খাদ্য। নইলে নড়তে-চড়তে না-পারা এই প্রাণীগুলির কী অবস্থাই না হত!"

রঙ্কুলাল বিজ্ঞের মতো বলল, "বিধাতার কী অদ্ভুত বিধান! এই স্পঞ্জগুলির জল শুষে নেবার ক্ষমতাও দারুণ। আমরা তো এতদিন আঙুল ভেজাবার জন্য টেবিলে এই সব স্পঞ্জই ব্যবহার করে এসেছি। তবে সেগুলোর মধ্যে তখন প্রাণ থাকে না এই যা। কিন্তু ঠিক রবারের মতো। টিপলে আঙুল বসে যায়, আবার আঙুল ছেড়ে দিলেই সেই আগের চেহারা। ইংরেজিতে তোমরা যাকে বল 'ইলাস্টিসিটি', ঠিক তাই। অদ্ভুত এদের ইলাস্টিসিটি।"

কঙ্কাবতী হেসে বলল, "বাংলায় আমরা একে বলি স্থিতিস্থাপকতা। কিন্তু সে ভাষা তো আর তোমরা বুঝবে না!"

"কী বললেন? স্-স্টিটিস্স্..." রেজিনা হেসে বলল, "আমরা ওটা উচ্চারণই করতে পারব না।"

তাকে বাধা দিয়ে এবার একটি ছাত্র প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ইলাস্টিক হওয়ারও তো একটা লিমিট, মানে সীমা বা মাত্রা আছে। কোনও জিনিসই তো সম্পূর্ণ ইলাস্টিক হতে পারে না!"

কঙ্কাবতী বলল, "হ্যাঁ, তাই তো জানি।তবে সম্পূর্ণ ইলাস্টিক হলে কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে তার একটা মজার গল্প আছে।

"এক বিজ্ঞানী নানা গবেষণার পর এমন একটা জিনিস তৈরি করলেন যা নাকি সত্যি-সত্যিই নিখুঁত ইলাস্টিক। সেই জিনিসটা দিয়ে একজোড়া জুতোর 'সোল' তৈরি করালেন তিনি। তারপর পরীক্ষার জন্য নিজেই সেই জুতো পরে আমেরিকার একটা তিরিশতলা বাড়ির জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন, নীচে, রাস্তায়। কিন্তু, যেহেতু তাঁর জুতোর তলাটা নিখুঁত ইলাস্টিক জিনিস দিয়ে তৈরি, তাই রাস্তায় নামা মাত্র সেটা তাঁকে আবার ঠেলে তুলে দিল তিরিশতলা উঁচুতে। সেখানে উঠেই আবার তিনি আপনা-আপনি নেমে এলেন

রাস্তায়, সঙ্গে -সঙ্গে আবার তাঁকে ঠেলে তুলে দিল সেই তিরিশতলার মাথায়। এইভাবে ক্রমাগত চলতে লাগল ওঠা আর নামা। দেখতে-দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল, কিন্তু কেউ তাঁর ওঠা-নামা থামাতে পারল না।"

শেষটা কী হল তা হলে? ভদ্রলোক উদ্ধার পেলেন কী করে?"

" সে আর বোলো না। কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপার চলতে লাগল। শেষে—"

রঙ্কুলাল কথাটা শেষ করল, "সে এক ট্র্যাজেডি। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত ওই বিজ্ঞানীকে গুলি করতে হল। গুলি খেয়ে তিনি কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জুতোর তলাটা আর তখন রাস্তার সংস্পর্শে রইল না। ফলে, তিনি লাফানো থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।"

"কিন্তু গুলি খেয়ে প্রাণে বাঁচলেন কি?"

"তা কি আর কেউ বাঁচে?" কঙ্কাবতী গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

মোটর এদিকে ছুটে চলেছে সমানে। হঠাৎ ড্রাইভার গাড়িটাকে তীব্রবেগে বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল, সমুদ্রের ধার দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে তারই থেকে বেরিয়ে-আসা অন্য একটা রাস্তায়।

রঙ্কুলালের জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টি দেখেই রেজিনা ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল, "হঠাৎ গাড়িটা ওই রাস্তা থেকে সরিয়ে নিলেন যে?"

ড্রাইভার উত্তরে কী যেন বলল। রেজিনা মন দিয়ে শুনল, তারপর রঙ্কুলালদের বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। "ওদিকে গেলে ওই পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে- রাস্তা একদম বন্ধ। আসলে কী জানেন, ওখানে একটা উপত্যকার মতো অদ্ভুত একটা জায়গা আছে। চারদিকে এমন উঁচু-উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা যে, ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। আর ও-জায়গাটার নামও প্রেতাত্মার উপত্যকা। লোকে বলে ওটা সত্যি-সত্যি ভূতের আস্তানা। ওখানে দিবারাত্র ভূতের কান্না, হাসি আর কত কী তর্জন-গর্জন শোনা যায়। দিনের বেলা ততটা নয়; কিন্তু রাতের দিকে, যখন সমুদ্র ছাড়া আর সব চুপচাপ, তখন সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়েও ওই সব শব্দ প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে যায়। বহু-বহু বছর ধরে এইরকম চলছে। আমরা ছোটবেলা থেকে এর গল্প শুনে আসছি, আমাদের বাবা-মায়েরাও, এমনকী দাদু-দিদারাও। কিন্তু কেউ কখনও এ-তল্লাটে আসেনি। আর, সত্যি বলতে কী, কেউ কখনও এদিকে আসতেও চায় না। কার দায় পড়েছে শখ করে জেনেশুনে বিপদের মধ্যে মাথা গলাতে? তাই ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য পথ ধরেছে। ওটা এড়িয়ে গিয়ে পরে আবার সমুদ্রতীরের নিশ্চিন্ত পথ ধরবে।"

"উঁহু!" সজোরে চেঁচিয়ে উঠে ড্রাইভারের কাঁধে হাত দিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল রঙ্কুলাল। বলল, "কখনও ভূত দেখিনি। একেবারে ভূতের রাজ্যে এসে স্বচক্ষে ভূত না দেখে যাচ্ছি না। গাড়ি ঘোরাতে বলো। আমরা ওই প্রেতের উপত্যকা দেখে যাব।"

ড্রাইভারের আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে কঙ্কাবতী বলল, "ওরা বোধহয় ভয় পাচ্ছে। গাড়িটা না হয় এখানেই থাকুক। চল্, আমি আর তুই ঘুরে দেখে আসি জায়গাটা।" রেজিনার দিকে ফিরে বলল, "তোমরা ওই সামনের স্টলে গিয়ে বোসো। বরং আর-একবার চা কি কফিটফি যা হয় খেয়ে নাও, গল্পগুজব করো। আমাদের হয়তো খুব দেরি হবে না। খুব বড় জায়গা বলে তো মনে হচ্ছে না। ধরো, ঘণ্টাখানেক? তবে পায়ে হেঁটে যাব তো, একটু এদিক-ওদিকও হতে পারে। আমাদের দেরি দেখলে ফেলে চলে যেও না যেন আবার!"

রেজিনার মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। "না, তা যাব না। কিন্তু আপনারা কি সত্যি ফিরতে পারবেন? ওখানে কয়েকশো বছরের মধ্যে কোনও জীবন্ত মানুষ গেছে বলে শুনিনি। গিয়ে থাকলেও তারা আর ফেরেনি। তা ছাড়া ভেতরে ঢুকবার রাস্তাও নাকি নেই!"

"সে আমরা ঠিক খুঁজে বার করে নেব। কিংবা, দরকার হলে, কিছুটা পাহাড় টপকেই চলে যাব। আমাদের দু'জনেরই পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নেওয়া আছে।"

রঙ্কুলাল কোনও ব্যাপারে জেদ ধরলে তাকে যে থামানো যায় না তা কঙ্কাবতীর অজানা নয়। সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। রঙ্কুলালকে ডেকে বলল, "আয় রঙ্কু, আয়! আর ওই ঝোলানো ব্যাগটাও সঙ্গে নে। কী জানি, কখন কী দরকার হয়।"

ব্যাগ বলতে ওদের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ছোট একটা মিনি ল্যাবরেটারি। গ্যাস মাস্ক থেকে শুরু করে অক্সিজেনের বোতল আর এটা-ওটা-সেটা। তবে খুব ভারী নয়। দু'জনে পালা করে বয়ে নিতে যেতে পারবে অনায়াসেই। সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওরা হাঁটতে শুরু করল। গাড়িটা ধীরে-ধীরে একটু দূরের একটা স্টলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সত্যি, এ-এক আশ্চর্য জায়গা। এমনটা ওরা কখনও দ্যাখেনি। এলাকাটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোথাও ঢুকবার কোনও পথ আছে বলে মনে হল না। কিন্তু মনে হল, ভেতর থেকে কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ

যেন ভেসে আসছে। কখনও আর্তনাদ, কখনও অট্টহাসি, কখনও আবার করুণ কান্নার স্বর।

রঙ্কুলাল জোর দিয়ে বলল, "নিশ্চয় ভিতরে ঢুকবার কোনও-না-কোনও পথ আছে। এ তো প্রাকৃতিক ব্যাপার, কেউ বানায়নি। কাজেই নিশ্ছিদ্র এ-কথা আমি মানতে রাজি নই। একটু খুঁজে দেখতে হবে। তাছাড়া ভেতরের ফাঁকা জায়গাটাকে উপত্যকা বলা হলেও মনে হচ্ছে খুবই ছোট। লম্বায় একশো মিটার বা ওইরকম, চওড়াও তার কাছাকাছি।"

আশ্চর্য, একটু খুঁজতেই দেখা গেল দুটো পাহাড়ের জোড়ের মুখে কয়েকটা বড়-বড় গাছ ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় গাছগুলির বয়সও নেহাত কম নয়। কিন্তু গাছ গজিয়েছে, তখন একটা ফাটলও নিশ্চয়ই আছে। বোধহয় গাছের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে।

দু'জনেই গাছে উঠতে ওস্তাদ। রঙ্কুলাল ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল একটা গাছে। পেছন-পেছন কঙ্কাবতীও।

সত্যি, যা ভেবেছিল তা-ই। গাছের আড়ালে চাপা রয়েছে একটা সরু ফাটল। চেষ্টা করলে কাত হয়ে তার ফাঁকা দিয়ে ঢুকে পড়া যায়। খানিকটা কসরত করে ওরাও ঢুকে গেল সেই ফাটলে, তারপর গাছ বেয়েই নেমে পড়ল সেই ফাঁকা উপত্যকায়।

তারপরেই ভয়ে ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। যে আওয়াজটা বাইরে থেকে এতক্ষণ অস্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছিল, এবার তা-ই শোনা যেতে লাগল বিকটভাবে। কী অদ্ভুত শব্দ! যেন একসঙ্গে হাজারটা লোক চেঁচামেচি করছে। কখনও হাসির শব্দ, কখনও গোঙানি। তারই মধ্যে চলেছে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার, শাসানি, বহুলোকের একসঙ্গে ঝগড়া।

"দিদি, ভয় পাচ্ছিস?" ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করল রঙ্কুলাল।

"না, ভয় কিসের!" ভয়ার্তকণ্ঠে বলল কঙ্কাবতী। তারপরেই হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা দম নিয়ে বলল, "কিন্তু শব্দই শোনা যাচ্ছে শুধু। বোধহয় পায়ের দুপদুপ আওয়াজও আছে তার মধ্যে, কিন্তু চোখে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয় একটা রহস্য আছে এর মধ্যে।"

রঙ্কুও যেন এবার একটু দম নিয়ে বলল, "সেইটিই তো উদ্ধার করতে হবে। কী নাম বলল যেন এ-জায়গাটার? গোস্ট ভ্যালি, অর্থাৎ প্রেতাত্মার উপত্যকা? তুই কি প্রেতাত্মা মানিস?"

কঙ্কাবতীও ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে। এবার বিজ্ঞের মতো বলল, "বিজ্ঞানীরা কখনও হাতেনাতে প্রমাণ না পেলে কিছু মানে না।"

"হ্যাঁ, আজ দেখা যাবে পরখ করে। প্রেতাত্মাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া তাদের উপস্থিতির আর কোনও পরিচয় তো পাচ্ছি না। ওরা কি রাত না হলে বার হয় না?"

ততক্ষণে দু'জনের মনেই বেশ সাহস এসে গেছে। প্রথম দিকের আচমকা ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে। ওরা ঘুরে-ঘুরে সমস্ত জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে।

ভেতরটা একদম জনশূন্য। কিন্তু বেশ বোঝা গেল চিরকাল এমনটা ছিল না। ইতস্তত ছড়ানো বেশ কিছু পরিত্যক্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল ওদের। কবে, কতদিন আগে এখানে লোকবসতি ছিল কে জানে! তবে বহুদিন যে কেউ এখানে ঢোকেনি তা স্পষ্ট বোঝা গেল। এক জায়গায় দেখা গেল বেশ কিছু উঁচু-উঁচু নারকেলজাতীয় গাছ, যা সমুদ্রের আশপাশে আপনি গজায়।

"দ্যাখ, দ্যাখ, দিদি, ওই বাড়ির ভাঙা বারান্দায় ওগুলি কী পড়ে আছে! বেশ কয়েকটা খুব মরচে-ধরা তীর আর লম্বা-লম্বা পাখির পালক, যা রেড ইণ্ডিয়ানরা আজও মাথায় পরে। তা হলে এ-জায়গাটায় একসময় রেড ইণ্ডিয়ানদেরই আস্তানা ছিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় গেল ওরা? কেনই বা গেল?"

এ-দিকে সেই রহস্যজনক শব্দ কিন্তু সমানে শোনা যাচ্ছে।

কঙ্কাবতী বলল, " হাসিকান্না, গোঙানি ছাড়া আর যেসব গোঙানি শুনছিস ওগুলি বোধহয় সেই রেড ইণ্ডিয়ানদেরই ভাষা। অর্থাৎ, ভূত হলে ওরা সব রেড ইণ্ডিয়ান ভূত।"

ওদের দু'জনকেও কিন্তু একটু জোর দিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল, নইলে ওই শব্দের মধ্যে কেউ কারও কথা শুনবে কী করে?

রঙ্কুলাল বলল, "সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চল্, ওই পাহাড়ের দেওয়ালটার কাছে যাই, যদি কিছু হদিস মেলে।"

দু'জনে এগিয়ে এল একটা উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালের পাশে। রঙ্কু বলল, "দ্যাখ, এখানে মাটিতে কী ভীষণ বালি জমে আছে। সমুদ্রের বালি। তা হলে এক সময় সমুদ্রের জল হয়তো এখানে ঢুকে গিয়ে জায়গাটা ভাসিয়ে দেয়। লোকেদের পালানোর একটা কারণও হতে পারে। সমুদ্র এখন সরে গেছে, কিন্তু লোকজন কেউ আর ফিরে আসেনি।"

পাহাড় দেখে ওরা আরও অবাক। পাহাড়ের সারা গা জুড়ে কিসের যেন একটা কালচে আস্তর। পাথরের নয়, অন্য কিছুর। রঙ্কুলাল কাছে গিয়ে

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করল। আঙুল দিয়ে টিপে দেখল, আঙুল সবটা বসে যাচ্ছে কিন্তু ছেড়ে দিতেই আবার যেমন-কে তেমন। ঠিক যেন চটচটে রবারের মতো কিছু দিয়ে মোড়া। রঙ্কুলাল ব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি বার করল, যার একদিক বাটালির মতো, অন্যদিক হাতুড়ির মতো, ভূবিজ্ঞানীরা যে ধরনের হাতুড়ি ব্যবহার করেন। পাহাড়ের গায়ে ঠুকঠুক করে সেই হাতুড়ি চালিয়ে দেখা গেল কালো আস্তরের নীচে রয়েছে সত্যিই পাথর।

"এঃ, এ তো তো দেখছি চুনা পাথরই বটে! সমুদ্রের ধারে ওই রকমই তো হবার কথা। কিন্তু সমস্ত পাথরের গায়ে ওই রকম কালচে রবারের মতো আস্তর এল কোত্থেকে? খুব পুরু মনে হচ্ছে। আধ মিটার তো হবেই, কোনও-কোনও জায়গায় এক মিটারেরও বেশি হতে পারে।"

"দাঁড়া, আমাকে দেখতে দে।" কঙ্কাবতী এবার ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা পুরু লেন্স বার করে নিয়ে আস্তরগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। "আরে এ তো মনে হচ্ছে স্পঞ্জ। সমস্ত পাহাড়টার গা জুড়ে স্পঞ্জ এসে বাসা বেঁধেছে, তাই চটচটে রবারের মতো লাগছে। চল্ তো, ওই দিকটার পাহাড়গুলো দেখি।"

সব দিকেই এক ব্যাপার। ক'টি পাহাড়ের গা-ই পুরু স্পঞ্জের আবরণে ঢাকা।

কঙ্কাবতী বলল, "বুঝেছি। এ-জায়গাটায় সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ায় লোকজন সব পালিয়েছে। সমুদ্রের জলের সঙ্গে এসেছে স্পঞ্জ। আর, স্পঞ্জের যা নিয়ম, একটা কিছু অবলম্বন পেলেই নিজেদের সেখানে আটকে রাখবে। পাহাড়গুলো পেয়ে তাদের সুবিধে হয়েছে খুব। তবে এত-এত স্পঞ্জ জমতে নিশ্চয়ই কয়েকশো বছর লাগবার কথা। সেই ফাঁকে চুনা পাথরগুলোও ফাঁকে-ফোঁকরে ক্রমাগত জমতে-জমতে জায়গাটাকে প্রায় নিশ্ছিদ্র করে ফেলেছে।"

"স্পঞ্জগুলি কিন্তু সবই মরা!" রঙ্কুলাল বলল।

"মরা তো হবেই," কঙ্কাবতী জবাব দিল। "সমুদ্রের জল সরে যাওয়ার পর ওদের তো আর খাবার জোটেনি! অথচ নিজেরাও যে জায়গা ছেড়ে চলে যাবে সে শক্তিও নেই। তাই ওখানেই ধীরে-ধীরে তাদের জীবনাবসান হয়েছে। পড়ে রয়েছে, শুধু রবারের মতো ইলাস্টিক মৃত শরীরগুলো।"

হঠাৎ রঙ্কুলালের মাথায় চন্ করে কী যেন একটা সন্দেহ এসে ঢুকল। সে ওখানেই মাটিতে বসে পড়ে কী যেন ভাবতে লাগল গভীর ভাবে—তন্ময় হয়ে। ও যখন কিছু একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে তখন ঠিক এই রকমই করে।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করল কঙ্কাবতী।

রঙ্কুলাল কোনও উত্তর দিল না। সে যেন তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কী ভাবছে।

একটু অপেক্ষা করে কঙ্কাবতী আবার বলল, "কী অমন ভাবছিস বল তো? তোকে নিয়ে আর পারা যায় না!"

রঙ্কুলাল এবার মুখ তুলে বলল, "মনে হয় রহস্যটা বারো আনা উদ্ধার করে ফেলেছি। পাহাড়গুলো কত উঁচু দেখছিস তো? একবার চিৎকার করে বল্ তো, বন্দেমাতরম্।"

সঙ্গে-সঙ্গে কঙ্কাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "বন্দেমাতরম্।" সেই সঙ্গে গলা মিলিয়ে রঙ্কুলালও চিৎকার করে উঠল, "বন্দেমাতরম্।"

মনে হল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ধাক্কা খেয়ে ওই শব্দটা ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে বারে বারে, চারদিক থেকেই। থামবার নাম নেই। যদিও অন্যান্য ভৌতিক শব্দগুলি থেকে ওটা পৃথক করে খুঁজে বার করা হয়তো কঠিনই, কিন্তু সদ্য-উচ্চারিত বলে শব্দটা একটু জোরেই হওয়াতে তার প্রতিধ্বনিগুলোও খুব জোরে জোরে আসতে লাগল। ওরা কান পেতে লক্ষ করল আর-সমস্ত চেঁচামেচি ছাপিয়ে বারে-বারে শোনা যাচ্ছে বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

"পেয়ে গেছি—পেয়ে গেছি! ইউরেকা!" এবার যেন আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল রঙ্কুলাল। এবার সে শব্দটাও প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল চারদিক থেকে।

"কী পেয়ে গেছিস?" কঙ্কাবতী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

"শোন্ বলি। আমার যা সিদ্ধান্ত তা হচ্ছে এই: এ-জায়গাটায় এক সময়ে লোকবসতি ছিল তা তো দেখাই যাচ্ছে। কতদিন আগে কে জানে! কয়েকশো বা কয়েক হাজার বছরও হতে পারে। তারপর সমুদ্রের জল এসে এ-জায়গাটায় ঢুকে পড়ল। চুনা পাথরগুলো বেশির ভাগ হয়তো আগেই ছিল, আবার নতুন করে তাদের কলেবরে বাড়তে লাগল। দেখতে-দেখতে জায়গাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে দেওয়াল-ঘেরা করে ফেলল সেই পাহাড়। লোকজন, যারা জায়গার মায়া ছেড়ে যেতে চায়নি তারাও ঘরবাড়ি ফেলে পালাতে লাগল। দেখতে-দেখতে জায়গাটা হয়ে গেল জনহীন, পরিত্যক্ত শ্মশানের মতো। এদিকে, এ-জায়গাটাকে তো স্পঞ্জের উপনিবেশ বলছিস। তা তো চোখেও দেখেছি। তোর অনুমানমতো সমুদ্রের জলের সঙ্গে তাই ঢেউয়ে-ঢেউয়ে রাশি-রাশি জীবন্ত স্পঞ্জও ঢুকে পড়েছিল এখানে এবং চারদিকের পাহাড়ের গায়ে লেপটে

নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় করে নিয়েছিল। পাহাড়গুলোও বেশ খানিকটা করে তখন জলের তলায় চলে গিয়ে থাকবে। কতদিন এভাবে কেটেছিল কে জানে! তারপর সমুদ্রের জল সরে গেল, স্পঞ্জগুলোও খাদ্যাভাবে মরে গেল, কিন্তু তাদের দেহ পুরু আস্তরের মতো উঁচু পাহাড়গুলোর গায়ে লেপটে রইল। এই স্পঞ্জ তো রবারের মতোই ইলাস্টিক, না হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি। সম্পূর্ণ ইলাস্টিক না হলেও তার কাছাকাছি হতে পারে।

"এবার আসি শব্দের কথায়। শব্দ তো বাতাসের ঢেউ। কিন্তু কোনও জায়গায় ধাক্কা খেলে তা আবার ঠিক সেইভাবে ফিরে আসতে পারে, যেভাবে তা উঠেছিল। ওকেই তো আমরা বলি প্রতিধ্বনি।

"চলে যাবার আগে বেশ কিছুদিন ধরে এখানকার বাসিন্দা যেসব আওয়াজ তুলেছিল, কান্না, হাসি, গোঙানি, চিৎকার, চেঁচামেচি, সেগুলোর ঢেউ ওই পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসেছে বারে-বারে। এ-পাহাড়ের দেওয়াল থেকে ও-পাহাড়ের দেওয়ালে, আবার সেখান থেকে অন্য পাহাড়ের দেওয়ালে, পাহাড়গুলোর গায়ে প্রায় সম্পূর্ণ ইলাস্টিক স্পঞ্জের আস্তর থাকায় সেগুলো এখনও থামেনি, সমানে ঘুরে-ঘুরে আসছে। পাহাড়গুলো কত উঁচু দেখেছিস তো? তাই তার উপর দিয়েও বেরিয়ে যেতে পারেনি সেই শব্দের ঢেউ। ফলে, দিনের পর দিন সে-শব্দ অবিরাম মুখরিত করে রেখেছে এই উপত্যকাকে। হয়তো আগের তুলনায় শব্দটা একটু ক্ষীণ হয়েছে, কিন্তু থামেনি। তাই নানারকম শব্দ মিশে একাকার হয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা জগাখিচুড়ি আওয়াজ, যেন দল বেঁধে একদল অদৃশ্য প্রেতাত্মা ওই সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ করে যাচ্ছে! লোকে তো ভয় পাবেই।"

"কিন্তু আমরা যে 'বন্দেমাতরম্' বললাম, সেটা ওর সঙ্গে মিশে গিয়ে তেমন জগাখিচুড়ি হল না তো?"

"আরে, তুই নিজে একজন বিজ্ঞানী হয়ে, হলিই না হয় প্রাণিবিজ্ঞানী, এমন প্রশ্ন করছিস কেন? একটু আগেই তো বললাম, ওটা যে সদ্য-তোলা চিৎকার। ওর জোর তো আগের তুলনায় একটু বেশি হবেই। তাই আগের আওয়াজগুলো ছাপিয়ে, তেমন স্পষ্ট না হলেও বেশ শুনতে পেয়েছি। কিন্তু তার আগে স্বাভাবিক গলায় আরও আস্তে আস্তে যেসব কথা বলেছি সেগুলোরও প্রতিধ্বনি নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে বলা হয়েছিল বলে পৃথকভাবে টের পাওয়া যায়নি।"

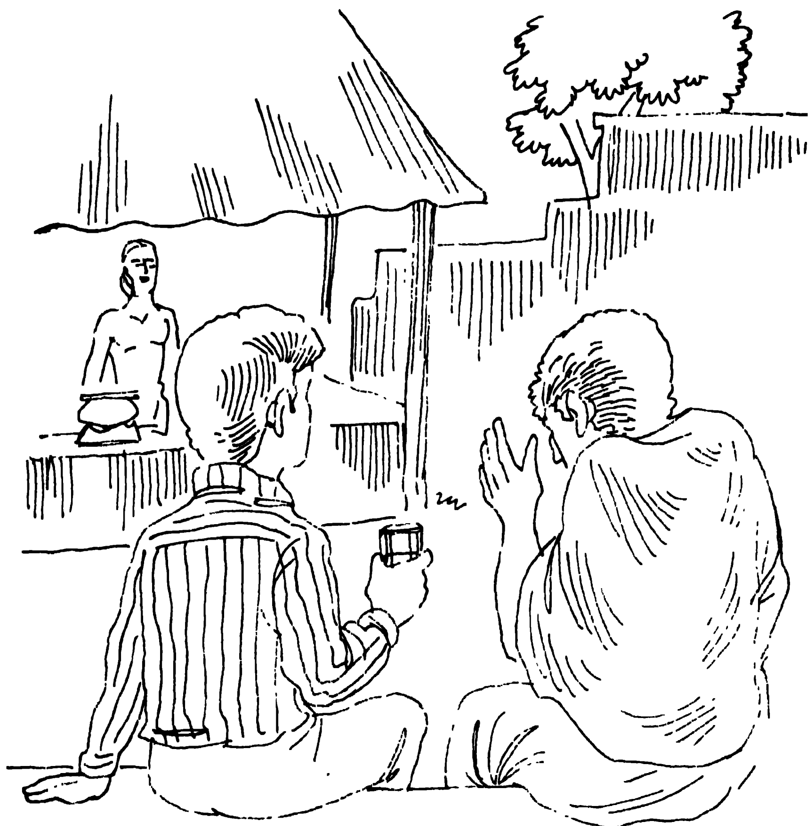
কঙ্কাবতী ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, "কী বুদ্ধি রে তোর! আমার ভাই না হলে এমন মাথা কারও খেলে?"

"যাঃ. বাজে বকিস না। কিন্তু আমাদের তো আবার মণ্টেভিডিওয় গিয়ে. আর একবার বক্তৃতা না দিলে চলবে না। প্রেতাত্মার উপত্যকার সমস্ত রহস্য ফাঁস না করে দিয়ে তো এখান থেকে যাওয়া চলে না। কাল মণ্টেভিডিওয় গিয়ে আমার বক্তব্য অন্তত একটা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলতেই হবে। তারপর এখানকার বিজ্ঞানীরাও এসে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। ওঁদের অন্তত ভূতের ভয় থাকবে না নিশ্চয়ই?"

কঙ্কাবতী তার ভাইয়ের মাথাটা আর-একবার নেড়ে নিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, "এখান থেকে বেরোবার সময়ে আবার তো সেই গাছে চড়তে হবে। ভাগ্যিস একটু আঁটসাঁট পোশাক পরে বেরিয়েছিলাম? কিন্তু আর দেরি করা ঠিক নয়। ওরা হয়তো গাড়ি নিয়ে স্টলের কাছে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আর ভাবছে, এতক্ষণে উপত্যকার অশরীরী প্রেতাত্মারা আমাদের ঘাড় মটকে দিল কি না।"

দু'জনেই খিলখিল করে হেসে উঠল।





মাত্র একখানা থান ইট

আশাপূর্ণা দেবী

মাত্র মিনিটপাঁচেক আগে, যখন সকালের প্রথম চায়ের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়েই বঙ্কু হাঁক পেড়ে বলে উঠেছিল, "কী বউদি, চা-টা কি আজ ভুল করে চিরতার জলে ভিজিয়ে ফেলেছিলে?" ...তখন কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল, পাঁচ মিনিট মাত্র পরেই সে আচমকা একটা খুনের আসামী হয়ে বসে সারা পৃথিবীটাকে ফুলেভরা সরষের খেত ভেবে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় মারবে সরষের খেত-বিহীন অন্য কোনও পৃথিবীতে গিয়ে আছড়ে পড়বার আশায়!

হ্যাঁ, আচমকা ওই খুনটা ঘটে যাওয়ার পরই দৌড় মেরেছিল বঙ্কু, আর মনে হচ্ছিল তার পিছু-পিছু ধেয়ে আসছে একটা তাজা রক্তের স্রোত, বঙ্কুকে গ্রাস করে ফেলবার জন্য। ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু—

খুনটা হল কে?

ওঃ। ভাবা যায় না।

একেবারে চিরকালের পাশের প্রতিবেশী গগন গাঙ্গুলি। তিনপুরুষে পাশাপাশি বাস করার সূত্রে বঙ্কুর বাবা সত্যহরি সরকার যাঁকে 'দাদা' বলে এসেছেন, আর বঙ্কুবিহারী জ্ঞানাবধিই 'জেঠু' ডেকে এসেছে। সত্যহরি নেই, তাঁর বিয়োগ ঘটেছে। থাকলে কী বলতেন তাঁর পুত্ররত্নটিকে?

কিন্তু বঙ্কুর কি কখনও খুন করবার কোনও মোটিভ ছিল? ...জেঠুকে, অথব আর কাউকে? ...বঙ্কুর জানা জগতে কেউ কখনও ভাবতেই পেরেছে, বঙ্কু হেন ছেলে, এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে?

অথচ সেটাই ঘটল। আর পালিয়ে বেড়ানো বঙ্কু অহরহ মনে-মনে ভেবে চলেছে, স্বর্গে চলে যাওয়া জেঠু বঙ্কুকে কি তাই ভাবছেন না? ছিল তেমন কোনও মোটিভ!...ভাববেন নাই-বা কেন? ...বারেবারে কি তিনি বঙ্কুকে ওয়ার্নিং-বেল দেননি? বলেননি, "ওরে বঙ্কা, ফের সেই গোঁয়ার্তুমি? তোর কপালে দেখছি খুনের দায়ে ফাঁসি যাওয়া লিখন রয়েছে!"

আর সেই তাঁকেই বঙ্কু—উঃ!

আহা, তিনি এখন আছেন কোথায়? স্বর্গে, না ইয়ে নরকে? ...আঃ, ছি ছি! গগন গাঙ্গুলির মতন লোক! কিন্তু পুরুতঠাকুররা যে বলে, "অপঘাতে মরারা স্বর্গ পায় না!" তা হলে? স্বর্গ-নরক দুটোর মাঝখানে কোনখানটায় ঠাঁই পেলেন?...

তা অপঘাতই তো! আচমকা মাথায় একখানা থান ইট এসে পড়ায় রক্তগঙ্গা হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে যা হওয়ার তা হয়ে গেলে সেটাকে অপঘাত বলতে হবে না?

উঃ। সেই ইটখানা মাথায় পড়া মাত্র কী আকাশ-ফাটানো চিৎকারই করে বসেছিলেন চিরকালের শান্ত মানুষটা। চিৎকারটা যেন এখনও আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রাস্তাতেই কি পড়েছিলেন গগন গাঙ্গুলি? তাকে কি রাস্তা বলে? গোয়াবাগান বাই লেনের এই ব্লাইণ্ড গলিটাকে কি রাস্তা বলে? সবেমাত্র নিজের বাড়ির দরজাটি থেকে বেরিয়ে গলিতে পা ফেলামাত্রই পাশের বাড়ির

ছাত থেকে সবেগে ধাঁই করে এসে তেল-চুকচুকে পাকা বেলের মতো টাকমাথাটিকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিল!

সে ইট কার?

বঙ্কুর নয়?

গগনবাবুর গগনবিদারী চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্কু ছাত থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল! ...পরক্ষণেই হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে নিজেদের বাড়ির দরজার খিলটা খুলে রকেটের বেগে ছুট মারল!

সেই বেগটা তাকে ছিটকে একেবারে এইখানে নিয়ে এসে ফেলেছে। ...এখন যেখানে বসে রয়েছে বঙ্কু।

এখন? শুধু বসেই নেই। একটা অজ পাড়াগাঁর খোয়াখোঁদল মেঠো রাস্তার ধারে একটা হতবিচ্ছিরি চালাঘর-এর চায়ের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে, পলকাটা মোটা কাচের একটা ময়লা চায়ের গেলাসে করে নিমপাতার রসের আস্বাদযুক্ত চা খাচ্ছে, মুখটা সিঁটকে-সিঁটকে।

এখন বঙ্কুর কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। তাদের সেই গোয়াবাগান বাই লেনের সাতকেলে পুরনো বাড়িটার দালানে, কেঠো টেবিলটার ধারে একখানা হাতলভাঙা আরও কেঠো চেয়ারে বসে বউদির হাতের চা-টায় চুমুক দিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, "চিরতার জলে ভিজিয়েছে না কি?"

সেই বঙ্কু কি এই বঙ্কু?...

যে বঙ্কু কলকাতা থেকে কে জানে কত দূরে এই একটা দেহাতি জায়গায় বসে রামতেতো চা খাচ্ছে।

জায়গাটা স্রেফ অজ পাড়াগাঁর মতো দেখতে।

অতঃপর? পালাতে হবে। ...পালাতে হবে।

এখান থেকে আরও দূরে-দূরান্তরে পালাতে হবে।

এখন বঙ্কুর একটাই স্বস্তি। এই রক্তগঙ্গাটা ঘটে বসবার আগেই বঙ্কুর বাইরে বেরোবার সাজসজ্জাটি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই চেহারায় ভদ্রস্থতা রয়েছে। একটু আগে যখন ল্যাতলেতে পায়জামা আর পিঠে জানলা-দরজাওয়ালা গেঞ্জিটা পরে বেড়াচ্ছিল, তখন যদি অমন হঠাৎ চোঁ-চোঁ দৌড়টা মারতে হত, তা হলে? সে অবস্থায় রাস্তায় দেখতে পেলেই তো পুলিশে ধরত!

এখন বহির্দৃশ্যে কোনও অসুবিধে নেই। ...তা ছাড়া পকেটে টাকা-পয়সাও রয়েছে কিছু। অন্যদিনের চেয়ে বরং বেশিই কিছু। কারণ, আজ বঙ্কু তার নিজের অর্গানাইজেশন গোয়াবাগান বাই লেনের কচিকাঁচাদের ফুটবল টিমের

নতুন ফুটবল কেনার জন্য টাকা নিয়ে বেরোচ্ছিল।

টাকাটা আছে। তাই আর-একটু দূরে পালাতে পারবার ভরসা হচ্ছে।...কিছু না হোক, দৈনিক দু-এক কাপ চা খেয়ে-খেয়েও দু-চারদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখানে হঠাৎ এসে পড়ল কেন বঙ্কু?

'কেন'র কিছু নেই। দিশেহারা হয়ে চেনা পাড়া থেকে সরতে-সরতে কোনখানে যেন একটা বাস-গুমটিতে ঢুকে পড়েছিল। ...দেখল, এ হচ্ছে দূরপাল্লার বাস গুমটি।

একজন কনডাক্টর চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, "ময়নাপুর...ময়নাপুর। ...লক্ষ্মীশোল... লক্ষ্মীশোল... ঘাঁটুই... ঘাঁটুই।"

বঙ্কুর কানে প্রথমটাই ঢুকে পড়েছিল, আর ঢোকামাত্রই টার্মিনাসে বসে-থাকা প্রায়-খালি বাসটার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ে একখানা ময়নাপুর-এর টিকিট কেটে নিয়েছিল।

ময়নাপুর বলে কোনও জায়গায় বঙ্কুর চেনা-পরিচিত কেউ আছে, এমন মনে হল না। ...অতএব আত্মগোপন করার পক্ষে সুবিধেজনক। এর পর তাক বুঝে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে ফেলতে পারলেই আশি পার্সেন্ট সেফ!

শ্যামবাজারের মোড় থেকে বাসটা ছাড়বার খানিকটা পর থেকেই বেশ যেন গ্রাম-গ্রাম ভাব দেখতে লাগল। তবে খালি বাস আর খালি রইল না। পিলপিল করে লোক উঠছে, নামছে।

বঙ্কুর ধারণা ছিল, দিকদিগন্তর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক কলকাতাতেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবুরা, বাজারু, হাটুরে সব লোকেরা মালপত্র নিয়ে। কিন্তু কলকাতা থেকে দৈনিক এত লোক মফস্বলে আসে? কী করতে? ...এতক্ষণ বঙ্কুর কানে কোনও কথা ঢুকছিল না, হঠাৎ কানে এল, "আর কী দাদা! এবার আমাদের কারখানাটিতেও তালা ঝুলল বলে।"

বঙ্কুর খেয়াল হল, ওঃ। কলকাতা থেকে বস্তা-বস্তা লোক যত সব কলকারখানায় ছোটে!

এত কথা কইছে সবাই। বাবাঃ। যেন কানের মধ্যে ড্রাম বাজছে। হঠাৎ কানে এল, "ঘাঁটুই। ঘাঁটুই...ঘাঁটুইয়ে কে নামবেন? চটপট নেমে পড়ুন!"

বঙ্কু হঠাৎ কী ভেবে, অথবা কিছু না ভেবে নেমে পড়ল এই ঘাঁটুইয়ে। যেখানে বঙ্কু বাঁশের বেঞ্চে বসে চালাঘর চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে।

নাঃ। এরকম জায়গায় পুলিশ-টুলিশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। অতএব নিরাপদ।

কিন্তু পৃথিবী কি কোনও সময় কখনও আপদশূন্য হতে পারে?

কোনওখানে কিছু না, হঠাৎ একটা মুসকোমতো লোক সেই বেঞ্চিটাতেই এসে বসল প্রায় বঙ্কুর গা-ঘেঁষে। গা-ঘেঁষা ছাড়া উপায় কী? এমন-কিছু আহামরি লম্বা তো নয় সেটা। ...তা ছাড়া শেষ মুড়োর দিকে বাঁশের খোঁচখাঁচ।

তা বসল, বসল, গায়ে পড়ে কথা বলতে আসা কেন? গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, "এখেনে এই নতুন বুঝি? ছারকে তো কই আগে দেখি নাই? এই গুপের চায়ের দোকানের সব খদ্দেরই তো আমার চেনা।"

যাক, চেনা নয়।

বঙ্কু নিশ্চিন্তভাবে বলে, "না, আগে কখনও আসিনি।"

"তো কী বাবদ আসা হয়েছে ছার?"

"ছার?"

বঙ্কু এখন লক্ষ করে লোকটা গোড়া থেকেই 'ছার ছার' মতোই কী একটা বলছে। 'ছার' মানেটা কী? ধিক্কার না?

বলে ফেলল বঙ্কু, "ছার মানে?"

"আজ্ঞে, ওই 'বাবু' আর কি! আজকালের ইয়ার ছেলেরা আবার বাবু ডাকটা নাকি তেমন পছন্দ করে না। তাই ছার বলা। আমার ভাগনা পদা বলে, ইস্কুলে-টিস্কুলে নাকি সমসকৃত পণ্ডিতমশাইর পর্য্যন্ত পণ্ডিতমশা'র বদলে ছার শুনতে চান।"

ওঃ। সার।

বঙ্কুর ধড়ে প্রাণ আসে। বলে, "কোনও কাজেটাজে আসিনি। এমনি ধরুন—গ্রাম দেখতে..."

"ধরব? ধরব কেন ছার? বলুন গেরাম দেখতে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই! কলকাতার ছেলে, গ্রামট্রাম তো দেখা হয় না!"

"অ। তো এখন আর গেরামের কী দেখবেন? আগের কালের গেরামের সে শোভা সৌন্দর্য আছে? এখন এ হচ্ছে না শহর না মফস্বল। খেরো খিচুড়ি। কী সব গাছগাছালি ছিল। আমবাগান, জামবাগান, কাঁঠালবাগান, জামরুল, পেয়ারা ফলের বেন্দাবন। আমরা তো ছার ছেলেবেলায় বাড়িতে গেরস্তর বরাদ্দ জলখাবার খেতে টাইম পেতুম না। হনুমানের মতো শুধু গাছে চড়ে-চড়ে ফলপাকুড় খেয়ে পেট ভরিয়েছি। এখন? কেউ কারও বাগানের দিকে ঘেঁষুক দিকি! কড়া প্পাহারা। তা ছাড়া থাকছেই বা কোথা? সব তো কেটে সাফ করে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়ি বানাচ্ছে। একটা পেয়ারা জোটে না ছেলেপেলের।"

বঙ্কু আর কী বলে? বলে, "তাই বুঝি?"

"তাই তো। তা ছাড়া ছেলেপুলেরাও তো আর এখন বাচ্চা থাকছে না। এইটুকু বয়েসে আচ্ছা হয়ে উঠছে। ...আবার ডেরাগ না ছাইপাঁশ কী যেন ধরে। পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেয়। বাপ-মা গার্জেনরা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এও একটা বেবসা হয়েছে পুলিশের। যেমন, লোকেদের মাঠে চরে বেড়ানো গোরুগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাউণ্ডে জমা দিয়ে বলে এল, 'আমার বাগানের গাছপালা খেয়ে নষ্ট করেছে।' গোরুর মালিক তখন টাকা দিয়ে গোরু ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য। ...তো ছেলেপুলেও তো আজকাল..."

কিন্তু বঙ্কুর কানে কী এসব কথা ঢুকছে? বঙ্কুর কানে বোমা দেগেছে, পুলিশ! বঙ্কুর প্রাণের মধ্যে হাজারটা বিছে কিলবিল করে উঠেছে। বঙ্কু বলে ওঠে, "এখানে—মানে এই অজ পাঁড়াগাতেও?"

"কী? কী বলছেন ছার?"

"মানে বলছি, এখানেও থানাটানা, পুলিশটুলিশ আছে? এতটুকু ছোট জায়গা?"

"শোনেন কথা। পুলিশ আবার কোথায় না থাকে? তবে দরকারের সময় কী আর আসে? অকাজের সময় আসে। তবে হ্যাঁ, থানাটা ঠিক এই ঘাঁটুইতে নেই। আছে সদরে। ময়নাপুরে। তো ওই যা বললুম, এই তো সেদিনকে সামান্য একটা ভাগের পাঁচিল তোলা নিয়ে, খুড়ো-ভাইপোর সঙ্ঘর্ষ! ভাইপো এই পাঁচিল গাঁথুনির একখানা থান ইট তুলে নিয়ে খুড়োর মাথায় বসিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে ফেরার। ...পুলিশ এল পরাদন। খুড়ো তখন মর্গে। ভাইপো নো পাত্তা।"

এ কী?

এসব কথা শোনাচ্ছে কেন লোকটা বঙ্কুকে? বঙ্কুর মধ্যে যে দামামা বেজেই চলেছে। ...ভাইপো! থান ইট! রক্তগঙ্গা। ...ফেরার! ...খুড়ো আর জ্যাঠায় তফাত কী? দুই তো আঙ্কেল। ...লোকটা কে? গোয়েন্দার চর? ...কিন্তু এক্ষুনি, এই ক' ঘণ্টার মধ্যে গোয়াবাগান বাই লেনের খবর গোয়েন্দা-পুলিশের কাছে চলে গিয়ে অ্যাকশান শুরু? এই ঘাঁটুইতে এসে গেছে? এত করিৎকর্মা এ-রাজ্যের পুলিশ? না কি কোনও প্রাইভেট গোয়েন্দা? যারা মুহূর্তে অসাধ্য সাধন করতে পারে। দোষীর মুখ দেখলেই চিনে ফেলতে পারে!

বঙ্কুর চোখের সামনে একটা ফাঁস-লাগানো ফাঁসির দড়ি ঝুলতে থাকে। সিনেমায়-টিনেমায় যেমন দেখা যায়।

বঙ্কু হঠাৎ উঠে চোঁ-চাঁ দৌড় মারে। দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে কাঁটাঝোপে পা ছড়ে গিয়ে, খানাখন্দে ঠোক্কর খেয়ে...

"কী হল? ও মশাই, কী হল? হঠাৎ ছুটলেন কেন?"

মুচকি হেসে বলে, "বুঝছেন না? হেড আপিসে গণ্ডগোল। তা নয় তো, অমন ফিটফাট ধোপদূরস্ত চেহারার ছোকরা এই অভাগা গুপের দোকানে চা খেতে আসে? এস্টেশনে স্টল নাই? সিনেমা হাউসের ধারে রেস্টুরেণ্ট নাই?"

তারপর? দিন কাটছে...রাত কাটছে সপ্তাহ কাটছে, মাস কাটছে, সেই দৌড় মারাই চলছে এখনও বঙ্কুর।

ক্রমশ সেই ধোপদুরস্ত চেহারা আর থাকে না। পকেটের পয়সাও জবাব দেয়। ...বঙ্কু সর্বত্র পুলিশের ছায়া দেখে। ...আর পালায়!

শুধু ছায়া কেন? কায়াই তো!

পানের দোকানে বসে ডলে-ডলে খৈনি খাচ্ছে পুলিশ! পাঞ্জাবির মাংস-পরোটার দোকানে বসে, মৌজ করে বিনি পয়সায় ভোজ চালিয়ে চলেছে পুলিশ! বাসে বিনা-টিকিটে চড়ে বসছে পুলিশ।

সারা জগৎটা যেন পুলিশে থিকথিক করছে! এদের মধ্যে কে যে কোন বিভাগের কে জানে! গোয়েন্দা-পুলিশ থাকতেই পারে। বঙ্কু এখন কী করবে?

বঙ্কুর তো এখন আর ছদ্মবেশেরও দরকার নেই। একমাত্র বঙ্কু প্রায়-ভিখিরির চেহারায় পৌঁছে গেছে। ...আর যেই যেখানে-সেখানে আনাচে-কানাচে একটু ঘাপটি মেরে বসছে, কী চেয়েচিন্তে শালপাতায় করে একটু আলুকাবলি, কি ঘুগনি খেয়ে খিদে মেটাতে চেষ্টা করছে, কোথা থেকে একজন পুলিশ এসে হাজির হচ্ছে। "অ্যাই, এখানে কী হচ্ছে? কে তুই? মুলুক কাঁহা? ...চোরি চৌরি করে পালাচ্ছিস? না কি, ডাকাইতি? না খুনভি? চল থানায় ঘুষে দিই গে!"

বঙ্কু হঠাৎ ভাবতে থাকে, তবে না কি দেশে পুলিশরা নিষ্ক্রিয়? কাগজে তো তাই লিখত! বঙ্কুর মতো একটা সামান্য প্রাণী, বেপোটে একটা খুন করে ফেলে, আত্মগোপন করে বেড়াতে যাওয়ায় বিশ্বভুবন পুলিশে ছেয়ে গেছে? ...সর্বত্র তাদের জাল পাতা?

অথচ বঙ্কু সত্যিই কিন্তু আর কোনও মোটিভ নিয়ে জেঠুর তেল-চুকচুকে টাকটাকে লক্ষ্য করে থান ইটখানা ফেলেনি তিনতলার ছাত থেকে!...

ঘটনাটা আদ্যোপান্ত ভাবতে থাকে বঙ্কু।

ওই গোয়াবাগান বাই লেনের বাড়িটায় সুয্যিঠাকুরের ছিল প্রায়

ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক। রোদের মুখ দেখা যায় না সারাদিন। ...কেবলমাত্র ভোর-সকালে গলির দু'পাশের বৃহৎ-বৃহৎ বাড়িগুলোর কোনও একটার ফাঁকফোঁকর ভেদ করে একচিলতে রোদ এসে পড়ে বঙ্কুদের বাড়ির ছাতে। ...পাঁচিলের একটা কোনায় বঙ্কু ভোরবেলা জগিং সেরে এসে, চান করে। তখন তার রতে পরা বাসী ছাড়া সিল্কের লুঙ্গিটাকে কেচে নিয়ে সেই চিলতে রোদটুকুর ওপর বিছিয়ে একখানা থান ইট চাপা দিয়ে শুকোতে দিয়ে নীচে নেমে যায় চা খেতে। তারপর সাজগোজ সেরে লুঙ্গিটাকে তুলে নিয়ে পাট করে নিজের ঘরে রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একদিন ভুলে গেলেই তো রাতে আর সহজে সেই লুঙ্গিকে খুঁজে পায় না। না তুলেছে? কোন ঘরের আলনায় রেখেছে? দাদারটার সঙ্গে গুলিয়ে গেছে মনে হচ্ছে—এইসব বেয়াড়া ব্যাপার ঘটতে থাকে। মা রেগেমেগে বলেন, "তো রাতদুপুরে ওই লুঙ্গি-টুঙ্গি করেই বা বাড়ি মাথায় করছিস কেন? আছে কোথাও? আর কিছু পরবার নেই তোর!..."

অতএব "আপনা হাত জগন্নাথ। নিজের কাজ নিজেই করো!"

এদিকে ব্যাপারটা এই—বঙ্কু যখন ছাতে এসে রোদটুকু সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে, ঠিক সেই সময়ই একেবারে পাশাপাশি ছাতে গগন গাঙ্গুলি উঠে আসেন সূর্যপ্রণাম সারতে। আট ফুট গলির দু'ধারে সেকেলে ঢাউশ-ঢাউশ দোতলা, তিনতলা বাড়িগুলোর কোনও একটু খাঁজ দিয়ে সূর্যের মুখটুকু একটু দেখতে পেলেই, উদাত্ত কণ্ঠে আওড়াতে শুরু করেন, "নমো জবাকুসুম সঙ্কাশং—"

চোখ বুজেই বলেন। তবু কেমন করেই যেন বঙ্কুঘটিত ঘটনা তাঁর চোখে পড়ে যায়। আর পড়লেই চেঁচিয়ে ওঠেন, "অ্যাই বঙ্কা, ওটা কী হচ্ছে? হঠাৎ জোর বাতাস এলে তোর সিল্কের লুঙ্গি উড়তে থাকলেই থান ইটখানা রাস্তায় পড়ে বসলে, কী কান্ড হবে খেয়াল নেই? খুনের দায়ে ফাঁসি যাবি রে আহাম্মক।"

সে-কথায় আমল দেয় না বঙ্কা। ভাবে, হুঁঃ। জোর বাতাস! এ গলিতে বলে, 'মলয় বাতাসই বয় না, তো জোর বাতাস!'

অতএব নিজের পদ্ধতিটি চালিয়েই যায়।

কিন্তু? হঠাৎ আচমকা ঘটেই গেল সেই অঘটন!

তবে হাওয়ায় উড়ে নয়। বঙ্কুরই হাতের টানে। বেরোবার আগে তাড়াতাড়ি লুঙ্গিখানাকে তুলে রাখতে গিয়েই—সিল্কের লুঙ্গিটা কেমন ফ্যাস করে ফেঁসে গেল। আর ইটখানা ঠিক কাটা ঘুড়ির মতো যেন ফস করে নীচে নেমে গেল!

তার মানে, লুঙ্গিটা শুধু নিজেই ফাঁসল না, বঙ্কুকেও ফাঁসিয়ে দিল।

আর ঠিক সেই মহামুহূর্তটিতেই গগন গাঙ্গুলির টাক-মাথাটি নিয়ে সেইখানটি দিয়েই যাওয়ার দরকার পড়ল কেন?

এ আর কিছু নয়। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী টিকে ফলপ্রসূ করবার জন্যই। কেন? আর কয়েক সেকেন্ড আগে বা পরে ওর ওখান দিয়ে যাওয়া চলত না? সেই যে বলেছিলেন, "বঙ্কা, কোনওদিন খুনের দায়ে ফাঁসি যাবি।"

ব্যস! তদবধি বঙ্কু না-জ্যন্ত না-মরা হয়ে অজানা-অচেনা সব বিদঘুটে-বিদঘুটে জায়গায় পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হদ্দ ভিখিরির অবস্থা।

একদিন একটা পানের দোকানে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে দেখে বঙ্কু যেন হাঁ হয়ে গেল।

এ কে? বঙ্কু নামের সেই ছেলেটা?

গোয়াবাগান বাই লেনের কচিকাঁচাদের ক্লাবের ছেলেদের প্রাণের ঠাকুর বঙ্কুদা!

পাড়ার সক্কলের প্রিয়পাত্র পরোপকারী বাবা বঙ্কুবিহারী? ভাই বঙ্কু! ওঃ, না, না! এ অসম্ভব। বঙ্কু সত্যিই রাস্তার ভিখিরি বা পাগলা'র মতোই দোকানে-পসারে এটা-ওটা চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে-! চালাকি করে হয়তো সত্যিই পাগলের ভান করছে!

কেন? না, প্রাণের ভয়ে?

ছি, ছি ছি। প্রাণ এত দামি? ধ্যাত!

হঠাৎ বঙ্কুর মনের মধ্যে তার বড়পিসিমার একটা কথা যেন বেজে উঠল। বড়পিসিমা রাগটাগ হলেই যখন-তখন বলে ওঠেন, "গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, এমন বাঁচনের থেকে মরণ ভাল।"

কথাটা মনে পড়তেই বঙ্কুর মনের মধ্যে একটি দিব্যজ্ঞানের উদয় হল। ঠিক! ঠিক! এমনভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল! ...পুলিশের ভয়ে, অর্থাৎ ফাঁসি যাওয়ার ভয়ে যে বঙ্কু এই এত দিন কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটোছুটি করে আর পালিয়ে-পালিয়ে একটা ভিখিরিতুল্য হয়ে পড়েছে, সে ঠিক করে ফেলল, এর চেয়ে মরাই ভাল!

কিন্তু মরব বললেই তো মরা হয় না? তার জন্যও তো উপকরণ চাই? গলায় দড়ি দিতে দড়ি চাই। বিষ খেতে বিষ চাই, পুড়ে মরতে হলে কেরোসিন চাই!

আছে সে-সবের কিছু বঙ্কুর নাগালে?

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মাথায় এল, আছে! একটা জিনিস

আছে!...ইউরেকা!

রেললাইন আছে।

তাতে গলা রেখে পড়ে থাকলেই ব্যস! কাজ হাসিল, কেল্লা ফতে।

আঃ, বিনা উপকরণের এই মোক্ষম ব্যবস্থাটি মনে পড়ে যাওয়ায় বঙ্কু নিজেকেই নিজে বাহাদুরি দিল।

এলোমেলোভাবে হাঁটতে-হাঁটতে বঙ্কু এখন যেখানে এসে পড়েছে, সে-জায়গাটার নাম জানে না বঙ্কু। তবে দেখে কাছাকাছিই রেললাইন আছে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ট্রেন আসা-যাওয়া করে।

ইলেকট্রিক ট্রেন।

শটশট আসে, যায়। মনে হয়, যত সব ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুরা চড়ে এতে। যায়, ফেরে। বঙ্কু সেই রেলের বাঁশি শুনতে পায়।

আপাতত বঙ্কু আস্তানা গেড়েছে একটা অতি-পুরনো গায়ে ফাটল-ধরা কালীমন্দিরের পেছনে একটা বেলগাছতলায়। কালীমন্দিরটার নাম নাকি মহাকালীর মন্দির। পুরনো হলেও নিত্যপুজোর ব্যবস্থা আছে। আর বিশেষ-বিশেষ দিনে খুব বোল-বোলাও! অনেক ভক্তটক্ত আসে।

আর এতেই সুবিধে হয়েছে বঙ্কুর।

বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরটি পেছনের গাছতলায় পড়ে থাকা পাগলটাকে দয়াধর্ম করে পুজোর প্রসাদ-ভোগের প্রসাদট্রসাদ দেন একটু।

তবে লোকে যেভাবে কুকুর-বেড়ালকে ডাকে, "এই আয়, তু তু।" সেইভাবে পাতায় মোড়া খাদ্যবস্তু হাতে নিয়ে ডাক দেন, "অ্যাই পাগলা আয়।"

তা হোক, পেট জ্বলে যাওয়া খিদের সময় খাদ্যবস্তু ছাড়া যায়?

দিন কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এ কি আবার বাঁচা?

হঠাৎই বঙ্কুর এই দিব্যজ্ঞানটি জন্মাল।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। চুপিচুপি কাজটা সেরে ফেলা যাক।

তো দিনের আলোয় তো চুপিচুপি হয় না।রাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

আজই সেই রাতটা হোক।

আজ সন্ধ্যায় পুরুতঠাকুর সন্ধেপুজো সেরে চলে গেলেই রেলগাড়ির শব্দ পেলেই ছুট মারবে বঙ্কু। আর ছুটে গিয়েই লাইনের ওপর গিয়ে ঝাঁপ দেবে।

আজ অবস্থা খুব অনুকূল। বোধ হয় অমাবস্যাটস্যা কিছু হবে। সন্ধে থেকেই গভীর অন্ধকার। নী নী করছে চারদিক।

লাস্ট ট্রেনটা কখন ফিরবে কে জানে। যে বঙ্কুর হাতে সর্বদা ঘড়ি বাঁধা থাকত, সে আজ সময়জ্ঞান হারাল!

তবে শুনে শুনে আন্দাজ হয়েছে।

মনে হচ্ছে এইখান থেকে যতসব লোক গুড়ের নাগরীর মতো ঠেসে কলকাতায় গিয়ে পড়েছিল, তারা এখন সেইভাবে ঠাসা হয়ে আবার ফিরছে। মাঝে মাঝেই থামে আর কিছু বস্তা লোককে নামিয়ে দিয়ে আবার ছুট মারে।

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ট্রেন আসার শব্দ পেল বঙ্কু। শুনেই পড়ি তো মরি করেই ছুট মারল

ট্রেনটা যেন না পালায়। আসছে। কাছে আসছে।

বঙ্কু ছুটে এসে লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু এ কী! আসতে আসতে প্রায় এসে কাছে আসার সময় হঠাৎ খ্যাঁচ করে থেমে গেল যে!

বঙ্কু পড়ে থেকেই দেখতে পেল, অনেক লোক ওই বে-জায়গাতেই নেমে পড়ে বলাবলি করছে, হয়ে গেল। কারেন্ট অফ হয়ে গেল। এখন দেখুন, কতক্ষণ অচল অধম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকে। ও কী! ওখানে কী? অ্যাঁ। গোরুটোরু না কি!

ও বাবা! বঙ্কুর বুক কাঁপে।

এইদিকেই আসছে মনে হচ্ছে। একজনের হাতে আবার টর্চ। তার মানে লাইনে গলা দিয়ে পড়ে থাকা বঙ্কুকে দেখতে পাবে। আর পেলেই রেলপুলিশকে খবর দেবে।

বঙ্কু আবার উঠে পড়ে পাঁই পাঁই ছুট মেরে সোজা সেই মন্দিরের পেছনের বেলগাছতলায়। বুক ধড়ফড় করছে।

আর ঠিক সেই সময়ই যেন বৃষ্টি এল মনে হচ্ছে।

হায়। একেই বলে অভাগার কপাল। সামান্য একটু মরা। তাও হয় না। বেশ বিনি পয়সায় হয়ে যাচ্ছিল। মা কালী। এই তোমার ব্যবহার।

বঙ্কু মন্দিরের পেছন থেকে ঘুরে সামনের দিকে এল মন্দিরের সামনের চাতালে। রাত হলেই গাছতলা থেকে এখানেই এসে শোয়। মাথাটা তো ঢাকা এখানে।

কিন্তু এ কী? এসে এ কী দেখল বঙ্কু?

অ্যাঁ। কাকে দেখল?

এখনও যে মন্দিরের দরজা খোলা। ভেতরে কে বসে?

বঙ্কু সেইদিকে তাকিয়ে... ভূ ভ় ভূ" করে লটকে পড়ল!

আর শুনতে পেল, পুরুতঠাকুরের গলার স্বর, ও কিচ্ছু না! একটা পাগলা থাকে এদিকে। বিষ্টি এল বলে মন্দিরের চাতালে উঠে এসেছে। আপনি পুজো চালিয়ে যান। এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হলেই দেখবেন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। হারানো মানিক ফিরে আসবে।"

কিন্তু বঙ্কুর যে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কুর যে বড্ড ভূতের ভয়। জেঠু কোথা থেকে আসবে? চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে।

জেঠু শেষে কিনা ভূত হয়ে গিয়ে কালীমন্দিরে! তা হতেই পারে। যত সব ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী তো মা কালীর সঙ্গী।

বঙ্কুকে তা হলে এখন জেঠুর ভূতের মুখে পড়তে হবে।

আর ছুট মারবার উপায়ও নেই। দারুণ বৃষ্টি নেমে গেছে। ছাট আসছে।

পুরুতমশাই একটা জ্বলন্ত প্রদীপ ধরে কাছে এসে নিচু হয়ে বলে ওঠেন, "এই পাগলা! এদিকে সরে আয়? গায়ে ছাট আসছে।"

কিন্তু ততক্ষণে?

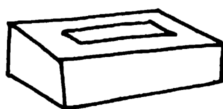
ততক্ষণে ভূতটা যে বঙ্কুকে দু'হাতে জাপটে, "এই হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া বঙ্কা! এতদিন ছিলি কোথায়? চল তো আমার সঙ্গে—"

তার মানে, ভূত নয়। জেঠু-সাজা গোয়েন্দা। এত দূরে এসেও বঙ্কুকে খুঁজে বের করেছে?

বঙ্কু সেই গোয়েন্দা অথবা ভূত অথবা জেঠুর জাপটানি থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

কী করে পারবে? টেকো মাথায় গোটা কতক স্টিচ পড়লেও চেহারাটি তো যে জাঁদরেল সেই জাঁদরেল! আর বঙ্কু? চিরকেলে টিংটিঙে, তায় আবার এখন এই অ্যাতদিন না খেয়ে না শুয়ে স্রেফ নেংটি ইঁদুর! চিঁ চিঁ করে বলল, "জে-জেঠু, তুমি বেঁ-চে আছ?"

জেঠু সদর্পে বলেন, "আলবাত আছি, থাকব না তো কী, পাড়ার লোকে তোর পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে খুনের দায়ে ফেলবে, তাই দেখব? ফুঃ! মাত্র তো একখানা থান ইট! তাতে এই গগন গাঙ্গুলি ঘায়েল হবে? চল, এখন তোকে তোর থানায় জমা দিই গে, তারা তোকে লক আপ-এ পুরুক!"





চকমকি মণি

লীলা মজুমদার

উত্তর কলকাতার একটা পুরানো পাড়ার ছাদের নতুন ফ্যাশনেব্‌ল ফ্ল্যাটে দেয়ালে গাঁথা যে লোহার সিন্দুকটি আছে, মধ্য-কলকাতার কোনো নামকরা দোকান থেকে সেটাকে ওভাবে নিলামে কেনা ওদের ভুল হয়েছিল। তার কারণ ওর একমাত্র চাবিটাও সঙ্গে ঝোলানো ছিল এবং সব নিলামঘরের যেমন নিয়ম, বিক্রির আগের তিনদিন সেটা সম্ভাব্য ক্রেতাদের সুবিধার জন্য, দোকানে প্রকাশ্যভাবে সাজানো ছিল, যাতে যার ইচ্ছা সে এসে পরখ করে দেখে যেতে পারে। অবিশ্যি উপযুক্ত প্রহরীদের সমক্ষে। সেবার কিছু বেশী

সংখ্যায় মূল্যবান আসবাবপত্র একসঙ্গে এসে পড়াতে কয়েকজন অস্থায়ী পাহারাদারদের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটু তৎপর আর ধূর্ত কারো পক্ষে সকলের অলক্ষ্যে মোমের প্যাডে ঐ চাবির দুপিঠের ছাপ তুলে নেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল না।

দুঃখের বিষয় কারিগর যতই ওস্তাদ হোক না কেন আর সত্যি কথা বলতে কি মিছিমিছি তো আর কানুকে মাছিমাষ্টার নাম দেয়নি লোকে। মাছির মতো খাড়া দেয়াল বেয়ে তরতর করে পাঁচ-ছয় তলা উঠে পড়া ওর কাছে কিছুই ছিল না। শেখাত না কাউকে। নাক সিঁটকে বলত, মাছিকে টিকটিকিকে ও-ভাবে উঠতেই বা শিখিয়েছে কে ? অনেকের ধারনা ছিল কানুর হাত-পায়ের তেলোর গড়ন অন্য রকম। আবার কেউ কেউ বলত লুকিয়ে লুকিয়ে ও নিশ্চয় হাতে পায়ে কিছু পরে নেয়। ঐ যে রেলগাড়িতে এক রকম তোয়ালে ঝুলোবার হুক বিক্রি করে, সেগুলো দেয়ালে বা দরজায় চেপে দিলে সেঁটে যায়। তাতে হাল্কা তোয়ালে গামছা বেশ ঝুলিয়ে রাখা যায়। কয়েকদিন পরে কে জানে কেন জিনিসটা আর কাজ করে না। যে কারণেই হোক না কেন, মানুষ মাত্রেই মাঝে মাঝে অপঘাতের বলি হতে পারে। এক্ষেত্রে কানু আপাতদৃষ্টিতে হাজার অলৌকিক ক্ষমতা ধরুকনা কেন, তবু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ সন্ধ্যায় মাটি থেকে দশ বারো ফুট উঁচুতে থাকতেই কেমন করে তার হাত পা হড়কে, দেয়ালে খামচাতে খামচাতে একেবারে নিচে পৌঁছে গেল। হয়তো কোথাও কিছু জখম হয়ে থাকবে, নিদেন হাড়গোড় ভেঙে কিম্বা সরে গিয়ে থাকতেও পারে, মোট কথা বাড়িটার রকের ওপর পড়েছে তো হাত পা এলিয়ে পড়েই রইল। মনে হল হাত পা যেন আর চলে না ; ঐ রকম আধশোয়া ভাবে এলিয়ে আছে তো এলিয়েই আছে। নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই, কিছু ভাবনা চিন্তা করার শক্তি টুকুও নেই। সুখের বিষয় শত্রুপক্ষের হাতে পড়লেও ক্ষতি নেই। মাছিমাস্টার অমন কাঁচা কাজ করে না। একটা হাতে বাঁধা মাদুলির মধ্যে যা পোরা যায় না, তার বেশী কোনো হাতিয়ারও নেই। সেকালের পেশাদারদের মতো নেংটি পরে, তেল মেখে হড়হড়ে গা, চিমটি দিয়ে ধরা যায় না এমনি প্রায় —ন্যাড়া মাথা নিয়ে ঠিক যেন বিজ্ঞাপন দিতে দিতে কানু কাজে বেরোয় না। নীল সরু ঠ্যাং প্যান্টালুন রবারের চপ্পল (সেটি অবিশ্যি খুলে রাখা হয়) সামনে পেছনে সমান লম্বা চুল, যে কোনো ভদ্রলোকের ছেলের মতো চেহারা। সে দিক দিয়ে কোনো ভয় নেই।

একইভাবে পড়ে থেকে কেমন ঢুল আসছিল আর সঙ্গে কানে একটা একটানা গুনগুন শব্দও পৌঁছচ্ছিল। হঠাৎ কানুর চোখের ঘুম ছুটে গেল।

তার সম্বিৎ ফিরে এল। সে চমকে উঠে গেল। অনেককাল পরে তার গলার ধারে কোতরঙ্গে কাটানো ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কারণটাও মনে পড়ে গেল। স্নানের ঘাটের পাশে সেখানে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তার পেছনে পুরনো একতলা বাড়িতে একজন স্থানীয় জমিদার অনেকদিন আগে একটা পাঠশালা করে দিয়েছিলেন। সেই পাঠশালাতে কানু পড়ত। পড়ত মানে যেত আসত, বাইরের ফাটা চাতালে অন্যান্য বিখ্যাত লোকেদের মতো অনেক সময় হাঁটু গেড়ে বসেও থাকত, পকেট থেকে গুলতি বের করে অঙ্ক কষতে ব্যস্ত বন্ধুদের কাগজের গুলি কিম্বা নুড়ি মারত। ক্লাসে অংক স্যার হয় দেখেও দেখতেন না, নয়তো এতই অন্যমনস্ক যে কিছুই লক্ষ্য করতেন না। তাঁর শেষটাও ভারি অদ্ভুত। রহস্যজনকভাবে হঠাৎ একদিন অদৃশ্যও হয়ে গেলেন।

বিশেষ করে সেই দিনের কথাই হয়তো আজ কুড়ি বছর পরে কানুর মনে পড়ল। তার আগের দিন গঙ্গায় বড় বান ডেকেছিল ; সে সময় এদিককার ঘাটটাট সব ডুবে যায়; পরে চাতালে নতুন নতুন ফাটল দেখা যায়। তা সেদিনও কানু ক্লাসে অংকের খাতা না আনার জন্যে চাতালে হাঁটু গাড়ল। কত করে অংক স্যারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে খাতাটা খুঁজেই পেল না, তা আনবে। অন্যমনস্ক ভাবে ভ্রুকুটি করে স্যার চাতাল দেখিয়ে দিলেন।

রোদের তেজ ছিলনা, হাঁটু গাড়তে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল চাতালে একটা নতুন ফাটল ধরেছে আর তার ভিতরে একটা কোনো সাপের কি অন্য জানোয়ারের চোখ কিম্বা কোনো মণিমুক্তাও হতে পারে, কেমন যেন সবুজ আলো ছিটোচ্ছে। তার থেকে কানু চোখ ফেরাতে পারছিল না, অথচ দুচোখ ঝলসে যাচ্ছিল, মাথা ঝিমঝিম করছিল মনে হচ্ছিল এক্ষুনি পড়ে যাবে। বোধয় কেমন একটা ঘোর লেগে গেছিল, তারি মধ্যে টের পেল অংক স্যার কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। আঙুল দিয়ে একবার সেই সবুজ আলোটার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল কানু, তারপর আর কিছু মনে নেই। অংক স্যারও হাঁকডাক করে সবাইকে ডেকে দিয়ে সেই যে 'ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি', বলে চলে গেলেন তারপর বেমালুম অদর্শন হলেন। ডাক্তার এসে যখন ওকে দেখছিলেন কানুকে ততক্ষণে ক্লাসঘরের বেঞ্চিতে শোয়ানো হয়েছে। মুখে মাথায় জলের ছিটা দিতেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু মাস্টাররা সকলেই অংকস্যারের খুব নিন্দা করেছিলেন, তা ছেলেরা একটু দুরন্তপনা করেই থাকে, তাই বলে ঠা-ঠা রোদে গরম সানের ওপর হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা। বিশেষ করে ওই ছেলে যখন হাইস্কুলের সমস্কিত মাস্টারের নিজের কে হয়। এসব

কথা যখন হচ্ছিল কানু মটকা মেরে পড়েছিল। তাকে ক'দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল ; তারি মধ্যে সে একবার চাতালের সেই নতুন ফাটলটা দেখে এসেছিল। সেখানে কিচ্ছু চকচক করছে না, ব্যাঙ ট্যাঙের চোখই হবেও বা। কিন্তু সেই ইস্তক অংক স্যারকে আর কেউ দেখেনি।

দেখেনি তো দেখেইনি। কাগজে নিখোঁজ বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ; তারা কোতরঙ্গে আর চারপাশের সব ছোট শহর-গাঁয়ে যথাসাধ্য তদন্তও করেছিল। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় নিশ্চিহ্ন হয় তাকে কি কখনও পাওয়া যায়? নিঃসন্দেহে তিনি স্বেচ্ছায়ই গিয়েছেন, কারণ মেস্‌বাড়ির পাওনা চুকিয়ে ছোট্ট সুটকেস আর বিছানা বেঁধে পাশের অমিয়-ক্যাবিনে এক টাকা দিয়ে পেট ভরে ভাত রুটি আর ঘ্যাট খেয়ে বাস স্টপের দিকে হাঁটা দিতে তাকে নাকি দেখা গেছিল। তবে খবরটা ভুলও হতে পারে, কারণ একেকজন একেকটা বাস স্টপের কথা বলেছিল। নিতান্ত অস্থায়ী ভাবে কাজে এসেছিলেন, ওর নামে কোনো মামলা বা অভিযোগও ছিল না। কোনো পাওনাদারও হামলা দেয়নি। কাজেই দুদিনে সবাই তাকে বেমালুম ভুলে গেল। কানুও এর পরেও এত মাস্টারের কাছে এত বিচিত্র সাজা পেয়েছিল, যে মনের মধ্যে ক্রমে তার চেহারাটাও ফিকে হয়ে গেছিল।

আজ কেন জানি চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ল। সাদা পাঞ্জাবী, খাটো থান ধুতি পরনে, পায়ে দড়ির তলা কাপড়ের চটি। রোগা, লম্বা অত্যন্ত ফরসা আর কপালের ঠিক মাঝখানে বেশ বড় এবং লম্বাটে একটা আঁচিল না জরুল। আসলে অতি ভালো মানুষ, তা কানুও তো কম জ্বালায়নি ওকে । সেজন্য হঠাৎ ভারি লজ্জা হল। পিসেমশায়ের সুপারিশে হাই স্কুলের ছয় ক্লাসে ভরতি হয়েছিল। কোনো মতে টেনেটুনে সাত আর আটও ম্যানেজ করেছিল। কিন্তু ঐ অবধি। আট থেকে নয় তিনবার চেষ্টা করেও যখন হলনা, তখন ওর পিসেমশাই রেগেমেগে কান ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। মা-বাপ ছিল না।

সেই ইস্তক চরে খেয়েছে কানু। তবে মন্দ কাটেনি গত কুড়িটা বছর। প্রথমে পালোয়ানজির আখড়ায় সাগরেদি, তারপর পালোয়ানজির ফ্রেন্ড ওস্তাদজি তার লোহার কারখানায় ওকে চাকরি দিল। লোহার আলমারি, যে কোনো সেফটি তালা-লাগানো সিন্দুক, বাক্স সেফ ওর হাতে পাঁচ মিনিটে ম্যাজিকের মতো নিঃশব্দে খুলে যেত। শেষটা একদিন ওস্তাদজি উল্টে ওর পায়ে গড় করে একশোটি টাকা প্রণামি দিয়ে বলল, 'আমাদের পেশায় পরস্পরের কাছে মিথ্যা বলতে নেই। তোমাকে কাছে রাখতে আমার ভয়

হয়। তোমার জয়জয়ন্তী হক। তবে আমার কাছ থেকে যতটা দূরে সম্ভব থাকবে। সেও আজ বারো বছর হল।

মনে মনে কানুও তাই চাইছিল। সে বড়ই উচ্চাভিলাষী। নিজের চেষ্টায় খাসা প্রাইভেট প্রাকটিস গড়ে তুলেছে। গোয়েন্দা বিভাগে তার নাম মাছি মাস্টার, মাছির মতো সে নাকি খাড়া দেয়ালে বেয়ে ওঠা নামা করে, কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। এক যদি লক্ষপতির হাহাকারকে চিহ্ন বলে ধরা যায়। গেরস্ত বাড়ির আর খেটে খাওয়াদের দিকে তাকায় না সে। কেউ তাকে দেখেনি, চেনে না। নাম অবধি শোনেনি। যখন লোকে তার আগমন টের পায় তার অনেক আগেই সে নিশ্চিহ্ন। নো পাত্তা এবং সুদূরে। পার্টনার না থাকাতে নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তিও বজায় থাকে। আর্থিক সুবিধাও আছে।

ই কি জ্বালা। অকেজো অপারগ হয়ে অন্য লোকের রকে শুয়ে শুয়েই বা এতকাল পরে এত কথা মনে পড়ছে কেন? এক রকম বলা যায় তার গোটা জীবন কথা। তেমন কোনো উদ্বেগও হচ্ছিল না। এদিকে তো তার সর্বনাশ হতে চলেছে। মাছি মাস্টার হতে হলে —তা নাই বা কেউ তাকে চিনল —রবারের মতো হাত পা আর মাদুলি পোরা সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর সদ্ব্যবহার করার ক্ষিপ্রতা চাই। হাড়গোড় জোড়া লাগলেও সে সব যে আর সম্ভব নয়, সে বুদ্ধি কানুর ছিল।

হঠাৎ চমকে চোখ খুলে চেয়ে ভাবে তবে কি জাগিনি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি আর চাঁদ-ডোবার পরেও উত্তর কলকাতার এই অন্ধকার গলিতে এত স্পষ্ট দেখছি কি করে যে সামনে অংক স্যার দাঁড়িয়ে আছেন? কতকাল কারো পায়ের ধুলো নেয়নি কানু। এখন কেন জানি ইচ্ছে হল একটা প্রণাম করে; কিন্তু শরীর যে নড়ে না। অংক স্যার বললেন, 'হয়েছে, ইচ্ছেই হল সব, ইচ্ছে করাও যা, কাজ করাও তা। এখন চুপ করে শুয়ে থাক। আমি এক্ষুনি আমার লোক নিয়ে আসছি। এই বলে পাশের গলিতে ঢুকে গেলেন।

কানুর মনে হল সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন শব্দটাও থেমে গেল। তবে ওটা ওর নিজের মাথা ঘোরার শব্দও হতে পারে, যদিও কান বোঁ বোঁ করার মতো নয়। হঠাৎ মনে হল, তবে কি ওটা অংক স্যারের মাথা ঘোরার শব্দ? কিন্তু পল কানু, তাতে ওর মাথা ঘুরবে কেন? কোনো কারখানায় মেশিনের চাকা ঘোরার শব্দও ঐ রকম। অংক স্যার কি তা হলে সত্যি মানুষ নন? ঐ বৈজ্ঞানিকদের তৈরী একটা যন্ত্র মানুষ, ঐ যে কি বলে কাগজে পড়েছিল একবার। এই সময় আবার ঘুম পেতে লাগল, তারি মধ্যে কানু টের

পেল খুব ষন্ডা কারা ওকে তুলে কোল পাঁজা করে পাশের গলিটা দিয়ে নিয়ে চলল। ঘুমের ঘোরে মনে হল কানে আবার গুনগুন শব্দটা আসছে। চোখের পাতায় যেন পাঁচ কিলো ওজন। অনেক কষ্টে চোখ একটু খুলে মনে হল ওদের সঙ্গে সঙ্গে অংক স্যারও চলেছেন আর তাঁর কপালের আঁচিল থেকে সত্যি একটা স্নিগ্ধ সবুজ আলো বেরুচ্ছে। ওটা কি তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গাড়ির হেডলাইটের মতো, যার সাহায্যে নিজের পথ দেখে চলা যায়? নাকি সার্চ লাইটের মতো, যা দিয়ে অন্যের ভিতরটা দেখা যায়। অংক স্যার যাই হন, তার চেলা হতে কানুর আপত্তি নেই। এখন এই হাড়গোড়ের যন্ত্রণাগুলো গেলে বাঁচা যায়। তার পর আর কিছু মনে নেই।

অনেক দিন লেগেছিল কানুর সেরে উঠতে, হয়তো মাস খানেক কি তারো বেশী। ততদিনে শীত পড়ে এসেছে। চোখের পাতায় উসুম উসুম গরম লাগাতে চেয়ে দেখে দুরের নীল পাহাড়ের খানিকটা উপর থেকে সূর্য কেমন মিষ্টি রোদ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এ সে কোথায় এসেছে । এ তো তার চিরচেনা গঙ্গানদীর তীর ভূমি নয়। বুক ভরে বাতাস নিল কানু। মনে হল প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

শরীরে মনে কেমন একটা আরাম লাগছিল। পাহাড়ে জায়গা হলেও নিশ্চই খুব উঁচু নয়, কই পাহাড়ের মাথায় তো বরফ নেই। পায়ের উপর একটা নরম আলোয়ান পাতা। মনে হচ্ছিল এইভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। মাছি-মাস্টারের কথা ভেবে হাসি পেল। তার সঙ্গে কানু সোমের কি? অনেক দিন পরে মনে পড়েছিল ওর নিজের নাম কানাইলাল সোম। দূরে পাহারের দিকে চেয়ে ভাবছিল এতদিনে নিশ্চই ঐ পাঁচতলা বাড়ির মালিকদের বেআইনি রোজগারের জমানো ঐশ্বর্য কোনো নিষিদ্ধ উপায়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় পাচার করা হয়ে গেছে।

কিন্তু তার সঙ্গে কানুর কি? সে যে উপায়ে ওদের পাপের ভার লঘু করার চেষ্টা করেছিল সেটাকেও খুব সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিম্বা আইন সঙ্গত বলা যায় না। তার যে কোনো পরিণামই হোক তাতে কানুর কিছু বলার নেই। তবে কিনা লোকগুলো কি ঐ ভাবেই জীবন কাটাবে? ওদের কি ঐ যে কি বলে হ্যাঁ বিবেক —বলে কিছু নেই? পরে কষ্ট পাবে না তো? এই সব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুম পেয়ে গেল। তারি মধ্যে একবার মনে হল ওরা কি খুব সুখী? একটু হাসিও পেল, নিজেও তো এ্যাদ্দিন দিব্যি সুখেই ছিল, এত কথা কখনো মনে আসে নি। তারপর সত্যি করে ঘুমিয়েই পড়ে থাকবে।

এক সময় চোখ খুলে দেখে সে তখনো সেই ছোট ঘরে আরামে শুয়ে

আছে। কোথাও একটা টিমটিমে সবুজ আলো জ্বলছে। তার আলোতে বুঝল অংক স্যার পাশে বসে। সবুজ আলোটা সত্যি সত্যি তার কপালের আঁচিল থেকে বেরুচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে আবার চোখ বুজে নিশ্চিন্ত গলায় কানু বলল, এতক্ষণে বুঝেছি। আমিই বদলে গেছি। ঐ সবুজ আলোর জন্যেই কি দাদা? আপনি কি জাদুকর?

অংক স্যার হেসে ফেললেন, না, না, আমি বিজ্ঞানের একজন সামান্য সেবকমাত্র। অল্প স্বল্প গবেষণা করি। জাদু বলে কিছু নেই; লোকে যা বুঝে উঠতে পারে না তাকেই বলে জাদু। কিন্তু আসলে সব আশ্চর্য ব্যাপারের মূলেই আছে হয় বিজ্ঞান, নয়তো লোক ঠকিয়ে পয়সা আদায় করবার জন্য সাজানো খেলা। যারা সৎ লোক, তারা বলেই দেয় এ সব হল গিয়ে ধাঁধার খেলা বা হাত সাফাই আর যারা ঠগ তারা বলে এসব জাদুবলে করি, আমরা জাদুকর।

তুমি যদি সব জেনেশুনে আমার ছাত্র হও, আমি খুশি হব। আমি যা খুঁজছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না, তুমি তা পাইয়ে দিয়েছিলে মনে আছে। তাই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আর যদি পুরনো জীবনে ফিরে যেতে চাও, তোমার মাদুলীটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সেটি ফিরিয়ে দেব আর তোমাকেও ছুটি দেব, তবে বড় দুঃখের সঙ্গে। ও—ও একটা ব্যামো। রেডিয়াম দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়। নানান প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে, বশীকরণ দিয়ে পাগলামির চিকিৎসা হয়। তোমার ঐ দুষ্কর্ম করার প্রবৃত্তিও তেমনি একটা ব্যামো। ওর-ও ওষুধ খোঁজা হচ্ছে। তোমার খুঁজে দেওয়া মণিটার সাহায্যে তোমার মগজ থেকে উদ্ধার করে তোমার সারা জীবনের ভাবনা চিন্তার ছাপ আমি জেনেছি। মনে হয় যে ব্যামোর কারণ দূর হয়েছে, রোগও সেরে গেছে। আমার কিছু বিশ্বাসী সাহায্যকারী দরকার। তুমি এলে তো কথাই নেই।

আহ্লাদে গলে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে কানু বলল, 'আমি যে আকাট মুখ্যু, আমার ৩২ বছর বয়স। মাছিগিরি ছাড়া কিছু জানি না কিন্তু বুঝতে পারছি সে-ও আর চলবে না। হ্যাঁ, আর কিছু টাকা এক জায়গায় পোঁতা আছে। তবে তার এক পয়সাও সৎভাবে রোজগার হয়নি, ভাবলাম যদি আপনার গবেষণার কাজে লাগে তাহলে আমি কৃতার্থ হই। কিন্তু পাপের টাকা কি আপনারা নেবেন?' অংক স্যার বললেন, 'টাকার আবার পাপ পুণ্য কি রে? অসৎ রোজগারের টাকা অসৎ মালিককে সৎকর্মে লাগাতে হয়। তোর ঐ পাঁচতলা বাড়ির অসৎ মালিক তো তার বাড়িটা আর পাঁচতলার ঘরের সিন্দুক ভরা টাকা সব আমাদের দান করেছে। ওখানেই আমাদের বিজ্ঞান গবেষণাগার

হবে। তাই তো তোর মাথায় সবুজ আলো ফেলে দেয়াল থেকে পেড়ে আনলাম।

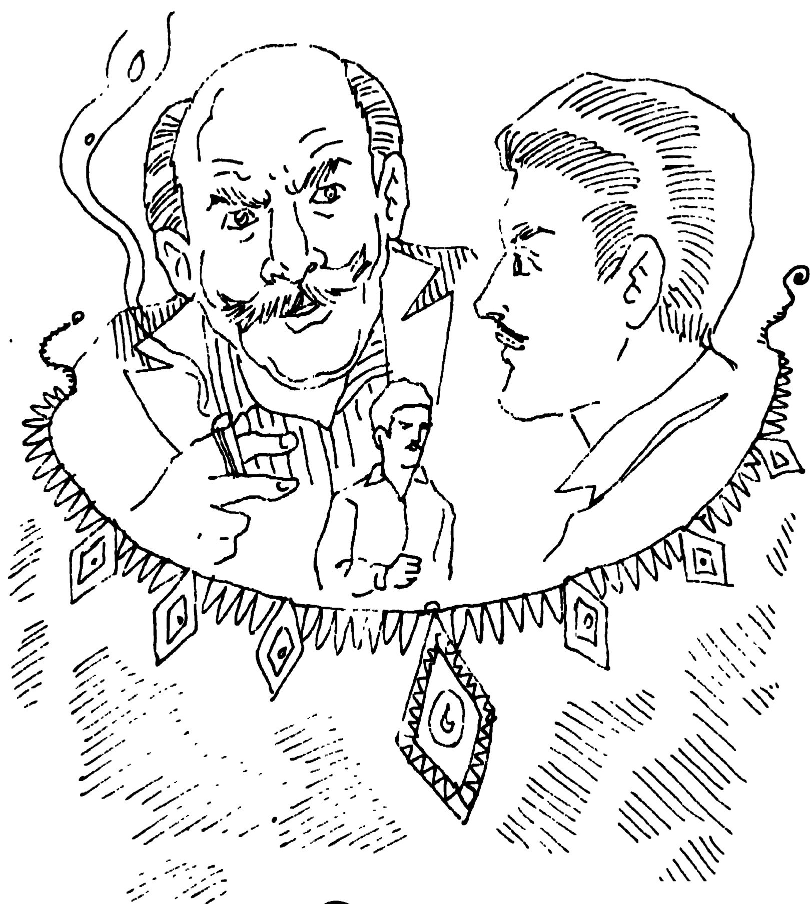
কানু বলল, 'পেড়ে আনলেন দাদা ? নাকি আছড়ে ফেললেন, যাতে আমায় সুদ্ধু চিকিচ্ছে করতে পারেন। ঐ সবুজ আলোতে কি তা বললেই মনে শান্তি পাই।

অংক স্যার বললেন, আজকাল সিলিকন বলে একটা আশ্চর্য যৌগিক পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আগে এর বিষয় প্রায় কোনো বৈজ্ঞানিকই জানত না, তবে আমার ঠাকুরদা স্ফটিক ইত্যাদির সাহায্যে ঐ চকমকিটি তৈরি করেছিলেন ; ঐখানে কোতরঙ্গে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৮৯৭ সালের বড় ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়ে। ঠাকুরদা পরিবারে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর গবেষণাগারটি খুঁড়েও বের করা যায়নি। এই মণিটি তাঁর তৈরি.।

আগে আমার কপালে সত্যি একটা লম্বা আঁচিল ছিল। ওটিকে অস্ত্র করে তুলিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে ঐ রকম একটা ঢাকনিওয়ালা কৌটোতে মণিটা রাখি। দরকারের সময় কপালে বেঁধে নিই। ঢাকনি ফাঁক করলেই আলো বেরোয়। মস্তিষ্কের ওপর ঐ আলোর কাজ। তুমি ঐ বাড়িতে যাবার আগে মালিকের মাথার গুরুতর রোগ হয়ে ছিল, আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম, ঐ মণির সাহায্যে। বলা বাহুল্য সেও একেবারে বদলে গেছে। ঐ বাড়ি ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সব দান করেছে, কে জানে চোরা চালানিও হয় তো তুলে দিয়েছে। এবার বল দুপুরে কি খাবি '?

কানু বলল, 'নলেন গুড় দিয়ে আস্কে পিঠে আর কাউনের চালের পায়েস।'





ঘড়ি-রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি ?

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, কেন? কেন?

ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, আমার ক্ষেত্রেও তা-ই। কিছু কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওঁর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।

জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।

মনে পড়ে গেল। বললাম, কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব! রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন, তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?

কর্নেল বললে, সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মীপ্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে

রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন!

হ্যাঁ কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক, নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা নিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন।উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডুপাত করছে।

তারকডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছে। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোসো জয়ন্ত! দেখি,কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।

বললাম, আমি এনে দিচ্ছি।

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পরদার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাঁচুমাচু মুখে তিনি বললেন, কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছে, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—”

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, বারবার টাইম ইজ মানি বলছেন। অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।

কর্নেল হেসে ফেললেন। ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?

ভদ্রলোক ঝটপট আমাকে নমস্কার করে বললেন, আপনিই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ টাইম ইজ মানি। বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভুতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়ে ছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙ্গারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?

নাহ্। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতেই বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।

আপনার দাদার নাম কী?

আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।

তিনি বেঁচে নেই?

আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দুমাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।

আপনি কোথায় ছিলেন তখন?

সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।

তারপর কী হল বলুন।

হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস! ব্যাস! ওই শেষ কথা।

কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?

দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে বুঝলেন তো?

বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল?

আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।

ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?

ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ারটেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।

আর কিছু?

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আর তেমন কিছু—ও হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।

কর্নেল হাসলেন। হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।

আমাকেও। বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, আপনার ঘরের ভুতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?

প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।

উনি কী বলেছিলেন?

উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পর দিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।

ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, কী বুঝলে জয়ন্ত?

ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।

তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?

তা হলে কোনও বোর্ডার— ধরুন, সেই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।

কর্নেল হাসলেন। টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং!

বিরক্ত হয়ে বললাম, কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।

হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়। বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। নীচের ফ্ল্যাটের লিন্ডারদাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দুজনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষ প্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা ইমপর্ট্যান্ট কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক

ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।

টাইম ইজ মানি! বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, এ কেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতশকাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, সত্যিই এটা নড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।

কীভাবে বুঝলেন?

কোনও আসবাব অনেককাল এক জায়গায় রাখলে মেঝেয় তার ছাপ পড়ে। পায়া দুটো সেই ছাপ থেকে সরে এসেছে।

এই সময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।

কর্নেল বললেন, আপনি এই আলমারিটা খুলুন।

খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড়র আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন। তল্লাশ শেষ হলে উনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার ছিলেন!

তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি!

আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?

আপনি ওঁকে ডাকুন।

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি

বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল,প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল বললেন, আসুন প্রভাতবাবু আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।

কর্নেল বললেন, চোরাই জিনিস! তার মানে?

মানে আপনারা ভালই জানেন! তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার। আমি ওকে পাত্তা দিইনি।

কিন্তু জিনিসটা কী?

খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, ওই লোকটাকে তাড়াও। কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুণ্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বললেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি বেচে দিয়ে থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, আপনার দাদা বলছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?

সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?

আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, দিন সাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?

কর্নেল হাসলেন, কারণ টাইম ইজ মানি।

কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।

ডায়ালের কাচ খুলে আতশ কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যাণ্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরী'স সেভেনটি ফার্স্ট ব্যর্থ অ্যানিভার্সারি...

চমকে উঠলাম। কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার! এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?

"ডার্লিং! হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরানো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, পানু। টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।" পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেট মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া

নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, "টাইম ইজ মানি। তবে, হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পেরেছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?"

সায় দিয়ে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।"





তীরের রাজা

মহাশ্বেতা দেবী

ছুটিতে তোতনের বন্ধুরা ভারতবর্ষের কত কত জায়গায় যায় আর স্কুল খুললে জমিয়ে গল্প করে। তোতনের যাওয়া হয় না কোথাও। ওর মা বাবার ছুটিই মেলেনা মোটে। দুজনেই চাকরি করেন, দুজনেই ব্যস্ত মানুষ। ওঁদের ছুটি নভেম্বরে। তখন তোতনের পরীক্ষার সময়।

তাই তোতন কক্ষনো জানে না, রোটাং পাসের নরম বরফ পেরিয়ে যেতে জুন মাসে কি মজা। ও জানেনা যে গোপালপুরে অক্টোবরে সমুদ্রে স্নান করে বালিমাখা টাটকা মাছ কিনে আনতে কেমন লাগে। ও তো চিল্‌কা

হ্রদে জেলেদের নৌকোয় ভাসে নি কখনো। কত সমুদ্র। কত পাহাড়। কত মরুভূমি। কিছুই ও দেখে নি।
তাই ও এই ছুটিতে চলে গেল পিসির বাড়ি শালগড়া। ঝাড়গ্রামকে পেছনে রেখে পিসেমশায়ের জীপে চেপে অনেক দূরে এক ছোট্ট গ্রামে।
পিসেমশাই সেখানে ক্ষেতখামার করছেন। চিনাবাদাম, কপি, আরো কত কি। ওঁদের বাড়িটা বাংলো ধরনের। বাড়ির পাশেই শালবন। বাগানের কোনায় শালগাছের মাথা কেটে তার ওপরে পিসেমশাইয়ের ছেলে কোকো একটা লগ কেবিন বানিয়েছে।

পিসেমশাই বললেন। কোকো তো তার পিসির বাড়ি। তুই এসেছিস তোর পিসির বাড়ি। লগ কেবিনটা এখন তোর হয়ে গেল।
পিসি বলল, লগ কেবিন হলে সেখানে সঙ্গী চাই। তোকে তীরের রাজা সোমরাইকে সঙ্গী করে দিচ্ছি। তোতন প্রথমটা সব কথা বোঝে নি। তারপরে বুঝল। পিসেমশায়ের ডান হাত হল কয়েকজন সাঁওতাল। তারাই চাষবাস করে। তাদের ছেলে সোমরাই। বেশ বাংলা বলে, শান্ত হাসিমুখ ছেলে। তোতনের চেয়ে বড়ই হবে। পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এতে তোতন অবাক হয়েছিল প্রথমে। তারপর বুঝেছিল। ওরা ছোটবেলা থেকেই কাজকর্ম করে, সুবিধে মত পড়তে যায়। তাই তোতনের মত ঠিক বয়সে ঠিক ক্লাসে পড়া ওদের হয় না।
সোমরাই এ বাড়িতে চমৎকার জালের ঘরে মুরগি পুষেছে। পিসেমশাই ওকে না কি মুরগি পালন ট্রেনিং পড়াবেন, তারপর ওর সঙ্গে মুরগির ব্যবসা করবেন। পিসেমশাইকেও খুব ভাল লাগল তোতনের। হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি আর জুতো পরে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন যাকে বলে।
শালগড়ায় এসে, কোথাও না যাবার দুঃখ ভুলে গেল তোতন। পেট ভরে ডিম, মুরগির মাংস, গরম রুটি খাও। পিসিমার তৈরি চিনাবাদামের মাখন, কেনা পী-নাট বাটারের চেয়ে অনেক ভালো। আর সোমরাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও। ওদের গ্রামে যাও, শালবনে বেড়াও, চলে যাও হাটে। সাইকেল চড়ে ঘোরো। পায়ে হেঁটে ঘোরো। দূরে দক্ষিণ পশ্চিমে ছোট ছোট পাহাড়। ওখানে সরকারী জঙ্গলে গেলে তীর দিয়ে খরগোশও মারা যায়।
সোমরাই বলল, ওদিকে এখন যেতে পারব না।
—কেন ?
—ওখানে ভয় আছে।
—কিসের ভয় ?

—দানো ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা।
—দানো ? সে আবার কি ?
—জানি না।
সোমরাইয়ের চোখ দুটোর ওপরে যেন পর্দা নেমে এল। ও বলল। খুব ভয়ঙ্কর দেখতে। দানোটাকে তাড়াবার জন্যে অনেক পুজো দেয়া হচ্ছে।
একদিন দু'দিনেই তোতন বুঝল, কোথায় যেন কি একট উত্তেজনা চলছে। পিসেমশাই কখনো জীপে কখনো সাইকেলে যখন তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন, তা জিগ্যেস করলে বলছেন, সাতরাজার ধন খুঁজতে যাচ্ছি। জানলি ?
পিসি কিছু বলে না। শুধু বলে, তোতন! যেখানে যাস, বলে যাস বাবা!
সোমরাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে গেলেও মুশকিল। ওদের গ্রামের "নাথুকে" বা প্রধান পুরোহিত বলছে, দানোটা আছে, সব দিকে যাস্ না তোরা।
লগ কেবিনই ভালো। কাঠের টাটকা গন্ধ মাখা ছোট্ট ঘরের তিনদিকে জানলা। সব জানলা খুলে শুয়ে থাকো চিৎপাত হয়ে। এদিকে তাকালে পিসিমার বাড়ি, বাগান, ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। ওদিকে তাকাও, ঘন শালবনের সবুজ পাঁচিলের আড়ালে কোথায় যে সোমরাইদের ছোট ছোট গ্রাম, তা দেখাই যাচ্ছে না। আর ওদিকে ? ছোট ছোট দুটো পাহাড়। তার এপার থেকে ওপার শালগড়া দুই নম্বর জঙ্গল। দেখতে কত সুন্দর। অথচ ওখানেই কোথায় আছে দানো।
লগ কেবিন থেকেই তোতন পোড়া কাঠের খুঁটি, জড়ানো জালের বাণ্ডিল, ভাঙা টালিগুলো দেখছিল। সবই ঢেকে গেছে ঘন সবুজ শ্যাওলায়। অনেকদিন পড়ে অছে। বর্ষার জল পেয়েছে।
সোমরাই বলল, কি দেখছ ?
—ওগুলো কি ?
সোমরাই মস্ত নিশ্বাস ফেলল। বলল, তীরের রাজার কাণ্ড। আসল তীরের রাজা ছিল পর্বত হাঁসদা। বাবুর মুরগির ঘর ছিল মস্ত। সে ঘরও ওর বানানো, আর ঘরের এক পাশেই ও ঘুমোত। তীর ছুঁড়ে উড়ন্ত পাখি নামিয়ে ফেলত।
—চলে গেছে ?
—গত বছর খুব মদ খেয়ে ঘুমোচ্ছিল। কুপী উলটে পড়ে ঘরে আগুন লাগে।
—কি হল ?
—ঘর জ্বলল, মুরগি মরে গেল, আর পর্বত তো পুড়ে গেল খুব। বাবু জীপে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

—মারা গেছে?

সোমরাই হাসল। বলল, না না। তবে সেরে উঠে ও হাসপাতাল থেকে কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না। হাসপাতালে সকলকে বলে গেল, আমার দোষেই এমনটা হল তো! এ মুখ আর বাবুকে দেখাব না।

তারপর বিষণ্ন গলায় বলল, পর্বত দাদা আমাকে তীর চালাতে শেখায়। ওর কাছে সবই শিখেছি। কিন্তু উড়ন্ত পাখি নামাতে শেখাটা বাকি থেকে গেল।

পিসেমশাই সাইকেল নিয়ে বেরোলেন। উনি কোথায় যাচ্ছেন তোতনকে একবারও সঙ্গে নিচ্ছেন না। তোতন বলল, ওই পাহাড়ে যাবে না?

—না না, দানো আছে।

তোতন তখনি ঠিক করল যে কাল ও একা একা চলে যাবে। দানোর ভয় ও করে না।

পিসিও রাতে বলল, দানো, ভূত, ডাইনি, এ সবে ওদের কেউ কেউ খুব বিশ্বাস করে বটে! তবে ওসব আমি তো দেখিনি।

—কিছু দেখ নি কখনো?

—না না।

—এ রকম জঙ্গলের জায়গা। কোনো অ্যাডভেঞ্চার কর নি?

—আমার মুরগি ধরতে বুনো বেড়াল আসে, ডিম খেতে সাপ আসে, সে গুলোকে যদি অ্যাডভেঞ্চার বলিস, তো মাসে কয়েকবার তেমনটা হয় বটে। হ্যাঁ, তা হয়।

—তখন কি করো?

—আমি প্রাণপণে চেঁচাই।

পিসেমশাই মুরগির ঠ্যাং চিবিয়ে বললেন, তোর পিসির চেঁচানি ঝাড়গ্রাম থেকে শোনা যায়। পিসির কাজ চেঁচানো। সে চেঁচিয়ে যায়। আমি থাকলে বন্দুক চালাই। সোমরাই থাকলে তীর চালায়। গোখরো ফণা তুলে দুলছে। ও তীরে গেঁথে দেবে।

—সত্যি! ভাবা যায় না।

—তোর কেমন লাগছে?

—চমৎকার!

—এই তো শুনতে চাই। কোকোটা গেছে তার পিসির বাড়ি। সে থাকলে তোর আরো ভাল লাগত। তা সাত রাজার ধন খোঁজা হয়ে যাক। তোকে নিয়ে আমি পাহাড়ের ওপারে বেড়িয়ে আনব।

—সেখানে কি আছে?

—কিছু না, জঙ্গল। জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকব এক রাত। শুনবি জঙ্গল কেমন কথা বলে।

পিসি বলল, আহা-হা! মরে যাই! জঙ্গলে যাও, যেখানে যাও, নাক ডাকিয়ে তো ঘুমোবে। সেবারে ওড়িশা গেলাম। জঙ্গলে মাচানে আছি, হরিণ জল খেতে এসেছে, এমন নাক ডাকালে হঠাৎ, যে হরিণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সব।

তোতন বলল, কই, আমিতো শুনিনি?

—শুনিস নি? তোর তাহলে বেজায় ঘুম।

—পিসেমশাই!

—কি রে?

—তুমি দানোটা দেখেছ?

—না রে। দানোটানো নেই।

—নেই তাই না?

—না না, ওগুলো...যাকে বলে....

—কুসংস্কার!

—তাই হবে।

তোতন যেন মনে খানিক জোর পেল।

পরদিন ও কাকভোরে উঠেছিল। উঠে হাত মুখ ধুয়ে পিসির জাল আলমারি থেকে বড় বড় কয়েকটা পেয়ারা হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। বয়স এগারো। কলকাতায় বড় স্কুলে পড়ে। তোতন ওসব দানোটানোকে ভয় করে না। ঝকঝকে সকালে দানোর ভয় কি? রাতের আঁধার তো নয়।

দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে ও দৌড়েছিল।

পাহাড়কে কত কাছে মনে হয়, পাহাড় কত দূরে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কখন পিসিমার বাড়ি, শালগড়ার শালবন, সব চলে গেল দূরে। ছোট ছোট গ্রামও চলে গেল পেছনে। তোতন যখন সরকারী জঙ্গলে পৌঁছল, তখন সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে। এই তাহলে সেই জঙ্গল! এখানেই আসে না সোমরাই, অথচ এখানে এলেই ও খরগোশ মারতে পারে। না মারলেই ভালো। খরগোশদের কান লম্বা, গায়ে ঘন লোম, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

জঙ্গলটায় অনেক গাছ! বেশ সবুজ সবুজ ছায়া। আর বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু এখন অবধি কোনো মানুষ চোখে পড়ে নি। তোতন এখন বাড়ি ফিরতে চায়। জল তেষ্টা পেয়েছে খিদেও পেয়েছে।

বেরোবার পথ খুঁজতে গিয়ে তোতন বুঝেছিল, জঙ্গলে সব গাছপালা একই রকম দেখায়। পথ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু ভয় পেলে খুবই মুশকিল। তাহলে সাহস চলে যাবে। তার চেয়ে ওপর পানে ওঠা যাক। উঁচুতে উঠে একটা গাছে চেপে ও বাড়িটা কোনদিকে, তা খুঁজে নেবে।

ওপর পানে উঠতে গিয়েই ও দানোটাকে দেখেছিল। ভীষণ বিকৃত মুখ, একদিকের চোখ নেই, সেখানে খানিক পোড়া চামড়া, আর একটা চোখে কোনো লোমই নেই। মাথায় চুল নেই, কোঁচকানো চামড়া, সে এক বিকৃত বীভৎস মূর্তি।

দানোটা গাছের নিচে বসে কি খাচ্ছিল। মা গো! পাখি পুড়িয়ে খাচ্ছে।

ওকে দেখে দানোটা বিকৃত গলায় কি যেন বলল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

ব্যস! তোতন পিছনে ফিরে এক ছুট। ও ছুটছে, দানোটাও ছুটছে। তোতন ছুটতে ছুটতে কাঁদতে লাগল। ভয়, কি ভীষণ ভয়!

ওদের দুজনকেই পিসেমশায়ের দলটা ধরে ফেলে, ঘিরে ফেলে।

পিসেমশাই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, পর্বত!

তারপর দানোটার হাত চেপে ধরে পিসেমশায়ের সে কি গর্জন।

—তুই হাসপাতাল থেকে পালালি, আর এখানে দানোর কথা উঠে গেল। আমি তোকে কয়েকদিন ধরে খুঁজছি আর খুঁজছি। তোতন! ভয় পেয়েছিলি তুই? হঠাৎ দেখলে ভয় পাবারই কথা।

তোতন আর মাথা তোলে না। খুব লজ্জা পেয়েছে সে। সোমরাই তো পর্বতের কথা বলেছিল। তোতনের তো সে সব কথা মনে পড়া উচিত ছিল। ইশ! ভয় পেয়ে গেল তোতন? কি লজ্জা, কি লজ্জা!

—সবাই ভয় পায় বাবু। তাই জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। ছেলেটা ভয় পেয়ে গেল। আমি ওকে বুঝাব, জিজ্ঞাসা করব, তুমি কাদের ছেলে, তা ও দৌড়াচ্ছে, আমিও দৌড়াচ্ছি।

—কোকোর মামার ছেলে।

—বুঝলাম বাবু।

—চল্, বাড়ি চল্।

—না বাবু!

—ওরে গাধা! তোকে আমার কাছে রেখে দেব। দৌড়াচ্ছিস, পাখি মেরে খাচ্ছিস, হাত পা তো ঠিক আছে।

—হ্যাঁ বাবু। তবে তীর তো মারতে পারব না আর।

—সে দেখা যাবে। ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলাম। তারা বলেছে কলকাতায় নিয়ে অপারেশন করলে চেহারা খানিক ভাল হবে তোর, সময় লাগবে।

—বলেছে?

—নিশ্চয়। আর সোমরাই। দেখে নে তোরা। গ্রামে গিয়ে বলে দে, দানোটাকে আমি ধরে ফেলেছি। ও দানো নয়, তোদেরই পর্বত।

সোমরাইরা এ-ওর দিকে তাকাল। তারপর নিশ্বাস ফেলে সোমরাই এগিয়ে এল।

—তোমার ধনুক, তোমার তীর দাদা!

পর্বত হাঁসদা ধনুকের গায়ে হাত বোলায় আর এক চোখে কাঁদে।—আমি তো পারবনা আর। তোকেই এখন তীরের রাজা হতে হবে।

—দেখতো পারো কি না।

—দেখব?

—দেখ।

তোতন চোখ তুলল। ওই তো ও ধনুক তুলেছে, তীরের মুখ ঠিক করছে। এক চোখে খুঁজে দেখছে কোথায় পাতার আড়ালে পাখি। ওই তো তীরের রাজা। এখন ওকে দেখে আর তো ভয় করছে না।

তোতন পিসেমশায়ের হাত ধরল। এখন মনে মনে বলল, পরে শুনিয়ে বলবে,—পিসেমশায়! হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি করে পর্বত-কে তুমি একটু অন্যরকম করে দিও। কত বইয়ে প্লাস্টিক সার্জারির কথা আমি পড়েছি!

পিসেমশাই বললেন, এখানেই বসা যাক। তোর পিসি খাবার, জল, চা, সব দিয়েছে। খাওয়া যাক। ভাগ্যে তুই বেরিয়েছিলি, তাই পর্বত বেঁচে গেল। নইলে না খেয়ে মরে যেত। দানো বলে কেউ মেরে দিত, কি হত তা কি বলা যায়? না, আমি খুব খুশি হয়েছি তোতন। তোকেই আমার শটগানটা দেবো। আরো বড় হ, তোকেই দেবো।

তোতন পর্বতকে দেখছে। এখনো পাখি খুঁজছে। তোতনও ভীষণ খুশি এখন। বাবা-মার সঙ্গে পুতুপুতু করে বেড়িয়ে আসে বন্ধুরা। তোতনের মত সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার তারা করেছে কখনো? পর্বত একটা হরিয়াল বিঁধল।

সাঁওতালরা সবাই আনন্দ করছে। সোমরাইয়ের বাবা বলল, তোতন। তোকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যাই চল্। খুব ছুটেছিস তো।

ইশ্।

তোতন মাথা নাড়াল দু'দিকে। বড়দের মত অ্যাডভেঞ্চার করে ফেলার পর আর কি কাঁধে চেপে ফেরা যায়?



অতনুবিহারীর ঘড়ি

হিমানীশ গোস্বামী

তা একটু দেরি হল বইকী! এক-আধ দিন সময় নয়, এক-আধ মাস নয়—একেবারে চোদ্দ বছর! একটা দেওয়াল-ঘড়ি কেনার কথা বলছেন অতনুবিহারীর গিন্নি মাধুরী সেই চোদ্দ বছর আগে থেকেই। এমন একটা চমৎকার দেওয়াল-ঘড়ি হবে যেটা পনেরো মিনিট পর-পর বেশ বাজনা বাজিয়ে জানিয়ে দেবে সময়ের জয়যাত্রার বিবরণ। প্রতি ঘণ্টায় টুং-টুং করে ঘণ্টা বাজবে। একটার সময় একটা টুং, দুটোর সময় দুটো টুং, তিনটের সময় তিনটে টুং, কী চমৎকার।

ঘড়ি অবশ্য বাড়িতে নেই তা নয়। অতনুবিহারীর নিজের হাতঘড়িই আছে দুটো। এ ছাড়া তাঁর পুত্র-কন্যা তিনজন, সবচেয়ে বড়র বয়স দশ, সবচেয়ে ছোটর বয়স পাঁচ—কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা করে ঘড়ি। জন্মদিনে পাওয়া সব ঘড়ি। এমনকী, অতনুবিহারীর গিন্নি মাধুরীরও একটা ঘড়ি আছে—কিন্তু কোনওটাই ঠিক সময়ে দেখার জো নেই। ছোটদের ঘড়ি তো হাতে-হাতেই ঘোরে প্রায় সব সময়—আর তারা যে কে কখন বাড়িতে থাকে তার ঠিক নেই। অতনুবিহারী নিজেও তো সেই কোন সকালে উঠে অফিসে চলে যান। ঘড়িও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলে। ফেরেন সেই সন্ধেবেলা। নিজের ঘড়িটিকেও যে দম দেবেন তাও সব সময় হয় না। তাই মাধুরী চেয়েছিলেন একটা বেশ বড় দেওয়াল-ঘড়ি। সারাদিন চমৎকার টিক-টিক করে চলবে, পনেরো মিনিট পর-পর—ঠিক তিনি যেমন দেখেছিলেন তাঁর বন্ধু ইরার বাড়িতে। কী চমৎকার বড় ঘড়ি সেটা ছিল, তিন সপ্তাহে মাত্র একবার দম দিতে হয়। তাতে আবার বড় একটা সেকেন্ডের কাঁটা লাগানো। আর সেটা নাকি এমনই ভাল ঘড়ি যে, এক মাসে মাত্র দেড় মিনিট ফাস্ট যেত। তা ও কিছু না। তিনি ঘড়িটার নামও লিখে এনেছিলেন, কেবল তাই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে দোকানের নামও। দাম বেশি একটু, তিনশো চল্লিশ, কিন্তু পাঁচ বছরের গ্যারান্টি, আর ইরার এক ভাইয়ের চেনা দোকান বলে একসঙ্গে সব টাকাও দেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাকিটা ছ'মাসে শোধ করলেই চলে। কিন্তু অতনুবিহারীর আর সময় হয় না। আসলে যেদিন মাইনে পান সেদিনই নানরকম বাধা এসে উপস্থিত হয়। তিনি সত্যি-সত্যি ভাবেন, না ঘড়ি একটা কিনতেই হয়। মাধুরীর অসুবিধে হয়। কত সময় একা বাড়িতে থাকে। সময় বোঝা যায় না। আর এ-ঘড়ি এমন কিছু মহামূল্য ব্যাপার নয়। একটা ঘড়ি, তাও সব দামটা একসঙ্গে দিতে হয় না, সহজ কিস্তিতে, অর্থাৎ মাসে চল্লিশ টাকার ব্যাপার। টিফিনের সময় ডালহৌসি স্কোয়ারের কাছে রাধাবাজারে ঘড়ির দোকানটিতে ট্রামে যেতে দশ মিনিটও লাগে না। গেলেই হয়। সেখানে কত আর সময় লাগবে। ড্রয়ারে সেই কবে থেকে চিঠিটাও পড়ে রয়েছে, মাধুরীর বন্ধু ইরার ভাইয়ের একটি চিঠি সেই কবে জোগাড় করে এনেছিল মাধুরী, সেও তো প্রায় ছ-সাত বছর হয়ে গেল।

কিন্তু কাজটা আর করাই হয় না। মাসের প্রথম দিনে অফিসের কাজ তত হয় না, কিন্তু অন্য নানারকম বাধা এসে জোটে। ওইদিন তাঁর উপর ভার পড়ে ড্রামা ক্লাবের জন্য চাঁদা তোলার। প্রতি মাসে প্রত্যেকে—প্রায় চল্লিশজন পাঁচ টাকা করে জমা দেন, আর সরস্বতী পুজোর আগের রাত্রে

সব অভিনয় হয়। অফিস থেকেও কিছু টাকা বরাদ্দ হয়। এজন্য সময় যায়। বেরনো হয় না।

অতনুবিহারী অভিনয় ভালই করেন। যদিও তাঁর স্বভাবটা বেশ লাজুকই। ভিড় তাঁর সহ্য হয় না। আবার তাঁর একটু-একটু কবিতা লিখতেও ইচ্ছে করে। তাঁর অফিস-ড্রয়ারের বাঁ দিকে রাখা একটা নীল রঙের খাতা আছে, খাতা নয়, ডায়েরিই বলা যায়—এখন সেটি তিনি খাতা হিসেবে ব্যবহার করেন। সেই খাতায় তিনি এই বছরেই অফিসের কাজের ফাঁকে প্রায় ত্রিশটি কবিতা লিখে ফেলেছেন। আগেই বলেছি, তিনি একটু লাজুক। লাজুক আর ভিতু। কিন্তু হলে হবে কী, কবিতার খাতায় তাঁর মারাত্মক সব সাহস ফুটে বেরোয়।

কলকাতার গোলমালে তাঁর ভয় বেশ বেড়ে যাচ্ছিল বলে বনগাঁ লাইনে একটা শান্ত পরিবেশে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেছেন। সেখানে রোজ গোলমাল হয় না তেমন, কিন্তু আসা-যাওয়া করার সময় খুব কষ্ট হয়। এত ভিড় ওই লাইনে! যে ভিড় এড়াতে তিনি গ্রামে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন সেই ভিড় তাঁকে রোজ ঠেলতে হয়।

আগেই বলেছি অফিস থেকে নানা কারণে প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে টিফিনে বেরোতে পারেন না। ঘড়িও কেনা হয় না। কিন্তু অফিসে কি মাসে একদিনই কাজ হয়? তা নয়, তবে অন্য দিনগুলিতে তিনি যান না কেন ঘড়ির দোকানে? অন্যদিন তাঁর টাকা থাকে না তা নয়। কতই বা টাকা। মাইনের দিনই যে ঘড়ির দোকানে যেতে হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই। আসলে মাসের ওই একটি দিনই মাধুরী মনে-মনে আশা করে থাকেন বোধ হয় অতনুবিহারী ঘড়িটা কিনে আনবেন। আর প্রতি মাসেই না আনতে-আনতে এখন অবশ্য আর আশাও প্রায় করেন না। অতনুবিহারীও ওই একটি দিনই লজ্জিত হন। এসে বলেন, বুঝলে, আজ এই হয়েছিল, তাই হয়েছিল। বড়সাহেব, বুঝলে, এইসা বিপদে পড়েছিলেন। তারপর বানিয়ে-বানিয়ে এমন গল্প শুরু করে দেন যে, মাধুরী বেশিক্ষণ রাগও করতে পারেন না।

আসলে অতনুবিহারী এমন ভিতু যে, কোনও কিছুই তিনি কিনতে চান না। বিশেষ করে দামি কোনও জিনিস হলে তাঁর যেন হাত-পা অবশ হয়ে আসে। কী আনতে কী আনবেন। দোকানদার ঠকিয়ে দেবে কি না এসব চিন্তা তো আছেই, তারপর এখন তাঁর মনে আবার ভয় বনগাঁ লাইনের ভিড়ে ঘড়ি নিয়ে ট্রেনে ওঠাই যাবে কি না! উঠলেও কেউ হয়তো গুঁতো দিয়ে ঘড়ির কাচটাই ভেঙে দেবে, কিংবা ওইদিনই হয়তো ট্রেনে দুর্বৃত্তরা ডাকাতি

করতে উঠে প্রথমেই তাঁর ঘড়িটাকে নিয়ে সরে পড়বে! সঙ্গে আবার ছোরা দিয়ে তাঁর পেটেই হয়তো...। বিকেলের দিকে সেজন্য কখনই আর ঘড়ি কেনার কথা শুনে তাঁর অফিস কর্তা চাটুজ্যে কেমন করে ইয়ার্কি মারবেন সেটা ভেবে উঠেনা। আবার অসুস্থ বলে ছুটি নিয়ে ঘড়ি কেনার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। এইভাবে ক্রমশ তিনি এড়িয়ে গেছেন এত বছর। দু-একবার ভেবেছিলেন একদিন ক্যাজুয়াল ছুটি নিয়ে সকাল-সকাল ঘড়ি কিনে বেলা বারোটা-একটার মধ্যে শেয়ালদা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরবেন। কিন্তু ক্যাজুয়াল ছুটি নিয়ে ঘড়ি কেনার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। এইরকমই চলছিল, হঠাৎ একদিন দারুণ সুযোগ এসে গেল। ভিড় ট্রেনে রোজকার মতো তিনি অফিসে গিয়ে সবে একটু আয়েস করে বসেছেন, এমন সময় সংবাদ এল তাঁদের অফিসের অন্যতম মালিক বিশ্বতোষবাবু মারা গেছেন, সেজন্য সেদিন বেলা বারোটায় অফিস ছুটি।

ব্যস, সুযোগ এসে গেল। কেবল তাই নয়, তাঁর পকেটে একশোটা টাকাও রয়ে গেছে। স্টেশন থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে দু-একটা কি ওষুধ আর বিস্কুট কেনার কথা। সেজন্য টাকাটা রাখা ছিল। ওষুধের দাম দশ-বারো টাকা। আর অন্যান্য দু-একটা জিনিসের দাম পনেরো টাকার বেশি হবে না। তিনি ড্রয়ার থেকে গিন্নির বন্ধু ইরার ভাইয়ের চিঠিটা নিয়ে মনে-মনে ভাবলেন, আজ মাধুরীকে বেশ খুশি করে দেওয়া যাবে।

ঠিক বারোটার সময় তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামে করে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে নামলেন। তারপর অল ইন্ডিয়া টাইমকিপার নামের দোকানটি খুঁজে বার করলেন। দেখলেন দোকানটি ছোট হলেও বেশ কেনাবেচা চলছে। তিনি দোকানে গিয়ে নানারকম টিক-টিক আওয়াজ শুনে বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ঘড়িদের টিটকিরি তাঁর আদপেই পছন্দ হয় না। যাই হোক, তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। মিনিট-দশেক পর তিনি ভাবছেন ওই দোকান থেকে তিনি চলে যাবেন। এ কেমন দোকান যে, দোকানদারদের কোনও আগ্রহ নেই? তিনি এক-পা এক-পা করে দরজার দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় বোধ হয় মালিকই হবেন, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সমেত চেহারার এক ভদ্রলোক বললেন, "কী, ব্যাপার কী, একটাও পছন্দ হল না?"

অতনুবিহারী বললেন, "না, তা কেন, পছন্দ হবে না কেন, দারুণ সব ঘড়ি।"

দোকানদার বললেন, "কোনটা পছন্দ হয়?"

অতনুবিহারী বললেন, "আমার তো অনেক'টাই পছন্দ হচ্ছে। কিন্তু তার

আগে একটা কথা ছিল।"

"কী কথা?"

অতনুবিহারী পকেট থেকে সেই চিঠিটা বার করলেন। বললেন, "এই চিঠিটায় কি আপনার নাম লেখা আছে?"

দোকানদার বললেন, "হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন তো?"

"পড়ে দেখুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।" অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে কথাগুলি তিনি বলে ফেললেন।

দোকানদার চিঠি পড়ে বেশ খানিক হাসলেন। বললেন, 'এ চিঠি তো কত বছর আগেকার।"

এবারে অতনুবিহারী বেশ খুশিই হলেন। তিনি আশা করছিলেন, এবারে দোকানদার বলবেন, মশাই কে না কে চিঠি লিখেছে, ওকে চিনি না, তার উপর ধারে মাল দেওয়া? হবে না। আর উনি দোকান থেকে বেরিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে ফিরে গিয়ে মাধুরীকে বলবেন, ওসব চিঠিতে কাজ হয় না। তোমার বন্ধুর ভাইকে কে চেনে ও-দোকানে?

দোকানদার কিন্তু বললেন, "ওরে, কে আছিস একটা ডাব নিয়ে আয়। বেশ গরম পড়ে গেছে, কী বলেন?"

অভিভূত হলেন অতনুবিহারী। বললেন, "ওই চিঠির বর্ণনা-মতো ঘড়ি আছে? এমন ঘড়ি কি আছে যেটা বাজে?"

"অনেকরকম ঘড়ি আছে। এই দোকানে এখনই আপনাকে তিনশোরকম দেওয়াল-ঘড়ি দেখাতে পারব। এ ছাড়া আমাদের গুদামঘরে আরও দুশোরকমের ঘড়ি আছে।"

"না মশাই।" অতনুবিহারী বললেন, "আমার ওইরকম ঘড়িই দরকার।"

"ওসব পুরনো যুগের ঘড়ি। আজকাল লোকেরা নেয় না।" দোকানদার বললেন।

"আপনার বোধ হয় ও ঘড়ি নেই?"

দোকানদার বললেন, "ও ঘড়ি বিক্রি হয় না বলে আমরা আর রাখি না। লাস্ট যে দশটা ঘড়ি এনেছিলাম কত বছর আগে যেন হবে সেটা, তা থেকে দু-একটা বোধ হয় পড়ে আছে। তবে মশাই, ঝামেলা কী জানেন? প্রত্যেক তিন সপ্তাহ পর-পর ঘড়ি নামিয়ে দম দিতে হয়। দু'বছর পর-পর একটু অয়েল করতে হয়। আর দামও বেশি। তার চাইতে আপনি ব্যাটারি-ঘড়ি নিয়ে যান, কতরকম সব ঘড়ি। নিঃশব্দে চলে, কোনও ঝামেলা নেই।"

"অ্যাঁ, কী বললেন, নিঃশব্দে চলে?"

"তবে আর বলছি কী?"

"কিন্তু এই ঘড়িগুলি তো সব টিক-টিক করছে!"

দোকানদার বললেন, "এই দোকানের শ'দুয়েক ঘড়ির প্রত্যেকটি অতি সামান্য আওয়াজ করছে। এত ঘড়ি একসঙ্গে থাকায় আওয়াজ একটু জোর শোনা যাচ্ছে।"

ভারী মনের মতো ঘড়ি এগুলো, মনে হল অতনুবিহারীর। এরই একটা নিয়ে গেলে হয়। চমৎকার, শব্দটব্দ হবে না।

"তবে যদি আপনি আওয়াজ চান তাও আছে। নতুন-নতুন সব জাপানি কায়দার ঘড়ি বেরিয়েছে, চমৎকার ডায়াল। ওই দেখুন একটা ঘড়ি, কয়েক সেকেন্ড পর ওটা থেকে আপনার খুশিমতো বাজনা বাজবে। মানে, ধরুন ওর মধ্যে একটা ছোট্ট টেপ-প্লেয়ার রাখা আছে—ওই শুনুন।" আর সত্যিই তো, সেই ঘড়ি একটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে বাজতে শুরু করল একটা হিন্দি গান!

অতনুবিহারীর মুখে বোধ হয় একটু অখুশি ভাব দেখে দোকানদার বললেন, "এই যে ডাব এসে গেছে, ভারী মিষ্টি জল, খেয়ে নিন।" তারপর একটু না থেমে বললেন, 'হিন্দি আছে, বাংলা আছে, ওড়িয়া আছে, ইংরেজি আছে—সবরকম আছে। তা ছাড়া আপনি নিজের গলায় গান গেয়ে সেটাকেও ঘড়িতে পুরতে পারেন।"

"না, এসবে আমার দরকার নেই। আমাকে ওই পুরনো আমলের ঘড়ি থাকলে সেটাই দিন। আমি গান জানি না, গাইব কী?"

"সে ঘড়ি আছে বইকী! তবে কিনা অপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। গুদামঘরে আছে। ধুলোটুলো সাফ করতে হবে। ভেতরটাও ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নেওয়া দরকার। আপনি ঘন্টা-দুই কোথাও ঘুরে আসুন।"

তার মানে তিনটে। তার মানে বনগাঁ লাইনে ভিড় শুরু। অতনুবিহারী বললেন, "তার আগে হয় না?"

দোকানদার বললেন, "তার আগে হলে তো ভালই। দেখা যাক হয় কিনা তার আগে।"

এবারে অতনুবিহারী বললেন, "আচ্ছা, ঘড়িটায় আওয়াজ হয় তো?"

দোকানদার বললেন, "আওয়াজ হয় কি না জিজ্ঞেস করছেন?"

অতনুবিহারী বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

দোকানদার এবার বললেন, "তা একটু-আধটু হয় বইকী। পুরনো আমলের ঘড়ি তো, আওয়াজ হবেই। যদি আওয়াজ না চান তো হাজাররকমের আধুনিক

ঘড়ি আছে।"

"না, না।" অতনুবিহারী বললেন, "আমার আওয়াজই দরকার।" তাঁর নিজের অবশ্য আওয়াজ-ফাওয়াজ একদম ভাল লাগে না, তবে মাধুরী আওয়াজ চান—কী আর করা যায়!

দোকানদার বললেন, 'এ ঘড়ি আমার একটাই আছে। পছন্দ না হলে কিন্তু আর ফেরত নেওয়া হবে না।"

"না, না, ফেরত দেব কেন?" অতনুবিহারী ঝামেলা করবেন না তিনি জানেন।

"দেখেশুনে নেবেন, ব্যস!" দোকানদার বললেন, "তারপর আর ফেরত নেই। বুঝলেন, আগে ফেরত নেওয়া হত, কিন্তু ঘড়ির কম্পানিটাই উঠে গেল কিনা, তাই এই ব্যবস্থা। তবে এ-ঘড়িটার দামও কমিয়ে দিয়েছি, এখন শ'খানেক টাকা পেলেই দিয়ে দিই, কিন্তু এ-ঘড়ি কি আপনার পছন্দ হবে?"

"তা আপনি এত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন? আমার ওই ঘড়িই চাই, মানে চিঠিতে ঠিক যা লেখা আছে।"

দোকানদার বললেন, "ওরে রঘু রে, ওরে রঘু, কোথায় গেলি, এক্ষুণি তারুকে বল তো বিনোদকে বলতে সেই ঘড়িটাকে ঠিকঠাক করতে, যত তাড়াতাড়ি হয়।"

এর পর অতনুবিহারী রাস্তায় নেমে পড়েন।

অতনুবিহারী দুটি ঘন্টা কী করবেন, বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন ট্রামে করে বালিগঞ্জ স্টেশনে যাবেন, আবার সেই ট্রামেই ফিরে আসবেন। বাঃ, দারুণ আইডিয়া! তিনি একটা ম্যগাজিন কিনে ফেললেন, তারপর একটা ট্রামে উঠে বসলেন। চমৎকার ট্রাম। বেশ আস্তে-আস্তে চলে, হুড়মুড় করে পাগলের মতো ব্যবহার করে না। দুপুরে ভিড়ও তেমন নেই।

প্রায় আড়াই ঘন্টা পর তিনি ফিরতে পারলেন। গড়িয়াহাটের কাছে একটা কিসের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল, আর ট্র্যাফিক জ্যাম। বড্ড দেরি হয়ে গেল। দোকানে এসে অবশ্য দেখলেন তাঁর ঘড়িটা তখনও আসেনি। দোকানদার বললেন, "ওর দু-একটা পার্টে একটু মরচে-মতো ধরেছে, তাই সেগুলোকে স্পিরিটে ডুবিয়ে দু'জনে মিলে পরিষ্কার করছে, আর আধ ঘন্টা পরই পেয়ে যাবেন।"

অতনুবিহারী দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার একটা দোকান থেকে এক টাকা দামের দুটো শিঙাড়া কিনে খেতে লাগলেন, বড্ড খিদে পেয়েছিল। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে দোকানে এসে দেখলেন, ঘড়িটাকে সুন্দর করে

খবরের কাগজ দিয়ে প্যাক করা হচ্ছে। ঘড়িটাকে যে কেমন দেখতে তাও তিনি জানতে পারলেন না। তা জানবার দরকারও নেই।

দোকানে কোনও কাগজপত্র সই করতে হল না, কিছু না। ক্যাশমেমোও দিলেন না কেউ। দোকানদার ওঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে একটা কালো খাতায় লিখে রাখলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা ভাল জিনিসই পেয়ে গেলেন, এমন জিনিস আজকাল আর পাওয়া যায় না। বাকি পঞ্চাশ টাকা আপনার খুশিমতো যে-কোনও সময়ে দিয়ে যাবেন। আচ্ছা নমস্কার।"

প্যাকেটটা ভারী নয়, তবে অতনুবিহারীর কাছে সেটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বলে মনে হতে লাগল। একবার বাঁ হাতে করে চলেন, একবার ডান হাতে সেটা ধরেন, কখনও-কখনও দু'হাতে ধরে পথ চলেন। রাস্তায় তো ভিড়ের অন্ত নেই। প্রায় চারটে বাজে, এরই মধ্যে হাজারে-হাজারে লোক শেয়ালদার দিকে চলেছে। অতনুবিহারীবাবু ভাবলেন, এই সেরেছে, এত লোক বোধ হয় তাঁরই কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়বে। ব্যস, তা হলেই হয়েছে আর কি। আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না। ঘড়ি নিয়ে তো নয়ই। তবু একটু পর আরও ভিড়, আরও ভিড় হবে। গাদা-গাদা মানুষ নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করবে। তার চাইতে এখন হুট করে একটা কম্পার্টমেন্টে কোনওমতে উঠে পড়লে কিছুটা স্বস্তি। যত ভাবেন ততই তাঁর মনের মধ্যে কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে। শেয়ালদার দিকে যত এগোন ততই যেন প্যাকেটটাকে আরও ভারী বলে মনে হতে থাকে। এরই মধ্যে হঠাৎ একজন রোগা টিঙটিঙে চেহারার লোক তাঁর ওই প্যাকেটের ওপর যেন একটা ঘুসিই বসিয়ে দিলেন। ঘুসি আসলে তিনি দেননি, তা ভিড় রাস্তায় তিনি উলটো দিকে একটু জোরেই আসছিলেন, আর বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। হাতের সঙ্গে প্যাকেটটার গুঁতো লাগতেই রোগা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "এইসব যাচ্ছেতাই জিনিস নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে লজ্জা করে না?"

অতনুবিহারীবাবু ভাবছিলেন তাঁর ঘড়িটা বুঝি শেষ হয়ে গেল, তিনি নিজেই কিছু একটা বলবেন ভাবছিলেন। রোগা টিঙটিঙে লোক দেখে বলতে একটু ইচ্ছেও করছিল, কিন্তু তার আগেই তাঁকে ওই কথা বলায় তিনি বললেন, "বাঃ মশাই, আপনি আমার নতুন ঘড়িটার বারোটা বাজালেন আর দোষ হল আমার?"

আর বেশি বলতে পারলেন না অতনুবিহারী, বলতে আর হলও না। হঠাৎ তাঁর প্যাকেট থেকে ঢোঁয়াই, ঝাং—ঝর ঝর ঝরররর ঝরররর টুং ঠিক করে এমন বিরাট একটা আওয়াজ বেরোল যে, হঠাৎ ভয় পেয়ে তাঁর

হত আলগা হয়ে গেল, আর দুম করে ফুটপাথের ওপর ঘড়িটা পড়ে, খ্যাঁ-অ্যাশ, খ্যাঁ-অ্যাশ, খ্রঁররর ঝাং, ঝররর ইত্যাদি প্রচণ্ড আওয়াজ করতে লাগল, আর কারা যেন বলল, "ওরে বাবা বোমা-টোমা নাকি", বলে হুড়মুড় করে যে যেদিকে পারল পালিয়ে যেতে লাগল। আর ঠিক এস সময় অতনুবিহারীর দুর্ভাগ্য, কাছেই একটা বাসের টায়ার প্রবল আওয়াজ করে ফেটে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে বউবাজার স্ট্রিট, যে রাস্তায় কয়েক সেকেন্ড আগে লোক কিলবিল করছিল, প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কেউ-কেউ বলতে-বলতে ছুটল, "কলকাতায় আবার শুরু হয়ে গেল রে, উঃ, আর পারা যায় না।"

অতনুবিহারী বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘড়িটাকে তুলে নিলেন। নাঃ, আর আওয়াজ-টাওয়াজ বেরোচ্ছে না। তিনি প্যাকেটটাকে নিয়ে হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর ভয় হল, এক্ষুণি বুঝি পুলিশ-টুলিশ এসে তাঁকে জাপটে ধরে লালবাজারের বোম-স্কোয়াডের সামনে বসিয়ে দিয়ে পর পর কুইজ-মাস্টারের কায়দায় একশো কুড়িটা প্রশ্ন করবে। উঃ, ভাবতেই তাঁর আতঙ্ক হল। তিনি গলি দিয়ে হনহন করে যাচ্ছেন, এখন গলিতেও রীতিমত ভিড় হয়ে গেছে। বহু লোক গুজব শুনেছে, বউবাজারে কারা বোমা ফেলেছে, আবার গুজবে যা হয় তাও হয়েছে, দু'জন নাকি তৎক্ষণাৎ মারা গেছে আর কয়েকজন রাস্তায় এখনও ছটফট করছে! অতনুবিহারীকে একজন কে হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ মশাই, ব্যাপারটা কী?"

অতনুবিহারী বললেন, "কিছু না, মশাই, কিছু না। স্রেফ গুজব।"

ভদ্রলোক বললেন, "তবে আপনি হনহন করে যাচ্ছেন কেন?"

অতনুবিহারী বললেন, "গুজব শুনে সমস্ত বউবাজারটা ফাঁকা হয়ে গেল কিনা, তাই কেমন ভয়-ভয় করছে, তাই তো হনহনিয়ে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে। ট্রেনেও আবার দারুণ ভিড় হয় আজকাল মশাই...।"

বলে অতনুবিহারী বেশ জোরেই চলছেন, এমন সময় একটি গোরু, যাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সাত চড়ে রা কাড়তে পারে না, সেইরকম একটা ছোট গোরু অকস্মাৎ তাঁর প্যাকেটটায় একটা শিং প্রায় ঢুকিয়ে দিল। গোরু বোধ হয় কোনও কারণে মাথাটা নাড়ছিল, হয়তো মাছির ভনভনানি কিংবা অন্য কিছু হবে, কিন্তু এবারে ফল প্রায় আগের মতোই মারাত্মক। এবারে প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ল না বটে, কিন্তু প্যাকেট থেকে যা আওয়াজ বেরোল তা আগের চেয়েও অন্তত দেড়গুণ আর অনেক বেশি কর্কশ। ঘ্র্যাঁ ঘ্র্যাঁ ঘ্যটাং-ঘ্রশ ঘ্রশ ঘ্র ঘ্র ঘ্র—উঃ, ঘড়িটার বোধ হয় আর কিছু নেই। কালই ওটাকে ফেরত

দিতে হবে দোকানে। আর সে-কথা ভাবতেই তাঁর শরীরটা কেমন যেন ঘামতে লাগল। কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। বহু লোক এবারেও পালাতে শুরু করল—আবার কেউ বলল, লোকটা বোমারু, এক ধরনের অতি-বিপ্লবী। কেউ বলল, অতি-বিপ্লবী না ছাই, প্রতি-বিপ্লবী না হয়ে যায় না। দুটো কান ছিঁড়ে দিলেই বিপ্লব বেরিয়ে যাবে।

ওই অবস্থাতে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, তা ছাড়া কোনও কথা-কাটাকাটি করাটাও ঠিক হবে না। ওদিকে ট্রেনগুলো সব বেরিয়ে যাচ্ছে। অতনুবিহারী ভাবলেন, ঘড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে লাভ নেই। ও-ঘড়ি নিয়ে কিস্‌সু লাভ নেই। উনি ভাবলেন, যদি ওঁর মেসোর বাড়িতে ঘড়িটাকে রেখে যাওয়া যায় তা হলে চমৎকার হয়। মেসোর বাড়ি এই তো কাছেই, সারপেন্টাইন লেনে। তিনি হনহন করে মেসোর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বাড়িতে বেশ বড়গোছের একটা তালা ঝুলছে। তখন তাঁর মনে হল, তাই তো, মেসোরা তো সব বাড়িসুদ্ধ পুরীতে বেড়াতে গেছেন—কালই গেছেন। সামনের দোকানদার দৃশ্যকুমার আইচের সঙ্গে অতনুবিহারী পরিচয় ছিল। অতনুবিহারী বললেন, "দাদা, আমার এই ঘড়ির প্যাকেটটা এখানে রেখে যাব এক রাতের জন্য। কাল সকালেই আবার নিয়ে যাব, যদি দয়া করে...।"

দোকানদার বললেন, "এ তো খুব ভাল কথা অতনুবাবু, খুব চমৎকার কথা, তবে কিনা কাল আমাদের দোকান বন্ধ। পরশু বিকেলে আবার খুলবে।"

অতনুবিহারী বললেন, "তাতে কী হয়েছে, আপনি রেখে দিন। আমার তাড়া নেই।" বলেই বললেন, "আমার দারুণ তাড়া আছে, আমি চলি, ক'দিন পরই আসব।" বলে প্যাকেটাকে দোকানে রেখেই তিনি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিলেন। হাঁটা অবশ্য সেটাকে ঠিক বলা যায় না, দৌড় দিলেন বললেই ঠিক হয়। যাই হোক, হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি শেয়ালদা স্টেশনে এসে দেখলেন ভিড় যেরকম হয় সাধারণত সেইরকমই ভিড়। তিনি কোনওমতে একটা কামরায় উঠে পড়লেন। যাক, একটু নিশ্চিন্ত হলেন অতনুবিহারী।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর তিনি বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলেন, তখন বেশ সন্ধে হয়ে এসেছে। বাড়িতে দেখলেন, তাঁর এক শ্যালক সস্ত্রীক বহুদিন পর বোম্বাই থেকে এসেছে, তাই নিয়ে মাধুরী দারুণ খুশি হয়ে নানারকম রান্নবান্নার বন্দোবস্ত করছে। তিনি মাধুরীকে ঘড়ির কথাটা বলবেন কি না ভাবছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায় তিনি স্থির করলেন ওসব না বলাই ভাল। অনেক কথা বলতে হবে, গুছিয়ে বলতে সময় লেগে যাবে বেশ। তার

চাইতে না বলাই ভাল। তিনিও শ্যালক আর শ্যালকের বউয়ের সঙ্গে নানারকম গল্প করতে লাগলেন। স্থির করলেন পরদিন আর অফিসেই যাবেন না। একটা দিন বেশ বিশ্রাম করা যাবে আর চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

প্রায় রাত দেড়টা পর্যন্ত গল্পটল্প করে শুতে যাওয়ার জন্য পরদিন অতনুবিহারীর ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হল। কেউ তাঁকে ডেকেও দেয়নি। এই সময় প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি ট্রেনে ভিড়ে পিষ্ট হন। বেশ খুশি হয়ে দেখলেন, খবরের কাগজখানা তাঁর টেবিলে পড়ে আছে। আজকের কাগজ! অতনুবিহারীর খবরের কাগজ রবিবার ছাড়া সকালে বিশেষ পড়া হয় না। তিনি আলস্যভরে কাগজটা তুলে নিলেন। তারপরই প্রথম পাতার নীচের দিকে তাঁর চোখে পড়ল। অ্যাঁ, এ কী!এ যে সারপেন্টাইন লেনের খবর। অ্যাঁ—দৃশ্যকুমার আইচ প্রহৃত! দোকানে বোমাতঙ্ক , কী ব্যাপার ? তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল, চুলগুলো সব খাড়া হয়ে উঠল। তিনি কেবল বলতে লাগলেন, "কী সাঙ্ঘাতিক, কী সাঙ্ঘাতিক!"

মাধুরী তাঁর ওই বিহ্বল ভাব দেখে বললেন, "কী আবার, এদিকে ডাকাতি-টাকাতি হল নাকি ?" মাধুরী জানেন ডাকাতি হলেই সেই খবর পড়ে অতনুবিহারী খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। অতনুবিহারী বললেন, "সাঙ্ঘাতিক! উঃ আমার জন্য, না তোমার জন্য এই বিশ্রী কাণ্ডটা হল!"

অতনুবিহারী বললেন, তাঁর শ্যালক বললেন, "কী ব্যাপার জামাইবাবু, হল কী ? "সর্বনাশ হয়েছে! এই খবরটা একটু পড়ো, তা হলেই বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের লোকেরা সবাই এক-একটা উজবুক! উঃ দৃশ্যকুমারকে লোকের মারল ? বিনা কারণে মারল ?"

বেশ গড়গড় করে কাগজটা পড়ে গেল অতনুবিহারীর শ্যালক। ঘটনাটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হবে না। তোমরা যারা এতখানি পড়েছ, তারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ ব্যাপারটা। তবু খবরের কাগজে যেভাবে বেরিয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি : মঙ্গলবার রাত্রে সারপেন্টাইন লেনের একটি দোকানে অকস্মাৎ প্রবল যান্ত্রিক আওয়াজ হতে থাকায় আশপাশের প্রায় চল্লিশটি বাড়ির আনুমানিক পাঁচশো ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায়। দোকানটি তখন বন্ধ ছিল। ব্যাপারটি রহস্যজনক বলে মনে হওয়ায় প্রতিবেশীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দোকানের মালিক দৃশ্যকুমার আইচকে সেই স্থানে ধরে আনেন। দৃশ্যকুমারবাবু যখন দোকানের একুশটি তালার এগারোটি খোলা শেষ করেছেন, সেই সময়, তখন রাত প্রায় বারোটা, দোকানের ভেতর থেকে আবার অদ্ভুত ঘড়াত-ঘড়াত ঘড়াং-ঢকাং ইত্যাদি প্রবল আওয়াজ শুরু

হয়ে যায়। এই সময় দৃশ্যকুমারের হাত কেঁপে যায় এবং দুটি চাবি হাত থেকে নর্দমায় পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়। তখন দৃশ্যকুমারবাবু দোকান খোলার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানালে জনতা দোকানঘরটিকে ভাঙার চেষ্টা করে। দৃশ্যকুমারবাবু তাতে বাধা দেওয়ায় বেশ খানিকক্ষণ হাতাহাতি চলে এবং কিছু লোক তাঁকে ঘুসিও মারে। ফলে দৃশ্যকুমারবাবু রাস্তায় পড়ে যান এবং জনতার মধ্যে দু'জন ডাক্তার থাকায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় দোকানঘরটি রক্ষা পায়। দৃশ্যকুমারবাবু ঘটনার ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারেননি। বেশি রাত্রের খবর, দোকানটি থেকে আর কোনও আওয়াজ বেরোয়নি। দৃশ্যকুমারবাবু বলেন, ঘটনার দিন বিকেলে তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর কাছে খবরের কাগজে মোড়া একটি মাঝারি ধরনের প্যাকেট রেখে যান। ওই প্যাকেটের মধ্যে কী ছিল তা তিনি জানেন না। তিনি সেই পরিচিত ভদ্রলোকের নামও জানাননি। পুলিশের সন্দেহ ওই প্যাকেটটিতে কোনও এক বিশেষ ধরনের বিস্ফোরক পাচার করা হচ্ছিল। এ ছাড়া পুলিশের ধারণা এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোনও চক্র জড়িত।

আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত! হ্যা-হ্যা করে হাসলেন অতনুবিহারী। আন্তর্জাতিক চক্র! তিনি আবার হাসলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর আবার ভয় হল। মনে হল তাঁর বাড়িতে বোধ হয় এবার পুলিশ আসবে। তাঁকে জেরা করবে। তাঁর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিস্ফোরক চক্রের যোগসাজস আছে কি না এ-কথা বার করার জন্য তাঁকে আজই হয়তো লালবাজারে নিয়ে যাবে। মাত্র একটা ঘড়ি তাঁকে এতখানি বিপদে ফেলবে তিনি যদি তার একটুও আভাস পেতেন তা হলে কি আর তিনি ঘড়িটা কিনে আনতেন? তারপরই তাঁর আর-একটা কথা মনে পড়ে ভয় আরও বেড়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলেন, পুলিশকে সব কথা খুলে বলবেন। তাঁর ঘড়ি কেনার আদ্যন্ত ইতিহাস সোজাসুজি বলবেন, একটুও লুকোবেন না কিছু, আর লুকোবার কীই-বা আছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আবার তাঁর মনে হল, তাই তো, সব তো তিনি বলবেন, কিন্তু প্রমাণ করবেন কেমন করে? দোকানদার তাঁকে তো কোনও ক্যাশমেমোই দেয়নি!

তবে একটি ব্যাপারে তাঁর মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। দৃশ্যকুমারবাবু, অর্থাৎ ওই দোকানের মালিক নিশ্চয় তাঁর নামটি এখনও জানাননি পুলিশকে। আর জানালেই বা কী। আসল ব্যাপারটা পুলিশ তো বুঝতেই পারবে দোকান খুলে প্যাকেটটা পরীক্ষা করার পর। একটা ঘড়ি তো আর বোমা নয়। কখনওই তা হতে পারে না। তিনি হঠাৎ একটু জোরে বলে উঠলেন, তিনি বললেন, "ঘড়ি কখনও বোমা হয়, পাগল?" তারপর আবার বললেন, "ঘড়ি বোমা

হয় না।" তারপরই তাঁর মনে পড়ল একটা গোয়েন্দা-কাহিনীতে পড়েছিলেন একটা ঘড়ির মতো দেখতে বোমার রোমহর্ষক কাহিনী! তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল যদি পুলিশও সেই কাহিনীটা পড়ে থাকে তা হলে? কিংবা ঘড়ির মধ্যে যদি সত্যিই বোমাই থেকে থাকে?

"তা হলে আর কী, সর্বনাশ!"

সারাদিন অতনুবিহারী মনমরা হয়ে রইলেন। তবে ক্রমশ সন্ধের দিকে তাঁর মনটা আবার ভাল হয়ে উঠল। পুলিশ যদি তাঁকে সন্দেহ করত, তা হলে কি আর তারা তাঁকে এতক্ষণে ধরত না? সন্ধেবেলা তিনি বললেন, "মাধুরী, ও মাধুরী, দাও তো বাজারের থলিটা, একটু জুত করে বাজার করে আনি।"

সমস্ত দিনের গুমোট ভাবটা কেটে গেল। ক্রমশ ঘড়ির ব্যাপারটা তাঁর মন থেকে চলে যেতে লাগল।





পরোপকারী ভূত

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ি ছ'ঘন্টা লেট। অর্থাৎ কিনা সন্ধে সাতটার সময় যেখানে নামার কথা, সেখানে নামতে হলো রাত একটায়। তিনু-ডাক্তার ভেবেছিলেন, কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে রিকশাভ্যানে উঠে বসবেন, একান্তই যদি রিকশাভ্যান না পাওয়া যায় তো গোরুর গাড়িই করবেন। কিন্তু হা কপাল, কোথায় কুলি। সারা স্টেশনে একটাও জনমানবের চিহ্ন নেই। অগত্যা ভারী স্যুটকেস্টা টানাটানি করে নিজেই প্ল্যাটফরমে নামালেন।

এ কি প্ল্যাটফরম রে বাবা! এ যে মোরাম বিছানো মাটি। এদিকে ওদিকে

দু-চারটে ঝাপড়ানো কৃষ্ণচূড়া কি রাধাচূড়ার গাছ। বেশ খানিকটা দূরে স্টেশনমাস্টারের ঘরের সামনে আলো জ্বলছে। সারা প্ল্যাটফরমে আর কোথাও কোনো আলোর বালাই নেই। আজ আবার কি তিথি চলছে কে জানে, চাঁদ-ফাঁদ কিছুই নেই। অমাবস্যা হবে হয়তো। মনে মনে ভীষণ বিরক্তই হচ্ছিলেন তিনু ডাক্তার। এই বয়সে আর এসব পোষায়?

কিন্তু উপায়ই বা কি! চাকরি রাখতে হলে সবই করতে হয়। রঘুনাথপুরের হেলথ সেন্টারের দয়িত্ব দিয়ে ওঁকে বদলি করা হয়েছে। হয় রঘুনাথপুরে গিয়ে জয়েন করো, নইলে চাকরি ছেড়ে কেটে পড়।

চাকরি ছাড়া কি সোজা কথা! খাব কি! এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই জয়েন করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনু ডাক্তার। আর ট্রেনটাও যেন ওঁর সঙ্গে শত্রুতা করল। ছ'ঘন্টা লেট হওয়ার কি আর দিন পায় না।

মনে পড়ল, কলকাতা থেকে যখন উনি রওনা দেন, অফিস থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, রঘুনাথপুর দারুণ চমৎকার জায়গা। একবার গেলে দেখবেন, এদিকে আর আসতেই ইচ্ছে করবে না। ওখানে আপনার জন্য ফার্নিশড্ কোয়ার্টার। চব্বিশ ঘণ্টা আলো জল। হেলথ সেণ্টারটা অবশ্য স্টেশন থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে। তা রিকশাভ্যান পাবেন। একান্তই যদি রিকশাভ্যান না পান তো গোরুর গাড়ি অঢেল। আপনি মানে, ডাক্তারবাবু এসেছেন শুনলে দেখবেন কেমন খাতির করে আপনাকে নিয়ে যায়।

এখন মনে হচ্ছে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কেন ডাক্তারবাবুরা থাকতে চান না। তা কি আর করা যাবে, এসে যখন পড়েছেনই, হেলথ সেণ্টার আব কোয়ার্টারটা না দেখে ফেরেন কি করে। তা ছাড়া ফিরব বললেই তো ফেরা চলে না, ফিরতি ট্রেন কাল দুপুর দুটোর আগে নয়।

চারপাশে একবার ভাল করে দেখে নিলেন তিনু ডাক্তার। লোকজন তো দূরের কথা শেয়াল কুকুরেরও দেখা নেই। ভাবলেন, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকারও তো মানে হয় না, যাই একবার স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকেই এগোই। অন্তত রাতটা ওঁর ওখানেই গল্পসল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সবে দু'পা মাত্র এগিয়েছেন, আর অমনি পেছন থেকে কার গলা, এই যে মশাই, শুনছেন?

কিছুটা যেন চমকেই উঠেছিলেন ডাক্তারবাবু? কে রে বাবা, কে ডাকে। ভুল শুনলাম না তো!

স্যুটকেসটা আবার মাটিতে রেখে পিছন ফিরে তাকালেন। তাকিয়েই অবাক, কম্বল মুড়ি দেওয়া একটা লোক। আশ্চর্য, এ আবার এল কোত্থেকে!

ডাক্তারবাবু বললেন, আমাকে ডাকছেন?

আপনি ছাড়া আর আছেটা কে এখানে যে ডাকব?

লোকটা এগিয়ে এল, আপনিই তো নতুন ডাক্তারবাবু, তাই না?

তিনকড়ি যে আজকের এই ট্রেনেই এখানে আসবেন এটা কারও জানার কথা নয়। তাহলে লোকটা জানল কি করে, না কি আন্দাজে ঢিল মারল। কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি?

আজ্ঞে আমি আপনার কম্পাউণ্ডার। মানে রঘুনাথপুর হেলথ সেণ্টারের কম্পাউণ্ডার।

তিনু-ডাক্তার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। যাক বাবা, নিজের লোক বলতে তবু একজনকে পাওয়া গেল। বললেন, ট্রেন থেকে নেমে যে কি বিপদেই পড়েছিলাম, কি বলব? তা আমি যে এই ট্রেনেই আসব, জানলেন কি করে?

লোকটা আরও এগিয়ে এসে একটু হাসল, খবর ঠিক পেয়ে গেছি স্যার, সে সব পরেই জানতে পারবেন, এখন চলুন, রাতটা আমার বাড়িতেই কাটিয়ে—

আপনার বাড়ি!

এই দেখুন, আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন! আমি স্যার সামান্য একজন কম্পাউণ্ডার। আপনি ডাক্তার আর আমি কম্পাউণ্ডার।

না, তা না। আচ্ছা কি নাম তোমার?

আজ্ঞে আমি, মানে আমার নাম ধনঞ্জয় বেরা। আপনি স্যার ধনা বলেই ডাকবেন।

তিনু-ডাক্তারের মনে পড়ল, হ্যাঁ ধনঞ্জয় নামটাই বলে দিয়েছিল কলকাতা থেকে। বললেন, হ্যাঁ ধনঞ্জয়ই বলে দিয়েছিল ওরা। তা ভাই ধনঞ্জয়, এত রাতে এই ভারি স্যুটকেস নিয়ে কোথাও যাওয়াটা কি ঠিক হবে। স্টেশনমাস্টারের ঘরেই বসে কাটিয়ে দেওয়া যায় না? কাল সকালে না হয়—

আপনি স্যার মিছিমিছি ভাবছেন, আমি যখন এসে পড়েছি, বাকিটা আমাকেই ভাবতে দিন।

বলেই ধনঞ্জয় ডাক্তারবাবুর স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিল। চলুন স্যার। মিনিট দশেকের রাস্তা। রাতটা স্যার আমার ওখানেই কাটিয়ে—

তিনু-ডাক্তার দেখলেন, ধনঞ্জয় স্যুটকেস মাথায় তুলে হাঁটতে শুরু করেছে। অতএব ওঁকেও হাঁটতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পাশাপাশি এসে তিনু ডাক্তার ধনঞ্জয়ের দিকে তাকালেন, এত রাতে কারও বাড়ি গিয়ে ওঠাটা কি ঠিক হবে! আমি বলি

কি, আমার তো ওখানে কোয়ার্টার আছেই। সেখানেই যাওয়া যায় না?

ধনঞ্জয় বলল, স্যার রিকশাভ্যান বা গোরুর গাড়ি যদি পেতাম হেলথ সেণ্টারের কাছে আপনার কোয়ার্টারেই চলে যাওয়া যেত। এত রাতে এতটা পথ স্যার আপনি হাঁটতে পারবেন না। আমার বাড়ি তো কাছেই, ওখানে আজকের রাতটা কেবল কাটিয়ে, কাল স্যার আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

তিনু-ডাক্তার একটু অবাক হন। হেলথ সেণ্টারে কি তোমার কোনো কোয়ার্টার নেই? তুমি কি এত দূর থেকেই যাতায়াত করো নাকি!

না স্যার। কোয়ার্টার থাকবে না কেন, আছে। তবে আমি তো এদিককারই ছেলে। আমার আদি বাড়িও এখানেই। আপনি চলুন না স্যার, গেলেই সব দেখতে পারবেন।

আবার দু'জনে হাঁটতে থাকে। কাঁচা মাটির রাস্তা। দু'পাশে ধান জমি। আবার কখনও-সখনও বিরাট বিরাট গাছ। গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে হাঁটতে কেমন যেন গা ছমছম করে।

ধনঞ্জয় বলল, স্যার, ওই যে আমার বাড়ি। গরিবের আস্তানা স্যার।

একটু অবাক হয়ে তাকালেন তিনু-ডাক্তার। দূর থেকে বাড়িটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। কেমন যেন ভাঙাচোরা দৈন্য দশা। আশ্চর্য, ওখানে কোনো লোক থাকতে পারে নাকি!

বললেন, তুমি ছাড়া আর কে থাকে ওখানে? তোমার ছেলেমেয়ে, বউ?

না স্যার। ওসব কোনো বালাই নেই। বিয়েই করিনি।

বলো কি হে, সংসার না করে কিভাবে বেঁচে আছ? অ্যাঁ?

সে সব স্যার অনেক কথা। রঘুনাথপুরের হেলথ সেণ্টারে যখন এসেছেন সবই জানতে পারবেন। আসুন, এদিকে, এদিকে।

বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কি বিশ্রী রাস্তা রে বাবা। এ রাস্তায় কখনও হাঁটা যায়!

তোমার বাড়ি অবধি কোনো রাস্তা নেই? তোমরা কি এইভাবেই চলাফেরা করো নাকি?

না স্যার। শর্টকাট করার জন্যই এদিকে যাচ্ছি। রাস্তা ধরে গেলে পথটা অনেকখানি ঘুরতে হতো। আসুন না স্যার। আর একটু তো মাত্র পথ।

তিনু-ডাক্তার কি আর করেন, ধনঞ্জয়ের পিছন পিছন হাঁটা ছাড়া এখন আর উপায়ও নেই।

যতই এগোন, বাড়ির চেহারাটাও তত স্পষ্ট হতে থাকে। এ যে একেবারে

ভুতুড়ে বাড়িরে বাবা! কোন মান্ধাতার আমলের বাড়ি কে জানে? এখানে যে কেউ বাস করতে পারে ভাবাই যায় না।

হ্যাঁ হে ধনঞ্জয়, এ বাড়িতে তুমি একা থাক! ভয় করে না?

আজ্ঞে ভয় কি? আসলে স্যার, পয়সাকড়ির অভাব, বাড়িটা যে সারাই করে নেব, তা আর হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া স্যার, আমি একা মানুষ। কোনো রকমে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেই হয়ে যায়।

বাড়িটার একদম কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা। তিনু ডাক্তার দেখলেন দেয়াল ফুঁড়ে বট অশ্বত্থ গজিয়ে গেছে। বিশ্বাসই হয় না, এখানে কখনও সখনও ধনঞ্জয় এসে রাত কাটিয়ে যায়। বারান্দা ভর্তি ছাগলের নাদি আর ময়লা। কত দিন যে কেউ এখানে ঝাঁটপাট দেয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়।

আসুন স্যার। গরিবের বাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে যাবেন।

বারান্দায় উঠে মাথা থেকে স্যুটকেসটা নামায় ধনঞ্জয়। এ বাড়ি স্যার আজ থেকে যে কত যুগ আগের তা হিসেবই নেই। এখন অভিশপ্ত বাড়ির মতো হয়ে রয়েছে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, এখানে থাকার মতো তোমার কেউ নেই?

ধনঞ্জয় একটু হাসল, থাকবে না কেন স্যার! তবে আমার ভাই-টাইরা কেউ আর গ্রামে থাকতে চায় না। চাকরিবাকরি যোগাড় করে সবাই এখন শহরের বাসিন্দা।

বলতে বলতে দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ায় ধনঞ্জয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা মচমচ করে শব্দ।

তিনু-ডাক্তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। সে কি হে, দরজায় তালা লাগিয়ে বেরওনি। চুরির ভয় নেই বুঝি এদিকে?

ধনঞ্জয় একটু হাসল, চোর কোন দেশে নেই স্যার। আসলে চোরও জানে এ ঘরে ঢুকে কিছুই পাবে না। যাক গে, আসুন স্যার। একটা মাত্র রাত তো, একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। কাল আপনাকে রঘুনাথপুরের কোয়ার্টারে পৌঁছে দেব।

ধনঞ্জয় ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তাকিয়ে রইলেন তিনু-ডাক্তার। ঘরের ভেতর জম্পেশ অন্ধকার। যতক্ষণ না আলো জ্বালান হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, ধনঞ্জয়ের আর কোনো সাড়াশব্দই নেই।

তিনু-ডাক্তার ডাকলেন, ও ধনঞ্জয় কোথায় তুমি? আলোটা জ্বালো। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে।

ঘরের ভিতর থেকেই ধনঞ্জয় উত্তর দিল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই স্যার। আপনার কাছে যদি থাকে একটু বার করুন না।

দেশলাই! তিনু-ডাক্তার বিড়ি সিগারেট খান না যে দেশলাই থাকবে। এই সময় মনে পড়লো, সঙ্গে একটা টর্চ নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। কি ভুলই হয়ে গেছে, তা বলার নয়।

আমার কাছেও তো দেশলাই নেই ধনঞ্জয়। কি মুশকিল হলো বলো দেখি।

আপনি ঘরে ঢুকুন না স্যার। একটা রাতের তো ব্যাপার। এখানে খাট আছে শুয়ে পড়ুন। ভোর হতে আর কতটুকুই বা বাকি।

তিনু-ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। নিরেট অন্ধকার। ঘরের ভিতর কোথায় খাট আর কোথায় কি, কিছুই বোঝার উপায় নেই।

একটা আলো যোগাড় করা যায় না ধনঞ্জয়? আশেপাশে তোমার জানাশোনা বাড়ি নেই?

থাকবে না কেন স্যার। গ্রাম দেশে কেউ অচেনা থাকে না, সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু স্যার, এত রাতে ডাকাডাকি করাটা কি ঠিক হবে?

বিপদে যখন পড়েছি, না ডেকেই বা উপায় কি! একটু দেখ না হে, আলো ছাড়া কি থাকা যায়।

ঠিক আছে, দেখছি স্যার। আপনি এই খাটে বসুন তো।

কোথায় খাট? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে।

ঠিক আছে স্যার, আমার হাত ধরে এগিয়ে আসুন।

শীতল একটা হাতের স্পর্শ পেলেন তিনু-ডাক্তার। হাত না যেন বরফের একট টুকরো।

তোমার হাতটা তো বরফের মতো ঠাণ্ডা হে।

না স্যার, ও কিছু না, আসুন এদিকে, এই খাট।

সত্যি সত্যি একটা খাটই। তিনু ডাক্তারের মনে হলো বেশ গদি পাতা। একপাশে বসলেন।

এবার আপনি শুয়ে পড়তে পারেন স্যার। আমি আলো পাই কিনা দেখি।

একটু তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। একা একা এরকম একটা ঘরে থাকব, বুঝলে না!

আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনি বিশ্রাম করুন। রাতও আর খুব বেশি নেই স্যার। একটু পরেই হয়তো পাখির ডাক শুনতে পাবেন।

ধনঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর তখুনি তিনু ডাক্তারের মনে হলো ধনঞ্জয়ের হাতটা অত ঠাণ্ডা হলো কি করে? জীবন্ত মানুষের হাত কি অত ঠাণ্ডা হতে পারে! আশ্চর্য!

ঘরের ভিতর স্তব্ধ হয়েই বসে রইলেন তিনু ডাক্তার। কি কুক্ষণেই যে এই রঘুনাথপুরে ডাক্তারি করতে এলাম, এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি।

অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইলেন তিনু-ডাক্তার। ধনঞ্জয় সেই যে আলো আনতে গেল তো গেলই।

তবে কি—না, তা কি করে হয়। জলজ্যান্ত মানুষটা ওঁকে এখানে নিয়ে এলো। তাছাড়া ধনঞ্জয় কম্পাউণ্ডারের কথা তো কলকাতা থেকেও বলে দেওয়া হয়েছিল।

বিছানায় একটু কাত হয়ে শুয়েই পড়লেন তিনু-ডাক্তার।আবোল-তাবোল ভেবে তো লাভ নেই, যা কপালে আছে হবেই। আর যতক্ষণ না ভোর হচ্ছে ততক্ষণ কিই বা আর করা যাবে।

ক্রমে ক্রমে আরও বেশ খানিকটা সময় চলে গেল। ধনঞ্জয়ের কোনো পাত্তাই নেই। তিনু-ডাক্তারও নরম বিছানা পেয়ে এক সময় ঘুমিয়েই পড়লেন।

ঘুম ভাঙাল যখন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন তিনু-ডাক্তার। দরজাটা হাঁ করা, খোলা। বিছানার একপাশে ওঁরই স্যুটকেসটা।

আশ্চর্য! ধনঞ্জয় কোথায় গেল? রাতে কি ও ফেরেনি নাকি। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনু-ডাক্তার। দুরে রাস্তায় গোরুর গাড়ি যাচ্ছে। ঝাঁকামুটে মাথায় কিছু কিছু লোকও চলাচল করছে।

কি যে করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বাড়িটার চেহারা সত্যি ভাবা যায় না। এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে নাকি! আশ্চর্য!

নাহ, একটু এগিয়ে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার। তিনু-ডাক্তার হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলেন রাস্তার ধারে, এই যে দাদা, শুনছেন?

মাঝারি বয়সের ভদ্রলোক দাঁড়ালেন, আপনি!

আমি রঘুনাথপুর হেলথ সেন্টারে যাব। কাল রাত একটার সময় ট্রেন থেকে নেমেছি।

লোকটা কেমন আপাদমস্তক দেখে নেয় তিনু-ডাক্তারের। তা, এখানে এলেন কি করে?

না মানে, ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আমাকে এখানে নিয়ে এলো। এই যে বাড়িটা

দেখছেন, ওখানে আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কোথায় যে গেল, আর ওব টিকিই পেলাম না।

ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আপানাকে নিয়ে এসেছে। আপনি গাঁজটাজা খাননি তো মশাই?

আজ্ঞে! আমি তিনকড়ি-ডাক্তার। হেলথ সেন্টারে বদলি হয়ে এখানে এসেছি। গাঁজা খেয়েছি বলছেন কেন?

ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার তো পরশুদিন মারা গেছে। রেলে কাটা পড়ে।

অ্যাঁ!

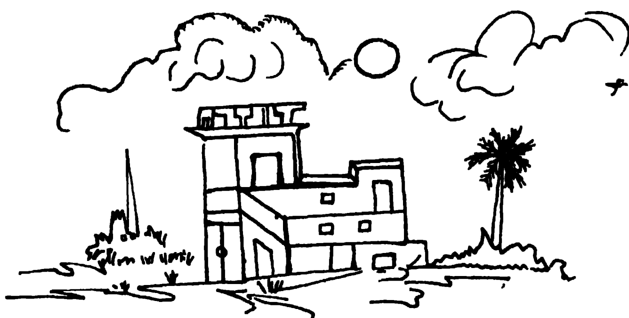
অ্যাঁ কি! সেই ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আপনাকে এখানে নিয়ে এলো বলছিলেন না, তাই!

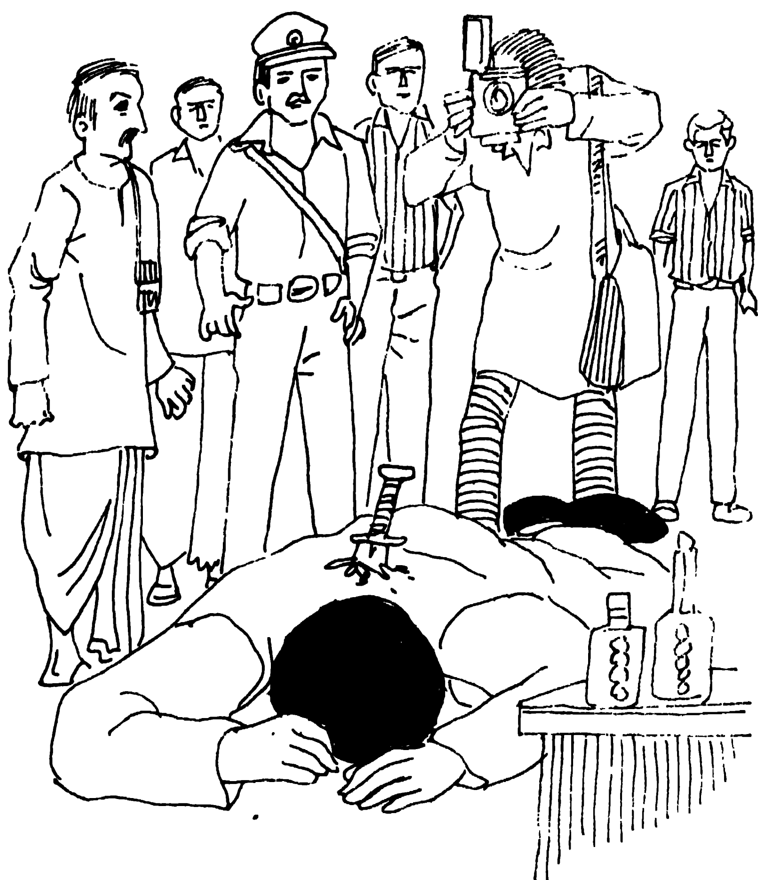
তিনু-ডাক্তারের বুকের ভেতর কেমন কাঁপুনি শুরু হলো এ সময়। ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার মারা গেছে। কবে মারা গেছে বললেন?

পরশু।

কিন্তু ও যে কাল আমাকে এখানে নিয়ে এলো। আমার কষ্ট হবে ভেবেই ও আমাকে ওর ঘরে রাতে শুতে বলেছিল।

লোকটা কেমন হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনু ডাক্তারের দিকে। তিনু-ডাক্তারও বুঝে উঠতে পারছিলেন না এ কি করে সম্ভব!





বিপদ যখন আসে

আনন্দ বাগচী

রাজুকাকা প্রথমে ওকে একা ছাড়তে চাননি, সঙ্গে লোক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমীর রাজি হয়নি, তার আত্মসম্মানে রীতিমত ঘা লেগেছিল। রাজুকাকা এমন ভাব করছিলেন, যেন সমীর কোন দুঃসাহসী অভিযানে যাচ্ছে। শেষে নিমরাজি হয়েও বলেছিলেন, আসলে কী জানিস, দিনকাল তো ভাল না!" সমীর হেসে ফেলেছিল। আসানসোল থেকে কলকাতা, বলতে গেলে এপাড়া-ওপাড়া। সবে হাঁটতে শেখা কত ভিখিরি ছেলেপুলেও বেমালুম চলে যাচ্ছে, আর সে, কলকাতর নামী স্কুলের ক্লাস টেনের সেকেণ্ড বয়, পারবে

না! এ কোনও কথা হল? তার ওপর টিকিট রিজার্ভেশন সব তো করাই আছে!

স্টেশনে যখন গাড়ি ঢুকছিল তখনই সমীর লক্ষ রেখেছিল চেয়ারকারের রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি ভাল করে থামার আগেই লোকজন ছুটতে শুরু করেছিল। সমীরও নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে এগোল। চেয়ারকারের দরজার কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় হুমড়ি খেয়ে রিজার্ভেশন লিস্ট পড়ছে। ওকে অবশ্য বেশি খুঁজতে হল না, লোকের ফাঁক ফোকর দিয়ে তাকিয়েই দেখতে পেল, তালিকায় তিন নম্বর নামটাই ওর। যাক এবার নিশ্চিন্তি। এখন শুধু কামরায় ঢুকে সিট নম্বর মিলিয়ে বসে যাওয়া।

কপাল ভাল হলে এরকমই হয়। জানলার ধারের সিটটাই পেয়ে গেল সমীর। আসার সময়েও জানলা পেয়েছিল, কিন্তু হাওড়া ছাড়িয়ে কিছুদূর আসতেই সন্ধে হয়ে যাওয়ায় বাকি রাস্তার প্রায় কিছুই ভাল করে দেখতে পায়নি। এবারে পাবে। ছুটন্ত দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে ফার্স্টক্লাস যাওয়া যাবে। স্টেশন এলে খুশিমতো চা খাবার কিনে খাওয়া যাবে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মেজাজটা এমনিতেই খুশ ছিল, তার ওপর নির্ঝঞ্ঝাটে এই উপরি পাওনার সম্ভাবনা। সমীরের উলটো দিকের চেয়ারে কোনও প্যাসেঞ্জার তখনও আসেনি। হয়তো খালিই যাবে কিংবা দুর্গাপুর থেকে কেউ উঠবে। সেই অদৃশ্য লোকটার মনগড়া একটা চেহারা দিতে দিতে সমীর হাতের সুটকেসটা সামনের খালি আসনে রেখে সবে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় জানলায় একখানা মুখ ভেসে উঠল। প্রথমে ভেবেছিল ভিখিরি কিংবা চা-অলা, কিন্তু মুখ তুলে তাকিয়েই বুঝতে পারল ভুল করেছে।

জানলার ওপিঠে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনও হাঁপাচ্ছিলেন। কোনওরকমে দম নিয়ে বললেন, ওঃ আর একটু হলেই মিস করতাম। তোমার নামই তো সমীর? রাজেনবাবুর ভাইপো? ক্রিক রো-তে থাকো।”

চল্লিশ মিনিটও হয়নি, সমীর রাজুকাকার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এরই মধ্যে কী এমন ঘটল। মনের উদ্বেগ গোপন করে সে জিজ্ঞেস করল, কেন, কী হয়েছে? আপনাকে তো ঠিক....

গোটা প্ল্যাটফর্মটাই বোধহয় ছুটতে ছুটতে এসেছেন ভদ্রলোক। এই বয়স, তার ওপর ভারী শরীর। দম ফুরনো গলায় কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যাচ্ছিল। ঘটনাটা অবশ্য একেবারেই সামান্য, সাধারণ। উনি থেমে থেমে যা বললেন, তার সারমর্ম এই। বৃদ্ধভদ্রলোক রাজাবাহাদুর ভুবনেশ্বর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে আসছেন। ভুবনেশ্বরবাবুর নাম সমীরের শোনা ছিল, রাজকাকাদের পাড়াতেই

ওঁর রীতিমত দর্শনীয় বাড়িটা সে দেখেছে। ভদ্রলোক অবশ্য এখন নামেই রাজা, তবে ওঁর পূর্বপুরুষরা যেন কোথাকার রাজা ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। ধনী হিসেবে যত না খ্যাতি, তার চেয়েও বেশি সুনাম তাঁর পাকা দাবাড়ু হিসেবে। রাজুকাকা শুধু যে ওবাড়ির ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তাই না, মাঝে মধ্যেই ভুবনবাবুর দাবার সঙ্গী। সেই ভুবনবাবুর এক নাতনির আজ জন্মদিনের উৎসব, কলকাতায়। নাতনি মানে মেয়ের মেয়ে। স্থির ছিল উনি আজ কলকাতায় যাবেন, কিন্তু কাল রাত্তিরে ঘরের মধ্যে পা পিছলে পড়ে কোমরে চোট খেয়েছেন। তাই সমীরের হাত দিয়ে তিনি নাতনিকে একটা প্রেজেণ্টেশন পাঠাতে চান, যাতে সন্ধে বেলার অনুষ্ঠানে সেটা পৌঁছে যায়। সমীরকে অবশ্য পৌঁছে দিতে হবে না, জামাইকে ট্রাঙ্ককল করে বলে দেবেন। সেই লোক পাঠিয়ে বিকেলের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে যাবে সমীরের কাছ থেকে।

কথাগুলো বলতে না বলতেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতেই জানলা গলিয়ে একটা ছোট প্যাকেট সমীরের হাতে গুঁজে দিলেন। সমীর দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ পেল না। গাড়ি ততক্ষণে স্পিড নিয়েছে। ছুটন্ত জানলা থেকে বৃদ্ধের মুখ মুছে যাবার মুহূর্তে তাঁর শেষ কথাটা শুধু শোনা গেল, খুব সাবধানে, বাবা!"

হাওড়ায় নেমে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ধরতে দেরি হওয়ায় বাড়ি পৌঁছতে প্রায় বেলা এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি খালি। মা না থাকলে বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করে। মা বোধহয় আরও এক সপ্তাহ আসানসোলে কাটিয়ে তবে ফিরবে। সমীরের থাকার কথা ছিল। কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে বলে থাকল না, দিন তিনেক থেকেই চলে এল। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। ওখান থেকে আজ প্লেনে দিল্লি চলে যাবেন অফিসের কাজে।

জলধরদা কিচেনে সমীরের জন্যে স্পেশাল কিছু রাঁধছে বোধহয়। মাংসের গন্ধটা এই বাইরের ঘর পর্যন্ত হানা দিয়েছে। কফি শেষ করে এবার স্নানটান সেরে নেবে বলে সমীর সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি ডোরবেল বেজে উঠল।

অসময়ে বেল বাজায় ঈষৎ বিরক্ত সমীর দরজা খুলতেই দুটি অচেনা লোক ওকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। হতভম্ব সমীর একটু কড়া গলায় শুধোল, "কে আপনারা? কাকে চাই?

ওরা সমীরের কথার কোনও জবাব দিল না। দীর্ঘ দোহারা চেহারার লোকটা সকলের আগে চোখ টানে। কালো টেরিলিনের ট্রাউজার্সের ওপরে একটা সাদা শার্ট, ঠোঁটের কোণ বরাবর টানা বারান্দা-মার্কা পুরুষ্টু গোঁফ। চোখে পোলারাইজড চশমা। ছায়ায় আলোয় লেন্সের রংটা কমে বাড়ে। সামনের

দাঁত দুটো নিষ্ঠুর হাসিতে যেন সামান্য উঁচু হয়ে আছে। আঙুলের ইশারায় সমীরকে সোফায় গিয়ে বসতে বলল।

দ্বিতীয় লোকটা ততক্ষণে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বেঁটে মোটা কাঠের গুঁড়ির মতো সলিড চেহারা। রোদে জলে হাওয়ায় পোড় খাওয়া। তামাটে রং। জোড়া ভুরুর নীচে ছোট ছটফটে চোখ দুটো অনবরত কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লম্বা লোকটা কেমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তার বুকপকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড দু আঙুলে ধরে টেনে তুলেই আবার ভেতরে রেখে দিল। যেন কণ্ডাকটারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মান্থলি দেখাল। ঘষা-চাপা গলায় বলল, লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আসছি।"

ঘরের আবহাওয়াটা বদলে গেল এক নিমেষে। সমীরের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। সোফার ওপর বসে পড়ে সে বলল, আপনারা কাকে খুঁজছেন? কী ব্যাপার?

ওরা দুজনেই এসে সমীরের মুখোমুখি বসল। বেঁটে লোকটা দাঁতে নখ কাটছে আর চারপাশ দেখছে।

"আমাদের কাছে খবর আছে" লম্বা লোকটা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ বাড়িতে একটা চোরাই নেকলেস এসেছে। যার দাম কম করেও কয়েক লক্ষ টাকা।"

সমীর স্তম্ভিত হয়ে ঘাড় নাড়ল, "অসম্ভব! আমাদের বাড়িতে? এসব কী বলছেন আপনি?"

"চালাকি করে লাভ নেই। আমরা সব জানি। ভালয় ভালয় নেকলেসটা বের করে না দিলে অনেক হুজ্জোতে পড়তে হবে। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, জানো নিশ্চয়।"

সমীর ঘাবড়ে গেল। কোথাও একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয়। কমজোরি গলায় জানাল, "আপনাদের বোধহয়..."

"না ভুল হয়নি। আমরা ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। আজ সকালে আসানসোল স্টেশনে হাতবদল হয়ে যে প্যাকেটটা এসেছে সেটা একবার দেখতে চাই।"

এবার সমীরের চমকাবার পালা। বাড়ি ফেরার পর প্যাকেটটার কথা কী করে যে একদম ভুলে গিয়েছিল সে, আশ্চর্য! আসলে জিনিসটা সুটকেসজাত করার পর ও নিয়ে আর কিছু ভাবেইনি সমীর।

ও হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো জন্মদিনের উপহার।

জন্মদিন কি মৃত্যুদিন সে পরে বোঝা যাবে। এই গ্যাংটার সঙ্গে যোগাযোগ কত দিনের?

বিশ্বাস করুন আমি কাউকেই চিনি না। প্যাকেটের ভেতর কী আছে কিছুই জানি না। বলেই সমীর উঠে গিয়ে তার সুটকেসের ভেতর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে এল। সাদা কাগজে জড়ানো, ধূপকাঠির গোল প্যাকেটের মতো একটা চোঙা, সাত আট ইঞ্চি লম্বা। প্যাকিংয়ের জোড়ের জায়গাটা গালা দিয়ে সিল করা।

লম্বা লোকটা হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্তে সিলটা দেখল। তার পর বুকপকেট থেকে ক্লিপ আঁটা জাপানি ছুরিটা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে শক্ত কাগজের টিউবটা দু'খণ্ড করে ফেলল। ভেতরে তুলোয় জড়ানো একটা রোল। তুলো ছাড়াতেই যেন একরাশ আলো ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ল। বুকের ভেতর বিস্ময়ের বাতাস টানার শব্দ হল সমীরের। সার সার হিরে বসানো একছড়া হার। লোকটি আঙুলের ডগায় তুলে ধরে সবজান্তার হাসি হাসল। হাসিটা ওই জাপানি ছুরির ফলার মতই নিষ্ঠুর, ধারাল এবং নিঃশব্দ।

এই তো! আমাদের ইনফর্মেশন কখনও ভুল হয় না। হার ছড়াটা বেঁটে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো দত্ত, ডেসক্রিপশন ফিট করছে কিনা। সেণ্ট পার্সেণ্ট শিওর হয়ে নিতে চাই।

সমীরের বুকের ভেতর যেন একটা রবারের বল শব্দ করে লাফিয়ে চলেছে। লোকটা বলল, ওয়েল মাই পুওর বয়, এবার তো তোমাকে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। কিছু অপ্রিয় কাজ আমাদের সেরে ফেলতে হবে ওখানে গিয়ে।

সমীর হাতজোড় করে বলল, আমার সব কথা শুনুন। শুনলেই বুঝতে পারবেন আমি এসবের মধ্যে নেই। এর বিন্দুবিসর্গও কিছু জানি না।

জ্বলন্ত চোখে সমীরের দিকে একপলক তাকিয়ে থেকে লোকটা বলল, বেশ বলো। তোমার গপ্পোটাও শুনে রাখি।

সমীরের আত্মসম্মানে লাগল, প্রতিবাদ না জানিয়ে পারল না। বলল, গপ্পো না, যা সত্যি তাই আপনাকে বলব। আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।

অলরাইট, অলরাইট! গো অ্যাহেড, বলে যাও। সময় নষ্ট করার মতো আমাদের এখন সময় নেই।

সমীর নিজের পরিচয় আর আসানসোল থেকে হঠাৎ ফিরে আসার কারণ জানিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘটনাটা বলল। বলতে বলতে একবার চোখ ফিরিয়ে

দেখল বেঁটে লোকটা নিবিষ্ট মনে একটা আতস কাচ দিয়ে নেকলেসটা পরীক্ষা. করে চলেছে।

সমীরের কাহিনী শেষ হয়েছে কি হয়নি, বেঁটে লোকটা তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, সার, বিলকুল ঝুটো!

লম্বা লোকটা চমকে উঠল, তুমি কী বলছ, দত্ত!

হ্যাঁ, সার, এটা একটা ইমিটেশন মাল! ওরা কৌশলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে।"

উত্তেজনায় লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই লম্বা লোকটা চোখের ইশারায় সমীরকে ফোন ধরতে বলল।

হ্যালো বলে কানে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে খোদ লালবাজারের গমগমে গলা শুনতে পেল সমীর। "দেখছি" বলে ফোনটা পাশে নামিয়ে রেখে সে বলল, "আপনাদের মধ্যে কেউ ইন্সপেক্টর তালুকদার আছেন?

আমি। কেন? লম্বা লোকটা বলল।

"লালবাজার আপনাকে চাইছে।"

সমীর বুঝতে পারছিল এবার আর তার নিস্তার নেই। পরে যাই হোক, আপাতত তাকে পুলিশের গাড়িতে চেপে থানায় যেতে হবে। লকআপে না ঢোকালেও নানারকম প্রশ্ন করে অনেক নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়বে। পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা সত্যি! এরপর মামলা হবে, আসামীরা ধরা পড়লে তাদের সঙ্গে তাকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ভয়ে, ক্ষোভে, অনুশোচনায় ভেতরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বাবার কাছে সে কী করে মুখ দেখাবে। পাড়ার লোক কানাকানি হাসাহাসি করবে!

দেরি দেখে জলধরদা মুখ বাড়াল, "কী সমুদাদা চান করতে..." কথাটা থেমে গেল ঘরের মধ্যে দুজন অচেনা লোক রয়েছে দেখতে পেয়ে। সমীর কোনও কথা বলল না, হাত নেড়ে জলধরদাকে চলে যেতে বলল। তার কান আর মন দুইই তখন টেলিফোনের দিকে উদ্বিগ্ন। লোকটা সাড়া দিল, বলল, হ্যাঁ. তালুকদার বলছি। আপনি? ওঃ ইয়েস সার...." খটাস করে জুতোর গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে এমন একখানা দর্শনীয় স্যালুট ঠুকল যে, এত দুঃখের মধ্যেও সমীরের হাসি পেয়ে গেল। এই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সমীর, ফোন করার সময় অনেকেরই স্থানকালের খেয়াল থাকে না, মনে করে সে অপর পক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো সেদিন তার এক পিসতুতো দাদা টেলিফোনে পিসেমশাইয়ের গলা শুনেই হাতের সিগারেট লুকোতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। পরে তা নিয়ে কত হাসাহাসি!

ইয়েস সার... নমস্কার। ইয়ে... নেকলেস আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা.. অ্যাঁ! আজ্ঞে, কোথায়? বলেন কী! হ্যাঁ, হ্যাঁ... নিশ্চয় এক্ষুনি আসছি। তা হলে রেখে দিলাম সার!”

টেলিফোনের একতরফা কথা শুনে ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে না পারলেও নাটকীয় কিছু যে ঘটেছে, তা লোকটার গলার স্বরের চমক আর মুখের ভাববদল দেখেই অনুমান করা শক্ত ছিল না। টেলিফোন রেখে দিয়ে লোকটা সমীরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। যেন সদ্য বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে একটু দম নিল। তারপর বলল, সরি ভাই, কিছু মনে করো না। তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। তবে এটাও ঠিক, তোমার কপাল ভাল।

কিছু বুঝতে না পেরে সমীর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

“আসলে গ্যাংটা ধরা পড়ে গেছে।” লোকটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, তারপর তা থেকে একটা ধরাতে ধরাতে বলল, আসল নেকলেসটাও পাওয়া গেছে। নাও দত্ত, লেট আস গো। বড় সাহেব তলব করেছেন।”

বলার দরকার ছিল না। দত্ত নেকলেসটাকে কাটা প্যাকেটের মধ্যে ভরে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি পুলিশের ফাঁদ থেকে ছাড়ান পেয়ে যাবে সমীর কল্পনাও করেনি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সমীর ওদের যাওয়া দেখছিল। হঠাৎ খেয়াল হতেই বলল, এটা ফেলে যাচ্ছেন....

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লম্বা লোকটা বলল, দরকার নেই। বরং কাউকে দিয়ে দিও। বলেই কেমন ঠোঁট মুচকে হেসে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

স্নান খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম করে বইপত্তর নিয়ে বসেছিল সমীর, কিন্তু মন বসাতে পারেনি। শেষে গল্পের বই, কিন্তু দু’চার পাতার বেশি তাও এগোল না। সকালের ব্যাপারটাই বারবার মনে পড়ছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে পুলিশ তাকে ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে, অথচ সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। কেমন যেন গাঁজাখুরি একটা গল্পের মতো, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছিল না। তারপর যতই বিকেল হয়ে আসতে লাগল, ততই মনের মধ্যে একটা নতুন অস্থিরতা দেখা দিতে থাকল। তার কেমন মনে হতে থাকল ভুবনেশ্বরবাবুর জামাই নিশ্চয় লোক পাঠাবেন। একটা ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনে তার দাদু নিশ্চয়ই অমন বহুমূল্য নেকলেস পাঠাতে যাবেন না। ইমিটেশন পাঠানোই তো স্বাভাবিক। তবে নকল হিরে হলেও আসলকে হার মানায় এমন কাজ। তুলোর মোড়ক থেকে বের করার পর কীরকম আলোর ঝিলিক

দিচ্ছিল ভাবলে অবাক লাগে। তার মানে, ঝুটো পাথরগুলোও বেশ দামি, শস্তা বাজারের মাল নয়। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার, ওই কাটা মোড়ক দেখে ওঁরা কি ভাববেন! সমীর ঘটনাটা খুলে বলবে। কিন্তু সে কি আর ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হবে?

কিন্তু সমীরের জল্পনা কল্পনাই সার হল। কেউ এল না। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল।

মনের অস্থিরতা থিতিয়ে আসতে সমীরের একসময় খেয়াল হল, রাজুকাকাকে পৌঁছনোর খবর জানানো হয়নি। মনে হতেই আর একটা মতলবও মাথায় খেলে গেল। রাত নটা নাগাদ আসানসোলের লাইন পেয়ে গেল। মায়ের সঙ্গে একটা দুটো কথা সেরেই রাজুকাকাকে চাইল। রাজুকাকা বললেন, তা হলে ভালভাবেই পৌঁছে গেছিস, পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

একটুও না, দিব্যি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি।

দাদা দিল্লি গেছেন শুনলাম, কবে ফিরবেন?

"শুনলাম পরশু দিন। আচ্ছা রাজুকা, তোমাদের রাজবাহাদুর কেমন আছেন এখন?

"কে রাজাবাহাদুর? ওঃ হো ভুবনবাবু! নাঃ, ওঁর খবর খুব ভাল না।

"কেন, চোট খুব মারাত্মক হয়েছে নাকি?"

"হবে না! এই বয়সে এত বড় একটা চোট..."

বাড়িতেই আছেন, না হাসপাতালে, কোমরের হাড়টা ভেঙেছে নিশ্চয়?

ঝোঁকের মাথায় কথা বলে যাচ্ছিলেন রাজুকাকা, খেয়াল হতেই থমকে গেলেন, "এই ছেলেটা! কী সব আজেবাজে বকছিস! নেকলেস চুরি যাওয়াটা অ্যাকসিডেন্ট নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে কি কোমরের হাড় ভাঙে! কিন্তু তুই এসব জিজ্ঞেস করছিস, এসব তো তোর জানবার কথা নয়।"

সমীরও সাবধান হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "ট্রেনে একজনের মুখে শুনলাম।"

"কে সেই লোক?"

"চিনি না। আচ্ছা রেখে দিচ্ছি।" বলেই সমীর তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দিল। কী মনে হতেই ফের ফোন তুলে অন্য একটা নম্বর ডায়াল করল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়েছিল সমীরের। চোখে মুখে জল দেবার আগেই ওর খবরের কাগজে চোখ বুলনো অভ্যাস। এ বাড়িতে বরাবরই ও ফার্স্ট রিডার। ফার্স্ট রিডারও বটে। হাতে গরম রুটির মতোই একেবারে মেশিন-গরম কাগজের ভাঁজ খোলার একটা আনন্দ আছে। বাবা মজা করে বলেন, আমার বেড টি আর সুমুর হচ্ছে বেড-পেপার।

কাগজ খুলেই ও খবরটা পেয়ে গেল। প্রথম পাতায় কয়েক লাইনে খবরটা কাটা পড়লেও পাঁচের পাতার অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে। 'রহস্যময় অন্তর্ধান' এই হেডিং দিয়ে আসানসোলের যশস্বী দাবাড়ু রাজাবাহাদুর ভুবনেশ্বর রায়চৌধুরীর হিরের হার চুরির এমন সবিস্তার কাহিনী রাতারাতি কী করে কলকাতার কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল, তা কেবল পাঠকদেরই না, স্বয়ং সেই খেতাব সর্বস্ব রাজারও বোধহয় বিস্ময় উদ্রেক করবে। শুধু তাই নয়, সেই হারটি সম্ভবত এখন কলকাতায়, কোনও শক্তিশালী দুষ্টচক্রের হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে। এই চুরির সঙ্গে রাজার বাড়ির ভেতরের কোনও লোকের যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়। কারণ এই মূল্যবান হারছড়ার কথা বাইরের কারও পক্ষে জানাই সম্ভব নয়। এত গোপনে, এত সাবধানে এই অলঙ্কারটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা সত্ত্বেও দাবাড়ুমশাই কোনও ধুরন্ধর মস্তিষ্কের কাছে বোধহয় এই প্রথম কিস্তিমাত হলেন। অথচ, না তিনি নিজে না স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ, কেউই কোনও সন্দেহজনক চরিত্রের অস্তিত্ব অনুমান করতে পেরেছেন। হারটির বর্তমান বাজারদর, অর্থাৎ নগদমূল্য পাঁচ ছয় লাখ হলেও, কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন এই অলঙ্কারটির ঐতিহাসিক ও পারিবারিক মূল্য অনেকগুণ বেশিই হবে। এর সঙ্গে অনেক কিংবদন্তি ও পারিবারিক বিশ্বাস জড়িত রয়েছে। অধিক রাত্রে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ মুখপাত্র জানান, তাঁরা অনেক বিলম্বে খবরটি পেয়েছেন যদিও এ ব্যাপারে এখনও বিস্তারিত অবগত নন। এইখানেই রিপোর্টার থেমে গেছেন, কিন্তু গোটা নিউজ স্টোরিটার মধ্যে তিনি রীতিমত এক গোয়েন্দা কাহিনীকারের মতোই কৌশলে কিছু অদৃশ্যসূত্রের যেন সন্ধান রেখে গেছেন। ভদ্রলোকের নাম ছাপা হয়নি, কিন্তু সমীর অনুমান করতে পারে এটি কার লেখা।

জলধরদার হাতের পয়লা রাউণ্ড চা খেতে খেতে সমীর যখন দ্বিতীয়বার কাগজের রিপোর্টটা পড়তে শুরু করেছে অমনি দরজার ঘণ্টিটা টুংটাং শব্দে বেজে উঠল। অসময়ে কে এল! সমীর ভাবছিল যন্ত্র ক্রমশ মানুষের হাতের পরিচিতি মুছে দিচ্ছে। আগে যখন দরজায় কড়া নাড়ার রেওয়াজ ছিল, তখন কিন্তু আলাদা আলাদা হাতের স্বাদ পাওয়া যেত। চরিত্রটিকে পৃথক করে চেনা যেত। বাঃ, বেশ ভাল পয়েন্ট। 'বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ' রচনায় এই উদাহরণটা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রসূনদা ঘরের মধ্যে উঁকি দিল, আলিগড়ি পাজামার ওপরে একটা ফিকে বেগনি রঙের হাফ পাঞ্জাবি। কাঁধে ক্যামেরা। সমীর অবাক হয়ে বলে, সুনুদা, তুমি?"

কী রে, খবরের কাগজও তোর টেক্সট বুকের মধ্যে পড়ে নাকি? বলেই পাশের চেয়ারটায় বসে পড়তে পড়তে বলল, তোর দু নম্বরি নেকলেসটা বের কর, চক্ষু সার্থক করে যাই।"

"যাবে কোথায়, বোসো। একেবারে মেশিনে ফর্মা চাপিয়ে এসেছ দেখছি। শোনো, খাসা লিখেছ।"

সমীরের পিঠ চাপড়ে প্রসূন বলল, তোর ভোকাবুলারি বেশ প্রেস মাইণ্ডেড হয়েছে দেখছি, গুড! তা তোর এই দাদাটি কি আর বসে জিরোনোর ভাগ্য করে এসেছে রে! আবার একটা ঝামেলা পাকিয়েছে, পরে বলছি। নে কুইক!"

পেটকাটা গোলাকার প্যাকেটটা ড্রয়ারের মধ্যেই ছিল। সমীর তার ভেতর থেকে হারছড়া বের করে নিজেই কেমন অবাক হয়ে গেল, "স্ট্রেঞ্জ!"

"হুঁ! এ তো দেখছি সস্তা কাচের মালা, তোর দামি ইমিটেশন না ছাই! কিন্তু স্ট্রেঞ্জ কেন?"

বলতে বলতেই ক্যামেরা বের করে ফেলেছিল প্রসূন। টেবিলের ওপর হারছড়াকে সেট করে ক্যামেরার ঝিলিক তুলতে তুলতে বলল, যেখানে দেখিবে ছাই, ক্যামেরায় রেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো.... হ্যাঁ বলো।"

"স্ট্রেঞ্জ কেন? এইজন্যে যে প্রথম যখন হারছড়াটা বার করেছিল লোকটা, তখন এতে আলোর ঝিকিমিকি ছিল, এখন নেই।"

"তার কারণ," প্রসূনদা সেকেণ্ডদুয়েক চুপ করে থেকে বলল, "সেই আসল হারছড়াটা হাত সাফাই করে সরিয়ে দত্ত নামের বেঁটে লোকটা দু'নম্বরি রেখে গেছে। আসলে ওরাও যে দু'নম্বরি পুলিশ। আমি তোর ফোন পাবার পর লালবাজারে খবর নিয়েছিলাম। ওই মানিকজোড়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। তা ছাড়া সন্ধের আগে হার চুরির কোনও খবরই লালবাজারে পৌঁছয়নি। চল একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায়? কী ব্যাপার?" সমীর জানতে চাইল। প্রসূন এড়িয়ে গেল ব্যাপারটা মুচকি হেসে।

এই কাছেই বলতে গেলে পাড়ার মধ্যেই। ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপারে গোয়ালটুলি লেনে।"

অফিসপাড়া ওয়েলিংটনের তখনও ঘুম ভাঙেনি। সারি সারি দোকানপাটে দাঁত কপাটি লেগে আছে যেন, খুলতে দেরি আছে। শুধু নানা জাতের পাঁচমিশেলি মানুষ চাঁদনি, হগমার্কেট, বউবাজার, বৈঠকখানা, যার যেমন গতি, বাজার যাচ্ছে-আসছে। গোয়ালটুলি লেন পুরো বসতপাড়া, সে জেগে উঠেছে

সকলের আগে। উনুনে আঁচ পড়েছে, কলতলা সরগরম, ছোটবড় মাঝারি বাড়িগুলো নিজের নিজের নিয়মে আড় ভাঙছে।

প্রসূনদা আগে আগে, মুখে কুলুপ। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সমীরের আন্দাজের বাইরে। মানুষটা এইরকমই নাটকীয়। ক্ষুরের মতো ধারালো, কিন্তু বড্ড একরোখা। সর্বাধিক প্রচারিত এক বাংলা দৈনিকের রিপোর্টার। অপরাধ জগতের ব্যাপার স্যাপার বেশিরভাগই প্রসূনদা কভার করে। সমীরের এক বন্ধুর দাদা, কিন্তু প্রায় নিজের দাদার মতোই।

গলিটা গোটা দুই তিন পাক খেয়ে আবার ওপাশের ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। প্রথম বাঁক পেরিয়ে দ্বিতীয় বাঁকের মুখোমুখি হতেই অনেক মানুষের উত্তেজিত কোলাহল কানে এল। তারপরেই দেখা গেল রাস্তা জুড়ে কৌতূহলী মানুষের জটপাকানো ভিড়, ছাদে বারান্দায় জানলায় মেয়েদের উঁকি ঝুঁকি। একটা মাঝারি আকারের ফ্ল্যাট বাড়ির সামনেটা পুলিশ কর্ডন করে ঘিরে রেখেছে। গলির ওমুখে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স।

নিজের প্রেসকার্ড দেখিয়ে কী বলতেই এ এস আই র‍্যাঙ্কের পুলিশটি হাতের ইশারায় ভেতরের সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল, "দোতলায় চলে যান, সাহেব ওখানেই আছেন।"

দোতলায় মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাট, একটার সদর বন্ধ, একটার খোলা। খোলা দরজার সামনে চেয়ার পেতে বসে থানা ইনচার্জ এজাহার নিচ্ছিলেন পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের। লোকটি অবাঙালি, পশ্চিমীটানে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। ওদের পায়ের শব্দ শুনে ও সি মুখ তুলে তাকিয়েই কৃত্রিম বিদ্রূপের গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, আসো, আসো, পেপার টাইগার আসো! তোমার লগেই অহন হা·পিত্যাশে বইস্যা আছি। তুমরা কি গো মনুষ্য নাকি, বাতাস শুঁইক্যাও গন্ধ পাও?"

প্রসূনদা হেসে ফেলে বলল, দাদা খাগড়াই ঘটি, বৃথাই মুখ খারাপ করছেন। আপনার শ্রীমুখে এই ছাঁচিবাংলা জম্পেশ হবে না।

পাশে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা দফতরের ছোটকর্তা। পরিচয়গুলো সমীর পরে জেনেছে। হেসে ফেলে বললেন, "আসানসোলের স্টোরিটা তো আপনারই করা? দেখলাম।" ও সি-র দিকে চোখের খোঁচা মেরে একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ তুলে বললেন, "পুলিশকে কিন্তু এক হাত নিয়েছেন!"

প্রসূনদা বলল, "শুধু স্টোরিটাই দেখলেন, স্টোরি এলিমেণ্ট দেখুন সঙ্গে করে এনেছি।"

ইঙ্গিতটা সমীরের দিকে। ও সি ভুরু নাচিয়ে তাকালেন, ওসব ব্যঙ্গ রসিকতা

রাখো। কথায় বলে ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে।" সাদা পোশাকের দিকে পাল্টা খোঁচা দিয়ে ফের বললেন, "যাও ডিউটি স্পটটা একবার দেখে এসোগে। ডেড বডি আর ফেলে রাখতে পারবে না, চালান দেব।"

প্রসূনদা বলল, চ, সমীর, দুটো শট নিয়ে আসি।"

উঁহু, ছেলেমানুষকে টেনো না, ভিরমি খেলে ফার্স্ট এড দিতে পারব না।" প্রথমে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য আটকালেন না।

দু'কামরার ফ্ল্যাট। বাইরের ঘরের মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল লোকটা। বিতিকিচ্ছিরি ভাবে। বাঁ দিকের পিঠে শোল্ডার ব্লেডের তলায় একটা ছুরি আমূল গেঁথে আছে। বাঁটটা শুধু দেখা যাচ্ছে। পিঠের কাছে জামাটা কালচে বেগুনি রক্তের একটা থিকথিকে ধারা মাটিতে এঁকেবেঁকে জমাট বেঁধে আছে। ভারী শরীরের টানে পলকা চেয়ারটা পাশে উলটে পড়েছে। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ঘরে জনাতিনেক লোক খুব ব্যস্ত। দু'জন ঘরের নানা জায়গা থেকে হাত পায়ের ছাপ তুলছে অদ্ভুত কায়দায়। পাশে টিপয়ের ওপর একটা বোতল আর গোটা দুই গেলাস। তৃতীয়জন ফোটোগ্রাফার। ছবি নিচ্ছে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। প্রসূনদার ক্যামেরাও ঝিলিক দিল। ফরেনসিকের লোকেরা সাবধানে পিঠ থেকে ছুরিটা খুলে নেবার পর দুজন কনস্টেবল বডিটাকে উলটে দিতেই সমীর চমকে উঠল। লোকটার চোখ দুটো খোলা। তার মরা মুখেও কেমন একধরনের আতঙ্ক, না আতঙ্ক না, যেন বোকাটে বিস্ময় লেগে আছে। মৃত্যু মুহূর্তের ভাবখানা এখনও মুছে যায় নি। জামার কোনায় টান পড়তেই প্রসূন অবাক হয়ে সমীরের দিকে ফিরে তাকাল, কী রে, শরীর খারাপ লাগছে?"

ফ্যাকাশে মুখে সমীর মাথা নেড়ে বলল, "এ সেই বেঁটে দত্ত, কাল আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছিল।"

নিহত লোকটার নাম রথীন দত্তগুপ্ত। এই চার ফ্ল্যাটের বাড়িতে সেই ছিল একমাত্র বাঙালি। এবং একা। বাকি তিন ফ্ল্যাটে ইউ পি, পাঞ্জাবি আর সাউথ ইণ্ডিয়ান পরিবার। দত্তগুপ্তর সঙ্গে বাড়ির বাসিন্দাদের কারওই প্রায় বাক্যালাপ ছিল না। লোকটা শুধু যে অমিশুকে তাই নয়, তার আসা যাওয়ারও কোনও ঠিক ঠিকানা ছিল না। হয়তো দু'চারদিন সে বাড়িতেই ফিরত না, আবার কখন-ও বা দিন-রাত ফ্ল্যাটের মধ্যেই কাটিয়ে দিত। কখনও কাছের এক হোটেল থেকে খাবার আসত, বাকি দিনগুলো বোধহয় নিজের হাতেই চালিয়ে দিত। ক্বচিৎ-কদাচিৎ দু'একজন অতিথি আসত, তারা বন্ধুবান্ধব কি ব্যবসাপত্তরের সঙ্গীসাথী তা কেউ জানে না। গতকালও একজন তার সঙ্গে

এসেছিল, কিন্তু কখন চলে গেছে কেউ জানে না। রাত্রে চিৎকার চেঁচামেচি কিংবা আর্তনাদ কেউ শোনেনি। তবে রাত দশটা নাগাদ দত্তগুপ্তর ঠিক নীচের ফ্ল্যাটের সাউথ ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক একটা আওয়াজ শুনেছিলেন। যেন ওপর তলার মেঝের ওপর কিছু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কিন্তু ওই একবারই। তারপর একটা হিন্দী গানের ক্যাসেট বাজতে শুরু করায় ওঁরা কোনও দুর্ঘটনার কথা ভাবতে পারেননি। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নিয়মমাফিক কাজের লোক এসেছিল। সে খুব সকাল সকাল এসে এঁটো বাসন মেজে দিয়ে চলে যায়। দত্তগুপ্তর ফ্ল্যাটে ঢুকেই সে ভূত দেখার মতো চেঁচিয়ে ওঠে। আর তখনই এ'বাড়ির সবাই খুনের খবরটা একে একে জেনে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয় কিছু পরেই।

কিন্তু পুলিশ তার নিয়মমাফিক তল্লাশ তদন্ত করেও কোনও সূত্রটুত্র আবিষ্কার করতে পারল না। বোতল গেলাস, ছোরার বাঁট, সম্ভাব্য সব জায়গাগুলোই একেবারে চাঁছামোছা। কারও হাতের ছাপ পাওয়া গেল না, হত্যাকারী বেশ ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিটি জিনিস একেবারে মুছেটুছে রেখে গেছে। পুলিশের এমনও সন্দেহ, সে হাতে দস্তানা পরে নিয়েছিল। ভেতরের ঘরে মৃতের জিনিসপত্র তছনছ করে রেখে গেছে। আলমারি, ওয়ার্ডরোব, বাক্স, সুটকেস প্রায় পাগলের মতো হাঁটকেছে, কিন্তু কোথাও মৃতের হাতের ছাপ ছাড়া অন্য কোনও ছাপছোপ নেই। টেপরেকর্ডার আর দরজার হাতলে তার হাত পড়েছিল নিশ্চিত, কিন্তু ছাপ পড়েনি।

কাজকর্ম চুকলে প্রসূন বলল, মিঃ ভাদুড়ী, একটু বসলে হত কোথাও। ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে নিতে সামান্য দু-চারটে কথাও হত। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি।"

গোয়েন্দাবিভাগের ছোটকর্তা প্রণবেশ ভাদুড়ী আবছাভাবে একবার সমীরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, মন্দ হত না, কিন্তু কোথায়?

জলধরদা মাটন ওমলেট, মাখন টোস্ট আর কফি দিয়ে গেল। সিলিংয়ের দিকে মুখ করে প্রণবেশবাবু চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছিলেন। প্রসূনদা সেই সুযোগে তাঁর একটা ভাবমগ্ন ছবি তুলে নিতেই তিনি চমকে তাকিয়ে বললেন, আরে মশাই, এ কী! আমার চাকরিটা খাবেন নাকি?"

"কারও চাকরি দিয়ে আমি ব্রেকফাস্ট করি না। এটা আমার পার্সোনাল প্রপার্টি হয়ে থাকল। যাক, কী স্থির করলেন তা হলে?"

"পরশু আমরা আসানসোল যাচ্ছি।"

"আমরা মানে?"

"আপনি, আমি আর সমীর। খুনের সঙ্গে চুরিটা যখন জড়িয়েই গেল, তখন ওখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। আসল রহস্যটা দানা বেঁধে আছে ওখানেই। অন্তত সেই বৃদ্ধটিকে আমাদের একবার দেখা দরকার। আর তাকে শনাক্ত করতে সমীরের সাহায্য দরকার। সকালে যাব রাতে ফিরব, কী সমীর, তোমার পড়ার খুব ক্ষতি হবে?"

সমীর ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফুটছিল। এত বড় একটা ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে যাচ্ছে, শুধু প্রসূনদার কাছেই না, গোয়েন্দাপুলিশের কাছেও তার গুরুত্ব বাড়ছে, এটা ভাবাই যায় না। বেশ জোরের সঙ্গেই সে মাথা দোলাল, না, ক্ষতি কেন হবে।" তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, বলল, "ভাল কথা! আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি, দেখুন তো কোনও কাজে লাগে কি না।"

"জিনিস! কোথায়? দত্তগুপ্তর ফ্ল্যাট থেকে?" প্রণবেশ খুব অবাক হলেন, "ওখানে তো..."

"না, ওখানে না। এখানেই, এ ঘরের মধ্যে। সুনুদা, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল চলে যাবার মুখে তালুকদার লোকটা যখন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেছিল তখন বোধহয় ওর পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।"

সমীর ভেতরের ঘর থেকে একটা ট্রামের টিকিট নিয়ে এসে প্রণবেশ ভাদুড়ীর হাতে দিল। তাই দেখে প্রসূনদা হেসে উঠল হো হো করে, "তুই বুঝি এন্তার ডিটেকটিভ নভেল গিলিস?"

সমীর লজ্জা পেয়ে বলল, "ও কথা কেন বলছ, সুনুদা?"

"বলছি এইজন্যে যে, সব কিছুর মধ্যেই তুই রহস্যের গন্ধ পেতে শুরু করেছিস। একটা সামান্য টিকিটও তুই কত যত্ন করে তুলে রেখেছিস, আশ্চর্য। ওরে পাগলা, ট্রামে রোজ হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে।"

"কিন্তু ওর পিছনে যে..."

প্রসূন কিছু বলতে যাচ্ছিল; প্রণবেশ হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, "না প্রসূনবাবু, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আমাদের কাছে একটা টিকিট কেন, একটা পোড়া দেশলাই কাঠিও ফেলনা নয়, ঠিকভাবে বলাতে পারলে তারা এক এক সময় অনেক কথা বলে ফেলে।"

বলে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তিনি টিকিটটা দেখতে লাগলেন। প্রসূন মজার গলায় বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। এবং এটাও আমার কাছে ফেলনা না।" প্রসূন হাত বাড়িয়ে ওমলেটের প্লেটটা টেনে

নিল, "এঁরা কিন্তু সবাই ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছেন, মিঃ ভাদুড়ী। সুনু, হাত লাগা—"

"এটা আবার কিসের সঙ্কেত? তাই তো...." টিকিটের উলটো পিঠে বল পেন দিয় লেখা কটা সংখ্যা দেখিয়ে প্রণবেশ প্রশ্ন করলেন, কিছু মাথায় আসে? কী মনে হয়?"

"সি থ্রি ফোর জিরো সিকস ওয়ান।

অর্থাৎ চৌষট্টি হাজার একষট্টি হতে পারে, অর্থাৎ ওই নম্বরটা দ্যাখো।"

প্রসূন বলল, "রহস্য যদি পাকাতেই হয়, তা হলে এরকমই ভাবতে হবে।"

"হুঁ। কিন্তু কিসের নম্বর? কার, কম্পার্টমেণ্ট না টেলিফোন নম্বর? নাকি অন্য কোনও রেফারেন্স। তলায় আবার পরশুদিনের তারিখ দেওয়া আছে, দেখুন।" প্রণবেশ বললেন।

প্রসূন চিন্তিত মুখে চুপ করে গেল। প্রণবেশবাবুর কপালেও ভাঁজ পড়ল এলোমেলো চিন্তার। সমীর ওদের দুজনের মুখের দিকেই পালা করে বারকয়েক তাকাল। তারপর যেন ক্লাস রুমের বেঞ্চে বসে মাস্টারমশাইকে হাত দেখাচ্ছে, এমনিভাবে হাত তুলে বলল, "আমি বলব?"

প্রণবেশ আর প্রসূন দুজনেই চমকালো। প্রণবেশের গলায় কৌতুক আর সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটল, গুড বয়! বলো শুনি।"

"আমার মনে হয়, সমীর একটু ইতস্তত করে বলল, "এটা কোনও ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের নম্বর।"

"তোমার এরকম মনে হবার কারণ?" প্রণবেশ অবাক।

"বাবাও আমাকে এরকম চিরকুট দিয়ে কখনও সখনও ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছেন তাঁর জমা রেখে আসা পাশ বই ফেরত নিয়ে আসার জন্যে: তাতেও সংখ্যার গোড়ায় ওরকম সি অক্ষরটা লেখা থাকত। সি ফর চেক, বাবার কাছে শুনেছি।"

পলকখানেক 'থ' হয়ে তাকিয়ে থেকে প্রণবেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ইয়েস! ইয়েস! মে বি। মাস্ট বি। দেখুন প্রসূনবাবু, আমাদের জটিল মাথায় সরল অঙ্ক কত বাঁকা পথ নেয়, ধন্দে ফেলে। অথচ সমীর...." বলেই টিকিটটা পকেটে রেখে দিয়ে ওমলেটের প্লেটটা কাছে টেনে নিলেন।

" তা না হয় হল।" টোস্ট ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রসূন বলল, "এই কলকাতা শহরে হাজারটা ব্যাঙ্ক আছে। আপনি কোন ব্যাঙ্ক তা জানেন না, কার অ্যাকাউণ্ট নম্বর তাও না। তা হলে?

"তা হলে এই ট্রামের টিকিট।" চোখে মুখে রহস্য ছড়িয়ে উনি নিশ্চিন্ত মনে কফিতে একটা চুমুক লাগালেন।

"বুঝলাম না।"

অনেক অঙ্ক এক্স ধরে করতে হয়। আমাদের কাছে ওই লম্বা লোকটা সেই এক্স। কী যেন তার পদবি বলেছিল, ইয়েস তালুকদার। পদবিটা বানানো হওয়াই স্বাভাবিক। সে যাই হোক, অ্যাকাউন্ট নম্বরটা ওই লোকটার হওয়াই সম্ভব। নিজের পাশবইয়ের নম্বর তারিখ দিয়ে লিখে রাখার একটাই কারণ আপাতত আমার মাথায় আসছে। অনেক ব্যাঙ্কেই লোকটার অ্যাকাউন্ট আছে, তাই পাছে পাশবইটা গুলিয়ে যায়, জমা দেবার সময়ে নম্বরটা লিখে রেখেছে। এইবার আপনার আসল প্রশ্ন, হাজারটা ব্যাঙ্ক আমাদের কি চুঁড়ে বেরোতে হবে? মোটেই না। ট্রামের টিকিটটার পাঞ্চিং মার্ক আমাদের বলে দিচ্ছে যে, হ্যারিসন রোড টু শ্যামবাজার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট বরাবর ব্যাঙ্কগুলোয় খোঁজ নিলেই লোকটার নাম ঠিকানা বেরিয়ে পড়বে।"

প্রসূন বলল, "ওয়াণ্ডারফুল। এবার আমি আপনার সঙ্গে একমত।"

লোকটা ওদের বৈঠকখানায় বসিয়ে পাখাটা খুলে দিল। তারপর বলল, "কর্তাবাবু পুজোয় বসেছেন, নামতে দেরি হবে। তা ধরুন আধঘণ্টাটাক।"

"ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করছি।" ভাদুড়ী বললেন।

" আজ্ঞে, নাম কী বলব?"

"নাম বললে তো চিনতে পারবেন না। বলবেন, কলকাতার এক খবরের কাগজ থেকে রিপোর্টারবাবুরা এসেছেন।"

লোকটার চোখে কেমন একটা রহস্যের হাসি যেন ঝিলিক দিয়েই, মিলিয়ে গেল। বলল, "অ, আপনারা সেই নেকলেস চুরির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে এসেছেন! আচ্ছা..."

লোকটা চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, প্রণবেশ ডাকলেন, "শুনুন। আপনি কি ওঁর ভাইপো? শুনেছি ওঁর এক ভাইপো আছেন।"

না। আমি ওঁর সেক্রেটারি। আসলে এ বাড়ির জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই আমাকে করতে হয়। হ্যাঁ, ভাইপো আছেন।"

"বাড়িতে আছেন? একটু খবর দিলে ভাল হয়।'

একটু চুপ করে থেকে লোকটা বলল, "কিন্তু তার সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না।"

"কেন অসুবিধে আছে?"

"আজ্ঞে ওনার মাথাটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। ঘরে শুয়ে আছেন।"

সমীর চাপা গলায় বলল, মাথা খারাপ।

লোকটি বোধহয় শুনতে পেয়েছিল, তাকাল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, আপনি ডাক্তারবাবুর ভাইপো না? কবে এলেন?"

"আজই। আমি এঁদের বাড়ি চেনাতে এসেছি। আপনি আমাকে কী করে...."

"বাঃ চিনব না। কর্তার হুকুমে আমিই তো আপনার টিকিট রিজার্ভেশন করে দিয়েছিলাম।"

"আরে, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।" প্রণবেশ বললেন, আপনার সঙ্গেই বরং ততক্ষণ দু'চারটে কথা বলি।'"

লোকটার নাম বিভূতি দাস। বয়স গোটা পঁয়ত্রিশ হবে। মুখের লম্বাটে গড়নের জন্যে রোগা মনে হয়। প্রণবেশ গল্প জমানোর ভঙ্গিতে এটা সেটা প্রশ্ন করছিলেন। কথায় কথায় জানা গেল, চুরিটা নাকি এমন রহস্যময় উপায়ে হয়েছিল যে, কাউকেই সন্দেহের মধ্যে আনা যাচ্ছে না। রাত্রের আহারপর্ব সেরে ভুবনেশ্বরবাবু নিজের শোবার ঘরের তালা খুলে দেখেন দরজা ওপিঠ থেকে বন্ধ। তাজ্জব কাণ্ড। ওঁর হাঁকাহাঁকিতে অন্য সকলের মতো বিভূতিও ছুটে আসে। তারপর সবাই মিলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দ্যাখেন ভেতরে কেউ নেই। জানলাগুলো খোলা বটে, তবে সে জানলা দিয়ে কারও বেরিয়ে য়াওয়া অসম্ভব। মজবুত লোহার ঘন গরাদে দেওয়া জানলা। চুরিটা তখনও ঠিক ঠাহর করতে পারেননি। সিন্দুক টেনে দেখলেন, ঠিক আছে। আরও কিছু পরে, শোবার ঠিক আগে হঠাৎ নজর পড়ল সিন্দুকের ওপরে রাখা অষ্টধাতুর গণেশমূর্তিটা যেন কেমনভাবে পড়ে আছে, ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় বসানো নেই। সন্দেহ হতেই গণেশের শুঁড়টাকে নির্দিষ্ট কায়দায় মোচড় দিলেন। গণেশের ভুঁড়িটা স্প্রিং বসানো ঢাকনার মতো খুলে এল। দেখলেন ভেতরটা ফাঁকা। নেকলের আর তিরিশ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা উধাও। কথায় বলে অতি সাবধানীর গলায় দড়ি, এ হল তাই। নেকলেসটাকে ভুবনবাবু ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখতে পারতেন, এমনকী তাঁর ওই দুর্ভেদ্যপ্রায় সিন্দুকেও, কিন্তু তা না করে তিনি বেশি বুদ্ধিমানের মতো রেখে দিয়েছিলেন সকলের চোখের সামনে, যাতে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারে। গণেশ তাঁদের বংশের কুলদেবতা, গণেশের নিত্যপূজা না করে তিনি জলগ্রহণ করেন না।

বিভূতি যেন ভেতরে ভেতরে কেমন অস্বস্তিবোধ করছিল, একটু পরেই কাজের অজুহাতে উঠে গেল। প্রসূন হেসে বলল, লোকটার বোধহয় গান বাজনার শখ আছে।"

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"লোকটা থেকে থেকে হাতের আঙুলগুলো কীভাবে নাড়াচ্ছিল লক্ষ করেননি? তবলচিদের অনেক সময় এরকম মুদ্রাদোষ থাকে। তাই না রে?"

প্রসূন সমীরকে একটা খোঁচা দিল।

অন্যমনস্ক সমীর কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, "প্রসূনদা, একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখলাম।

"আমাকে সেদিন ট্রেনের জানলায় যে বৃদ্ধ প্যাকেটটা দিতে এসেছিলেন, তাঁর হাতের আঙুলেও এই একই কায়দা দেখেছিলাম যেন। মনে হচ্ছিল ব্যাঙ্কের কাউন্টারে বুঝি দু'হাতে নোট গুনছেন।"

প্রণবেশ তাঁর চেয়ারের মধ্যেই যেন লাফিয়ে উঠলেন, "সমীর! তুমি তো ভাই কামাল করে দিলে। এই সামান্য সূত্রটা তো আমার চোখের সামনেই ঝুলছিল, কিন্তু দেখতে পাইনি। বিভূতি এ বাড়িতে কাজে ঢুকেছে মাত্র বছর দেড়েক আগে। ওর বাবা ছিলেন এ বাড়িতে চল্লিশ বছরের পুরনো নায়েব। তাঁর মৃত্যুর পর বিভূতি এসে এখানে জুটেছে। কিন্তু তার আগে নানা জায়গায় নাকি ছুটকো কাজ করেছে। তবে কি ব্যাঙ্কে কাজ করেছে? যদি করে থাকে, তবে সে চাকরি কেন ছাড়ল? ছাড়ল, নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

এর পরের ঘটনাগুলো অঙ্কের মতো মেলানো। কিন্তু প্রণবেশবাবু নিজের কৃতিত্ব এক আনাও স্বীকার করেননি। বলেছেন যে, সমীর যদি না মাঝখানে থাকত, তা হলে এই রহস্যের যবনিকা তাঁর পক্ষে উন্মোচন করা বোধহয় সম্ভব হত না। বিভূতিই পরচুলা আর দাড়ি এঁটে স্টেশনে নেকলেসটা সমীরের হাত দিয়ে পাচার করেছিল। কলকাতায় তার পুরনো তিন শাকরেদ যারা একদা এক ব্যাঙ্কে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের কাছে। কিন্তু তালুকদার লোভ সামলাতে না পেরে দত্তগুপ্তকে খুন করে। বাকি দুজনকেও ফাঁকি দেবার তালে ছিল। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ভুবনবাবুর ঘরের জানলা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রণবেশ ভাদুড়ীই প্রথম লক্ষ করলেন, তাঁর জানলার একটা গরাদ কৌশলে খোলা যায়। সেই পথ দিয়েই বিভূতি নেকলেস চুরি করতে ঘরে ঢুকেছিল এবং বেরিয়ে গিয়েছিল।

সমীর জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু গণেশমূর্তির মধ্যে যে ওটা আছে বিভূতি সে কথা জানল কী করে।

প্রণবেশ বলেছিলেন, সেটাই তো আমি প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম ঘরে ঢুকেই। ভুবনবাবুর ঘরের দেওয়াল-জোড়া আয়নাটা আউট হাউসে বিভূতির ঘর থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। বিভূতি এক রাতে দূরবিন দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফেলে। ভুবনবাবু গণেশের পেটের ভেতর থেকে নেকলেস বের করে সেদিন দেখছিলেন। আমার অনুমান, বিভূতি সত্যি বলে স্বীকার করেছে।



ইষ্টকুটুম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বটুকদাদা গেরুয়া ঝোলাটা থেকে একটা ছোট্ট ডিম বার করে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের ডিম বল তো?

আমরা তিন-চারজন এক সঙ্গে বললুম, কই, দেখি, দেখি!

বটুকদাদা হাত উঁচু করে বললেন, না। কেউ হাতে নিতে পারবে না। দূর থেকে দেখে বলো।

পিংপং বলের চেয়েও বেশ ছোট সেই ডিমটা, ছাই ছাই রঙের। দেখে মনে হয়, সাধারণ একটা পাখির ডিম। কিন্তু বটুকদাদার কাছে তো সাধারণ

জিনিস কিছু থাকে না। বটুকদাদা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ান, মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হন তাঁর ঝুলি ভর্তি গল্প আর নানান রকম আজব জিনিস নিয়ে।

সেইজন্যই মণ্টু বললো, ওটা কুমিরের ডিম!

রতন বললো, ড্রাগনেরও হতে পারে।

আমি বললুম, আমার মনে হচ্ছে ঈগল পাখির!

বটুকদাদা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন। এই নীলুটা অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। তবে ঈগল পাখি নয় রে। ধনেশ পাখির ডিম এটা! এবারে আসামের এক জঙ্গলে গেসলুম, বুঝলি সেখানে—

রতন বললে, বটুকদাদা, তুমি তো সকাল বেলায় বললে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলে। সেখান থেকে আসাম বুঝি কাছে?

বটুকদাদা বললেন, কাছে কি দূরে তা জেনে তোর দরকার কি? মুর্শিদাবাদ গেলে বুঝি আসাম যাওয়া যায় না? আসামও বলতে পারিস, ভুটানও বলতে পারিস। সেই জঙ্গলটার নাম মানস। জঙ্গলটার আদ্ধেক আসামে আর আদ্ধেক ভুটানে। কি গভীর বন, কত বাঘ, কত হাতি, একদিন একটা পাগলা হাতির পাল্লায় পড়ে...আচ্ছা, সেই হাতির গল্পটা আর একদিন বলবো! সেই জঙ্গলে মাঝে মাঝেই শোঁ-শোঁ করে ঝড়ের শব্দ পাওয়া যায়। অথচ হাওয়া নেই, গাছের পাতা নড়ে না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি বিরাট বিরাট ডানা মেলে এক রকমের পাখি উড়ে যাচ্ছে। প্রথম ভাবলুম গরুড় না রক পাখি? একটা পাখির ডানায় এত শব্দ! তারপর একদিন দেখি নদীর ধারে সেই দুটো পাখি বসে আছে। তখন মস্ত বড় লম্বা ঠোঁট দেখেই বুঝলুম, আরে, এ যে ধনেশ! এর আগে জ্যান্ত ধনেশ দেখিনি কখনো!

আমরা অবশ্য জ্যান্ত কিংবা মরা কোনো ধনেশ পাখিই দেখি নি। তবে ছবি দেখেছি বইতে।

বটুকদাদা বললেন, তাই ভাবলুম, একটা ধনেশ পাখির ডিম নিয়ে যাই। তোদের দেশে তো এ পাখি নেই।

মণ্টু জিজ্ঞেস করলো, বটুকদাদা, অতবড় ধনেশ পাখির এত ছোট ডিম?

বটুকদাদা এক গাল হেসে বললেন, এত বড় বড় বট গাছের কত ছোট ফল হয় দেখিস নি? কত কষ্ট করে জোগাড় করতে হল এই ডিমটা। ধনেশ পাখি ডিম পাড়ে প্রকাণ্ড গাছের মগডালে। এই বয়েসে অত উঁচু গাছে ওঠা কি সোজা কথা? তবু তোদের কথা মনে করেই আনলুম।

রতন জিজ্ঞেস করলো, সত্যি এই ডিম ফুটে বাচ্চা হবে?

বটুকদাদা বললেন, আলবৎ হবে! দ্যাখ না, কি সুন্দর খড়ের বিড়ে বানিয়ে রেখে দেবো। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। আমি অবশ্য এবারে দু' তিন দিনের বেশি থাকবো না। তোরা মধু জোগাড় করে রাখবি, ওরা মধু খেতে ভালবাসে!

আমি বললুম, বটুকদা, আমি একটু ডিমটা একবার ছোড়দিকে দেখিয়ে আনবো।

মণ্টু আর রতন এক সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, না, এই ডিমে কারুর হাত দেওয়া চলবে না!

আমি বটুকদাদার চোখের দিকে তাকিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বললুম, ছোড়দির খুব অসুখ! ছোড়দি তো এখানে আসতে পারবে না!

বটুকদাদা বললেন, ও তাইতো, ছোটনের অসুখ। আচ্ছা, ওকে একবারটি দেখিয়েই কিন্তু নিয়ে আসবি।

মণ্টু জিজ্ঞেস করল, ধনেশ পাখির জন্য খাঁচা বানাতে হবে না?

বটুকদাদা বললেন, অত বড় পাখি কি খাঁচায় রাখা যায়? ধনেশ পাখি ডানা ছড়ালে কত বড় হয় জানিস? এই অ্যাত্ত বড়! ছোট বেলা থেকে পোষ মানাবি বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে, ও সেইখানেই থাকবে!

মণ্টু আর রতন ঝগড়া করতে লাগল কার বাড়ির ছাদে ধনেশ পাখিটা থাকবে তাই নিয়ে। আমি ডিমটা নিয়ে এক ছুটে চলে গেলুম ছোড়দির ঘরে।

ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে এক বছর আগে। জামাইবাবুর সঙ্গে ছোড়দি থাকে লাদাখে। সে যে কত দূর! জামাইবাবু সেখানে ভূতাত্ত্বিকের কাজ করেন। ছোড়দি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যে কি খালি খালি লাগতো। আগে ছোড়দি আমাকে কত বকুনি দিত, এখন মনে হয়, সেই সব বকুনিও কত মিষ্টি ছিল!

এতদিন পর ছোড়দি আবার এসেছে। কিন্তু এ যেন অন্য ছোড়দি। আগের মতন আর দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে না, চেঁচিয়ে আমাদের নাম ধরে ডাকে না! পেয়ারা গাছেও ওঠে নি একবারও। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা এত বদলে যায়? ছোড়দি হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। ছোড়দি এখন আমাদের সঙ্গে বেশি মেশে না, মা, পিসিমা আর বড় বৌদির সঙ্গেই তার যত গল্প।

সাত দিন থাকার পরেই ছোড়দি অসুখে পড়লো!

এ কি রকম অদ্ভুত অসুখ, সব সময় জ্বর। জ্বরে ছোড়দির মুখখানা ঝাঁ ঝাঁ করে, চোখ লাল হয়ে যায়, ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিয়ে গেলেন কত। তবু সেই জ্বর কমে না।

দু'সপ্তাহ বাদেই ছোড়দির চলে যাবার কথা। জামাইবাবু মানে প্রকাশদার

এসে নিয়ে যাওয়ার কথা। প্রকাশদা লাদাখ থেকে এসে ছোড়দিকে নিয়ে আন্দামান চলে যাবেন। ছোড়দির কি মজা, কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবে!

কিন্তু কুড়ি দিন হয়ে গেল, প্রকাশদা এলেন না, তাঁর কোনো চিঠিও পৌঁছোলো না। লাদাখ থেকে চিঠি আসতে কতদিন লাগবে কে জানে!

সেইজন্য, ছোড়দির শুধু জ্বর নয়, খুব মন খারাপ! ছোড়দি হাসে না, গল্প করে না, শুধু শুয়ে থাকে। ছোড়দিকে নিয়ে বাড়ির সবার সেইজন্য খুব চিন্তা। ছোড়দিকে খুশি করার জন্য যে কি করা যায়, তাই ভেবে পাই না। তবে ছোড়দি এক সময় খুব পাখি ভালোবাসতো, নিশ্চয়ই এই ডিমটা দেখে খুশি হবে!

ছোড়দির ঘরে ছোড়দি নেই। বিছানা খালি। ছাদেও ছোড়দিকে পাওয়া গেল না। অনেক সময় রান্না ঘরে ছোড়দি মায়ের পাশে বসে থাকে, এখন দেখি রান্না ঘরে মা একা।

খুঁজেতে খুঁজতে দেখি পুকুর ধারে ছোড়দি একলা বসে আছে। জলে পা দুটো ডোবানো। অনেকখানি ভিজে গেছে শাড়ীটা। মাথার চুলগুলো খোলা, ছোড়দি গুণগুণ করে একটা গান গাইছে, সেটা দারুন দুঃখের গান মনে হলো।

আমার পায়ের শব্দ শুনে ছোড়দি মুখ ফিরিয়ে এমনভাবে তাকাল যে আমাকে যেন চিনতেই পারছে না।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার কি হয়েছে, ছোড়দি?

ছোড়দি বললেন, কিছুই হয় নি তো!

আমি বললুম, তুমি এই দুপুরবেলা একা একা বসে আছো কেন?

ছোড়দি বললো, এমনিই বসে আছি। আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে, নীলু!

আমি তখন আলতো করে ধরা ডিমটা দেখিয়ে বললুম, জানো, এবার বটুকদাদা কি এনেছে? এই দ্যাখ, ধনেশ পাখির ডিম!

ছোড়দি ভুরু কুঁচকে বললো, কি পাখির ডিম বললি?

আমি বললুম, ধনেশ পাখি! সেই পাখি কত বড় জানো, বটুকদাদার দু'হাতের চেয়েও বড়। আর তার ঠোঁটটা আমার পায়ের চেয়েও লম্বা!

ছোড়দি হাত বাড়িয়ে ডিমটা নিয়ে বললো ধ্যাৎ, কে বললো, এটা ধনেশ পাখির ডিম। বাজে কথা।

আমি জোর দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, এটা ধনেশ পাখির। বটুকদাদা আসামের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছে!

ছোড়দি বললো, বটুকদাদা আর গুল মারবার জায়গা পায় না? বটুকদাদা আবার আসামে গেল কবে? ধনেশ পাখির ডিম জোগাড় করা মোটেই সহজ নয়।

ছোড়দির কথা আমার বিশ্বাস হল না। বটুকদাদা কি আমাদের জন্য একটা যা তা পাখির ডিম আনতে পারেন?

আমি বললুম, ঠিক আছে, তোমার দেখা হয়ে গেছে তো? এবার ফেরৎ দাও।

ছোড়দি এক ধমক দিয়ে বলল, না, দেবো না। যা ভাগ! পাখির ডিম নিয়ে ছেলেখেলা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

আমি বললুম, এটা আমার জিনিস নয়, বটুকদাদার জিনিস! তুমি দিয়ে দাও! মণ্টু আর রতন আমাকে মেরে ফেলবে!

ছোড়দি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যা বাড়ি যা পড়তে বোস গিয়ে। খালি আড্ডা! এই বয়সেই বড্ড আড্ডা দিতে শিখেছিস!

ডিমটা হাতে নিয়ে ছোড়দি দৌড়ে চলে গেল পুকুরপাড় দিয়ে।

আমার এসব খারাপ লাগল! বটুকদাদাকে এখন আমি কী বলি? মণ্টু আর রতন আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু ছোড়দির শরীর খারাপ আর মন খারাপ, এখন তার ওপর রাগ করা যায় না।

আমি বটুকদাদার ঘরে গিয়ে তার গা ঘেঁসে বললুম, বটুকদাদা, আমার হাত থেকে পড়ে ডিমটা ভেঙ্গে গেল! তুমি আমায় মারবে?

বটুকদাদা আরাম করে হুঁকোয় তামাক টানছিলেন। আমার মাথার চুল ধরে আদর করে বললেন, জানি, তুই মিছে কথা বলছিস! তোর ছোড়দি ভেঙ্গে ফেলেছে, তাই না? যাক গে যাক যা হয়ে গেছে গেছে! আমি আবার আসামে যাচ্ছি, এবার এক সঙ্গে তিনটে ডিম আনবো!

আমি নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললুম, মণ্টু আর রতন যদি ছোড়দির নামে কিছু বলে?

বটুকদাদা বললেন, ওদের আমি বলে দেব এখন যে আমার হাত থেকেই ডিমটা পড়ে গেছে। প্রকাশের চিঠি আসেনি, ছোটনের খুব মন খারাপ। তাকে কেউ কিছু বলবে না।

এর পরের দিন ছোড়দির খুব জ্বর বাড়লো। তার পরের দিন আরও একটা ঘটনা ঘটলো!

বাবা পোস্ট অফিস থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে মুখ কালো করে বাড়িতে এলেন। সেই কাগজ দেখালেন জ্যাঠামশাইকে। তারপর দাদা, মা, বৌদি, পিসিমা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন খবরের কাগজটার ওপরে।

প্রথম পাতাতেই একটা চৌকো জায়গায় খবর বেরিয়েছে। লাদাখে ধস্ নেমে সাতজন লোক মারা গেছে। তাদের মধ্যে একজন বাঙালী!

কোনো লোকেরই নাম দেয়নি অবশ্য, কিন্তু লাদাখে আরও কি বাঙালী থাকতে পারে? মা প্রায় কাঁদতে শুরু করে দিলেন, পিসিমা বললেন, চুপ, চুপ, এখুনি ছোটনকে কিছু জানিও না। আগে পাকা খবর আসুক!

বাবা পোস্ট অফিসে ছুটলেন টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য। পিসিমা আমাকে বললেন, নীলু, তুই ওপরের ঘরে গিয়ে ছোটনের পাশে গিয়ে বোস। খবরদার, ওকে যেন কিছু বলবি না!

খাটের ওপর একটা পাতলা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে ছোড়দি। মাথার কাছে জানলাটা খোলা। ছোড়দি জানলার দিকে ফিরে আছে। তার দু'চোখে জল।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই রে, ছোড়দি শুনতে পেয়ে গেছে নাকি? ছোড়দির কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে গেল।

ছোড়দি একবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বলল, আয় নীলু, বোস। তোর মাস্টারমশাই আসে নি? এখন পড়বি না।

আমি বললুম, না। আমি তোমার কাছে একটু থাকবো? তুমি কেন সেদিন পুকুরে পা ডুবিয়ে বসেছিলে? তাই তো তোমার জ্বর বাড়লো!

ছোড়দি সে কথায় কান না দিয়ে বললো, নীলু, দ্যাখ, এই পেয়ারা গাছটায় একটা কী সুন্দর পাখি এসে বসেছে। এটা কী পাখি, চিনিস?

আমাদের বাড়ির পাশেই একটা বড় পেয়ারা গাছ। তার ডালপালা দোতলার জানলা দিয়ে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। পেয়ারা গাছটায় অনেক রকম পাখি এসে বসে পেয়ারা খাওয়ার জন্য। এখন অবশ্য গাছটায় একটাও পেয়ারা নেই। কিন্তু একটা নতুন রকমের পাখি খুব কাছেই এসে বসেছে।

পাখিটা অনেকটা গেরুয়া খয়েরি রঙের, শালিকের চেয়েও বড়, লম্বা লেজ। চোখে অবাক অবাক ভাব। আমি এই রকম পাখি আগে দেখিনি।

ছোড়দি বলল, একে বলে ইষ্টকুটুম পাখি। আমার দিকে কী রকম তাকিয়ে আছে দ্যাখ। ঠিক যেন আমার অসুখের কথা শুনে আমাকে দেখতে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই পাখি কিরকম ডাকে? শিস দেয়?

ছোড়দি বললেন, একবার ডেকেছিল, চুপ করে বসে থাক, আবার ডাকতে পারে। জানিস নীলু সেদিন তোর কাছ থেকে যে ডিমটা নিয়েছিলুম সেটা আমি পুকুর ধারে একটা গাছে ফাঁকা পাখির বাসায় রেখে এসেছি। সেটা এই পাখিরই ডিম ছিল না তো?

আমি বললুম, সেটা তো ছিল ধনেশ পাখির ডিম।

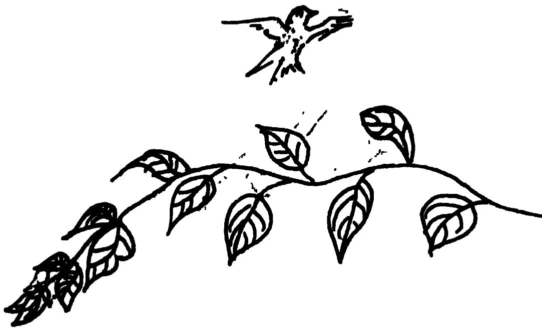
ছোড়দি বললেন, ভ্যাট্, বাজে কথা! এই নীলু, আমি ভাল আছি, আমার জ্বর ছেড়ে গেছে এই কথাটা বলে দে না পাখিটাকে!

আমি কী করে বলব, আমি কি পাখির ভাষা জানি? আমি ছোড়দির কপালে হাত রাখলুম। সত্যিই জ্বর নেই।

ইষ্টকুটুম পাখিটা টুইট করে একবার ডেকেই উড়ে চলে গেল। বেশ জোরে ডাকে তো পাখিটা!

তারপর ছোড়দির পাশে বসে বসে আমি গল্প করছি, বোধহয় এক ঘন্টা কেটে গেছে। হঠাৎ একতলায় একটা গোলমাল শোনা গেল। কিসের যেন আনন্দের হৈ চৈ। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এসে দাদা বললেন, এই ছোটন, আয়, আয়, নিচে আয়। প্রকাশ এসেছে! এই মাত্র এসে পৌঁছোলো।

ছোড়দি ধড়মড় করে উঠে বসল। আমি পেয়ারা ডালটার দিকে তাকালাম। ইষ্টকুটুম পাখি আমি আগে তো দেখিনি। কিন্তু মায়েদের কাছে গল্প শুনেছি, ঐ পাখি বাড়িতে এসে বসলে সে বাড়িতে অতিথি আসে। ইষ্টকুটুম পাখিটা কি আগেই ছোড়দিকে প্রকাশদার কথা জানাতে এসেছিল?





কালাচাঁদের দোকান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন তখন যেখানে সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে।

আজ এ স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, "আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!"

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেণ্ট টানব কী করে?"

গিন্নি বললেন, "ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এর পর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মাম্‌লা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।"

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, "একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।"

বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালও নয়, মন্দও নয়। এই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইছাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, "কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। অসুখ হলে ডাক্তার বদ্যি পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?

নবীনবাবু বললেন, বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু'দিন হাট।'

"তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?"

"ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে।"

"জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।"

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কী আর করা। নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।"

প্রথমদিন বাজার করতে দু'ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারিদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালও নয়। পাওয়াও যায় না সব কিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, "আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!"

নবীনবাবু ফাঁপরে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, "ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?

"তেল পাব কোথায়?"

"দ্যাখো না একটু খুঁজে পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।"

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপনা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, "আজ্ঞে আসুন।"

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, "আছে। ভাল ঘানির তেল।"

"কত দাম?"

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, " দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ'টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু'ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে

বললেন, "বাঃ, এ তো দারুণ ভাল তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?"

নবীনবাবু বললেন, "আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভাল।"

লোকটা যে সত্যিই ভাল তার প্রমাণ পাওয়া গেল দুদিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধ্যের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, "আপনাকে অত দাম দিতে হবে না।"

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নামই তো জানি না এখনও।"

"আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।"

"আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?"

"যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।"

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, "ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?"

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমোনো করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে আর বাছাই গরম মশলা।"

"দাম?"

"দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায় কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, সাত জন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।"

"হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলব'খন।"

দু'দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, "তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরনো?"

"কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, তা কম হবে না। ধরুন, এ গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।"

নবীনবাবুর একটা খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরনোই হবে তা হলে দাস গিন্নি এ দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, "এ গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, "হ্যাঁ গো, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।"

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, "কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।"

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু একথা সে কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, "তা কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।"

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।"

"ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ দোকানের কথা জানে না।"

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু মৃদু হেসে বলে, "জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, "হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও খদ্দেরও কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?"

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, "একজনের জন্যেই তো দোকান।"

"অ্যাঁ!"

কালাচাঁদ হাসল, "আসবেন।"

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নয়?"

"পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।"

"তাড়া কিসের?"

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, "না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দুদিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ দুঃখের কথা কই। টাকা পয়সার কথা থাক।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন। পাঁচ টাকা পাওনা। বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক-সবজিও ক্রমে ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, "ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।"

"দিয়ো না। হ্যাঁ গো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?"

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, "না না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?"

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।





ভূত অদ্ভুত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার ঠাকুরদা যখন বাড়িটা কিনছিলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলেছিলেন কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাড়িটা ঐতিহাসিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওলন্দাজ গভর্নরের কুঠিবাড়ি। কিন্তু, যেখানেই ইতিহাস, সেইখানেই তো ভূত। ইতিহাসের আর-এক নাম ভূত বললেই বা ক্ষতি কী! বাড়িটায় যেমন অনেক রহস্য আছে, সেইরকম অনেক ভূতও আছে। তা না হলে এতদিন খালি পড়ে থাকে!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'মশা তাড়াবার যেমন ধুপ আছে, আমার কাছে

সেইরকম ভূত তাড়াবার ধুনো আছে। ভূতকে আমি তেমন ভয় পাই না, ভয় পাই মানুষকে।'

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা শিক্ষক। আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যাও কিছু কম ছিল না। সকলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। ভূত, প্রেত, ভগবান, কোনওটাই মানতেন না। বাড়িটা কেনা হল প্রায় জলের দামে। বিশাল এক দোতলা বাড়ি। দু'মহলা। সামনের দিকটা পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পেছনের মহল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এল' শেপ। পেছনে একটা বারান্দা, পুবে শুরু হয়ে দক্ষিণ বরাবর পশ্চিম হয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। এই উত্তরটাই ছিল ভয়ঙ্কর। নিরালা, নির্জন। গাছপালা-ঘেরা। মনে হত ভূতের আড়ত।

নানা জনের নানা কথায় ওই বাড়িতে ভূতের যে তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল এইরকম—

এক, গভীর রাতে বাড়ির ন্যাড়া ছাত থেকে কেউ একজন বিশাল একটা ঘুড়ি ছাড়ত। কালো রঙের ঢাউস ঘুড়ি। অন্ধকার আকাশ। জ্বলজ্বলে তারা। কালো একটা ঘুড়ি প্রেতাত্মার মতো লাট খাচ্ছে, টাল খাচ্ছে। গোত্তা খেয়ে নীচে নামছে, পড়পড় শব্দে উঠে যাচ্ছে আকাশের টঙে। যাদের ঘুম ভেঙে যেত, ত'প' শব্দটা শুনতে পেত। সাহসী যারা, তারা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালে ঘন কালো ছায়ার মতো একটা কিছু দেখত পেত।

দুই, কুয়োর সঙ্গে একটা হ্যান্ড পাম্প লাগানো ছিল। গভীর রাতে কেউ সেটাকে পাম্প করত। হ্যাচাং-হ্যাচাং শব্দ শুনতে পেত প্রতিবেশীরা।তালাবন্ধ খালি বাড়ি অথচ জল পাম্প করার শব্দ। সাহসীরা তিনতলার ছাত থেকে এই বাড়ির পাতকো তলায় টর্চলাইট ফেলত। লোক নেই, জন নেই, । পাম্পের হাতল ওঠানামা করছে।

তিন, মাঝরাতের ন্যাড়া ছাতে জলের মূর্তি। একটা মূর্তি চলেফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জল টলটলে। যেমন,এক বালতি জল। বালতিটা নেই, জলটা বালতির আকার ধরে আছে। সেইরকম মানুষের আকারে জল। ছাতে টলে টলে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে আকাশে হাত তুলছে।

চার, সার্চলাইট। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে ছুটে যেত। গোল হয়ে ঘুরত। সেই আলোর উৎস এই বাড়ির ছাত।

পাঁচ, একবার এক যাত্রার দল এই পাড়ায় তিনদিন ধরে যাত্রা করতে এসেছিল। সেইদলকে এই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতের অভিনয়ের পর দলের নায়িকা সকাল দশটার সময় ছাত থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে গিয়ে, হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে ছিলেন এক মাস।

তিনি বলেছিলেন, অদৃশ্য কেউ ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

ছয়, একবার এক ভবঘুরে মানুষ এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি। যাওয়ার আগেই পাড়ার লোককে বলেছিলেন, এই বাড়িটায় অদ্ভুত একটা কিছু আছে। প্রবল বাতাস যখন কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে বইতে থাকে তখন শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হয়। সারা রাত বাড়িতে সেইরকম শব্দ হয়। বাইরে বাতাস নেই ভেতরে বাতাস কেঁদে-কেঁদে ফেরে।

সাত, বাগানের মাটি খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কোনও মহিলার। হাতে বালা ছিল।

আট রান্নাঘরের বাইরের দেওয়াল বেয়ে একটা পোড়া মাটির নল সোজা উঠে গেছে তিনতলার ছাতে। খালি বাড়ি। তালা বনধ। কেউ কোথাও নেই। প্রতিবেশীরা দেখছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আমার ঠাকুরদা এর সব কটাই লিখে রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভূতের লিস্ট।' বাড়ির দখল নিয়ে বললেন, "দেখা যাক, কোন ভূত কখন দর্শন দেয়। ভূতের দর্শন পেলে ভগবানেরও দর্শন পাব।"

আমরা তখন খুবই ছোট। আমি আর আমার দিদি সন্ধে হলেই দুজনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। এ-মহল থেকে ও-মহলে যেতে ভয়ে বুক কাঁপত। বারান্দার ঘুরপাক। বাঁ দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর-একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ডান দিকে বাগান থেকে উঠে এসেছে ঝোপঝাপ, গাছপালা। রেলিংয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে পাতকো তলা। হ্যান্ড পাম্পের হাতলটা অন্ধকারে নিরেট এক অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে চিকচিকে জোনাকি। কে আবার শিখিয়ে দিয়েছিল, জোনাকিরা সব প্রেতাত্মা। তাই সন্ধেবেলা দিদি আর আমি যেন অবিচ্ছেদ্য দুই প্রাণী। দিনের বেলা যত ঝগড়া, রাত্তির হলেই গায়ে গা লাগানো গলায়-গলায় ভাব। মা কি জ্যাঠাইমা হয়তো উত্তর মহলের রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, "উমা শুনে যা।" আমরা অমনি দুজনে জড়াজড়ি করে হাজির হলুম।

মা আমাকে বললেন, "তোকে কে ডেকেছে! পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন ?"

জ্যাঠাইমা মাকে বললেন,'বুঝলি না, সব ভূতের ভয়ে জুজু হয়ে আছে।"

আমি আর দিদি দু'জনে যে ঘরে বসে পড়তুম, সেই ঘরের দুটো জানলা। হা হা করছে। জানলা মানেই ভূত। লম্বা-লম্বা হাত বাড়ালেই হল। জানলার দিকে পেছন ফিরে বসা চলবে না। ভূত পিঠে পেছনে সুড়সুড়ি দিতে পারে।

দু'জনে মাথা খাটিয়ে বের করলুম, দু'জনে পিঠে পিঠ দিয়ে বসব। একজনের মুখ এজানলার দিকে আর একজনের মুখ ও-জানলার দিকে। ভূত যদি হাত বাড়ায়, দেখতে পাব আর চিৎকার করে উঠব। একটু করে পড়ি আর ভয়ে ভয়ে তাকাই। তাকাই আর পড়ি,পড়ি আর তাকাই।

আমি যে জানলাটার দিকে তাকাতুম তার ওপাশেই ছিল বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি,বাড়িটার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা খিড়কির, আর একটা সদরের। ওটা ছিল সদরের সিঁড়ি। একদিন আমরা দু'জনে পড়তে বসেছি। পড়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে , এমন সময় জানালায় একটা মুখ। সাদা লম্বা দাড়ি, চুল। ধকধকে দুটো চোখ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার চিৎকার, "দিদি রে! ভূত।" বলা মাত্রই দিদির এক লাফ। দুজন বইপত্তর উলটে, জড়াজড়ি করে দৌড় মারলুম উত্তর মহলের রান্নাঘরের দিকে। জ্যাঠাইমা ময়দা মাখছিলেন। সোজা তাঁর ঘাড়ে। তিনজনেই চিতপাত। জলের ঘটি উলটে গেল। উলটে গেল দুধের ডেকচি। মা আলুর দমের আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। মা ভয় পেলে ইংরেজি বলেন। চিৎকার করতে লাগলেন, "আর্থকোয়েক, আর্থকোয়েক। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।"

জল, ময়দা, ডাল, দুধ সব মেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "আমরা ভূত দেখেছি।"

"সন্ধে সাতটার সময় ভূত!"

না, ভূত নয়। এক ভদ্রলোক। আশুবাবু, আমার ঠাকুরদার বন্ধু। কবি। ভদ্রলোকের পেছন-পেছন ঠাকুরদাও উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। তিনি হুটোপাটির শব্দ শুনেছিলেন। রান্নাঘরে এসে বললেন, "ছি ছি! কী লজ্জার কথা। আশুবাবু বলছেন, আমার চেহারাটা কি এতই ভয়ঙ্কর যে, ছেলেমেয়ে দুটো ওইভাবে ছুটে পালাল। এ দাড়ি তো আমার অনেক দিনের। কবিতায় তেমন ফোর্স আসছিল না বলেই দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছি, কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।"

মা বললেন, "বাবা, এ দুটো হল রামভিতু। দিনরাত, চলতে-ফিরতে ভূত দেখছে।"

পরে দিদিতে-আমাতে একটা গবেষণা হল। যতই হোক আমরা তো অপমানিত হয়েছি। ভয়ঙ্কর অপমান। ঠাকুরদার কবি-বন্ধুকে ভূত ভেবেছি।

দিদি বললে, "বিলু, ভূত সম্পর্কে তোর কোনও আইডিয়া আছে? কেমন দেখতে, না দেখতে?"

আমরা দুজনেই তো দেখিনি কখনও। কেবল শুনেছি। ভূত দেখা যায় না। ভূত কেবল কর্ম। কর্ম বললে ভুল হবে। ভূত হল অপকর্ম। নানারকম

অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে। দিদি বললে, "একটা লিস্ট কর, এক নম্বর, ভূত অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ করে। দুই, ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে। তিন, যে-কোনও জিনিসকে শূন্যে উঠিয়ে দেয়। চার, শুয়ে থাকলে ঠ্যাং ধরে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ, বন্ধ জানলা, দরজা খুলে দেয়। ছয়, হা হা করে হাসে। সাত, পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। আট, ঝড় হয়ে বয়ে যায়। নয়, মেজাজ ভাল থাকলে জিনিসপত্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। দশ, জিনিসপত্তর অদৃশ্য করে দেয় আবার জিনিস রেখেও যায়। এগারো, ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে। বারো, কখনও অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মতো কাউকে-কাউকে দর্শন দেয়। নাকিসুরে কথা বলে।"

লিস্ট শেষ হওয়ার পর দিদি বললে, "শোন বিলু, এর পর থেকে কোনও লোক দেখলে ভূত-ভূত করে চেঁচাবি না গাধার মতো। আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। ছোট হলেও খুব ছোট নই। ভূতের কোনও চেহারা থাকে না। ভূত হল বাতাস, ভূত হল ধোঁয়া, ভূত হল শব্দ।"

বেশ চলছিল হেসে-খেলে আমাদের সংসার। মা আর জ্যাঠাইমা যেন দুই বোন। ঠাকুরদা যেন মহাদেব। বাবা আর জ্যাঠামশাই যেন গলায়-গলায় দুই বন্ধু। আর আমরা, ভাই-বোন, কেউ কাউকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। দুজনে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ কী মন খারাপ! অনেকক্ষণ দেখা হবে না দু'জনের। স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদির স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরতুম। দিদি ভীষণ বেড়াল ভালবাসত। পথে কোনও বেড়াল দেখলেই থমকে দাঁড়াত। বলত, বিলু, দ্যাখ, কী সুন্দর মা-লক্ষ্মীর মতো বেড়াল। চুকু-চুক করে ডাকত। বেড়াল অমনি লেজ তুলে নির্ভয়ে দিদির কাছে এসে গায়ে গা ঘষত। আমার একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হত। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে টানছি। বুটজুতো দিয়ে পাথরের টুকরোয় শট মারছি। আর দিদি আমাকে সাবধান করছে। যখন শুনছি না, কান ধরে বলছে, বানর ছেলে। আমি হিহি করে হাসছি। দিদি ভয় দেখাচ্ছে, বাড়ি চলো না, তোমার হবে। বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের দুজনের দৌড় শুরু হত। রেস। দিদিকে খুব ফরসা আর সুন্দর দেখতে ছিল। যখন ছুটত, ফিতে-বাঁধা বিনুনি পিঠে দুলত। সপাত-সপাত শব্দ করত। ফরসা গাল দুটো গোলাপের মতো লাল হয়ে যেত। আর আমি তখন দিদিকে আরও ভালবেসে ফেলতুম।

এই সময় মা একদিন ভীষণ ভয় পেলেন। রাত এগারোটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দক্ষিণের মহলে আসছেন, ডান দিকে

ছাতে ওঠার সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার। হঠাৎ দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরে কে একজন ছাতে উঠে যাচ্ছে। মা ভেবেছিলেন, জ্যাঠাইমা। জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাতে ছাতে যাচ্ছ কেন?" কিন্তু ঘরে এসে জ্যাঠাইমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। শেষে বাবা আর জ্যাঠামশাই টর্চ নিয়ে ছাতে গেলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

ঠাকুরদা বললেন, "কিছুই না, চোখের ভুল, অমন হয়। ভূত তো বাইরে নেই, আছে মানুষের মনে।"

সবাই সায় দিলেন, ঠিকই তো, ঠিকই তো।

মা কিন্তু পর-পর তিনদিন একই সময় সেই মূর্তিকে ছাতে উঠে যেতে দেখলেন। জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউই তেমন পাত্তা দিলেন না, মায়ের এই দেখাটাকে। ঠিক সাতদিনের মাথায় ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। হয় কাকে এনেছিল, না হয় বেড়ালে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। নীচে নেমে এসে জ্যাঠাইমাকে একবার বলেছিলেন। জ্যাঠাইমা আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জিনিসটাকে কেউই তেমন ভয়ের চোখে দেখেননি, কিন্তু সেইদিনই সন্ধেবেলা মায়ের কেঁপে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, "আর কিছু করার নেই, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে।" চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মা চলে গেলেন।

দিদি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মনে-মনে ভাবি, মা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ ফিরে আসবেন একদিন। দুহাতে জড়িয়ে ধরবেন আমাদের দুজনকে। আমি দিদির দিকে তাকাই। দিদি আমার দিকে। দু'জনেই কেঁদে ফেলি।

দিদি বলে, "মায়ের মতো মা কি আর পাওয়া যাবে রে বিলু! আর বেঁচে থেকে কী হবে। জ্যাঠাইমাও আমাদের মা।তা হলেও, মা একটা আলাদা জিনিস।"

পাড়া প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, তখনই বলেছিলুম, বাড়িটা হানাবাড়ি। শুনলে না তোমরা! এখনও সময় আছে। সংসারটা চুরমার হয়ে যাওয়ায় আগে পালাও। কেউই সে কথা শুনলেন না। বাবা বললেন, "এদের মা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার কাছে সেই জায়গাটা তীর্থ।"

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো।"

ছ'টা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। শীতের মুখে দিদি একদিন সেই মূর্তি দেখতে পেল সিঁড়িতে। লালপাড় শাড়ি পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দিদি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "বিলু, এইবার

আমার মরার পালা।”

সকলে দিদিকে জেরা শুরু করলেন, “তুই কী দেখেছিস, ঠিক করে বল।” দিদি বললে, “বলে আর কী হবে। আমি যা দেখেছি তা দেখেছি। এইবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকে চলে যেতে হবে মায়ের কাছে।”

আমি আর দিদি এক বিছানায় পাশাপাশি শুতুম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদির মুখে। দিদি অনেকক্ষণ জেগে শুয়েছিল কপালে হাত রেখে। হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে বললে, “শোন বিলু, আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার যা আছে সব একটা বাক্সে ভরে তোর কাছে রেখে দিবি। কাউকে দিবি না। বাক্সটার ওপর বড়-বড় করে লিখে রাখবি, ‘আমার দিদি।’ যখন তুই অনেক বড় হয়ে যাবি,তখনও বাক্সটা তোর কাছে রেখে দিবি। মাঝে মাঝে খুলে দেখবি। যখনই খুলবি আমার গলা শুনতে পাবি, বিলু।”

সে- রাতে দুজনেই জেগে রইলুম। কারও চোখে ঘুম নেই। সকালে সারা বাড়িতে ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের ছাতে আমাদেরই সাদা ধবধবে বেড়ালটা মরে পড়ে আছে। সুস্থ সুন্দর বেড়াল। আগের রাতে জ্যাঠাইমার হাতে মাছ-ভাত খেয়ে গেছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ফুলের মতো সাদা একটা বেড়াল দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ছাতের এক কোণে। কাল রাতে কাগজের একটা দলা নিয়ে কত খেলেছে। দিদির কোলে শুয়ে ঘড়ঘড় করেছে। জ্যাঠাইমা যখন রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, পিঠে গা ঘষেছে।

দিদি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসল। আমাকে বলল, “বড় ভয় করছে রে বিলু। আমার মৃত্যুটা কীভাবে হবে। ছাতে, না ঘরে।”

আমার ঠাকুরদা সেদিন আর স্কুলে গেলেন না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বাবা আর জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, “তোমরা উমাকে ঘিরে বসে থাকো, যেন নিয়ে না যেতে পারে!” কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছুই বললেন না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলেন একটা লরি চেপে, সঙ্গে তিনজন লোক। সেইদিনই আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিলুম। সব জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা আর একটা বাড়িতে এসে উঠলুম। ভূত আছে কিনা জানি না, কিন্তু ভূত যেন একালের টেররিস্ট। দিদির বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সেদিন বলেছিল, “বাড়িটা ছাড়, নয়তো একেও মারব!”

শুধু একটাই দুঃখ, বাড়িটায় না এলে, মা হয়তো আজও বেঁচে থাকতেন।



বিন্দু বিসর্গও বানানো নয়

পূর্ণেন্দু পত্রী

পৃথিবীতে যে অনেক নামী নামী লোক জন্মেছে, সে আমি জানি। রবীন্দ্রনাথ, আলাউদ্দিন খিল্‌জী, হেমামালিনী, কপিলদেব, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আইনস্টাইন, সন্তোষ দত্ত ওরফে জটায়ু এমনি আরো কত সব। ওঃ আরেকজনের নাম বলতে ভুলে গেছি। সত্যজিৎ রায়। কেউ কেউ বলে তাঁর বাবা-ঠাকুর্দাও নাকি খুব নামী লোক ছিলেন। হয়তো হবে। সে যাই হোক, এঁরা সকলেই খুব নামী। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমার মতো বহু-নামী মানুষ বা ছেলে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন জন্মাবে কিনা সন্দেহ।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন, ফচকেমি করছি। আপনারা যা খুশি ভাবতে পারেন। আমি সত্যি কথাটাই বলে যাব। যার বিন্দু-বিসর্গও বানানো নয়। ছেলেবেলা থেকেই শুরু করি।

আমি আমার মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান। এর মানে, আমার আগে চার দাদা আর তিন দিদি। তাদের সকলের আসল নাম আর ডাক নামগুলো বলে দি।

বড়দা।

আসল নাম, যাজ্ঞ্যবল্ক। ডাক নাম, হীরু।

মেজদা।

আসল, ঋষ্যশৃঙ্গ। ডাক, ছিরু।

বড়দি।

আসল, উর্বশী। ডাক, টেঁপি।

সেজদা।

আসল, ধৃষ্টদ্যুম্ন। ডাক, নিরু।

মেজদি।

আসল, ঊর্মিলা। ডাক, খেপি।

ছোড়দা।

আসল, বৃষকেতু। ডাক, পিলে।

ছোড়দি।

আসল, উত্তরা। ডাক, নেপি।

এরপর আমি। আমার আসল নাম মার্কণ্ডেয়। ডাক নাম, তিলে। কিন্তু বাবাই যা সেই ছেলেবেলায় ঠিক নামে ডাকতেন আমাকে।

—এ্যাই তিলে, এদিকে আয় তো ! তুই নাকি চাটুজ্যেদের বাগানে আমলকি পাড়তে গিয়ে এমন ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করেছিস যে, কানা হয়ে গেছে কার নাকি চোখ '?

আমলকি পাড়তে গিয়ে কি করেছিলাম, সেটা অন্য কাহিনী। তাছাড়া অনেক আগের কথা। তখন ক্লাস ফোরে পড়তাম। আর তখন বাবাও কানে শুনতে পেতেন। ঐ ক্লাস ফোর বা ফাইভ পর্যন্ত বাবাই যা একমাত্র আমাকে ডেকেছেন আমার আসল নামে। এখন কানে শুনতে পান না। আর চোখেও বেশ ঝাপসা। তাই শুধু আমি নই, গোটা বাড়ির সকলকেই ভুল নামে ডাকাডাকি তাঁর। এখনকার কথা থাক। খুব ছেলেবেলায় ফিরে যাই। দেখতে গোলগাল নাদুসনুদুস ছিলাম বলেই হয়তো খুব ছেলেবেলায় সবাই আমাকে ভালবাসতো খুব। তখন বড়দি বলতো,

—ও তিলু, তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই— নাচটা দেখিয়ে দেতো একবার।

ছোড়দি বলতো,

—আরে ও তিলু যা পাচ্ছিস মুখে পুরছিস কেন? অ্যাঁ?

বড়দা ডাকতো, তিল্লি।

মেজদা, তাল্লু।

মেজদা, তিলি।

ছোড়দা, তাল্লি।

সেজদা, তুল্লুক।

বড় পিসির বিয়ে হয়েছিল অনেক দূরে। অনেক পরে পরে আসতেন তাই। তাঁর আসার ফাঁকে ফাঁকে সেই ছোট্টবেলার ফুটবলের মতো গোলগাল আমি লম্বা হয়ে যাচ্ছি ক্রিকেটের স্টাম্পের মতো। আর বড় পিসি আমাকে দেখেই বলে উঠতেন

—হ্যাঁরে হিল্লে, দিনকে দিন তুই এমন প্যাঁকাটির মতো রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?

আমি প্রথম দিকে প্রতিবাদ করতাম।

—বড় পিসি, আমি হিল্লে নই গো। হিল্লে হল জ্যাঠাবাবুর মেজছেলে। আমি তো তিলে।

বড় পিসি হাত পা ছড়িয়ে হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে

—তাই বুঝি? তুই তিলে? চশমাটা খুলে রেখেছি তো তাই তোকে ঠাওর করতে পারিনি।

বড়দির আর মেজদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আমার জন্মানোর আগে। ছোড়দির বিয়ের সময় এক এক করে আত্মীয়রা আসছে। ছোটপিসি আসবে তমলুক থেকে। আমরা সবাই গেছি গঙ্গারধারে খেয়া ঘাটে। কী অদ্ভুত কাণ্ড, ছোটপিসি মেজদা, সেজদা, ছোড়দাকে ঠিকঠাক নামে ডাকল। কেবল আমার বেলায় উল্টোপাল্টা। প্রণাম করতেই,

—আরে থাক্ থাক্। ও মা, পিলু নাকি? বাবা, কবে তুই এমন বড় হয়ে গেলি রে। এই তো সেদিন জন্মালি চোখের সামনে। আমি ভুল ভাঙাতে যাই।

—আমি পিলু নয় ছোটপিসি। আমি তিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটপিসির উত্তর

আরে, যার নাম ভাজা চাল, তার নামই মুড়ি। পিলুও যা, তিলেও তাই। তিলে নামটাতো হয়েছে পরে। তার আগে তুই ছিলি পিলু। পিলু বলেই ডাকতাম তোকে সবাই। তিলে নামটাতো হল আট-দশ মাস পরে। বোধহয় অন্নপ্রাশনের সময়। মায়ের এক সন্নেসী মামা এসে হাজির তখন। এক ফোঁটা তোকে কোলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে তিনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন তোর মা মানে আমাদের মেজবৌদিকে—ও কুন্দনন্দিনী, কী নাম রেখেছিস তোর এই তিলের নাড়ুর মতো ছেলেটার? ব্যাস, সেই থেকে তোর ডাক নাম হয়ে গেল তিলে। কেউ কেউ তিলের থেকে নাড়ুটাই পছন্দ করেছিল বেশি। পরে দেখা গেল নাড়ু নামটা হলে ডাকতে পারবে না অনেকে। কেননা বাড়ির গৃহদেবতা নাড়ুগোপাল। আমার কাছে তুই সেই পিলেই রয়ে গেছিস আজো।

(২)

অনেক আগের কথা।

এখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। ক্লাস সেভেনের ছাত্র। একই ক্লাসে রয়ে গেছি তিনবছর। প্রথম বছরে ফেল করেছিলুম অঙ্কে। দ্বিতীয় বছরে ইংরেজিতে। তৃতীয় মানে গত বছরে সংস্কৃতে। এবারে যাতে সংস্কৃতে উতরে যেতে পারি তার জন্যে রোজ সন্ধের পর দোতলার বারান্দায় বসে হেঁকে হেঁকে মুখস্থ করছি পড়া। একদিন পাড়ার ভাদুড়ীকাকা এসে বাবাকে বললে,

—তোমার ছোট ছেলেটা আজকাল কেমন চমৎকার পড়াশুনো করছে মন দিয়ে। শুনেও সুখ।

বাবা কনে শুনতে পান না আর চোখেও ঝাপসা, আগেই বলেছি। বাবা বললেন,

—কী বললেন ভট্টাচায্যি কাকা? বৃষ্টি হবে? মেঘ করেছে?

ভাদুড়ী কাকা এবার ক্যানেস্তারা পেটানোর মতো গলা চড়িয়ে

আমি ভাদুড়ী বলছি। ভট্টাচায্যি নই। তোমার ছেলে গোল্লার কথা বলছিলাম। কী চমৎকার গলা ছেড়ে পড়াশুনো করছে আজকাল। আমরা কদ্দুর থেকে শুনতে পাই। নিঝুম রাতটা গমগম করতে থাকে যেন। আর আমাদের বাড়ির ছেলেগুলোর গলায় সাড়াটি নেই, শব্দটি নেই। মশার মতো পিন্‌পিন করে কি আউড়ে যায় ভগবান জানে।

মা এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার পিছনে। মা বলে,

গোল্লা বলছ কাকে ঠাকুরপো? চেঁচিয়ে ইংরেজি পড়ে তো নুড়ো। আমার ছোট ছেলে।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, ভাদুড়ী কাকার পিটপিটে চোখ দুটো তখন ফুলে পাকা কালো জাম।

—তুমি ইংরেজি বলছো বৌদি? আমরা তো শুনতে পাই নরঃ, নরৌ, নরাঃ মানে সংস্কৃত।

মায়ের জবাব,

এ তুমি কি বলছ ঠাকুরপো? ইংরেজরা কি মানুষ নয়? মানুষ মানেই তো নরঃ। দু-বছর আগে নুড়োটা ইংরেজিতে ফেল করেছিল তো। তাই উনি বকুনি দিয়েছিলেন খুব। ইংরেজিই হচ্ছে উপরে উঠবার মই। দূরে পাড়ি দেওয়ার জাহাজ। জীবনে সাক্সেসফুল হবার মাদুলি।

ভাদুড়ী কাকা মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ কাঠঠোকরা পাখির মতো চুপচাপ তাকিয়ে থেকে কোনো কথাটি না বলে চলে গেলেন। চলে যেতেই তখুনি মায়ের ডাক,

অ্যাই নুড়ো, এদিকে আয়।

আমি কাছে আসতেই

—ভাদুড়ী ঠাকুরপো এসে তোর নাম গোল্লা বলল কেন রে?

প্রশ্নট শুনে গোড়ায় খানিকটা মচকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় আমার। আমি তো আর মাকে বলতে পারি না যে, ইংরেজি অঙ্ক আর সংস্কৃতে গোল্লা পেয়ে আসছি বলে স্কুলের কিছু ছেলে আমাকে ঐ নামে খেপায়। ব্লাকবোর্ডে ছড়া লেখে। আর এই নিয়ে যে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় প্রায়ই হাতহাতি মারামারির মতো অবস্থা ঘনিয়ে ওঠে, বলতে পারি না সেটাও। তাই খানিকটা সময় লেগে যায় একটা লাগসই মিথ্যে বানাতে।

—গোল্লা হল একটা নাটকের চরিত্রের নাম। এ-বছর দুগ্‌গা পুজোর সময় আমরা একটা মজার নাটক করবো। সে নাটকে গোল্লা একটা গুণ্ডার চরিত্র। আমি সেই রোলে অভিনয় করবো।

মায়ের গলায় তখন ভালোবাসার পাঁচফোড়ন-দেওয়া অভিযোগ

—বাঃ, পাড়ার অন্য ছেলেরা করবে ভালো ছেলের রোল। আর তোমার বরাতেই কিনা গুণ্ডা? অমন রোল নেবার দরকার হল কেন?

—মা, যখন নাটকটা হবে, তখন দেখো। গুণ্ডা হলে কি হবে, নাটকের একেবারে শেষে দেখা যাবে, ঐ গুণ্ডাই হল সবচেয়ে সাচ্চা দেশপ্রেমিক। একদম হিন্দী ছকে ফেলা নাটক। ঐ গুণ্ডার যখন ফাঁসি হবে, তুমি চোখের জল রাখতে পারবে না।

এইটুকু শুনেই মায়ের জল-ছলছল চোখ। যাক বাঁচা গেল। এ যাত্রা কোনমতে রেহাই।

হ্যাঁ, একটা কথা এখুনি বলে নিতে হয়। নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে উঁকি দিয়েছে প্রশ্নটা। মা আমাকে, নুড়ো ডাকে কেন? মা ছাড়া কিন্তু আর কেউ আমাকে ঐ নামে ডাকে না। ডাকা বারণ। এর পিছনে যে মজার ইতিহাসটা আছে, ইতিহাস অথবা পুরাণ, সেটাই বলে দিচ্ছি এখন।

আপনারা তো আগেই শুনেছেন ভাইবোন মিলিয়ে আমরা আটজন এবং আমিই সকলের চেয়ে ছোট। তার মানে কি? মানে হল আমি মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান। অষ্টম গর্ভের সন্তানরা নাকি বাঁচে না। আর যদি বাঁচে তারা বিশ্ববিখ্যাত হয়। আমি যে এই মুখুজ্যে বংশের জয়তিলক হয়ে উঠবো একদিন, এই বিশ্বাসে মা আমাকে, আমার ছ-সাত মাস বয়স পর্যন্ত অতিরিক্ত আদর দিয়ে ডাকতেন তিলক।

গালে চুমু খেতে সুরু করে বলতেন, তিলক আমার, তিলুক আমার, তুলুক আমার...

হঠাৎ একদিন নাকি ঠাকুমার বা ঠাম্মার বকুনি।

—বলি বৌমা, কীরকম বেয়াক্কেলে বলতো তুমি? অষ্টম গভ্যের ছেলে তোমার। অমন ছেলে লাখে একটা বাঁচে। তুমি কিনা তাকে ভালো ভালো নামে ডেকে আদর করছ? এতখানি বয়স হলো, এখনো জ্ঞান-গম্যি হলনি তোমার? অষ্টম গভ্যের ছেলেকে যদি অশুভ শক্তির খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তাকে ডাকতে হবে আজেবাজে, এলেবেলে, হতকুচ্ছিৎ, বিদিকিচ্ছিরি কোনো একটা নামে।

সেই থেকে মায়ের মুখে আমি নুড়ো। আসলে আমার মুখে মায়ের গোপন মঙ্গল কামনার নুড়ো।

৩

অষ্টম গভ্যের সন্তান যে কি জিনিস তা আমি জানতুম না অনেকদিন পর্যন্ত। জিজ্ঞেস করে উত্তর পাইনি কারো কাছ থেকে। উল্টে রাতপেঁচার মতো কটকটে চোখে তাকিয়েছে কেউ কেউ। কেউ কেউ হাঁকিয়েছে কড়া দাবড়ি।

—তুই এক ফোঁটা ছেলে, তোর ওসব বড়দের ব্যাপারে কৌতূহল কেন রে?

অবাক কাণ্ড! বড়দের ব্যাপারে কৌতূহল দেখালাম কখন? আমার কৌতূহল তো নিজেকে নিয়ে। আমি অষ্টম গভ্যের সন্তান। অষ্টম গভ্যের সন্তানরা

বাঁচে না কেন, সেটাই শুধু আমার জানার ইচ্ছে। আর কিছুতো নয়। আমার তো বুঝে নেওয়া দরকার আমি বাঁচবো কি বাঁচবো না। খুব মন খারাপ ছিল তা নিয়ে। অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

রাখে হরি তো মারে কে। একদিন এসে গেল সুবর্ণসুযোগ। ঠাম্মার মরো মরো অবস্থা, হঠাৎ হাঁপানির টানে। এখুনি কোবরেজ মশাইকে না ডেকে আনলে নয়। ওদিকে বাইরে তখন প্রলয় নাচন। ঝমঝমে বৃষ্টি। তার সঙ্গে সাংঘাতিক ঝোড়ো হাওয়া। পৃথিবীকে ভেঙে চুরে লণ্ডভণ্ড করার মতো দুর্যোগ। ঘরের বাইরে পা বাড়ায় কার সাধ্যি।

মা সবাইকে বলে। কেউ রাজি হয় না। শেষে আমাকে। আমি বলি,

—আমি কি করে যাবো। আমার মতো পুঁচকে ছেলেকে তো পলকা পালকের মতো উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলবে কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। রাস্তায় পড়ে থাকবো মরাকাঠ হয়ে।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে যখন, ছোটপিসি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকে রান্নাঘরের আড়ালে। মেজদির আবার একটা বাচ্চা হবে। তাই ছোট পিসিকে ডেকে আনা হয়েছে কদিন হল। আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ছোটপিসি ফিসফিস করে বললে।

—তোর কোন ক্ষতি হবে না বাবা তিল্লু। তুই অষ্টম গর্ভের সন্তান। তুই হলি আমাদের বংশের কিষ্টো।

—অষ্টম গর্ভের সন্তান হলে নাকি বাঁচে না?

—সেসব তোর জানার দরকার নেই।

—না, তাহলে যাব না। যেতে পারি যদি বলো।

—কি বলব?

—অষ্টম সন্তান হলে কি হয় বলতে হবে। যদি বলো, তাহলে যেতে পারি। ছোট পিসি বাধ্য হয়ে রাজি হয়। দুর্যোগ ফুঁড়ে আমি দৌড়ে যাই হরিহর কবিরাজের কাছে। ফিরে আসি কবিরাজকে সঙ্গে নিয়েই।

সেইদিন রাত্রে ঘুমোবার আগে ছোটপিসি অষ্টম গর্ভের সন্তানের গল্প শোনাল আমাকে।

—মথুরা নামে ছিল একটা রাজ্য। তার রাজা ছিল উগ্রসেন। সেই উগ্রসেনের ছেলে কংস। কংস ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে। বড় হতে থাকে যত, ততই বাড়ে তার দুষ্টুমি। দুষ্টুমি বাড়তে বাড়তে একদম নিষ্ঠুর চরিত্রের হয়ে গেল সে। তখন করলে কি, বাবাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে

নিজেই বসে পড়ল সিংহাসনে। ঐ কংসের ছিল একটা বোন। নাম দেবকী। তার বিয়ে দিয়ে দিল বসুদেব-এর সঙ্গে। আর বিয়ের দিনই আকাশ থেকে দৈববাণী, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান বধ করবে কংসকে। কংস তো দৈববাণী শুনে রেগে লাল। বিয়ের পরই দেবকী আর বসুদেবকে পুরে দিলে কারাগারে। কারাগারে দেবকীর একটা একটা করে ছেলে হয় আর কংস তাদের মেরে ফেলে। এমনি করে মারা গেল ছজন। তখন সপ্তম সন্তানকে বাঁচানো হল মিথ্যে কথা বলে। আসলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্য জায়গায়। আর মিথ্যে করে কংসকে জানানো হয়েছিল যে গর্ভেই মারা গেছে সে। এরপর এল অষ্টম গর্ভের সন্তান। মহামায়ার মায়ায় গোটা মথুরা রাজ্য ঘুমে অচেতন। তখন বসুদেব নিজের অষ্টম গর্ভের ছেলে কৃষ্ণকে গোপালকে নন্দের কাছে রেখে নন্দের স্ত্রী যশোদার সদ্যোজাত মেয়েকে এনে শুইয়ে দিলে দেবকীর কোলের কাছে। পরের দিন, দেবকীর কন্যা সন্তান জন্মেছে খবর পেয়ে কংস কারাগারে ঢুকে সেই মেয়েকে হত্যা করতে যাচ্ছে যখন, মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে। আর আকাশ থেকেই কংস শুনলে তার ভবিষ্যৎবাণী 'তোমাকে যে বধ করবে সে বেঁচে আছে আর বড় হচ্ছে।' ডাক পড়ল পুতানা নামের রাক্ষসীর। আদেশ পেয়ে পুতনা নিজের বিষাক্ত স্তনের দুধ খাইয়ে মারতে লাগল মথুরার সব কটি শিশুকে। কিন্তু একজনকে পারল না। সে ঐ কৃষ্ণ। সে এমন ভাবে পুতানার স্তন্য পান করল যে মরে গেল পুতানাই। তারপর কংস কতরকম যে ছল-বল-কৌশল করল কৃষ্ণকে মারতে তা শেষ করা যাবে না বলে। শেষ পর্যন্ত ঐ কৃষ্ণের হাতেই একদিন মরতে হল দোর্দণ্ড প্রতাপ কংসকে। এই হল পুরাণের কাহিনী।

পিসিমার মুখে ঐ গল্পটা শোনার পর থেকে, আমি বেশ টের পেতে থাকি যে আমার ভিতরে এসে গেছে একটা পরিবর্তন। আগে আমার মধ্যে কাজ করতো আটচল্লিশ রকমের ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ। যেমন ধরা যাক ভূতের ভয়। ভূতের নাম শুনলেই সজারুর কাঁটা গজাতো গায়ে। এর পরে দেখি আগের মত কাঁটা দিয়ে ওঠে না আর। বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীদের তো নিজের মুখে বলতে পারি না যে, আমি যেহেতু অষ্টম গর্ভের সন্তান, তাই কেউ করতে পারবে না আমার কোন ক্ষতি। অথচ মনে মনে ব্যাপারটাকে পরীক্ষা মানে যাচাই করে নেওয়ার খুব ইচ্ছে। কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতেই মাথায় এসে গেল একটা বুদ্ধি।

একটা কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া উচিত ছিল। ক্লাস ফোরে ওঠার পর

থেকেই ছড়া লেখা অদ্ভুত প্রতিভা গজিয়ে ওঠে আমার ভিতর। কেউ যেমন ইচ্ছে করলেই পারে শিস দিতে, কিংবা কট্‌কট্‌ করে আঙুল মট্‌কাতে, কিংবা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কিংবা আরশোলার ভয়ে তুড়িলাফ খেতে, কিংবা গাছে পাকা আম-জাম-জামরুল দেখলেই ঢিল ছুঁড়তে কিংবা দোষ করে অনর্গল মিথ্যে বলে যেতে, আমি সেই ভাবেই পরতাম যখন-তখন ছড়া লিখতে। যখন ক্লাস ফাইভে উঠেছি তখন ঐ প্রতিভা মানে ছড়া বানানোর ঐ প্রতিভা এমন সহজাত হয়ে গেছে আমার যে ক্লাসে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডে ছড়া না লিখলে নিসপিস করতো হাত। অনেক কাণ্ডকারখানা হয়েছে তা নিয়ে। কাণ্ডকারখানা মানে স্যারেদের হাতে কানমলা, বেতের চাবুকের মার ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন নয়, পরে কখনও সবিস্তারে বলা যাবে সে কাহিনী। এখন আসল কথায় আসি। অর্থাৎ কীভাবে আমার নিজের সম্বন্ধে যা কিছু ভয়গুলো প্যাঁকাটির মতো ভাঙতে লাগল, তারই ইতিহাস।

৪

আমাদের বাড়ির লম্বা পাঁচিলটা যেখানে শেষ, তার পরেই মস্ত মাঠ। সেই মাঠের মাঝামাঝি বাঁ দিকে খগেনকাকাদের বিরাট বাগান। মাঝখানে কয়েক বছর খগেনকাকারা এখানে ছিলেন না। বোম্বায়ে থাকতেন। সেই সময় থেকে বাগানটা চলে যায় ভূতের দখলে। এমন গাছ নেই যা মিলবে না ঐ বাগানে। রাশি রাশি ফল পাকছে। কিন্তু পেটে যাচ্ছে না কারো। খাচ্ছে পাখিরা আর পোকারা। চোখের সামনে পাকা তাল, কি ঝুনো নারকেল কি থোকা থোকা লাল আম কালো জাম সাদা জামরুল কি হলুদ পেয়ারা দেখেও বাগানে ঢুকে সে সব ছোঁয়ার দিকে পা বাড়াতে সাহস পায় না কেউ। ঢুকলেই সর্বনাশ। হয় ঘাড় মটকে দেবে। নয়তো এমন ভয় দেখাবে যে তাতেই হার্টফেল হওয়ার অবস্থা।

এই তো কদিন আগে কী দশাটাই না হল সাঁতরা বুড়ির। বিকেল হলে মাঠের গোবর কুড়োনোটাই বুড়ির একমাত্র কাজ। ঐ গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানায়। আর ঐ ঘুঁটে বেচেই পেট চালায়। একদিন গোবর কুড়োতে কুড়োতে দেখে খগেনকাকাদের বাগানের ভিতর অনেক গোবর নাদা। বুড়ি গোবরের লোভে ভুল করে ঢুকে পড়েছে বাগানে। বাগানে ঢুকেই দেখে চারদিকে অসংখ্য গরু। সাদা, লাল, কালো, খয়েরি, হলুদ ছোপের প্রায় শখানেক গরু। বুড়ি তো জানে না যে ওরা গরু নয়, ভূত। ভূতেরাই গরু সেজে ভয় দেখাতে এসেছে গাছের মগডালগুলো থেকে। অনেক গরু মানে অনেক গোবর।

বুড়ি চলে আসে বাগানের ভিতর। তারপর সবকটা একসঙ্গে এমন বিকট ধরনের হাম্বা হাম্বা রব তুলে শিং উঁচিয়ে বুড়িকে তাড়া করে যে, পালাবে কি সেইখানে মাটিতে আছড়ে অজ্ঞান। পরের দিন জ্ঞান হবার পর পালিয়ে বাঁচে।

স্পষ্ট মনে আছে সেদিন ছিল বেস্পতিবার। স্কুলের ছুটির পর বাড়িতে ফিরে খেয়ে দেয়ে মাকে বলি।

—একটু বেরোচ্ছি।

—কোথায় বেরোচ্ছিস এমন সন্ধ্যের সময়? তার উপর আজ অমিবস্যে।

অন্য কেউ হলে মা যে উদ্বিগ্ন হতেন না এতখানি, সে আমি জানি। অষ্টম গর্ভের সন্তান বলেই এতখানি ভয় ভাবনা। আমি বলি।

—এই যাবো আর আসবো। ও পাড়ার নবোর কাছ থেকে বই নেবো একটা।

আমি যখন বাগানটার কাছাকাছি, তখন ঘুরঘুট্টি হয়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। চুপিচুপি, ভিতরে না ঢুকে, বাগানের সীমান্ত রেখাটা ছুঁয়ে দাঁড়াই। আর সেখানে দাঁড়িয়েই পাঠ করি আমার একটা সদ্য লেখা ছড়া।

ওরে ওরে ওরে ওরে ভূত
শুনে যা আমার আপশোস,
তোরা কেউ মর্গের নোস,
তোরা সব স্বর্গের দূত।

পড়েই চুপ করে থাকি। কি ঘটে দেখার জন্যে। ছড়াটা শেষ হতেই কানে আসে গোটা বাগানের মধ্যে একটা হুটোপাটির শব্দ। যেন হঠাৎ একটা পাগলা ঝড় ঢুকে পড়েছে বাগানে। তারপরেই মাটিতে পাকা তাল পড়ার মতো ধুপধাপ শব্দ। তার মনে ওরা গাছের মগডাল থেকে লাফিয়ে নামছে মাটিতে। কেন নামছে? আমার ঘাড় মটকাবে নাকি? ভয়ে গোটা গায়ে কাঁটা। তবু দাঁড়িয়ে থাকি মনে মনে রাম রাম জপতে জপতে। হঠাৎ দেখি সব চুপচাপ। নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে যেমন থমথমে হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহ। তাহলে কি ওরা আরও ছড়া শুনতে চাইছে আমার কাছে? ঘাড় মটকাতে চাইলে তো এগিয়ে আসতো আমার দিকে। বরফের ছ্যাঁকার মতো বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতো গায়ে। হ্যাঁ, সত্যিই ওরা আমার মুখের ছড়া শোনার জন্যে উন্মুখ। সাহস পেয়ে বাগানের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে আমি আওড়াই দুনম্বর ছড়াটা।

ভূত আমার, ভূতুম আমার ওরে
বন্দী হয়ে আছিস কিসের ঘোরে?
ভূত-ভূতোনি ছেলেমেয়ের দল

মানুষ হতে চাস কি চাসনা বল।

ছড়া শেষ হওয়া মাত্রই তুমুল ঝটপটানির শব্দ। আর সেই সঙ্গে চিনচিনে, মিনমিনে, খিনখিনে, খনখনে, খ্যাসখেসে, ভ্যাসভেসে, খুশখুশে, খট্‌খটে, খিঁটখিঁটে, পিট্‌পিটে, বিড়বিড়ে, ঘ্যাস্‌ঘেসে, ঘড়ঘড়ে এমনি সব নানান স্বরের মিশেলে তৈরি একটা বিটকেল কোরাস।

চাঁই চাঁই লেখাপড়া নামতা
হাঁউ মাঁউ খাঁউ নেহি মাংতা।

বলে কি সব? এরা মানে ভূতের এইসব কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েরা চাইছে লেখাপড়া শিখতে? সাহস পেয়ে আওড়াই তিন নম্বর ছড়াটা।

কেন তোদের মানুষ-খেকো ভাবে?
দুর্নামটা মুছে ফেলতো শিগ্রি।
ইচ্ছে থাকলে কালে এসে যাবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ডিগ্রি।

তারপরে যা ঘটল, তা লিখে বোঝাবার মতো ক্ষমতা থাকলে আমিও হয়ে যেতাম আরেকজন সাহিত্যসম্রাট। আমাকে ঘিরে জুড়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের তাতা থৈ থৈ নাচ আর গান। গানে অবশ্য সুর নেই তেমন। বড্ড কাঠখোট্টাই। গানটা গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী সঙ্গীতের মতই অনেকটা।

মোরাঁ শিঁখবো মোরাঁ লিখবো
মোরা বিদ্যাসাগর ডিগবো।
মোরা ছাড়বো হকড়ি মিকড়ি
মোরা ইউনিভাস্যে ইগবো।

শোনার সময় সব কথার মানে বুঝতে পারিনি। পরে, ওদের সঙ্গে জম্পেশ আলাপ জমে যাওয়ার পর জেনেছিলাম কি বলতে চেয়েছিল আসলে। বিদ্যাসাগর ডিগবো মানে, বিদ্যার সাগরকে ডিঙোবো আর ইউনিভাস্যে ইগবো মানে ইউনিভার্সের দিকে এগোবো আমতলা, জামতলা, তেঁতুলতলা ছেড়ে।

৫

এসব ঘটনার ক'মাস পরেই বেরোল ক্লাস সেভেনের পরীক্ষার ফলাফল। আমি কি হয়েছিল শুনলে অবিশ্বাসে চোখ দুটো যে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোঠর থেকে, সে আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি। অঙ্কে আর সংস্কৃতে কোনমতে পাস। বাকি সব বিষয়ে হায়েস্ট মার্কস। স্যারেরা অবাক। সহপাঠীদের চোখ ছানাবড়া। বাবা খবর শুনে থ। মা বোবা। দাদারা দিশেহারা। একমাত্র

ছোট পিসিমার মুখেই খই ফোটা।

—হবে না? ও হল অষ্টম গর্ভের সন্তান। এই তো শুরু। আমার সাত রাজার ধন এক মানিক তিল্লু তিল তিল করে আরো কত কী করে বসবে সে আমি মনশ্চক্ষে সব দেখতে পাচ্ছি। উ ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারবেনি তোমরা। ও হল রাজা দশরথের দিগ্বিজয়ের ঘোড়া। এগোতে এগোতে ও আর এগোনো থামাতে পারবে না। ভবিষ্যতে আমি যখন থাকবো না, তখন মিলিয়ে দেখে নিও আমার কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে।

হতবুদ্ধি হয়ে ইতিহাসের স্যার জানতে চাইলেন।

—মার্কো, আমার হাতে আজ পর্যন্ত কেউ আশি পায়নি। তুই কি করে নব্বই পেয়ে গেলি বলতো? কবে এত পড়লি তুই?

বাংলার স্যার-এর দুই ভুরুতে গোঁফের মতো ঘন চুল। আমার দিকে তাকিয়ে সেই গোঁফওয়ালা ভুরু দুটো একাদশীর চাঁদের মতো বেঁকে উঠে গেছে কপালে।

—আচ্ছা মান্ডে, একটা কথার জবাব দে তো। ধরে নিলাম, খুব মন দিয়ে পড়েছিস। তাই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিস সব প্রশ্নের। কিন্তু শুদ্ধ বানানগুলো লিখলি কি করে? তোর তো রস্যোউ দীর্ঘোউ-এর জ্ঞান নেই। অন্তত কমাস আগেও ছিল না। তাহলে.....

ভূগোলের স্যারের ইয়া ভুঁড়ি। অচেনা কেউ দূর থেকে দেখলে ভাববে পেটের মধ্যে ইস্কুলের গ্লোবটা লুকোনো। কথা বলতে গেলে হাঁপিয়ে যান। তোতলামি এসে যায়। তাঁরও ঐ ধরনের প্রশ্ন—

—হ্যাঁরে মার্কা, তু-তুই উরু-উরু-উরু গুয়ের ব্রি-ব্রি বিষ্টিপাতের পরিমাণটা পোর-পোর-পোরয্যান্ত জা-জা-জানলি কি-ই করে ব-ব বল্‌তো?

সব চেয়ে খুশি হয়েছিলেন ইংরেজির স্যার। বুঝলি মার্কণ্ডেয়, তুই যা মার্কস পেয়েছিস ইংরেজিতে, এটা অলমোস্ট ওয়াল্ড রেকর্ড ব্রেক করা। জার্মানির কাল মার্কসও এত মার্কস পাননি কোনোদিন ইংরেজিতে। আজ থেকে তোকে আমি আর মার্কণ্ডেয় না বলে মার্কস বলেই ডাকবো।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? ডাকনামটা কীভাবে বাড়ির লোকজনের মুখে মুখে পালটে গেছে সে তো আগেই শুনেছেন আপনারা। ভালো নামটাও পাল্টে কত রকম হয়ে যাচ্ছে সেটাও শুনে নিন নিজেদের কানে। তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন বলেছি যে আমার মত বহু-নামী কেউ পৃথিবীতে জন্মায়নি কখনো।

এবার আসল ব্যাপারটা ফাঁস করি।

নিশ্চয় আপনাদের মনেও প্রশ্ন জেগেছে, পরীক্ষায় এমন অভূতপূর্ব রেজাল্ট

করলাম কি করে। এর একটাই উত্তর। পূর্বকথিত ভূতেদের দয়ায়।

ঐ যে ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, ছড়া শোনাই আর ওদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেয় উতলা হয়ে ওঠে, সেইদিনই যখন ফিরে আসতে চাইছি, কিছুতেই ছাড়বে না। কিছু খেয়ে যেতে হবে। এই বলে রাশিকৃত, ঝুড়ি ঝুড়ি, আম, আতা, আনারস এমনকি আমসত্ত্ব পর্যন্ত এনে জড়ো করতে লাগল আমার সামনে। ওদের উদার আতিথেয়তার বহর দেখে যখন বুঝে গেলাম যে, এরা আমাকে ওদের মাই ডিয়ার বুজুম ফ্রেণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে তখনই সাহস করে বলেছিলাম।

—এ সব ফল চাই না। চাই অন্য ফল।

—কি ফঁল বঁলুন। সেই ফঁলই পেঁড়ে দিচ্ছি। নাঁসপাতি? বেঁদানা? জলপাঁই? টোঁকোঁকুল? কাঁলো জাঁম?

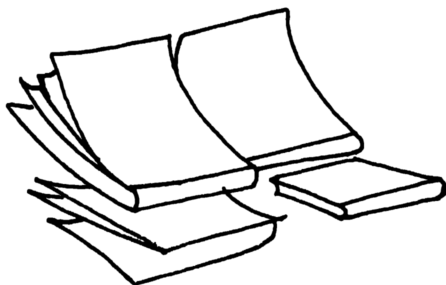
—না না। আমি চাই ফলাফল। যাকে ইংরেজিতে বলে রেজাল্ট। পরীক্ষার ফলাফল।

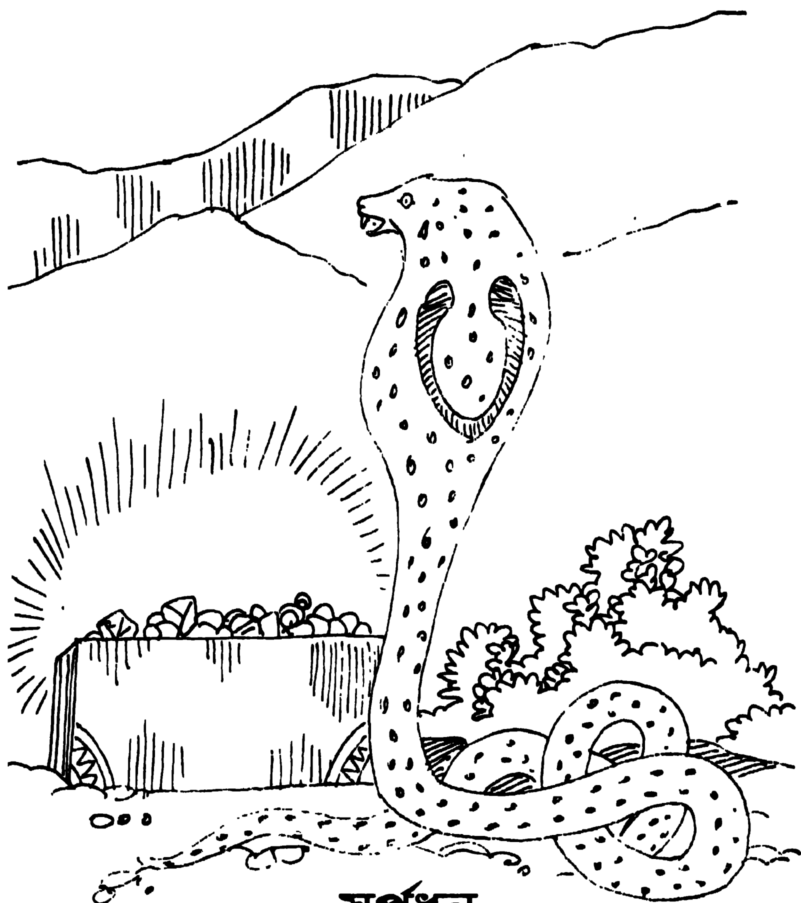
প্রথমে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। আমি বুঝিয়ে দি। শুনে ওরা বলে।

দোঁন্তরি, দোঁন্তরি। উঁইল ম্যাঁতারসিঁ।

মানে ডোন্ট ওরি। উই উইল সি দা ম্যাটার।

সত্যিই সত্যিই কথা রেখেছিল ওরা। পরীক্ষার পনেরো দিন আগেই অঙ্ক আর সংস্কৃত ছাড়া আর সব কোশ্চেন পেপার আমার মুঠোয়। অঙ্ক আর সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র ছাপা হয়ে পৌঁছেছিল পরীক্ষার আগের দিন। তাই....





সর্পধন

সঙ্কর্ষণ রায়

পাহাড়ের হাড়-পাঁজরের আড়ালে

আমার তাঁবুর সামনেই পাহাড়। পাহাড়টি একেবারে নেড়া। তার ওপরে গাছপালা নেই, এক দানা ঘাসও গজায় নি। মাটির কোন আবরণ পড়েনি বলেই গাছপালা বা ঘাস জন্মাতে পারে নি। পাথরের হাড়-পাঁজর সব বেরিয়ে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের কঙ্কাল।

আমার কাজ পাথর পরীক্ষা। পাহাড়টি কঙ্কাল-সর্বস্ব হওয়াতে আমার কাজের

সুবিধে হয়েছে, পাহাড়ের পাথরগুলো আমার নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে। খুবই সাধারণ পাথর। কোয়ার্টজাইট এবং কোয়ার্টজাইটকে বিদীর্ণ করা কোয়ার্টজ এবং পেগমেটাইটের শিরা উপশিরা। এদের দেখি, এদের প্রসার ও গঠন বোঝার চেষ্টা করি, কারণ এদের আড়ালে মণিরত্ন খুঁজে পাবার আশা রাখি। আমার পূর্ববর্তী ভূবিজ্ঞানীরা এখানে পোখরাজ, গোমেদ,জামিরা, বৈদুর্য, স্ফটিক, ওপাল প্রভৃতি বিবিধ রতনের খোঁজ পেয়েছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট অনুসরণ করে আমিও খুঁজে বেড়াই।

পাথর পরীক্ষা করতে করতে পাহাড়ের মাথার ওপরে এসে দাঁড়ালাম একদিন। আমি উত্তর দিক থেকে উঠে এসেছি, উত্তর দিকে আমার ক্যাম্প। আমার ক্যাম্প থেকে কিছুদূরে জামালপুর রেলস্টেশন। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণের উপত্যকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ে কোন গাছপালা না থাকলেও উপত্যকাটি বনে আচ্ছন্ন। উপত্যকার বন আমার মনকে টানে। বনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল যে সব মণিরত্ন আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের চেয়ে অনেক বেশী দামী এই বনের গাছপালা। দুরবীনের মধ্য দিয়ে বনের মধ্যে রকমারি গাছের সমাবেশ দেখতে পাই।

গাছপালা দেখতে দেখতে একটা বাগান নজরে এল। ফুলের বাগান, মাঝখানে ঝিল, ঝিলের ধারে সাদা-বাড়ি। বনের মাঝখানে এই বাগানবাড়ি দেখে বুঝতে পারি যে এ বাড়ি যিনি তৈরি করেছেন তিনি নির্জন বনবাস পছন্দ করেন। কে তিনি আমার এই প্রশ্নের জবাবে আমার গাইড্ বিদ্যাধর ঝা বললে, মুঙ্গের শহরের মস্ত বড়লোক রাঘবেন্দ্র সিং। এককালে মণিরত্নের কারবারী ছিলেন, কারবার বন্ধ করে এখন ওখানে থাকেন। লোকজনের সঙ্গ বিশেষ পছন্দ করেন না। দয়া করে ওঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না, কারণ দেখা না করে উনি কুকুর লেলিয়ে দেবেন।

বল কি! আমি চমকে উঠি।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ করে পাহাড় থেকে নেমে আমার তাঁবুর মধ্যে বসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় বিদ্যাধর এসে বললে, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার। রাঘবেন্দ্র সিংয়ের ছেলে ও মেয়ে সুজিত ও সুচেতা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়!

কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার মধ্যে সর্বনাশের কি আছে? আমি বললাম।

আর কেউ হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু রাঘবেন্দ্র সিংয়ের ছেলে ও মেয়ে....

বিদ্যাধরের কথা শেষ হওয়ার আগেই সুজিত ও সুচেতা বললে, আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করি তা বোধ হয় এই লোকটি চায় না! সে যাই হোক, এসে যখন পড়েছি, তখন তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না আমাদের।

সুজিত ও সুচেতা দুজনকেই দেখামাত্র ভাল লেগে যায় আমার। এমন স্বাস্থ্য ও রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। দুজনেরই গায়ের রং ফর্সা, চোখ টানা টানা, মুখে আভিজাত্যের ছাপ আছে। সুজিতের বয়স বাইশ তেইশ হবে, সুচেতার বোধ হয় কুড়িও পেরোয়নি।

আমার সঙ্গে তোমাদের কি দরকার? আমি প্রশ্ন করি।

দরকার আমাদের নয়। আমাদের বাবার। তিনি অবিলম্বে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরি।

সুজিত ও সুচেতা প্রায় সমস্বরে কথাগুলি বললো।

আমি আবাক হয়ে ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের বাবার আমার সঙ্গে কোন রকম দরকার থাকার তো কথা নয়। আমার মত জিয়োলজিষ্ট তো তিনি নন.....

আপনার মত জিয়োলজিস্ট না হলেও আমি জুয়েলজিস্ট। মৃদু হেসে রাঘবেন্দ্র সিং বললেন। পাহাড়ের ওপর থেকে বাগানের মধ্যে যে সাদা বাড়ি দেখেছি, তার বাইরের একটি ঘরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। মাঝবয়সী বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। সুপুরুষ হলেও সু-মুখ নন, কারণ মুখে-তাঁর অজস্র কাটা দাগ, দেখে মনে হয় যেন তিনি কারুর সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে ডুয়েল লড়েছেন।

জুয়েলস্ মানে মণিরত্ন নিয়ে আমার কারবার। রাঘবেন্দ্র বলে চলেন। যে পাহাড়ে আপনি আপনার ভূবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই পাহাড়ে আমি মণিরত্নের খোঁজে গিয়েছিলাম...

মণিরত্নের খোঁজে গিয়েছিলেন! আমার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। খুঁজে পেয়েছিলেন কিছু?

অনেক কিছুই পেয়েছিলাম। মনের মত সব মণিরত্ন।

কই আমি তো পাচ্ছি না। দিনের পর দিন খুঁজে যাচ্ছি, পাথর পরীক্ষা করছি, কিন্তু সাধারণ পাথরের আড়ালে এক টুকরো স্ফটিকও (স্বচ্ছ কোয়ার্টজের দাগ) দেখতে পাচ্ছি না।

সাধারণ পাথরের আড়ালেই আছে অসাধারণ পাথরগুলি। ঠিক জায়গায় সাধারণ পাথরের মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করলেই তাদের পাওয়া যাবে।

ঠিক জায়গা মানে? আমি ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করি। কোথায় সেই ঠিক জায়গা?

উত্তরে একটু কেবল হাসলেন রাঘবেন্দ্র।

খানিকক্ষণ বাদে রাঘবেন্দ্র বললেন, ঠিক জায়গার হদিস নেওয়ার-চেষ্টা না হয় পরে করবেন, আগে জেনে নিন পাহাড়ের পাথুরে হাড়পাঁজর কি সব অমূল্য মণিরত্ন চাপা দিয়ে রেখেছে।

পর পর অনেকগুলো মণিরত্নের কথা বললেন রাঘবেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পাথরের দ্রব্যগুণ সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস এবং তাকে নিয়ে যে সব কিংবদন্তী চলে আসছে তাদের কথাও বললেন।

যে সব মণিরত্ন ঐ পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে তারা হল পোখরাজ, গোমেদ, সৌগন্ধিক, তামড়ি, পীলু, চন্দ্রকান্ত, বৈদুর্য, স্ফটিক, জাবীরা ও ওপাল।

প্রাচীন কালের মানুষ পোখরাজকে পাথরে জমাট বাঁধা আগুন বলে মনে করত, আর গোমেদকে মনে করত হীরার সমগোত্রীয়। চীনদেশের মানুষদের বিশেষ প্রিয় পাথর পীলু বা জেড্। তারা বিশ্বাস করত জেড্-এর মধ্যে সব রকম রত্নের গুণ আছে এবং মানুষের সদ্‌বৃত্তিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। চন্দ্রকান্ত মণির সমাদর করতেন হিন্দু মুনি-ঋষিরা। তাঁরা মনে করতেন যে চাঁদের কিরণে চন্দ্রকান্তমণি থেকে জল ঝরে। বৈদুর্যমণি এক আশ্চর্য পাথর। বেড়ালের চোখের মত দেখতে। বিশ্বময় তার সমাদর। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মত দেখতে। স্ফটিকের গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ বরফ। স্ফটিকে ম্যাঙ্গানিজ, টাইটেনিয়াম বা লোহার সংমিশ্রণ ঘটলে তার রং বেগুনী হয়ে ওঠে। বেগুনী রঙের স্ফটিককে বলে জামীরা বা অ্যামিথিস্ট। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে অ্যামিথিস্ট ধারণ করলে ঘোরতর মদ্যপও মাতাল হয় ন। ওপালও একটি সুন্দর পাথর। মুক্তার মত তার জৌলুস। লালচে হলুদ রঙের ওপালকে বলা হয় আগুনে ওপাল। নেপোলিয়ন বোনেপার্টের স্ত্রী জোসেফিনের আংটিতে একটি বড় আকারের আগুনে ওপাল ছিল, তাকে বলা হত জলন্ত ট্রয়। তাতে আগুনের শিখার মত লাল রঙের নকশা আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ওপাল পরতে ভালবাসতেন। যাদের অক্টোবর মাসে জন্ম ওপাল নাকি তাদের কপাল ফিরিয়েছে।

এই সব পাথর হীরা, চূণী বা পান্নার মত দামী নয় বলে এদের উপরত্ন বলে। উপরত্ন শব্দটি অবশ্য রাঘবেন্দ্রের পছন্দ নয়। কারণ হীরা চূণী পান্নার চেয়ে এসব পাথরের ওপরেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব বেশি। তিনি মনে করেন যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই মনের মত বলে এসব পাথরকে মণিরত্নের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

রাঘবেন্দ্রের সুদীর্ঘ ভাষণ শেষ হলে পর আমি বললাম, এই সব পাথর

আমারও মনের মত। কিন্তু ঐ পাহাড়ে কোন কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে জানতে পারলে ভাল হত।

জানতে পারলে আমিও খুশি হতাম, রাঘবেন্দ্র বললেন, কিন্তু যে জানত সে বেঁচে নেই। সে ছিল স্থানীয় একজন আদিবাসী। নাম তার ভিষণ শেখ। সে ঐ পাহাড় ভেঙে এই সব মণিরত্ন খুঁজে এনে দিত আমাকে। নগদ দাম দিয়ে আমি পাথরগুলো কিনে নিতাম। একটি বাক্সের মধ্যে তাদের জমিয়ে রাখছিলাম। ভেবেছিলাম বাক্সটি ভরে গেলে পর পাথরগুলো গুজরাটের সুরাটে পাঠিয়ে পালিশ করিয়ে আনব। কিন্তু সে আর হল না। বাক্সটি ভরে যাওয়ার আগেই একদিন সাপের কামড়ে ভিষণ মারা গেল....

মণিরত্নের পাহারাদার

ভিষণ শেখ মারা গিয়েছিল শঙ্খচূড় সাপের কামড়ে। ঐ পাহাড়ের একটি গর্ত থেকে সাপটি বেরিয়ে এসে ভিষণকে আক্রমণ করেছিল। রাঘবেন্দ্রর ভাই বিজয়েন্দ্রর চোখের সামনেই ঘটেছিল এই ঘটনা।

রাঘবেন্দ্রের মত বিজয়েন্দ্ররও মণিরত্নের কারবার ছিল। ভিষণের মৃত্যুর পর তিনি রাঘবেন্দ্রর কাছে এসে বললেন যে ভিষণ ঐ শঙ্খচূড় সাপের গর্ত থেকে পাথরগুলো তুলে আনছিল। সাপটির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পর পর কয়েকদিন পাথরগুলো নির্বিঘ্নে তুলে আনতে পারলেও শেষের সেদিন সাপটির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং তার ছোবল খেয়ে মারা পড়েছিল। বিজয়েন্দ্রর আশঙ্কা, সাপটি তার গর্ত থেকে চুরি যাওয়া পাথরগুলোর গন্ধ অনুসরণ করে রাখবেন্দ্রর বাড়ির অন্তঃপুরে গিয়ে হাজির হতে পারে। অতএব পাথরগুলোকে সাপটির গর্তে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

কি যে বলছ তুমি তার ঠিক নেই! রাঘবেন্দ্র বলেছিলেন, পাথরগুলোর কোন গন্ধ নেই, সাপের নেই গন্ধবোধ। কাজেই গন্ধ অনুসরণ করে ঐ সাপটির আমার শোবার ঘরে এসে পৌঁছানো অসম্ভব ব্যাপার।...

কিন্তু এই অসম্ভবই সম্ভব হল, সেদিন রাত্রে শঙ্খচূড় সাপটি রাঘবেন্দ্রর শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকল। রাঘবেন্দ্র তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। সাপটি ফণা তুলে দাঁড়াতেই তাঁর ঘুম ভাঙল। সাপটি তাঁর ওপরে ছোবল মারতে উদ্যত হতেই তাঁর কুকুর দুটি তেড়ে গিয়ে সাপটিকে বের করে দেয় বাড়ির বাইরে।

ঐ পাথরগুলির মালিক তা হলে ঐ শঙ্খচূড় সাপ! আমি বললাম, রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শুনে মনে হচ্ছে যেন রূপকথার গল্প।

মালিক নয়, পাহারাদার। রাঘবেন্দ্র বললেন, পাথরগুলি কেউ ঐ সাপের গর্তে রেখেছিল। সম্ভবতঃ ভিষণ শেখই রেখেছিল। সে-ই ওখান থেকে রোজ পাঁচ ছটা করে পাথর তুলে নিয়ে এসে দিচ্ছিল আমাকে। তার পেশা ছিল সাপ খেলানো, পাথর-সংগ্রহ নেশা। ঐ শঙ্খচূড় সাপটি হয়তো তারই পোষা। তাকে পাহাড়ের একটি গহ্বরে রেখে সে পাহাড় থেকে খুঁড়ে বের করা পাথরগুলো ওখানে লুকিয়ে জমিয়ে রাখছিল....

ভিষণ শেখের পোষা হবে তো তাকেই ছোবল মেরে, মেরে ফেলল কেন?

আর কেউ হয়তো তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তার দিকে তেড়ে গিয়ে তাকে মারতে গিয়ে হয়তো ভিষণকে মেরেছিল।

পাথরগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সাপটির আপনার ঘরে ঢোকার ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য নয় কি সিংজী?

আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমি কি করে অবিশ্বাস করি বলুন? সাপটি সত্যিই ঢুকেছিল আমার ঘরে এবং যে বাক্সেব মধ্যে পাথরগুলি ছিল। আমার অ্যালসেশিয়ন কুকুরদুটির তাড়া খেয়ে বেরোবার সময় সেই বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল...

বলেন কি! আমার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

ঠিকই বলছি। রাঘবেন্দ্র বললেন। সাপটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দেখলাম, বাক্সটি নেই। বাক্সটি আমার বালিশের তলায় চাপা ছিল, কি করে সাপটা ওটাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বলতে পারব না। আমার মনে হচ্ছে খানিকক্ষণের জন্য আমি হিপ্নোটাইজড্ হয়ে পড়েছিলাম।

কে আপনাকে হিপ্নোটাইজ করেছিল? ঐ সাপটা?

ঐ সাপটাই তো আমার ঘরে ঢুকেছিল, কাজেই.....

মুখোশধারী

শঙ্খচূড় সাপটিকে অনুসরণ করে রাঘবেন্দ্রর অ্যালসেশিয়ান কুকুরদুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রাঘবেন্দ্র তাঁর বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বালিশের তলায় পাথরের বাক্সটি না থাকায় তিনি ধরে নিলেন যে সাপটাই বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাক্সটি উদ্ধার করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু দরজার কাছে এসেই বাধা পেলেন। দরজার সামনে হঠাৎ এসে

দাঁড়াল একজন মুখোশধারী মানুষ। সে যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। রাঘবেন্দ্রর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি ছোরা চালাতে থাকে। তাঁর সর্বাঙ্গ এবং মুখ আজও সেই আক্রমণের চিহ্ন বহন করছে।

তাঁর আর্তনাদ শুনে তাঁর কুকুর দুটি ফিরে এসে মুখোশধারীকে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সে রাঘবেন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং কুকুর দুটির তাড়া খেয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে থাকে। পেরিয়ে যায় বাগান, ঢুকে পড়ে বনের মধ্যে। বনের মধ্যে চিহোড়লতার ঝোপের মধ্যে একটি গহ্বর ছিল। দিন কয়েক আগে এখানে ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের ফলে এই গহ্বরের সৃষ্টি। কুকুর দুটির তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে গিয়ে এই গহ্বরের মধ্যে পড়ে যায় মুখোশধারী।

মুখোশধারী গহ্বরের মধ্যে পড়ামাত্র তার চার দেয়াল থেকে ধস নামে এবং জীবন্ত সমাধি ঘটে মুখোশধারীর। অনেক চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে পারেন নি রাঘবেন্দ্র।

মুখোশধারীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে গহ্বরের কাছাকাছি শঙ্খচূড় সাপটির মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন রাঘবেন্দ্র। প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা সাপটি অ্যালসেশিয়ান কুকুরদুটির আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু বাক্সটি নেই। সাপটি যদি বাক্সটি বয়ে নিয়ে এসে থাকে, তা তার মৃতদেহের কাছাকাছি পড়ে থাকা উচিত। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না।

খুঁজে পাবেন কি করে! আমি বললাম। যত বড় আকারের ফণাওয়ালা সাপ হোক না কেন, তার পক্ষে একটি বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?

এক্ষেত্রে সম্ভব বলেই মেনে নিতে হবে। রাঘবেন্দ্র জবাব দিলেন। কারণ সাপটি আমার মাথার কাছেই ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আমার কুকুরদুটির তাড়া খেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দেখলাম যে আমার বালিশের তলায় বাক্সটি নেই। সাপটি বেরিয়ে যাওয়ার পরই সেই মুখোশধারী মানুষটি আমার ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল...

তাঁর মানে বাক্সটি মুখোশধারী মানুষটির হস্তগত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক বলেছেন। আশা করি এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে এক্ষেত্রে অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে, ঐ সাপটিই বাক্সটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন, সে মারা পড়ার পর বাক্সটি কোথায় গেল? সাপ এবং ঐ মুখোশধারী মানুষটি মারা পড়ার পরই আমি বনের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি.....

আর কেউ হয়তো বাক্সটি নিয়ে পালিয়েছিল।

অসম্ভব। আমার এবং আমার কুকুর দুটির চোখে ধুলো দিয়ে ওর ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আমার ধারণা বাক্সটি ওখানেই আছে কোথাও। আমার অনুরোধ, আপনি ওটাকে খুঁজে বের করুন।

হলুদ ফুল সাদা ফুল

বাক্সটা কিসের তৈরি ? আমি প্রশ্ন করি।

রুপোর। রাঘবেন্দ্রর উত্তর। ভিষন শেখ পাহাড় থেকে এই সব পাথর আনা শুরু করতেই আমি আমার কারিগরদের দিয়ে বাক্সটা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম।

রাঘবেন্দ্রর বাগান পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকি। ঘন বন। রকমারি গাছের সঙ্গে আছে আগাছা। গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। পথ নেই। অনেক কষ্টে লতাঝোপ ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাই। আমার সঙ্গে আছেন রাঘবেন্দ্র।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। রাঘবেন্দ্র বললেন, মনে হচ্ছে কে একজন সামনের ঐ লতাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

বনের জন্তু জানোয়ার নয়তো ! আমি বললাম।

না। মানুষের গন্ধ পাচ্ছি। আমার কুকুর দুটোকে নিয়ে আসা উচিত ছিল...

কই, গাছগাছড়ার গন্ধ ছাড়া অন্যকোন গন্ধ তো নাকে আসছে না আমার।

আমার নাকে আসছে। সেদিন আমার শোবার ঘরের দোরগোড়ায় মুখোশধারীর মুখোমুখী হয়ে যে গন্ধ পেয়েছিলাম, সেই গন্ধ আমার নাকে আসছে। মুখোশধারী তো ধস চাপা পড়ে মরেছে। সে তার কবর থেকে উঠে এসেছে নাকি।

বলতে বলতে রাঘবেন্দ্রর গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

এগিয়ে চলুন। আমি বললাম।স্বচক্ষে দেখুন কে আছে ওখানে....

বলে রাঘবেন্দ্রর পাশ কাটিয়ে আমি এগিয়ে যাই। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে অগত্যা রাঘবেন্দ্র আমাকে অনুসরণ করেন।

ঘন চিহোড়লতার ঝোপ ঠেলে আমরা এগিয়ে যেতেই একজন মানুষকে দেখতে পেলাম। কাঁধে ঝোলা, হাঁটু পর্যন্ত ট্রাউজার গোটানো, ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। আমাদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে পালালো।

বিজয়। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন রাঘবেন্দ্র। আমার ভাই বিজয়েন্দ্র। কিন্তু কি করছে সে এখানে।

আমরা যা করছি তা-ই হয়তো করছেন। আমি বললাম। হয়তো আপনার

সেই মণিরত্নের বাক্সটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

কি দেখছিল সে এখানে ওরকম ঝুঁকে পড়ে'?

আসুন আমরাও দেখার চেষ্টা করি। শঙ্খচূড় সাপটির মৃতদেহ কি এখানে পড়েছিল'?

হ্যাঁ এখানেই, ঐ বন হলুদের গাছটির পাশে। আর ঐ যে নিচু জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই ধসে চাপা পড়েছিল মুখোশধারী....

সেই মুখোশধারীর গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলেন না। এখনো কি পাচ্ছেন'?

না তো। নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে রাঘবেন্দ্রর মুখ। বিজয় এখান থেকে চলে যেতেই সেই গন্ধটিও মিলিয়ে গিয়েছে।

তা হলে কি আপনার ভাই বিজয়েন্দ্রই সেই মুখোশধারী'? আমি প্রশ্ন করি।

সে কি করে হবে! মুখোশধারী তো ধসে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে!

আসুন রাঘবেন্দ্রবাবু, যেখানে ধস নেমেছিল সেখানেই যাই।

সেখানেই তো আছি আমরা। সামনের ঐ নিচু জায়গাটিতে বড় একটা গহ্বর ছিল। মুখোশধারী সেখানে পড়ে যেতেই ধস নামে, দেখতে দেখতে গহ্বরটি পুরোপুরি মাটিতে চাপা পড়ে যায়। আমার চোখের সামনেই এসব ঘটেছিল। গহ্বরের মধ্যে মাটির তলায় চাপা পড়া মুখোশধারীকে অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি।

আমার কি মনে হচ্ছে জানেন'? একটু ইতস্ততঃ করে আমি বললাম। আমার মনে হচ্ছে মুখোশধারীর সঙ্গে সেদিন রাত্রে আপনার ভাই বিজয়েন্দ্রও এসেছিলেন...

না, না এ হতে পারে না! আর্তস্বরে বলে উঠলেন রাঘবেন্দ্র। আমার ছোট ভাই, আমিই ওকে মানুষ করেছি...।

গহ্বর ও ধসের কোন চিহ্ন নেই, নিচু জমির ওপরে ঘন ঘাসের আচ্ছাদন পড়েছে। রাঘবেন্দ্র বললেন যে এই ঘাসের আচ্ছাদন দিয়েই জায়গাটিকে চেনা যায়। দেখে মনে হয় যেন পুরু একটি সবুজ রঙের গালিচা পাতা হয়েছে।

এখন ঘাস আর কোথাও নেই। এখানকার মাটির অতিরিক্ত উর্বরতাই ঘাসের এই পুরু আবরণকে সম্ভব করেছে। উর্বরতার উৎস বোধহয় মুখোশধারীর মৃতদেহ। দেহ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিকে উর্বর করে মাটির উপরে পুরু ঘাস সৃষ্টি করেছে।

এ অঞ্চলে ঘাসের মত ছোট ছোট রঙের ফুল ফুটে থাকে। কিন্তু ঘাসেব গালিচার ওপরে ফুলের রং বদলে উজ্বল সাদা হয়ে গিয়েছে।

কেন এখানে ঘাসফুলের রং বদলেছে'? কেন এই উজ্জ্বল সাদা রং'?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, রাঘবেন্দ্রও জানেন না।

ঘাসফুলের রঙ বদলানো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলুন! রাঘবেন্দ্র বললেন। যেখানে মুখোশধারী ধসে চাপা পড়েছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে ঘাসফুলের এই অদ্ভুত রং। সেখানে তো আর ঐ বাক্সটি নেই! বাক্সটি বনের মধ্যে কোথায় পড়ে আছে কে জানে। ঘাস ফুল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাক্সটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন...

পরদিন খুব সকালে একাই ঢুকলাম ঐ বনের মধ্যে। চিহোড়লতার ঝোপ পেরিয়ে সেই ঘাসে ছাওয়া নিচু জায়গাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বিজয়েন্দ্রর মুখোমুখি হলাম।

আমাকে দেখে বিন্দুমাত্রও ঘাবড়ে গেলেন না বিজয়েন্দ্র, পালাবারও চেষ্টা করলেন না। মৃদু হেসে তিনি বললেন, আজ আপনি একা এসেছেন, দাদা আপনার সঙ্গে নেই, কাজেই আমার পালিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই। আশা করি দাদার সঙ্গে আলাপ করে আপনি বুঝতে পেরেছেন, তিনি আমাকে তাঁর শত্রু বলে বিবেচনা করছেন...

তাতে তাঁর দোষ কি বলুন! আমি বললাম।সেদিন রাত্রে শঙ্খচূড় সাপ ও মুখোশধারীর সঙ্গে আপনিও তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন...

মুখোশধারীর আক্রমণ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য ঢুকতে বাধ্য হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর কুকুরদুটোই তাঁকে বাঁচাল।তাঁর প্রাণরক্ষা হলেও মুখোশধারী মারা পড়েছেন।

এখন এখানে আপনি কি করছেন?

আপনার মত আমিও হারানো রত্নপেটিকার সন্ধান নিচ্ছি।

যা আপনার নয় তাকে খুঁজে বের করে আত্মসাৎ করতে চান, তাই না?

না। যা আমার জিনিস তাকেই আমি ফিরে পেতে চাই। আমার কথা শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন, তাই না? পাথরগুলো আমার, কারণ ঐ পাহাড় লিজ্ নিয়ে আমি নিয়মিত খনন চালিয়ে অনেক রকম মণিরত্ন খুঁজে বের করেছিলাম। ভিষণ শেখ ওগুলো চুরি করে সাপের গর্তে রেখেছিল এবং একে একে আমার দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করেছিল। বাইবেলে পাপের বেতন মৃত্যু বলে একটা কথা আছে না, ভিষন তা-ই পেল, ঐ সাপের কামড়েই সে মারা পড়ল। পাথরগুলোকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমি ঐ মুখোশধারীকে নিযুক্ত করেছিলাম। পেশায় ভিষনের মত সে-ও একজন সাপুড়ে, আমার খনিতে কাজ করত। সে এবং তার মত অনেকে তাদের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ঐ পাহাড় থেকে রকমারি মণিরত্ন খুঁজে বের করে

খনিটাকে নিজেদের খনি বলে ভাবতে শুরু করেছিল। কাজেই তাদের আহরণ করা মণিরত্নের অপহরণ তারা সইতে পারেনি, এই ব্যাপারে আমার দাদাকে মূল অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে ঐ মুখোশধারী তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিল.....

এখন বলুন, রত্নপেটিকাটির খোঁজ এখানে কোথায় নিচ্ছেন আপনি? শঙ্খচূড় সাপটির মৃতদেহের আশেপাশে তন্ত তন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান মেলে নি...

মিলবেও না। কারণ সাপের পক্ষে রত্নপেটিকাটিকে বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। অতএব ধরে নিতে হয় যে বাক্সটি ঐ মুখোশধারী দাদার বালিশের তলা থেকে বের করে নিয়েছিল। সাপটিকে নিয়ে সেই ঢুকেছিল দাদার শোবার ঘরে। সাপটি ফণা তুলে দাঁড়াতেই দাদা সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বাক্সটি সে হস্তগত করেছিল। আপনাকে আগেই বলেছি যে ঐ কাজ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছিল। আমি যদি জানতাম যে এ জাতীয় অপকর্ম সে করতে চলেছে, অবশ্যই তাকে বাধা দিতাম, তাকে ও তার সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিতাম যে একজোড়া হিংস্র অ্যালসেশিয়ান সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেও কুকুর দুটি তাঁকে পাহারা দেয়।

চিহোড়লতার বেষ্টনীর মধ্যে নিচু জমিতে ঘাসের ওপরে ফুটে থাকা সাদা ফুলের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, বাক্সটি তা হলে এখানেই মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে?

হ্যাঁ বিজয়েন্দ্র জবাব দিলেন। বাক্সটি তার হাতে ছিল, দাদার কুকুরদুটি তাকে তাড়া করার পরও তার হাত থেকে তা পড়ে যায় নি। অতএব বাক্সসুদ্ধ সে গহ্বরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। তারপর ধস নেমে ঐ বাক্সসুদ্ধই তাকে চাপা দিয়েছিল। বাক্সটি যে এখানে মাটির তলাতেই চাপা আছে তার প্রমাণ সম্প্রতি ফুটে উঠেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন...

কি দেখব? আমি প্রশ্ন করি।

ওখানে ফুটে ওঠা ঘাসফুল দেখুন। হলুদরঙের ঘাসফুল ওখানে কি রকম সাদা হয়ে উঠেছে দেখেছেন!

হ্যাঁ দেখেছি। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। আজও তাই দেখতে এসেছি। ফুলের হলুদ রং এখানে সাদা হয়ে গেল কি করে ভাবছি।

মাটির মধ্যে রুপো এসে মিশেছে, পরিমানে নগণ্য হলেও এই রুপো ফুলের হলুদ রংকে সাদা করে দিয়েছে।

বলেন কি!

ঠিকই বলেছি। আমার কোন ডিগ্রী না থাকলেও ভূবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। মাটির মধ্যে ধাতু এসে মিশলে গাছপালার ওপরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে, ফুলের রং বদলায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানকার মাটির মধ্যে রূপো এল কোথা থেকে? এর উত্তর আমার দাদার রূপোর বাক্স। রাসায়নিক অবক্ষয়ের ফলে রূপোর বাক্স থেকে রূপো বেরিয়ে এসে মাটিতে মিশেছে, সেই রূপো ঘাসফুলের রং বদলে দিয়েছে।

এমন সময় হাজির হলেন রাঘবেন্দ্র। বিজয়েন্দ্রর মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, তুমি!

হ্যাঁ আমি। বিজয়েন্দ্র বললেন। রায়সাহেবকে তাঁর খোঁজাখুঁজিতে সাহায্য করছিলাম। তোমার রুপোর বাক্সটি কোথায় আছে তার হদিস মিলেছে...

বলেই দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন বিজয়েন্দ্র।তাঁর গমনপথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন রাঘবেন্দ্র।

সর্পধন

পরদিন সকালে আমার তাঁবুতে এসে হাজির হলেন রাঘবেন্দ্র। উত্তেজিত স্বরে বললেন, বনের মধ্যে বিজয় তার এক সাকরেদকে নিয়ে সাদা ঘাসফুলগুলো সব উপড়ে ফেলে ঘাস কাটছে। এর পর মাটি কাটতে শুরু করবে। আমি চাই না আমার মণিরত্নের বাক্সটি তার হস্তগত হোক। আমি আমার লোকজন নিয়ে যাব, আপনিও চলুন, বিজয় বাক্সটি পাওয়ামাত্র ওটা কেড়ে নিতে হবে...।

না না। আমি বললাম। কাড়াকাড়ির মধ্যে আমি নেই!

কাড়াকাড়ির মধ্যে আপনাকে থাকতে তো বলিনি! আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে হয়তো কাড়াকাড়ির দরকারই হবে না। আপনি ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলে বিজয় হয়তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বাক্সটি আমাকে দিয়ে দেবে....

বনের মধ্যে চিহোড়লতাঝোপ ঠেলে এগিয়ে গিয়ে একটি বীজা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন রাঘবেন্দ্র। ইসারায় আমাদের চুপ করে থাকতে বলে তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, আপাতত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা যাক। বাক্সটা বিজয়ের হাতে এলেই এগিয়ে যাব আমরা...

বাক্সটা বিজয়েন্দ্রর হাতে আসার আগেই মাটি ফুঁড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল একটি প্রকাণ্ড শঙখচূড় সাঁপ, ছোবল মারল সে বিজয়েন্দ্রর কপালের ওপরে।

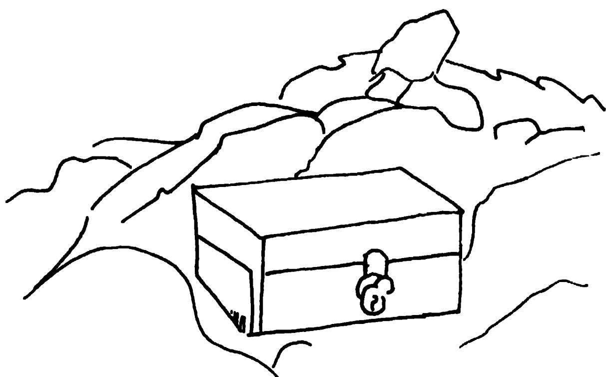
বিজয়েন্দ্রকে মুঙ্গেরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

এরপর একদিন রাঘবেন্দ্র আমাকে বললেন, বুঝলেন রায়সাহেব, এখানকার মণিরত্নে আমাদের কোন অধিকার নেই, এগুলো সর্পধন।

বলেন কি আমার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

ঐ পাহাড়ে আপনি মণিরত্নের সন্ধান নিচ্ছেন, ওখান থেকে আমার ও বিজয়েন্দ্রর সাকরেদরা মণিরত্ন বের করে নিয়ে এসেছে, অথচ পাহাড়টির নাম রত্নগিরি নয়, সর্পগিরি। ঐ পাহাড় ও পাহাড়ের চারপাশের বনে শঙ্খচূড়ের রাজত্ব। ওখান থেকে আমাদের মণিরত্ন আহরণকে তারা তাদের এলাকা থেকে হরণ বলে বিবেচনা করেছে, তাই সাপের কামড়ে মারা গেল ভিষণ শেখ, আমার ঘরে ঢুকে আমাকে মারার চেষ্টা করল একটি শঙ্খচূড়, আপনার চোখের সামনেই আর একটি শঙ্খচুড় বিজয়েন্দ্রকে মারল। আমার বাক্সসুদ্ধ মণিরত্ন মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে ওদের কাছেই ফিরে গিয়েছে। এরপর আর ওদের ধনে আমাদের লোভ হওয়া উচিত নয়। আমার অনুরোধ, আপনিও আপনার অনুসন্ধান বন্ধ রেখে বাড়ি ফিরে যান....

বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন রাঘবেন্দ্র। তারপর আমিও আমার তাঁবু খুলে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ফিরে যাই কলকাতায়।





সত্যি লিলিপুট

শেখর বসু

ইমন যে দু-তিনটে জায়গায় যেতে খুব ভালবাসে সেগুলোর একটা হল বকুলমাসির বাড়ি। মাসির নাম কিন্তু সত্যি সত্যি বকুল নয়, বকুলতলায় থাকেন বলে বোনঝি-বোনপোর মুখে ঘুরতে ঘুরতে কবে যেন ওই নামটা পাকা হয়ে গেছে। শুধু ইমনই নয়, বকুলমাসির বাড়িতে যেতে ভালবাসে সবাই। তার কারণ, মাসি খুব খাওয়ান। এটা শেষ হল তো সেটা, সেটা শেষ হল তো আর-একটা।

ইমন এখন ছোটই, তবে ওর আরও ছোটবেলায় একটা কথা ঠাকুমার

মুখে প্রায়ই শুনত। কথাটা হল— যে খায় চিনি, জোগান চিন্তামণি। তার মানে যে যা চায়, ভগবান তাকে ঠিক সেটা জুটিয়ে দেন। তবে চাওয়ার জিনিসটা ভাল হতে হবে। ইমনের আজকাল প্রায়ই মনে হয়, এর কাছাকাছি আর একটা কথাও সমান সত্যি। শুধু চাওয়াই নয়, কেউ অনেক কিছু দিতে চাইলেও ভগবান তাকে সেই ব্যবস্থাটা ঠিক করে দেন। এই যেমন বকুলমাসি।

বকুলমাসির বাড়ির চারদিকে শুধুই খাবারের দোকান। কী নেই সেখানে? রোলের দোকান, চপের দোকান, চিনে আর মাদ্রাজি খাবারের রেস্টুরেন্ট। গলির এ-মুখে ঝালমুড়ি, ফুচকা, ও-মুখে আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস আর মিষ্টি। ঠিক মধ্যিখানের একটা দোকানে আবার গাদা-গাদা বাবল গাম আর চকোলেট। বকুলমাসি এত খাওয়াতে ভালবাসেন বলেই ওঁর বাড়ির চারপাশে এত দোকান।

রোববারদিন বিকেলে মা'র সঙ্গে বকুলমাসির বাড়ি যাওয়ার সময় ইমনের হঠাৎ মনে হল— আচ্ছা, বকুলমাসির আর একটা নাম চিন্তামণিমাসি দিলে কেমন হয়! কিন্তু বকুলমাসিদের দরজা খুলে যেতেই ইমন এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, ওই কথাটা ওর মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেল বেমালুম। ওর মাও কম অবাক হননি।

বকুলমাসিরা দোতলায় থাকেন, একতলায় সদর দরজা। সন্ধের মুখে দরজার ওপাশে আবছা অন্ধকার! অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে দিল কে?

অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে আসার পরে মস্ত দরজার পাল্লার আড়ালে কী যেন একটা নড়ে উঠতে দেখল ইমন। কী? কে? একটানে পাল্লাটা সরাতেই দেখা গেল জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একরত্তি একটা মেয়ে। লম্বায় বড়জোর হাত-দেড়েক।

ইমনের মা বললেন, "তুই কে রে? কী করছিস এখানে?"

চিঁ-চিঁ করে উত্তর দিল মেয়েটি, "দরজা দেব এবার।"

ভেতরে ঢুকল ইমনরা, কিন্তু ওপরে ওঠার আগে ওরা মেয়েটির দরজা দেওয়া দেখল। সত্যি, দেখার মতো দৃশ্য! মেয়েটির অন্তত পাঁচ গুণ লম্বা দরজা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজার পাল্লা দুটো। পাল্লার একেবারে নীচে একটা আড়াআড়ি ছিটকিনি। বোঝাই যায়, সদ্য লাগানো হয়েছে ওটা। তার মানে একরত্তি এই মেয়েটার জন্যে।

মেয়েটাকে কসরত করে দরজায় ছিটকিনি লাগাতে দেখে ইমনের মা সেই যে হাসতে শুরু করেছিলেন, তা আর থামল না সহজে। বকুলমাসি মা'র রাঙাদি। মা হাসতে-হাসতে বললেন, "রাঙাদি, ওই লিলিপুটটাকে তুমি জোটালে কোত্থেকে?"

মা'র কথায় বকুলমাসিও হাসলেন, তারপর বললেন, "সত্যিই লিলিপুট, তবে যাই বলো আর তাই বলো, এই লিলিপুটটাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। কাজের লোক দু'মাস আগে এক সপ্তাহের জন্যে দেশে যাব বলে সেই যে গেছে, ফেরার আর নাম নেই। ও না থাকলে আমাকে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না।"

হাসতে হাসতে আবার অবাক হলেন মা। "কেন, ও কী করে তোমার?"

"সবচেয়ে কঠিন কাজটা। সকাল আর সন্ধেয় পাঁচ মিনিট অন্তর মক্কেল আসে তোর জামাইবাবুর। তখন দরজা খোলা-বন্ধের দায়িত্ব ওই লীলার ওপর।"

ইমনের মা এই দিকটা আগে ভাবেননি। সত্যি, অ্যাডভোকেট জামাইবাবুর কাছে লোকের ভিড় তো লেগেই থাকে। এবার তারিফ করার গলায় বললেন, "লীলাবতী তোমাকে তা হলে দারুণ সার্ভিস দেয়।"

"সার্ভিস বলে সার্ভিস! ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু বেল বাজলেই ছুটে যায়। দরজা খোলে, খেয়াল করে বন্ধ করে আবার।'

সোফার ওপর বেশ আয়েস করে বসে ইমনের মা বললেন, "তোমার ক্রেডিটও কম নয়, ওইটুকু মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া চাট্টিখানি কথা! এত ছোট কাজের মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।"

এই কথাটা কানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ইমন মা-মাসির গল্পে মন দিচ্ছিল না একটুও। কিন্তু এবার ও হঠাৎই খুব সজাগ হয়ে উঠল। লীলা ডাইনিং-স্পেসের কোণের দিকে কোলে একটা পুতুল নিয়ে বসে ছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, একটা পুতুলের কোলে আর একটা পুতুল। ইমন বকুলমাসির দিকে তাকিয়ে সামান্য চাপা গলায় বলল, "আচ্ছা, ওর বয়েস কত হবে? তিন?"

বকুলমাসি হেসে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, দেখলে তাই মনে হয়। শরীরে বাড়বৃদ্ধি বলে কিছু নেই। হবেই বা কোত্থেকে? গরিব-ঘরে জন্মেছে যে।"

ইমন কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "ন্না, এখন ওর ঠিক বয়েস কত হবে?"

"কত আর হবে! সাড়ে-চার কি পাঁচ।"

উত্তেজনা জোর করে দমন করে ইমন বলল, "আচ্ছা, ওই বোধহয় সবচেয়ে ছোট—"

"সবচেয়ে ছোট কী?"

"সবচেয়ে ছোট কাজের মেয়ে।"

বকুলমাসি হেসে উঠে বললেন, "সে তোমার মা জানে।"

মা বললেন, "সত্যি রাঙাদি, এত ছোট কাজের মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি!"

যা জানার তা জানা হয়ে গিয়েছিল ইমনের। একটু আগের সেই উত্তেজনাটা হঠাৎ শরীরের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতেই ও উঠে পড়ল ওখান থেকে। তারপর বসার ঘরে গিয়ে বসল।

বসার ঘরেই টিভি। একটু বাদে শুরু হবে স্পাইডারম্যান, কিন্তু টিভি খোলার জন্যে একটুও আগ্রহ বোধ করছিল না ইমন। ওর মাথায় এখন অন্য চিন্তা।

কুইজের পোকা ইমন। নানা ধরনের রেকর্ডে মগজ ভর্তি। বাড়িতে গোটাপাঁচেক বই ওর সব-সময়ের সঙ্গী। ওগুলোর একটা হল গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। পৃথিবীর বিচিত্র সব ঘটনার রেকর্ড আছে ওতে। বইটা দারুণ ভাল লাগে ওর। পড়তে পড়তে ওর চোখের সামনে কতকিছু ভেসে ওঠে। গিনেস না থাকলে ও কি জানতে পারত পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মেয়ের নাম স্যাণ্ডি অ্যালেন। উচ্চতা ৭ ফুট ৭$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। তার মানে এই যে ঘরের দরজা, এর ওপরেও দু'হাত। উরিব্বাস! ঠিক যেন দৈত্য! গিনেস না থাকলে কি জানতে পারত পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা লোক রবার্টের ওজন ১,০৬৯ পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রমাণ সাইজের আট-দশজন মানুষ একসঙ্গে ওজন নিলে যা হয় রবার্টের একার ওজন তাই। বাব্বা! ঠিক যেন বাচ্চা হাতি! গিনেস না থাকলে ও কি জেনারেল টম থামের কথা জানতে পারত! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে মারা যাওয়ার সময় টম লম্বায় ছিল মাত্র তিন ফুট চার ইঞ্চি।

ইমনের মাথা গিজগিজ করছে নানা ধরনের রেকর্ডে। কিন্তু ও আর সেদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ডাইনিং-স্পেসে। কাজের মেয়ে লীলা ঠিক আগের জায়গাতেই কোলে পুতুল নিয়ে বসে আছে।

ইমন সোজা এগিয়ে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই, তোর বয়েস কত রে?"

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে ইমনের মুখের দিকে তাকাল লীলা। ওর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল সামান্য। ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত নেই।

একই প্রশ্ন আবার করল ইমন। এবার মেয়েটা, "জানি না," বলেই ছুট লাগাল ওদিকের ঘরে।

ছোটার সময় কাজের মেয়েটাকে আরও ছোট বলে মনে হচ্ছিল ইমনের। ওর সারা শরীরে আবার সেই উত্তেজনা। হ্যাঁ, গিনেস বুকে জায়গা পাওয়ার মতো এটাও একটা রেকর্ড। পৃথিবীর সবচাইতে কমবয়সী কাজের মেয়ে—দি ইয়াঙ্গেস্ট মেডসারভেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড।

ইংরেজিটা মাথায় আসতেই শরীরে মৃদু একটা শিহরণ খেলে গেল ইমনের।

কালকেই গিনেস বুকের দফতরে পাঠিয়ে দিতে হবে খবরটা। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত খবর ছাপা হয় ওই বইতে, সুতরাং এটা ছাপা না হওয়ার কোনও কারণ নেই। বলা যায় না, খবরটা ছাপার সঙ্গে-সঙ্গে লীলার একটা ছবিও ছেপে দিতে পারে ওরা।

আচ্ছা, ছবি কি এখনই পাঠাতে হবে? উত্তেজনায় পায়চারি শুরু করে দিল ইমন। ন্‌না, আগে থেকে ছবি পাঠাবার কোনও দরকার নেই। অত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, খবরটা সত্যি কি মিথ্যে জানার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই একজন প্রতিনিধি পাঠাবে এখানে। দরকার হলে সে-ই তুলে নেবে ছবি।

কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পায় ইমন। ও দেখতে পেল গিনেস বুকে ছবি বেরিয়েছে লীলার। হাসছে। কিন্তু দুটো দাঁত নেই কেন? ওর তো একটা মোটে পড়েছে এখন!

ইমন পরিষ্কার বুঝতে পারল, ছবিটা ভবিষ্যতের। তার মানে, গিনেস বুকের প্রতিনিধি যখন ছবি তুলতে আসবে তখন আরও একটা দাঁত পড়ে যাবে লীলার।

পরের ছবি এত আগে দেখে ফেলার জন্যে বেশ মজা পেল ইমন। তবে খানিকক্ষণ বাদে ও তৎপর হয়ে উঠল। সময় থেমে থাকে না। সময় বাড়া মানেই বয়েস বাড়া। কালকেই অতি অবশ্য চিঠি পাঠাতে হবে গিনেস বুকের দফতরে। দেরি হলে সেই ফাঁকে লীলার বয়েস বেড়ে যাবে আরও কিছুটা। গোটা পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর এক প্রতিযোগিতা চলছে সব-সময়। একটা মাত্র মুহূর্তের জন্যে কত কিছু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। দেরি করলে হয়তো লীলার কোনও প্রতিযোগিনী এসে যাবে। বলা যায় না, একটুর জন্যে তার কাছে হেরেও যেতে পারে লীলা।

বসার ঘরে এসে টিভিটা খুলে দিল ইমন। স্পাইডারম্যান শুরু হয়ে গেছে। মাকড়সা-মানুষ মাকড়সার জালের অদ্ভুত দড়িতে ঝুলে বিদ্যুৎগতিতে উড়ে যাচ্ছে আকাশছোঁয়া বাড়ির এক ছাত থেকে আর এক ছাতে। ছবির দিকে চোখ থাকলেও ওর মন কিন্তু অন্যদিকে।

গিনেস বুকে ভারতের রেকর্ড বলতে বিদঘুটে দুটো ব্যাপারের কথা এখন মনে পড়ছে ইমনের। একটা হচ্ছে পেল্লায় মাপের হাতের নখ। পুনের শ্রীধর চিলাল বাঁ হাতের নখগুলোর মাপ সাড়ে-বিরানব্বই ইঞ্চি। ওই মাপের নখ গজাতে লেগেছে সাতাশ বছর।

দ্বিতীয় রেকর্ডটা গোঁফের। উত্তর প্রদেশের এক ব্রাহ্মণের গোঁফের মাপ ছিল একশো দুই ইঞ্চি।

ভারতের এই ধরনের রেকর্ড আরও দু-চারটে থাকতে পারে। কিন্তু শেষতম রেকর্ডটা হবে দারুণ মজার— পৃথিবীর সবচাইতে কমবয়সী কাজের মেয়ে। বকুলমাসি বলেছেন, লীলার বয়েস সাড়ে-চার কি পাঁচ। কিন্তু ইমনের দৃঢ় বিশ্বাস, তিন সাড়ে-তিনের বেশি কখনওই নয়।

আচ্ছা, এই ধরনের রেকর্ড যারা পাঠায় গিনেস বুকের তরফ থেকে তাদের কোনও উপহার দেওয়া হয় না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। খুব ভাল কোনও উপহার। উপহারের কথা ভাবতে গিয়ে ইমনের শরীরে আর এক দফা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

টিভিতে স্পাইডারম্যানের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই শুরু হয়ে গেল বকুলমাসির নিজস্ব অনুষ্ঠান। প্রথমেই গরম গরম এগরোল। এগরোল এগিয়ে দিয়ে বকুলমাসি জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবি বল?"

এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যেন এগরোল কোনও খাবারই নয়। ইমন হেসে ফেলল। "রোল তো খাচ্ছি, আবার কী খাব!"

ইমনের কথা বকুলমাসির বোধহয় কানেই গেল না। চকচকে মুখে বলে উঠলেন, "আমাদের পাড়ায় যা একটা কচুরির দোকান হয়েছে না— এত ভাল কচুরি তুই কোথাও পাবি না। এই সময় ভাজে। দাঁড়া, আনাচ্ছি।"

আধঘন্টার মধ্যে এসে গেল কচুরি। সত্যিই দারুণ! সঙ্গের তরকারিটাও চমৎকার। কচুরির পরে ছানার পোলাও। পোলাওয়ের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে মাসি বললেন, "ইমনবাবু তো এখন বেশ বড়সড় হয়ে গেছেন, আমাদের সঙ্গে একটু কফি চলবে না কি?"

আঁতকে ওঠার ভান করে ইমন বলল, "কফি! অসম্ভব। এত খাওয়ার পরে জল খাওয়ারই জায়গা থাকবে না।"

এই ধরনের রকমারি খাবার খেতে খুব ভালবাসে ইমন। কিন্তু, তা বলে এত! ও টেবিলে বসে খাচ্ছিল, একটু দূরে, মেঝের ওপরে লীলা। দু'জনে দু'জায়গায় বসলে কী হবে, একই খাবার খাচ্ছিল ওরা। আর অবাক কাণ্ড, দু'জনের খাবারের পরিমাণও ঠিক এক!

অবাক হয়ে গিনেস বুকের মধ্যে আবার মনে মনে ঘুরতে শুরু করে দিল ইমন। ছোট্ট ওই পাখিটার নাম যেন কী! ওই যে মাথার ওপর একটুখানি ঝুঁটি। সারাদিনে নিজের শরীরের ওজনের বিশ গুণ বেশি খাবার খেয়ে রেকর্ড করে বসে আছে।

লীলার সঙ্গে ওই পাখির মিল আছে বোধহয় কিছুটা। কত খাবার! অথচ দিব্যি চেটেপুটে শেষ করে ফেলল সব! বকুলমাসির দয়ার শরীর। স্নেহের

গলায় জিজ্ঞেস করলে লীলাকে, "তোকে আর একটু ছানার পোলাও দেব?"

সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা করে একপাশে ঘাড় কাত করল মেয়েটা। বকুলমাসির একটুখানি মানে অনেকখানি। লীলার থালায় ছানার পোলাওয়ের ছোট্ট একটা পাহাড় গজিয়ে উঠেছিল। পাহাড়টা আবার মিলিয়েও গিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে।

খাওয়ার শেষে বসার ঘরে বসে পুরনো একটা কমিকসের বই নতুন করে পড়তে শুরু করে দিল ইমন। ও-ঘরে গল্প করছেন মা আর মাসি। মাঝেমধ্যে ওঁদের গল্পের টুকরোটাকরা ভেসে আসছিল এ-ঘরে। কিন্তু কমিকসের গল্প আর-একটু জমে উঠতেই বাইরের আর কোনও শব্দ কানে ঢুকল না ইমনের।

নিশ্চিন্তে কেটে গেল অনেকটা সময়।

ইমন যখন বইটা শেষ করার মুখে তখন ওর মা ঘরে ঢুকে বললেন, "কী রে, বাড়ি যাবি না? রাত হয়ে গেছে অনেক।"

"এক মিনিট।"

এই গল্পের শেষটা পরিষ্কার মনে আছে ইমনের, তবু আর-একবার শেষ না করে উঠতে পারল না ও।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মা আর মাসি শেষ কথাগুলো সেরে নিচ্ছিলেন। শেষ কথাগুলো এইরকম— "এত দেরি করে এলি যে, কোনও গল্পই করা গেল না।"

"তুমি এবার চলে এসো একদিন। কবে আসছ?"

"যাব। তুই আবার কবে আসছিস?"

আর পাঁচটা কথার শেষে এই কথাগুলো ফিরে আসছিল বারবার। দেওয়ালঘড়িতে ন'টার ঘন্টা বাজতেই তাড়া লাগাল ইমন, "মা, চলো এবার"

"এ কী! ন'টা বেজে গেছে!"

মা'র কথা থামতেই ব্যস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন বকুলমাসি, "লীলা, লীলা।"

কোনও সাড়া এল না।

বকুলমাসি তখন সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে নেমে গেলেন নীচে, তারপর ঘুমন্ত লীলাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "দেখেছ কাণ্ড, সন্ধে হতে-না-হতেই ঘুম জুড়ে দেবে রোজ। এখন ওর ঘুম ভাঙাও, খাইয়েদাইয়ে শোওয়াও। ভাল জ্বালা হয়েছে আমার।"

মা হাসতে-হাসতে বললেন, "কাজের মেয়ে রেখে তোমার তা হলে কাজ বেড়েছে দেখছি।"

"আর বলিস না, সেদিন ওকে বিয়েবাড়িতে নিয়ে আর-এক ফ্যাসাদ।"

"ওকে বিয়েবাড়িতেও নিয়ে যাচ্ছ?"

"কী করব, বায়না ধরল যে। যাওয়ার পরে ভাবলাম— ছেলেমানুষ তো, ফার্স্ট ব্যাচেই খেয়ে নিক বরং। কিন্তু কে জানত ও খেয়েদেয়েই ঘুম জুড়ে দেবে! শেষে, আমার কোলে উঠেই বাড়ি ফিরল।'

বুকলমাসির কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল ইমন। ওর মাও হাসলেন। তারপর হাসির মধ্যেই বিদায় নেওয়ার পালা চুকল।

রাস্তায় নেমে কয়েক পা হাঁটার পরে ইমন বলল, "লীলার কপালটা দারুণ! ভাল বাড়িতে কাজ পেয়েছে। দিনরাত্তির ভালমন্দ খাওয়া আর কোলে উঠে ঘুমনো।"

মা হাসতে-হাসতে জবাব দিলেন, "রাঙাদি পারেও বটে।"

"আচ্ছা মা," ইমন চারদিক একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "ওই মেয়েটার, মানে লীলার বয়েস ঠিক কত হবে?"

মা একটু অবাক হয়ে বললেন, "তুই তখন থেকে ওর বয়েস নিয়ে পড়েছিস কেন বল তো?"

"বলো না কত? আমার মনে হয় তিন কি সাড়ে-তিন।"

মা দূরের একটা মিনিবাসের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "জানি না।"

কথা আর বাড়াল না ইমন। এখন চুপ করে যাওয়াই ভাল। দু'দিন বাদে তো চমকে যাবে সবাই।

পরদিন বিস্তর ভেবেচিন্তে গিনেস বুকের সম্পাদকের নামে ছোট্ট একটা চিঠি লিখল ইমন। লিখল: আপনারা তো গোটা পৃথিবীর বিচিত্র সব খবর ছেপে থাকেন— তা, আমি এই ধরনের একটা খবর জানাচ্ছি আপনাদের। একটি কাজের মেয়ের সন্ধান পেয়েছি আমি। আমার ধারা, ও পৃথিবীর সবচাইতে কমবয়সী কাজের মেয়ে। ওর বয়েস তিন সাড়ে-তিনের বেশি নয়, অথচ পরের বাড়িতে ঘরসংসারের কাজ করে যাচ্ছে দিব্যি। খবরটা সত্যি কি না দেখার জন্যে আপনাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিতে পারেন এই ঠিকানায়। তবে আজ থেকে ঠিক দেড় মাস বাদে পাঠালে আমি সাহায্য করতে পারি আপনাদের। কারণ, ওই ঠিকানাটা আমার মাসির ঠিকানা, আর দেড় মাস বাদে আমাদের স্কুলে পুজোর ছুটি শুরু হলে আমি কিছুদিন আমার ওই মাসির বাড়িতেই থাকব। আপনি এত তারিখ থেকে এত তারিখের মধ্যে আপনাদের প্রতিনিধিকে আমার মাসির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই আমার নাম, এই আমার

মাসির ঠিকানা।— সব গোটা-গোটা করে লিখে গিনেস বুকের নিউ ইয়র্কের ঠিকানায় চিঠি ছেড়ে দিল ইমন।

চিঠিটা পোস্ট করার পরেই অদ্ভুত এক উত্তেজনার মধ্যে পড়ল ইমন। রাজা হওয়ার চাইতে রাজা বানানো ঢের বেশি কঠিন। ঠিক সেইরকমই কঠিন আচমকা কোনও রেকর্ড করে ফেলার বদলে সেই রেকর্ড খুঁজে বার করা। লীলা তো নিজের রেকর্ডের কথা জানে না, জানলেও বুঝতে পারবে না কিছুই।

ইমনের উত্তেজনা থিতিয়ে এল আস্তে-আস্তে। টেবিল টেনিস আর ক্রিকেটের ভেতর দিয়ে দিন গড়াতে লাগল ওর। তবে ঝলমলে দিন একটানা বেশিদিন চলে না। পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার মুখেই ওর শরীরে পুরনো সেই উত্তেজনা ফিরে এল আবার। পরশুদিন ওদের বকুলমাসির বাড়িতে যাওয়ার কথা। তার পরের সপ্তাহে গিনেস বুকের প্রতিনিধি আসবে ওখানে। সম্পাদক ওর চিঠির কোনও উত্তর দেননি, তবে মনে হয় ঠিক সময়েই প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেবেন।

পুজোর ছুটিতে বকুলমাসিদের বাড়িতে আরও অনেকের আসার কথা। আসবে রমু, হেনরি, পাপাই আর কৌশিক। আহ্! যা জমবে না! প্রাণভরে এন্তার খাও আর খেলো। কেউ কিচ্ছু বলবে না। বকুলমাসির বারণ— পুজোর সময় ছোটদের বকাবকি করা চলবে না।

নানা ধরনের খেলা আর কুইজের মজায় মগজ ঠাসা ছিল ইমনের, কিন্তু বকুলমাসির বাড়িতে পা দিতে না-দিতেই মুখ কালো হয়ে গেল ওর। এ কী! এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মাত্র দেড় মাসে কেউ কি এতখানি বাড়তে পারে!

কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। ইমনের বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তরে বকুলমাসি হাসতে হাসতে বললেন, "শোনো কথা! বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েরা বাড়বে না? আমাদের লীলাকে বড় হতে দেখে এত অবাক হওয়ার কী আছে!"

এখন লীলার ঠিক আগের মতো ছোট্টখাট্টো হয়ে থাকা যে কী জরুরি ছিল, বুকলমাসিকে তা বলে বোঝানো যাবে না। ইশ্! মাত্র দেড় মাসের মধ্যে লীলা একলাফে এতখানি বড় হয়ে গিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার সুযোগটা অল্পের জন্য হারাল! এখন ওকে দেখে কেউ বলবে না যে ও পৃথিবীর সবচাইতে অল্পবয়সী কাজের মেয়ে। এমন কাজের মেয়ে তো কতই আছে। ইমন ব্যাজার মুখে মাসিকে বলল, "তুমি না বড্ড খাওয়াও! মাত্র দেড় মাস আগে লীলা কী ছোট ছিল, আর এখন কত বড়!"

আসল ব্যাপারটা জানা না থাকলে ইমনের এই কথাটা যে-কারও কাছে বিদঘুটে ঠেকবে। বকুলমাসিরও ঠেকল, উনি চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, "ছিঃ, এসব কথা বলতে নেই। ও আগে তেমন খেতেটেতে পেত না বলেই বাড়তে পারেনি। এখন একটু আধটু পাচ্ছে, তাই—। তবে বয়েস আন্দাজে আর একটু বাড়া উচিত ছিল লীলার।"

বকুলমাসির কথায় রীতিমত লজ্জা পেয়ে ইমন বলল, "ন্‌না, আমি সে-কথা বলতে চাইনি, আসলে.....।"

আসল কথাটা শোনার অপেক্ষায় না থেকে বকুলমাসি চলে গেলেন ওখান থেকে।

এবার ? দুর্ভাবনায় ভারী হয়ে উঠল ইমনের মাথা।

গিনেস বুকের সম্পাদকের প্রতিনিধি এখন এখানে হাজির হলে কী বলবে ও ?

প্রতিনিধির আসার কথা সামনের রোববার থেকে শনিবারের মধ্যে। রোববার আসতে এখনও চারদিন বাকি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না....।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ইমন ছুট্টে গিয়ে সামনের পোস্টাফিস থেকে একটা অ্যারোগ্যাম কিনে আনল, তারপর ছোট একটা চিঠি লিখল গিনেস বুকের সম্পাদককে। চিঠিটা এইরকম :

প্রিয় সম্পাদক,

খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, লীলা নামের ছোট্ট সেই কাজের মেয়েটি হঠাৎই বেশ কিছুটা বড় হয়ে গেছে। আসলে, আমার মাসি ওই মেয়েটিকে ঠিক তাঁর নিজের মেয়ের মতো বড় করে তুলছেন। এইসব কারণে মনে হয় আপনাদের গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে লীলার খবর ছাপাবার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা নষ্ট করার জন্যে আমি লজ্জিত। নমস্কার নেবেন।

বিনীত ইমন

চিঠিটা পোস্ট করার পরেও ইমন একটু ভয়ে-ভয়ে ছিল, কিন্তু না, বিব্রত হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। গিনেস বুকের সম্পাদকের কোনও প্রতিনিধি আসেননি বকুলমাসির ঠিকানায়।

এদিকে পুজোর দিনগুলো কেটে গেছে দারুণ মজায়। আর যা খাওয়াদাওয়া হয়েছে না ! এমন খাওদাওয়ার কথা ওরা বোধহয় কখনই ভুলবে না।

বাড়ি ফিরে আসার দিন ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ইমনের। এই ক'দিনেই ইমনদা'র খুব ভক্ত হয়ে গেছে লীলা। পাশের বাড়ি থেকে কতবার

যে ওদের ক্রিকেট-বল কুড়িয়ে এনে দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। ইমনরা চলে যাওয়ার সময় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলেছিল লীলা।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাটতে ইমন ভাবছিল— মেয়েটাকে দেখতে এখন একটু বড় হলে কী হবে; মনটা রয়ে গেছে ঠিক তিন বছরের বাচ্চাদের মতোই। কিন্তু কী লাভ তাতে? গিনেস বুক তো আর মনের বয়সের হিসেব ধরে না!





এইট্‌থ্ ম্যান

দিব্যেন্দু পালিত

ম্যাচের দিন মাঠে পৌঁছে টিম শুনে আবারও হতাশ হলো গাটাই। কুমুদ স্মৃতি বিদ্যালয়ের ক্রিকেট কোচ ভানুবাবু স্যার গতকাল সেভেন-এ-সাইড টুর্নামেন্টে অশোকনগর জুনিয়ার স্কুলের বিরুদ্ধে, খেলার জন্যে যে আটজনের নাম ঘোষণা করেছিলেন, সেই লিস্টে তার নাম ছিল পাঁচে। ভেবেছিল এবার নিশ্চয়ই চান্স পাবে। আজ দেখল, ফাইনাল লিস্টে তার নাম নেমে এসেছে আটে। সে এইট্‌থ্ ম্যান।

তবে, হতাশ হলেও একেবারে দমে গেল না গাটাই। সে রোগা প্যাংলা,

পা দুটোও একটু একটু বেঁকা। শরীরে জোর কম। কিন্তু, উৎসাহ খুব। মনটা উড়ো মেঘের মতো—মন খারাপেই জমে থাকে না। ভাবল, প্রথম সাতজনের মধ্যে না থাকুক, এইট্থ্ ম্যান তো। দরকার হলে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে সেই নামবে মাঠে। এসব ভেবেই মনটা ভালো হয়ে গেল আবার।

কুমুদ স্মৃতি ক্রিকেট দল অবশ্য ডাকাবুকো কিছু নয়। হেরোই বলা যায়। আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের চারটে স্কুলের মধ্যে লিগ খেলায় এরই মধ্যে হেরেছে দুটো ম্যাচে। আজ তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ পড়েছে অশোকনগর জুনিয়র স্কুলের সঙ্গে। ওদের টিম ভালো, গতবার জেলা পর্যায়ে উঠে হেরে যায় সেমিফাইনালে। হারানো শক্ত।

খেলা শুরু হলো। পঁচিশ ওভারের খেলায় টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম বল থেকেই ধুম-ধাড়াক্কা পেটাতে শুরু করল অশোকনগর জুনিয়ারের দুই ওপেনার— মতি আর ওদের ক্যাপ্টেন চাঁদ।

কুমুদ স্মৃতির বোলিং ওপেন করে গবু আর রবি। গবুর প্রথম ওভারেই একটা ওভার বউন্ডারি তিনটে বাউন্ডারি, একটা দুই আর একটা নো বল সমেত রান উঠল একুশ। দ্বিতীয় ওভারে রবি দিল আঠারো। এর মধ্যে চাঁদুকে আউট করার একটা সহজ সুযোগও হাতছাড়া করল কুমুদ স্মৃতি। কীভাবে সেটাই আশ্চর্যের।

ওই দ্বিতীয় ওভারেই চতুর্থ বলে টাইমিং ভুল হওয়ায় মিডঅনে উঁচু আর লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিল চাঁদু। ক্যাচটা যখন শূন্য থেকে নীচে নামছে আর কভার থেকে ঠিক জায়গায় দৌড়ে গিয়ে ক্যাচ লোফার জন্যে দু'হাতের তালু পদ্মফুলের মতো করে দাঁড়িয়েছে ঘোঁটলা, তখন কুমুদ স্মৃতি সাপোর্টারদের সে কী উল্লাস। দু'ওভারে বত্রিশ রান হলেও একটা উইকেট তো পড়তে যাচ্ছে। উত্তেজনার মাথায় কোচ ভানুবাবু তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্বপন স্যারের পিঠে থাবড়া মেরে বললেন, 'বুদ্ধি করে বলটা একটু টেনে ছেড়েছিল রবি, কী বলো। চাঁদু বুঝতেই পারেনি।'

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে এইট্থ্ ম্যান গাটাইও শুনল কথাগুলো। কিন্তু স্বপন স্যার জবাব দেবেন কি! তার আগেই গোটা মাঠ দেখল, ক্যাচটা ঘোঁটলার তালুতে বন্দি না হয়ে কাঁধ ছুঁয়ে গড়িয়ে গেল মাঠে—চোট খেয়ে বসে পড়ল ঘোঁটলা আর ওই ফাঁকে আরও তিনটে রান দৌড়ে নিল চাঁদু আর মতি।

এক ওভার চার বলে অশোকনগরের রান তখন বত্রিশ। ভানুবাবুর মুখে চুন।আর তাকাচ্ছেন না স্বপন স্যারের দিকে। যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন, এভাবে খেললে তো ওরা চারশো রান তুলে ফেলবে।

স্বপন স্যার বললেন, ছশোও তুলতে পারে।

গাটাই মজা পেয়ে বলল, স্যার তাহলে কি ওয়াল্ড রেকর্ড হবে?
কিন্তু জবাব দেবে কে। মাঠে তখন খেলা বন্ধ। চোট খেয়ে আঁকুপাঁকু করছে ঘোঁটলা। লোকনাথ অ্যাকাডেমির দ্বিজেন দত্ত সেদিনের আম্পায়ার। তিনি ছুটে এসে দেখলেন ঘোঁটলাকে, তারপর মাঠের বাইরে গিয়ে বরফ ঘষতে বললেন কাঁধে।

ঘোঁটলাকে বেরিয়ে আসতে দেখে গাটাইকে মাঠে নামার ইশারা করলেন ভানুবাবু। স্বপনস্যার বললেন,যাও, গাটাই। ছুটোছুটি করে কিছু রান বাঁচাতে পারো কি না দ্যাখো।

গাটাই খুশি। পারলে ছুটে না গিয়ে তখন ডিগবাজি খেয়েই মাঠে ঢোকে। সে তো জানেই কপালটা তার বড়ই মন্দ। সেভেন-এ-সাইড দলে এ পর্যন্ত কখনও প্রথম সাতে ঢুকতে পারেনি। ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে এইটথ্ ম্যান হয় দৌড়ঝাঁপ করে ফিল্ডিং খাটে, কিন্তু ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায় না। কখনও এইটথ্ ম্যান হয়েও সুযোগ আসে না মাঠে নামার। সেই দিনগুলো বড়ই খারাপ— টিমের প্রথম সাতজনের কারও চোটফোট লাগে না। বেজায় হিসি বা অন্য কিছু পায় না। গোটা দলটাই খুব স্বাভাবিক ভাবে খেলে, হেরে ফিরে আসে।

সেদিন দ্বিতীয় ওভারেই মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে বেজায় খুশ হলো সে। মাথার খাড়া চুলগুলো আর একটু খাড়া হয়ে গেল যেন।

কিন্তু তারপরেই শুরু হলো নতুন ঝামেলা।

তৃতীয় ওভারে আবার বল করার কথা গবুর। প্রথম দু'ওভারে চৌত্রিশ রান দিয়ে কুমুদ স্মৃতির ক্যাপ্টেন চন্দন যখন থার্ডম্যান থেকে গবুকে ডাকছে, দেখা গেল এক হাতে পেট চেপে অন্য হাত নেড়ে না-না করছে গবু। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সবাই ছুটল সেদিকে। গবু বলল, এখন বল করতে পারবে না।

এক ওভারে একুশ রান দিলে কোনও বোলারেরই পরের ওভার করার ইচ্ছে থাকে না, মারের ভয়ে পা কাঁপে। গবুরও সেরকম হলো কি না কে জানে। কিন্তু এক ওভার বল করেই আর করব না বললে ওর বাকি ওভারগুলো করবে কে। চন্দন জিজ্ঞেস করল, 'বল করবি না কেন।'

পেটটা ভুটভাট করছে কেমন।

তার মানে।

মানে কী বলবার আগেই আগুপিছু হয়ে ত্যাড়াং ব্যাড়াং করতে লাগল গবু।তার পরেই 'ওরে বাবা পায়খানা এসে গেছে—বলে ছুটল মাঠের বাইরে।'

সবাই অবাক। টিম হারে হারুক, কিন্তু খেলার শুরুতেই এ কেমন বিপত্তি। কুমুদ স্মৃতির এইট্‌থ্‌ ম্যান গাটাই মাঠে নেমেছে আগেই। কাঁধে চোট পেয়ে ঘোঁটলা তখনও মাঠের বাইরে। গবুও গেল। এখন ছ'জনে খেলা মানে যেখান সেখান দিয়ে বল গলিয়ে বাউন্ডারি নেবে অশোকনগরের মতি আর চাঁদু।

এমনিতেই কুমুদ স্মৃতির প্লেয়ার কম। যে দল হেরেই যাবে সে দলের উচিত মাঠে নেমে শান্তভাবে খেলা এবং হেরে আসা। কোচ ভানুবাবু এইভাবেই ভাবেন।

এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ প্লেয়ার লাগবে কেন! ভানুবাবুর দলে আছে মোট দশজন। মাঠে এসেছে আটজন। বাকি দু'জনের মধ্যে পর পর দুটো ম্যাচের দু ইনিংসেই প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হওয়ায় পাছে আবার জোর করে ব্যাট করতে পাঠান ভানুবাবু, সেই ভয়ে মাঠেই আসেনি নিতু। আর টিমের আটজনের মধ্যে নাম না থাকায় মৈনু গেছে মামাবাড়ি।

একজন প্লেয়ার কম থাকার জন্যে নয়, সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। পেট ভুটভাট করায় গবু গেছে মাঠের বাইরে। ওর বদলে বল করতে পারত ঘোঁটলা— এখনও বরফ এসে পৌঁছায়নি বলে বেঞ্চিতে বসে কাঁধ রগড়াচ্ছে সে। দলে আর দু'জন বল করতে পারে। ডাম্বল আর অপু। একজন মিডিয়াম ফাস্ট বোলার অন্যজন স্পিনার। রান আটকানোর জন্যে বল করতে আসে দশ ওভার শেষ হওয়ার পরে। গাটাইও বল করে অবশ্য, তবে সে বল কখনও উইকেট কিপারের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় বাউন্ডারিতে, কখনও পিচের মাঝখানে পড়ে আর এগোতে চায় না। একটা দুটো বল অবশ্য কপিবুকও হয়ে যায়। কিন্তু, এই খেলায় সে এইট্‌থ্‌ ম্যান—শুধু ফিল্ডিংই করতে পারে।

উপায় নেই দেখে ডাম্বলকেই ডাকল চন্দন।

তো, ডাম্বলও বেঁকে বসল। মাঠে নামার আগে শরীর চাঙ্গা করার জন্যে সকলকে আখের রস খাইয়েছিলেন ভানুবাবু। সেই রস খেয়ে তারও নাকি পেট গুড়গুড় করছে। একটু সইয়ে না নিয়ে দৌড় শুরু করলে তাকেও ছুটতে হবে মাঠের বাইরে। আর অপু বলল, বলের সাইন মরেনি এখনও, এই অবস্থায় সে বল করলে ওরা ছ'বলে ছত্রিশ রান নেবে।

চন্দনের মাথা গুলিয়ে গেল। তবে সে দমবার ছেলে নয়। টিম বার বার হেরে গেলেও তার রান থাকে সবচেয়ে বেশি। হাঁটাচলায় গাভাসকার। বই পড়ে মুখস্থ করেছে ক্রিকেটের সব আইনকানুন। কিন্তু, বল করতে গেলে প্রায়ই 'নো' কিংবা 'ওয়াইড' করে ফেলে, এই যা।

সমস্যায় পড়ে মাঠের মধ্যেই দলের পাঁচ জনকে নিয়ে কনফারেন্স শুরু

করে দিল চন্দন। তাতেও সমস্যার সমাধান হলো না। এদিকে খেলা প্রায় তিন মিনিট বন্ধ। কুমুদ স্মৃতির সাপোর্টাররা দলের দু-দুজন খেলোয়াড়কে মাঠ ছেড়ে আসতে দেখে আগেই 'থ' বনে গিয়েছিল। এখন মাঠের মাঝখানে অন্যদের জটলা করতে দেখে বুঝতে পারছে না গোটা দলটারই পেটে ভুটভাট শুরু হলো কি না—দু ওভারেই বেদম পিটুনি খেয়ে গোটা দলটাই এবার পেটে হাত চাপা দিয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসবে না তো।

ওদের পেটছাড়া অবস্থা দেখে মজা পেয়ে অশোকনগরের সাপোর্টাররা ততক্ষণে ছোট ছোট বাঁশের বাঁশিতে পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো-পোঁ শব্দ তুলতে শুরু করেছে।

বেগতিক দেখে ছুটে এলেন আম্পায়ার দ্বিজেন দত্ত।

'ব্যাপারটা কী। বোলিং শুরু হচ্ছে না কেন!'

চন্দন বলল, 'দুজন বোলার সিক। ফুড পয়জন হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'ফুড পয়জন! কী খেয়েছিল?'

'আজ্ঞে আখের রস।'

'আখের রস!' বিচলিত ভাবে ঘড়ি দেখলেন দ্বিজেন দত্ত। তারপর বললেন, 'আখগুলো পচা ছিল না তো?'

চন্দন এতক্ষণ খেলা নিয়ে ভেবেছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা ভেবে দেখেনি। হঠাৎ মনে হলো তার নিজের পেটও গুড়গুড় করছে। গুড়গুড় আর ভুটভাট কি একই ব্যাপার? এই অবস্থায় তার পক্ষেও গবুর বদলে বল করা ঠিক হবে কী? ঘাবড়ে গিয়ে মাঠের বাইরে তাকিয়ে ভানুবাবুকে খুঁজল চন্দন। দেখতে পেল না। লোকটা হাওয়া হয়ে গেল না কি।

চন্দনকে এলেবেলে হতে দেখে আম্পায়ার দ্বিজেনবাবুও বুঝতে পারছেন না কী করবেন। কুমুদ স্মৃতি উইক টিম, অশোকনগরের সঙ্গে খেলায় ওরা যে হারবেই তাতে তাঁরও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, খেলে হারবে তো! আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী দু দলকেই খেলতে হবে অন্তত দশ ওভার করে, তা না হলে হারজিতের ফয়সালা হবে না। এখন পর্যন্ত খেলা হয়েছে মাত্র দু ওভার। তাও একটা দলই ব্যাট করেছে। তা হলে উপায়?

দ্বিজেন দত্ত আকাশের দিকে তাকালেন। রোদ ঝক্‌মক্ করছে চারিদিকে। একটুও মেঘের আভাস নেই কোথাও। সুতরাং বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হলে না হয় খেলা পণ্ড হয়েছে ধরে নিয়ে দু দলকেই সমান পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া যেত। আগের দুটো খেলায় জিতে এমনিতেই এগিয়ে আছে অশোকনগর

জুনিয়র, ওরাও আপত্তি করত না। কিন্তু, রোদকে তো আর বৃষ্টি বলে চালানো যায় না!

মাঠ জুড়ে শুধু পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো-পোঁ আওয়াজ। ক্রিকেট খেলার আসর না রথের মেলা বোঝা দায়। বিরক্তিকর শব্দ শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল দ্বিজেনবাবুর। ভাবলেন, একটা উপায় আছে অবশ্য-অকারণ সময় নষ্ট করে খেলায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্যে কুমুদ স্মৃতিকে শাস্তি ও অশোকনগরকে ওয়াকওভার দেওয়া। আম্পায়ারের সে-ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওই যে চন্দন বলল ফুড পয়জন হয়েছে, সেটা কি কারণ—না অকারণ? ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা, এখানে কারণকে অকারণ বলে চালানো যায় নাকি! নাঃ তা হয় না।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে দ্বিজেন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'দলে আর বোলার নেই?'

'আছে। কিন্তু' —চন্দন পড়ল বিপদে। ডাম্বলের পেট গুড়গুড় করছে আর অপু ছ'বলে ছত্রিশ রান দিতে চায় না। আম্পায়ারকে এসব বলা যায় না। বললেই তো খেলা বন্ধ করে দেবে।

ক্যাপ্টেনকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে গাটাই আর সামলাতে পারল না নিজেকে। বেফস্‌কা বলে ফেলল, 'আমি বল করতে পারি।'

বুদ্ধু আর কাকে বলে। চন্দন বিরক্ত মুখে তাকাল গাটাইয়ের দিকে। তার আগে আগাপাস্তলা গাটাইকে লক্ষ্য করতে করতে দ্বিজেনবাবু বললেন, 'তুমি না এইট্‌থ্‌ ম্যান। ক্রিকেটের নিয়মকানুন জানো না!'

দেরি হচ্ছে দেখে ততক্ষণে অশোকনগরের দুই ব্যাটস্‌ম্যান মতি আর চাঁদুও এসে পড়েছে সেখানে। পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো-পোঁ শব্দে ঝালাপালা কানটা আম্পায়ারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চাঁদু বলল, 'কী হচ্ছে স্যার। আমাদের সব কনসেনট্রেশন যে নষ্ট হয়ে গেল।'

'সে তো হবেই। বিব্রত গলায় বললেন দ্বিজেন দত্ত, 'আখের রস খেয়ে গোটা দলের ফুড পয়জন। এখন এইট্‌থ্‌ ম্যান বল করতে চাইছে।'

চাঁদু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল এবং কিছুই না বুঝে মতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'করুক না, কী বল?'

মতিও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'আম্পায়ার রাজি হলেই হলো। কিন্তু'—

'কিন্তু আবার কি!' চন্দনের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে গাভাসকারের ব্যক্তিত্ব ফিরে এলো আবার। কায়দার গলায় বলল, 'আম্পায়ারের ডিসিশনই ফাইনাল। তোমাদের আপত্তি নেই বলছ!'

মতি বলল, 'পরের ওভারেও কি গাটাই-ই বল করবে না কি!'

গাটাইয়ের মনে বেশ একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে তখন। হেসে বলল, 'আমি একটানা ছত্রিশ ওভারও বল করতে পারি। এটা তো—'

· চাঁদু একটা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সকলকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিজেনবাবু পকেট থেকে নোট বই আর পেনসিল বের করে বললেন, 'আর সময় নষ্ট করা যাবে না। আমি লিখে নিচ্ছি, অপোনেন্ট টিমের ক্যাপ্টেনের পারমিশানে এইটথ্ ম্যানকে বল করতে দেওয়া হচ্ছে। চলো, খেলা শুরু করো।'

আবার সকলকে যার যার জায়গায় ফিরতে দেখে পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো-পোঁ আওয়াজ দ্বিগুণ জোরালো হয়ে হঠাৎই থেমে গেল আবার। বোঝা যাচ্ছে খেলা শুরু হতে দেখে সকলেই খুশি।

বল এখন গাটাইয়ের হাতে। দৌড় শুরু করার অগে চন্দন ওর পাশে এসে বলল, 'তুই বল করছিস দেখে ওরা পেটাবার চেষ্টা করবে। লাইন আর লেনথ ঠিক রাখলেই হলো। মনে রাখবি এটাই তোর চান্স। পরের ওভারে না হয় আমিই বল করব। যা—'

গাটাই বল করার জন্যে দৌড় শুরু করতেই আবার বেজে উঠল বাঁশিগুলো।

একটুও না ঘাবড়ে গাটাই এগিয়ে গেল এবং বলটা ওর হাত থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ারের 'নো' ডাক শুনে সবাই দেখল, উইকেট কিপার বাবুনের মাথার প্রায় তিন হাত ওপর দিয়ে বলটা শূন্য পেরিয়ে মাটিতে ড্রপ খেয়ে ছুটছে বাউন্ডারির দিকে। বাউন্ডারি বাঁচানোর জন্যে বলের পিছনে পিছনে ছুটেও চার রান আটকাতে পারল না ডাম্বল। চার রান নয়, নো বলের রান জুড়ে পাঁচ। বাউন্ডারি সীমানার বাইরে থেকে পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো-পোঁ আওয়াজের মধ্যে বলটা কুড়িয়ে আর হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাটাইয়ের দিকে তেড়ে এলো ডাম্বল। এই মারে কি সেই মারে। চন্দন ছুটে না এলে বড়সড় চেহারার ডাম্বল হয়তো রোগা-প্যাংলা গাটাইকে কষিয়েই দিত একটা ঘুসি।

ওকে থামিয়ে চন্দন বলল, 'মাঠের মধ্যে এটা হচ্ছে কি! স্কুলের প্রেস্টিজ যাবে যে।'

'ধুত্তোর প্রেস্টিজ!' ডাম্বল বলল, 'সেই দৌড় করালো! পেটের গুড়গুড় বেড়ে গেছে—- এবার আমিও বেরিয়ে যাব।'

ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ডিপ ফাইন লেগে পাঠিয়ে গাটাইয়ের কাছে ফিরে এলো চন্দন।

'এভাবে নো বল করলে তো কুড়ি বলে ওভার হবে।'

'হোক না!' গাটাই হেসে বলল, 'বলে ব্যাট তো ছোঁয়াতে পারেনি!'

সেই অদ্ভুত কথা শুনে জবাব ফুটল না চন্দনের মুখে। মাথা নাড়তে নাড়তে সে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। আর ভাবল এই ছ'টা বল কোনওরকমে উতরে দিতে পারলে আর এই পাগলটাকে বল করতে দেবে না।

কিন্তু, পরের বলেই গোটা মাঠকে চমকে দিল গাটাই। পিচের মাঝখানে ড্রপ খেয়ে বলটা আস্তে হয়ে এগোতে লাগল উইকেটের দিকে। পেটাবে বলে আগেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল মতি। গড়ানো বলটা ব্যাটের তলা গলে সোজা মিডল স্টাম্পে আঘাত করতেই ছিঁটকে গেল বেল। বোল্ড।

কুমুদ স্মৃতির সাপোর্টাররা লাফাতে শুরু করে দিল। হইহই চিৎকার। দলের সবাই ছুটে এলো বোলারকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু ওদের নাগাল এড়িয়ে পিচের চারদিক ঘুরে ছাগল ছানার মতো তেড়াং-বেড়াং করে লাফাতে শুরু করে দিল গাটাই।

এক উইকেটে সাঁইত্রিশ। মাঠে নামল অশোকনগরের বেস্ট ব্যাটস্‌ম্যান রাজা। চারদিক থমথমে। এত থমথমে যে মনেই হয় না একটু আগে পর্যন্ত পোঁ-পোঁ পোঁপ্পো পো শব্দে টেকা যাচ্ছিল না মাঠে।

পরের বল এবং আবার অদ্ভুত কান্ড। প্রায় কপিলদেবের দেওয়া লেন্‌থে বলটা পড়ে অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে আউটসুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রাজা কাট্ করতে গেল এবং ব্যাটে খোঁচা লেগে বল চলে গেল সোজা বাবুনের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপিল।

হতভম্ব ভঙ্গিতে দ্বিজেন দত্তের দিকে তাকিয়ে রাজা দেখল আঙুল তুলে দিয়েছে আম্পায়ার। মাথা নিচু করে সে ফিরতে লাগল প্যাভেলিয়নের দিকে। আর কুমুদ স্মৃতির সাপোর্টারদের চিৎকার আর দলের খেলোয়াড়দের নাচানাচির মধ্যে আবার ছাগল ছানার মতো পিচের চারদিকে ঘুরে নাচ জুড়ে দিল গাটাই।

দু উইকেটে সাঁইত্রিশ। ব্যাট হাতে মাঠে নামল সূর্য। তাড়ু ব্যাটস্‌ম্যান। সাধারণত আরও নীচে খেলে। মনে হচ্ছে ভয় পেয়েই অশোকনগরের কোচ ওকে তুলে দিয়েছে অর্ডারের ওপরে। আর তো তেমন ব্যাটস্‌ম্যানও নেই। সে যাই হোক সূর্য ক্রিজে পৌঁছতে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছু বুদ্ধি দিল ক্যাপ্টেন চাঁদু। মাথা নেড়ে স্টান্স নিল সূর্য।

গাটাই বল করতে ছুটছে। এবার অনেকটা রান আপ নিয়ে, ঠিক বোঝা গেল না কেন। বলটা শর্টপিচ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সূর্যর মাথার ওপর দিয়ে। ছেড়ে দিলে চলে যেত উইকেটকিপার বাবুনের হাতে। হঠাৎ কি বুদ্ধি চাপল সূর্যর মাথায় —কিম্ভুত ভঙ্গিতে ব্যাটটা তুলে খোঁচা দিল বলে। উঁচু বলটা

আরও উঁচু হয়ে শূন্যে উঠে নামতে লাগল ফাইন লেগের দিকে। তারপরেই বন্দি হলো ছুটে আসা ডাম্বলের দু হাতের মুঠোয়।

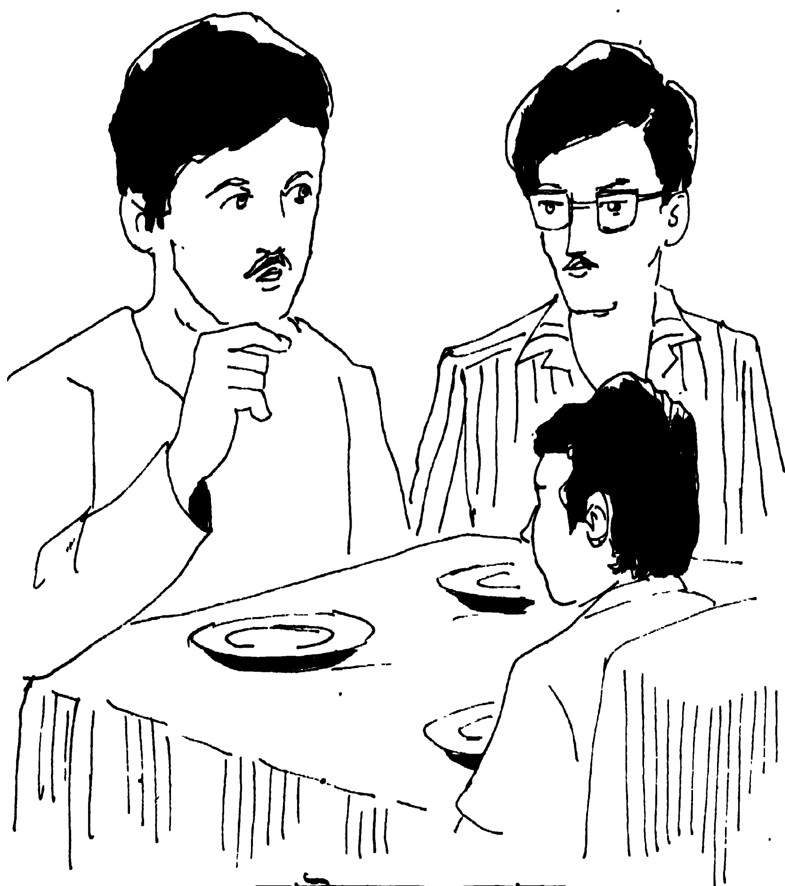
তিন উইকেটে সাঁইত্রিশ। তার চেয়ে বড় কথা হ্যাট্রিক করে ফেলল গাটাই। মাঠের কেউই ভাবতে পারছে না সত্যি সত্যিই ঘটেছে এমন একটা কান্ড। এইট্‌থ্‌ ম্যান বল করছে আর উইকেট পড়ছে টপাটপ! এ কি ভেল্‌কি না জাদু। আর সেটা দেখাচ্ছে কে, না রোগা-প্যাংলা গাটাই।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভেল্‌কি বা জাদু নয়। সেদিন সত্যি সত্যিই এক ওভারে 'ন' রান দিয়ে অশোকনগর জুনিয়রের পাঁচটা উইকেট নিয়েছিল গাটাই। পরের ওভারে আরও তিন রান দিয়ে শেষ উইকেটটা তুলে নেয় ডাম্বল। আর যে স্কুল কখনও জেতে না, সেই কুমুদ স্মৃতি বিদ্যালয়ই সেদিন একা গাটাইয়ের জোরে অশোকনগর জুনিয়রকে হারিয়ে দিল তিন রানে।

খেলার শেষে যখন কুমুদ স্মৃতির কোচ ভানুবাবু গাটাইয়ের খাতিরে গ্যাটের টাকা খরচ করে রসগোল্লা আনালেন খেলোয়াড় আর সাপোর্টারদের জন্যে, তখন দেখা গেল ভ্যাবলা মুখে বসে আছে গাটাই। হাতের সেই রসগোল্লাটা কিছুতেই তুলতে পারছে না মুখে। বলে কী সবাই, সে-ই নাকি ম্যাচ জিতিয়েছে।

রোগা প্যাংলা ছেলেটা কী করে বুঝবে, সুযোগ পেলে এইট্‌থ্‌ ম্যানরাই কখনও কখনও টিমকে জিতিয়ে দিতে পারে।





বাইরের লোক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

রামুদা ঠিক কবে থেকে আমাদের বাড়িতে আছেন জানি না, কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি আমি ওঁকে দেখছি। আসলে উনি যে আমাদের নিজের দাদা নন, সেটাও আমরা জেনেছি অনেক পরে। ছোটবেলা থেকেই খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা সবই তো একসঙ্গে। কখনও তাই ওঁকে আমরা বাইরের বলে ভাবতে পারিনি।

আমাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব মেলামেশা করলেও রামুদা যে একেবারে আলাদা ধরণের মানুষ, সেটা অবশ্য আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারতাম। উনি

থাকেন বিশাল বাড়ির একটা আলাদা ঘরে। সেটাই অবশ্য ওঁর স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেওয়ার কারণ নয়। ওঁর চেহারাতেও চোখে পড়ার মতো কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। মাথার চুলে নিয়মিত তেল মাখেন, জামা-কাপড় পরেন ধোপদুরস্ত। দেওয়াল আলমারির তাক, টেবিলের বইপত্র গুছিয়েই রাখেন সবসময়ই। এমনকী, কাবলি জুতোজোড়ার ওপরেও দৃষ্টি রাখেন সদাসতর্ক। নিজেই পালিশ করেন।

একবার কোনও একটা জিনিস ওঁর মাথায় ঢুকে গেলেই হল, তা হলে আর দেখতে হচ্ছে না। ব্যাপারটা নিয়ে এমন চিন্তাভাবনা শুরু করবেন যে, তখন আর বাইরের পৃথিবীর কোনও কিছু ওঁর মাথায় ঢুকবে না। স্নানের আগে প্রতিদিনের অভ্যাসমত মাথার চুলে তেল দেবেন, আমাদের সঙ্গে খেতে আসবেন মা ডাকামাত্রই, অন্যান্য দিনের মতো কথাও হয়তো বলবেন আমাদের সঙ্গে, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যাবে, ওঁর মনটা আমাদের মধ্যে নেই। হয়তো দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদ্‌ঘুটে কোনও বইয়ের পাতায়, এবং শেষপর্যন্ত তা আর বইয়ের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, একেবারে আফ্রিকার জঙ্গলে কিংবা চাঁদে, না হয় এমনকি ইউরেনাসেরও বলয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা আর তখন ওঁকে বিশেষ ঘাঁটাই না। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের আশেপাশে জাম্বো হাতিদের বন কিংবা চাঁদের পাহাড় থেকে তখন উনিই যা সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠান, তা থেকেই আমরা যা বোঝার বুঝে নিই।

কিন্তু আজ খাবার টেবিলে অবস্থাটা একেবারে আলাদা। মায়ের ডাক পাওয়া মাত্রই আজও রামুদা এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদেরই যা দেরি হল সেটা অবশ্য নতুন কথা নয়। নতুন কথাটা হল, আজ আমাদের টেবিলে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ডলফিন। অন্যান্য দিন খেলাধুলো নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। আমাদের এই আধাগঞ্জ, আধাশহরে গত বছর শীতে সার্কাসের এক দল এসেছিল। সার্কাসের একটা হাতি কী করে যেন ছাড়া পেয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ওই হাতিটাকে নিয়েও আমাদের খাবার টেবিলে আলোচনা চলেছিল বেশ কয়েকদিন। মাঝেমধ্যে আমরা নিজেরাও হয়ে উঠি আলোচনার বিষয়বস্তু। আমার পরীক্ষার ফল, ছোট বোন রীণার সর্দিজ্বর, কিংবা বড়দার কলকাতার হোস্টেল, আলোচনা হিসেবে কোনওটাই বাদ যায় না। এরই মধ্যে আজ হঠাৎ ডলফিন প্রসঙ্গে এসে পড়ল। কী করে এল?

মা বললেন, আমি নাকি জেগে জেগে ঘুমোই। জেগে জেগে কেউ ঘুমোতে পারে? নাকি এটা স্রেফ কথার কথা। মা'র ধারণা, কোনও দিকেই আমার খেয়াল থাকে না। আমি জেগে জেগে ঘুমোই। দিন দুপুরে আমার চোখের

সামনে একবার নাকি ছিঁচকে চোর ঢুকে কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে পালিয়ে ছিল। লোকটা যে চোর আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম, বাইরের কোনও লোক দুপুরবেলা টিউবওয়েলের জল খেতে আমাদের বাগানে ঢুকেছে। আমি জানলার ধারেই বসেছিলাম। লোকটার সঙ্গে আমার চোখাচোখিও হয়েছিল। এখনও ওঁর মুখ আমার মনে আছে। হঠাৎ আমাকে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখে লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কয়েক সেকেন্ডমাত্র। তারপরই সহজ-স্বাভাবিকভাবে, গুটি গুটি পায়ে সে নলকূপের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ওদিকেই আমাদের বাড়ির খিড়কি দরজা। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফিরেও গেল তারপর। কিন্তু সন্ধেবেলা মা আবিষ্কার করলেন, উঠোনে শুকোতে দেওয়া কয়েকটা জামাকাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। কে নিতে পারে? ওই লোকটা ছাড়া কে আবার? সে তো দিব্যি গা ঢাকা দিল। বদনাম হ'ল আমার। জেগে জেগে ঘুমনোর বদনাম। মা প্রথমে রাগারাগি করেছিলেন। তারপর এক সময় ব্যাপারটা হালকা হয়ে এল, খাবার টেবিলে শুরু হল আমাকে নিয়ে হাসাহাসি।

জেগে জেগে ঘুমনোর অপবাদটা কিন্তু আমি ভুলিনি। আমার এই এক মুশকিল। কোনও কিছুই ভুলি না। বুদ্ধিমান চোর আমাকে বোকা বানিয়ে গেল, এমন ভাব করল যেন ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না। এত বড় ঘটনা কি ভুলতে পারি! ঘটনাটা বড় নয়, তার জ্বালাটাই বড়। ব্যাপারটা কিছুই না। কিন্তু সেটাই কাঁটার মতো গেঁথে গেল আমার মনে। তবে বহুদিনের এই যন্ত্রণটা আজ খেতে বসে কিছুটা অন্তত যে হালকা হয়ে যাবে, তা ভাবিনি।

আজ রবিবার। ছুটির দিন বলে বাবাও আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছেন। আজকের খবরের কাগজের রবিবারের পাতায় ডলফিন নিয়ে একটি লেখা বেরিয়েছে। কত লেখাই তো বেরোয়! সব পড়া হয় না, পড়া হলেও মনে থাকে না। আবার অনেক লেখা নিজেরা না পড়লেও বাবার মুখে শুনতে শুনতে সেগুলো আমাদের পড়াই হয়ে যায়। ডলফিনের কথা আজ বাবাই তুললেন। প্রথমে অবশ্য ওঁর কথাটা আমি বুঝিনি। কারণ বাবা একটু হেঁয়ালি করেই কথাটা বলেছিলেন।

"শোনো, পল্টু এতদিনে তোমার একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তোমার মতোই জেগে জেগে ঘুমোয়।"

আমরা দুই ভাই বোন ও রামুদা এ-ওর মুখের দিকে তাকালাম।

"সে অবশ্য মানুষ নয়। আজই একটা প্রবন্ধ পড়লাম। ডলফিন নাকি একটা চোখ খোলা রেখে ঘুমোয়। পড়তে পড়তে আমার পল্টুর কথা মনে

পড়ে গেল। পল্টু অবশ্য দুটো চোখই খোলা রেখে ঘুমোয়।" বাবা হাসতে হাসতে বললেন। রসিকতাটা এই প্রথম আমি উপভোগ করলাম।

কিন্তু রামুদার হঠাৎ আবার এমন অবস্থা হল কেন? ডলফিনরা এক চোখ খোলা রেখে ঘুমোয় শুনেই ওঁর যেন ভাবান্তর হল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে গেলেন। তবে কি রামুদার মাথায় এবার ডলফিন ভর করল?

আগেও এধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল। সামান্য ঘটনা। কিন্তু রামুদার আজকের ভাবান্তর দেখে দুটো ঘটনার মধ্যে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পাচ্ছি। সকালে উঠে ব্রাশে টুথপেস্ট নিয়ে দাঁত মাজছিলাম। আমার কাছ থেকে টুথপেস্টের টিউবটা চেয়ে নিলেন রামুদা। উনি খুব ভোরেই ওঠেন। আর সকালের দিকেই আমাদের ঘুমটা খুব জাঁকিয়ে আসে। ভাবলাম, রামুদার ঘুম থেকে উঠতে এত দেরি হল কেন? না, ভুলটা আমারই। রোজকার মতো রামুদা সেদিনও ভোরেই উঠেছেন। টুথপেস্টের টিউবটা দেখেই চটপট এগিয়ে এসেছেন আমার কাছে। তারপর টিউবটা হাতে নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। রামুদা যেন তখন এক অন্য জগতের মানুষ। বিড়বিড় করে বলছেন, "বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার নিয়ে আমরা যতটা সময় দিই, ছোটখাটো আবিষ্কারের ব্যাপারে ততটা সময় দিই না। এই যেমন, টুথপেস্ট টিউব। কে প্রথম এই টিউব তৈরী করেছিল? কিংবা একটা সেফ্‌টিপিন, অথবা বলপয়েন্ট কলম। কে প্রথম সেফ্‌টিপিন তৈরি করে পেটেন্ট নিয়েছিল? টুথপেস্টের টিউবটাই বা প্রথম কার মাথায় আসে?'

ব্যস, রামুদাকে আর দেখতে হল না। শুরু হয়ে গেল জোর গবেষণা। আমাদের এখানে ভাল লাইব্রেরী নেই। লাইব্রেরী থাকলেও রামুদার যে ধরনের বইপত্র দরকার তা প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ রামুদার বইপত্রের অভাব হয় না। যত গোলমেলে বিষয়ই হোক, তিনি তার একটা না একটা বই জোগাড় করে ফেলবেনই। টুথপেস্ট টিউবের আবিষ্কর্তার সন্ধানে এরপর বইপত্র তল্লাশি শুরু হয়ে গেল পুরো উদ্যমে! কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই আমাদের কাছে বিচিত্র সব তথ্য একের পর এক আসতে থাকল।

আমেরিকার জন র‍্যান্ড নামে এক ভদ্রলোক টুথপেস্ট টিউবের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। সেটা সেই ১৮৪১ সালের কথা। সেফ্‌টিপিন কে পেটেন্ট নিয়েছিলেন জানতে চাও? ভদ্রলোকের নাম ওয়াল্টর হান্ট। তিনি পেটেন্ট নিয়েছিলেন ১৮৪১ সালে। জন লাউড-এর নাম আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত বলপেন আমাদের হাতে হাতে ঘোরে। রামুদা আর জানিয়ে দিলেন, আমেরিকার ১৭৯০এ পেটেন্টব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত

লাখ চল্লিশেক পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছে। সাল তারিখ সমেত একটি ছেলের তৈরি খেলনাগাড়িও আছে এই তালিকায়। সাল তারিখ সমেত নামগুলো গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন রামুদা। খুঁজে পেতে এত সব নাম জোগাড় করাও কম কথা নয়। এও এক আবিষ্কার। বলছিলাম একবার কোনও একটা জিনিস রামুদার মাথায় ঢুকলেই হল! বিশ্বব্রহ্মান্ড রসাতলে গেলেও রামুদাকে ওঁর ভাবনাচিন্তার জগৎ থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না।

আজ তা হলে ডলফিন ওঁর মাথায় ঢুকল! আর কয়েকটা দিন মাত্র, তারপর ডলফিন নিয়ে আজগুবি সব কথাও আমাদের শুনতে হবে। কিন্তু যা ঘটল, যা দেখলাম তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

এই কদিন রামুদা ওঁর ঘর থেকে বিশেষ বেরোননি। একবারই বোধহয় ওঁর বন্ধু জিতেনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। জিতেনবাবুই ওঁকে নানারকম বইপত্র দেন। মনে হয় ডলফিনের বইয়ের খোঁজে রামুদা জিতেনবাবুর কাছেই গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসেছেন কোনও বইপত্র না নিয়েই। তারপর থেকে আর ঘরের বাইরে বেরোননি রামুদা। খাবার টেবিলে আমাদের দু'বেলা যে দেখা হত, তাও বন্ধ। বোধহয় শরীর খারাপ। মা নিজে দুপুরে ও রাত্রে ওঁর ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসেন। সেদিন রাত্রে ওঁকে খাবার পৌঁছে দিয়ে মাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে। বাবার কথাটাই শুধু শুনতে পেলাম, 'কালই আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুমি যা বলছ, তা শুনে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

কিছুটা মমতা, কিছুটা কৌতূহল নিয়ে সেই রাত্রেই আমি রামুদা-র কাছে গেলাম। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। দরজার সামনেই চৌকি। আমি যে ঘরে ঢুকেছি, তা রামুদা টের পাননি। ঘুমোচ্ছিলেন। কিন্তু কী কান্ড! রামুদার একটা চোখ খোলা। প্রথমে দেখে মনে হয় জেগে আছেন। কিন্তু পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দেখলাম সত্যিই উনি ঘুমোচ্ছেন। একটা চোখ পুরোপুরি খোলা। এই ক'দিনে রামুদার চেহারাও যেন কেমন বদলে গেছে। ঠোঁটটা ছুঁচলো, গা-টাও পিছল। চমকে উঠলাম ওঁকে দেখে। তারপর একটা কথা মনে আসতেই ভয়ে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ডলফিনের গল্প শোনার পরই কি রামুদার এই পরিবর্তন হল? ডলফিনের মতোই উনি একটি চোখ খোলা রেখে ঘুমোচ্ছেন?

পরের দিন ভোরবেলা আরও একটা কান্ড ঘটল। রামুদার ঘরে কে যেন মৃদু শিস দিচ্ছে। বেশ কয়েকবারই নাকি শিস শোনা গেছে। আমরা অবশ্য তখনও ঘুমিয়ে আছি। কথাটা পরে শুনেছিলাম। বাবার আর সেদিন অফিসে

যাওয়া হয়নি। উনি রামুদাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। এদিকে আমাদের ইস্কুল যাবার সময় হল। ইস্কুল যেতে ইচ্ছেও হচ্ছে না। মা জোর করে পাঠালেন। রামুদাকে নিয়ে বাবা তখনও ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরেননি।

এখানে ডাক্তার বলতে একমাত্র সুবোধকাকা। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলেই তেঁতুলতলা। সপ্তাহে দু'দিন ওখানে হাট বসে। হাটতলায় সুবোধকাকার বাড়ি। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে কিছুদিন উনি একটি সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারি করেছিলেন। আমাদের গ্রামে তখন আবার অদ্ভুত একটা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। গ্রামের লোকেরা গিয়ে ভিড় জমাল সুবোধকাকার হাসপাতালে। হাসপাতালটা অবশ্য খুব একটা দূরে নয়। এখান থেকে বাদশাহি সড়ক ধরে বড় জোর পাঁচ ক্রোশ। সুবোধকাকাই রোগীদের পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। কালাজ্বর। আগে এই রোগ হলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু এখন ওর ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সুবোধকাকার ওষুধে সবাই সুস্থ হল। ভাল ছাত্র হিসেবে আগেই ওঁর নাম ছিল। তারপর ভাল ডাক্তার হিসেবেও স্বীকৃতি পেলেন। গ্রামের সবার অনুরোধেই সুবোধকাকা গ্রামে ফিরে এলেন, আর ডাক্তারখানা খুলে বসলেন হাটতলায় নিজেদের বাড়ির বৈঠকখানায়।

হাটতলা আমাদের বাড়ির খুব কাছে। রামুদাকে নিয়ে বাবার ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কথা নয়। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে শুনলাম, বাবা ফিরেছেন দুপুর নাগাদ। সুবোধকাকা খুব যত্ন নিয়ে রামুদাকে দেখে বলেছেন চিন্তার কারণ নেই। আরও কী কী যেন বলেছেন। বাবাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারি না। ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিলাম দেখে মা নিজেই কথাটা আমাদের বললেন। তবে মা এমন একটা কথা বললেন, যা শুনে খটকা লাগল।

"এবার থেকে রামুর সামনে আর গল্পগুজব করা যাবে না। ওর মনটা খুব নরম। কখন কী ভেবে বসে।"

"কী হয়েছে মা?"

"কী আবার! ওই যে তোর বাবা ডলফিনের গল্প জুড়ে ছিলেন ওর সামনে। তা থেকেই তো যত গন্ডগোল। বলি, রামুর কি আর মাথার ঠিক আছে? ডলফিনের কথা শুনে নিজেকেই ও ডলফিন ভাবতে শুরু করল। যত ঝামেলা সব আমার কপালেই জোটে।"

সেদিনই জানলাম, রামুদা আমাদের কেউ নন। অনেক দিন আগের কথা। বাবা যেমন এখন গ্রামের সমবায়-অফিসে কাজ করেন, তখন কিন্তু ওঁর কোনও

চাকরিবাকরিই ছিল না। আমাদের এক আত্মীয় কাজ করতেন আসানসোলের কাছে কোলিয়ারীতে। চাকরির খোঁজে বাবা ওঁর কাছে গিয়েছিলেন। কয়েকবার ঘোরাঘুরির পর চাকরিও একটা পেয়েছিলেন। চাকরি বলা ভুল। আসলে ঠিকেদারির কাজ। কোলিয়ারির কাজে লোকজন আনতে বাবাকে মাঝেমধ্যেই সিংভূম, ছোটনাগপুর, গোরক্ষপুরের মতো জায়গায় যাতায়াত করতে হত। ঠিকাদারির কাজ জমে উঠলে বাবা কোলিয়ারিতেই বাসা করলেন। আর ওই কোলিয়ারিতেই ঝড়-বৃষ্টির এক রাত্রে রামুদাকে আমাদের বাড়ির দরজায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তারও বছর পনেরো পর আমার জন্ম। কোলিয়ারির বাসা উঠিয়ে বাবা তখন গ্রামে নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে এসেছেন।

রামুদার কথা যত শুনছি, ততই আরও বেশি করে ওঁর ওপর মমতা হচ্ছে। আমরা সেদিন আর খেলতে গেলাম না। রামুদার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবলাম। দরজা আজও ভেজানো। তাই ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধা হল না। দেখলাম, রামুদার ঘরের পশ্চিমের জানলাটা খোলা। সেই জানলা দিয়ে বিকেলের তেরছা রোদ ঘরে এসে পড়েছে। বাইরের নিমগাছের পাতা অল্প হাওয়ায় কাঁপছে। ঘরটা আগের মতোই ফিটফাট, তকতকে। রামুদা ঘুমোচ্ছেন। সুবোধকাকা বোধহয় ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। না হলে এই সময় রামুদা ঘুমোবেন তা হতেই পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় পিছন ফিরে আবার রামুদার দিকে তাকালাম। দু'টি চোখই বন্ধ। নীল সমুদ্রের ডলফিনের শিস্‌ও আর আমরা শুনতে পাচ্ছি না।

কিন্তু আরও ঘোর বিপদের দিন যে এগিয়ে আসছে, তা জানার উপায়ই তখন ছিল না। সুবোধকাকার ওষুধে, মায়ের যত্নে রামুদা সুস্থ হয়ে উঠলেন। খাবার টেবিলে দু'বেলা আবার আমাদের গল্প জমে উঠল। মা যে বলে দিয়েছিলেন, রামুর সামনে কোনও গল্পগুজব করবে না, সেই কথাটাই আমরা ভুলে গিয়েছি। আসলে সুবোধকাকাই নিশ্চয় কথাটা বাবাকে বলেছিলেন। বাবা আবার কথাটা মাকে জানান। মা সেটাই আমাদের জানিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনা যা'ই হোক, রামুদার সামনে আবার গল্পগুজব পুরোদমে চলতে লাগল। এভাবেই এসে পড়ল ডাইনোসরের কথা।

একটা পত্রিকায় ডাইনোসর প্রজন্মের খুঁটিনাটি খবর দেওয়া হয়েছে। তাতেই পাওয়া গেল আলট্রাসরাস, সুপারসরাস-এর বিবরণ। ডাইনোসর-এর বিবরণ। ডাইনোসর বংশে এরাই নাকি নতুন সংযোজন। এক একটা আলট্রাসর, সুপারসর হত পাঁচতলা বাড়ির মতো লম্বা। খাবার-টেবিলে বাবাই খবরটা পরিবেশন করলেন। শোনামাত্রই রামুদা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মনে হল,

প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে যেন উনি ফিরে গিয়েছেন। সেই মুহূর্তে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম, কী ভুলটাই না বাবা করে বসলেন।

আমাদের বাড়িতে একটা ঝড় বয়ে গেল। সুবোধকাকা বারবার এসে রামুদাকে দেখে গেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রামুদা নাকি অস্বাভাবিক রকমের ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। ওঁর ঘরে আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। একবার ভেতরে যেতে পারলে বুঝতাম সত্যিই ওঁর কী হয়েছে।

তবে কানাঘুষোয় জানা গেল, সুবোধকাকা বলে দিয়েছেন রামুদাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। ওঁর নাকি থাইরয়েড-এর কী অসুখ হয়েছে।

সুবোধকাকাই বলে দিয়েছেন, এরপর আমরা যেন রামুদার সামনে ভুলেও কোনও জীবজন্তুর গল্প না করি। আর যদি করতেই হয়, তা হলে পিঁপড়ের গল্পই করা ভাল। ডাইনোসরের চেহারাটা থেকে তবেই উনি মুক্তি পাবেন। তা ছাড়া রামুদাকে নাকি আর সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়ার কোনও উপায় নেই।





পদ্ম মণ্ডলের গল্প (আর আমরা)

নবনীতা দেবসেন

ডাক্তারবাবু বাড়িতে এলেই উৎসব। লোকের বাড়িতে ডাক্তার আসা মানেই মন খারাপের উদ্বেগের কথা তো? আমাদের মোটেই তা নয়। ডাক্তারবাবু আমাদের বন্ধু। অসুখ না করলেও আসেন। এসে গল্প বলেন। ছোটরা-বড়রা সবাই বসে যাই তাঁর সামনে, মা সুদ্দু। ডাক্তার-বাবুর বড় মেয়েটি যে মার চেয়েও বড়। তার ছোট ছেলেই মার বয়সী। মাও ছোট মেয়ে হয়ে গল্প শুনতে বসে যান। 'ডাক্তারবাবু, ট্যাটনের গল্প বলুন!'— ডাক্তারবাবু! আপনার চৈতন ঘোড়ার গল্পটা বলুন!' মার দেখাদেখিই আমরাও শিখেছি ডাক্তারবাবু

এলেই গল্প বলুন! গল্প বলুন! চেঁচাতে। ডাক্তারবাবু ও জমিয়ে বসে গল্প বলেন। ছুটির দিনে ডাক্তারবাবুর আসাটা তাই আমাদের বাড়িতে মস্ত একটা উৎসবের মতন। কতো যে গল্প আছে তাঁর ঝুড়িতে। একটা একটা গল্প অনেকবার শুনেও, আবার শুনতে ইচ্ছে করে। এত সুন্দর করে বলতে পারেন। তবে মাঝে মাঝে গল্পের শেষ অংশটা ভুলে যান। বলেন— 'বিবাশী বছর বয়েসে কি অতটা মনে থাকে'? যে পর্যন্ত মনে আছে বলে দিলাম। বাকিটা তোমাদের মাকে বলো, বানিয়ে দেবেন। ওই তো আস্ত গল্প লিখিয়ে মজুত আছেন তোমাদের ভাঁড়ারেই, তবে বেশির ভাগ গল্পই ওঁর জীবনের ঘটনা, তার শেষগুলো ওঁর মনে থাকে।

ছেলেবেলায় যেসব গল্প তাঁর মায়ের দিদিমার মুখে দিদিমা ঐ মা'য়ের মুখে শোনা, সেগুলোর শেষ-টেষগুলো একটু ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। আর বিক্রমপুরের সেই বর্ষাকালে, নদীর জল বেড়ে উঠলে ওঁদের ঘরবাড়িটাড়ি সব জলের নিচে চলে গেলে মাচার ওপরে বসে বসে যখন ভাত রান্না করে খাওয়া হত, আর সবাই মিলে অন্য একটা মাচার ওপরে রাত্রে শোওয়া হতো, সেই সময় ওঁদের প্রতিবেশী পদ্ম মণ্ডল মশাই গান গেয়ে আর গল্প বলে পাড়ার ছোটদের সারারাত ভুলিয়ে রাখতেন— সেই গল্পগুলোরও ঠিক খেই থাকে না। গানগুলো আর মনে নেই কিনা'? গল্পগুলোর আধখানা যে বলা হতো গান করেই।

ডাক্তারবাবু এই সব বিক্রমপুরের গল্প আজ আমাদের কানে রূপকথার মতো শোনায়।

—'মাচার ওপরে'? সারাদিন'? সারারাত'?'

কী করবো'? জল বেড়েটেড়ে বাড়ি বাড়ি ঘর দুয়ার সব তো জলে ভরা। টৈটম্বুর। থাকতো কোথায়'? বসতো কিসে'? পদ্ম মণ্ডল আমাদের পাশের বাড়ির লোক, তাদের জমি নিচু, জল হলে আর রক্ষা নাই। দিনের বেলায় যে যার নিজেদের বাড়িতেই বাঁধা একটা মাচায় উঠে বসে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করে আর রাত্রে আমাদের উঠানের মাচায় শোয়। আমরা সবাই, সব বাচ্চারা এক সঙ্গে— সে যা বিমল আনন্দ, কী বলি!' শুনেই আমাদেরও বিমল আনন্দ।

—'পদ্ম মণ্ডলের গল্প বলুন, ডাক্তারবাবু!

—কোনটা'? ট্যাটনেরটা'? না শোলমাছেরটা'?'

ট্যাটনের গল্প হলো সিরিয়াল, অনেকটা সুপারম্যানের মতো। ট্যাটনের খালি বয়েস অল্প। কিশোর ছেলে। সে জল ডাকাতদের হাত থেকে মা-ঠাকুমা

বাপ-জ্যাঠাদের উদ্ধার করে কেবল তার অসীম সাহস, আর প্রবল উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। তার গল্পগুলোই ডাক্তারবাবুর নিজের সবচেয়ে পছন্দ, কিন্তু কোনটাই শেষ অবধি মনে পড়ে না বলে আমাদের অপছন্দ।

'শোলমাছেরটা কখনও শুনিনি। সেটাই বলুন।'

সেই পোড়া শোলমাছ পালিয়ে যাওয়ার গল্প নয়তো? মা বলেন। সেই শনির গল্প?

'না তো! এই শোল মাছটারে পুড়াইবে কি, এরে তো মুক্তিই দিয়া দিল কমবুদ্ধির বউ।'

'শুনি? শুনি? শুনি?'

শোনো। এক ছিল কমবুদ্ধির বউ। বউ বেচারীর কমবুদ্ধি বলে বড় দুঃখ। তার মনটা নরম, মানুষটাও ভাল, কিন্তু বুদ্ধিটা বড় কম। একদিন তার স্বামী একটা মস্ত শোলমাছ জ্যান্ত ধরে এনে তাকে বলল, 'বউ রান্না করো।' বউ তো রাঁধতে বসেছে। মাছটাকে কুটতে হবে প্রথমে। কিন্তু যেই বঁটির কাছে নেওয়া, শোলমাছ ছটফট ছটফট করে উঠলো। শেষে বউর হাত ফসকে পালিয়েই গেল। বউটার খুব মায়া করলো। আহা রে। মরতে আর কারই বা ভাল লাগে। যাহোক, বউ তাকে ধরে এনে আবার কুটতে বসলো। মস্ত বড় শোলমাছ। আবার ছটফট করতে করতে সে জোর করে আবার পালালো। কিন্তু বউ তাকে এবারও ধরে ফেলেছে। রান্না ঘরের মধ্যে থেকে তো মাছ বেরুতে পারছে না? চার দেওয়ালের মধ্যেই আছে। তিনবারের বার শোলমাছ এমনই ছটফট সুরু করলো যে বঁটিই উলটে গেল। বউ মায়া করে বললে— 'যাঃ তোকে আর কেটেকুটে কাজ নেই। তুই বড্ড ভিতু মাছ। চল তোকে পুকুরে ছেড়েই দিই!' এই বলে তাকে নিয়ে গিয়ে খিড়কির পুকুরে ছেড়ে দিলে কমবুদ্ধির বউ। এদিকে সেই অকাজ তার ছোট ননদ তো দেখে ফেলেছে। ননদ এসে বললে— বউদিদি মাছ কই! মাছ রাঁধো ভাত খাবো!' তখন বউয়ের ভয় হয়ে গেল। তাই তো? শাশুড়ি ননদ, স্বামী শ্বশুর, সকলে খেতে বসবেন, সে মাছ রান্না করবে কেমন করে? মাছ তো রাঁধতেই হবে! কিন্তু এখন মাছ পাবে কোথায়? কমবুদ্ধির বউটি ঘাটে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।'

ডাক্তারবাবু এইখানে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন— পদ্ম মণ্ডল এইখানে একখান গান গাইতো, আমার সেটা মনে পড়ছেনা। সেই গানটা যখন পদ্ম মণ্ডল গাইতো না, আমরা ছোটরা প্রত্যেকে চোখের জলে ভেসে যেতাম। কেঁদে কেঁদে মাচাতেই বান ডাকিয়ে ফেলতাম। বড়রাও ধুতির খুঁট দিয়া—'

ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে একটু এক লাইন দু'লাইন বাঙালভাষা বলেন। বেশি না।

'গানের কথাগুলি না, ভা-রি দু:খের ছিল! মায়া মমতা কইর‍্যা দিলাম মাছটারে ছাইর‍্যা, অখন আমারে কে দ্যাখে, কে মায়া মমতা করে'? এই আর কি। কান্দতে ..... কান্দতে.....কান্দতে বউ দেখলো পুকুরের এক কোণায় একটা বক বসে আছে। বক মাছ ধরছে। বউয়ের মনে হলো এইতো'? এই বক বাবাজীরেই ধরি গিয়া। সে তখন বকের কাছে গেল। বকের কাছে গিয়ে বললো— বলে ডাক্তারবাবু আবার থেমে যান। আবার চুপ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী ভাবছেন।

'অ ডাক্তারবাবু। বলুন না'? তারপর কী হলো'? বকের কাছে গিয়ে বউটা বককে কী বললো'?'

'বকের কাছে যাইয়া'? বকের কাছে যাইয়া তো কমবুদ্ধির বউ আবার একখানা গান গাইয়া মাছ-ভিক্ষা করলো। সেই গানটাই ভাবতাছি। মনে আর পড়ে না। সেই গানখানাও যা গাইতো না, পদ্ম মণ্ডল'? বুড়ামানুষ'? কিন্তু কী গলা! যেন ম্যাজিক ছিল গলাতে। বউটার দুঃখ যেন টুপ্ টুপ্ কইর‍্যা ঝইর‍্যা ঝইর‍্যা পড়তো ওর গলার থিইক্যা। কিন্তু গানটাই তো মনে আসে না!'

'ঠিক আছে বুঝে গেছি। গান গেয়ে মাছ ভিক্ষে চাইলো বউটা, বকটার কাছে। এই তো'? তারপর'? তারপর কী হলো ডাক্তারবাবু। বক মাছ দিলো'?

'তা তো মনে নাই'? এক্কেরে ভুইল্যা গ্যাছি। এই য্যাঃ!' ডাক্তারবাবু জিব কাটেন। আমরা প্রায় কেঁদে ফেলি।

'ওমা! সে কি'? এত গান শুনলেন, এত কান্নাকাটি করলেন, শেষটা কী হলো সুখের না দুঃখের, তাও মনে নেই'?'

'গানগুলা এতই সুন্দর, এত দুঃখের, যে তার এফেক্টেই বোধকরি গল্পটা আনইম্পর্টাণ্ট হইয়া গ্যাছে। মনেই নাই।'

'বউটার কী হলো কিছু মনে নেই'? শাশুড়ি তাকে বকাবকি করলো কিনা'? বক মাছ দিলো কিনা'? একটু ভাবুন না, প্লীজ'?'

'বক বোধহয় মাছ দ্যায় নাই। এই শাশুড়ি বউয়ের গল্পগুলার সবই ট্রাজিক এন্ডিং হইত। যেমন তিলে—চোক্‌লায় পু....র্ পু....র্।'

'সেটা আবার কি'?'

'সেটা ঘুঘুজাতক।'

'অর্থাৎ'?'

'অর্থাৎ হেটা ঘুঘুপাখির জন্মকথা। আগে তো ঘুঘুপাখি ছিল না'? কেমন কইর‍্যা হইলো, সেই কথা।'

'কেমন করে হলো?'

'শাশুড়ি তো বলেছে বউকে জাঁতায় তিলের খোসা ছাড়িয়ে আনতে। বউ এনেছে। তা খোসা ছাড়ালে তো তিলের ওজন কমে যাবেই। শাশুড়িই দুষ্ট প্রকৃতির। সে ইচ্ছা করে বলছে 'তিলের ওজন কেন কমে গেছে বউমা তুমিই চুরি করেছো।' বউ হিসাব বোঝাবে কি, চোর বলেছে বলে তার মন খুবই খারাপ হোলো। তার সারা গায়ে তখনও তিলের খোসা উড়ে লেগে আছে—বউ বললো তিলে-চোক্‌লায় পু...র পু...র! পু...র্ পুর্।' বলতে বলতে ঘুঘুপাখি হয়ে উড়ে গ্রামের বাইরে চলে গেল যেখানে জন বসতি নাই। ঘুঘ্ ঘু..ঘু..বলে না, ঘুঘুপাখি'? 'পু....র্ পু...র্' ঠিক ঐরকমই শুনতে। অবিকল ঘুঘুর ডাকের মতো ডেকে ডেকে বলতো পদ্ম মণ্ডল। বউটা মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে ঘুঘুপাখি হয়ে উড়ে চলে গেল। তাই তো ঘুঘুপাখির সারা গায়ে অমন ফুট্ ফুট্। ঐ তিলের খোসার ছাপ লেগে আছে। বউ আজও কেবল শাশুড়িকে বলছে 'তিলে-চোক্‌লায় পু..র্ পু..র্। পু...র্ পুর্।' ডাক্তারবাবু দুঃখী মুখে চুপ করে যান। গলা শুনে আমাদেরও মন বিষণ্ন হয়ে গেল। টুম্পাটা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়।

'কিন্তু কমবুদ্ধি বউ কি করলো'? সেও পাখি হয়ে উড়ে গেলো'? কী পাখি হলো?'

'বাকিটা'? তোমাদের মায়েরে কও না'? নাও লেখিকা, শ্যাষ কইরা দাও দিনি গল্পটা। অগো প্রাণে শান্তি দাও। বুড়া হইসি। মনেও থাকে না। শ্যাষটায় কী হইছিল, কে জানে'? তোমার মায়েরে কও সুখের শেষ বানাইতে। বউটা মানুষ ভালো ছিল।'

ডাক্তাবাবু তো ডিস্‌পেনসারিতে চলে গেলেন। আমরা ধরলাম মাকে।

'মা, গল্পটা শেষ করে দাও। লক্ষ্মীটি!'

...'তারপর, বক তো কিছুতেই বউটার কথা শোনেনা।' কি আশ্চর্য—'বলবামাত্র মা সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করে দ্যান। মারও বোধহয় রান্না শেষ না-হওয়া অবস্থায় বউটাকে ফেলে রাখা পছন্দ হচ্ছিল না।—'বউ কত কাঁদে, কত বলে—

'বক মশাইটি, বক মশাইটি,
একটা মাছ দিননা ভাইটি'?'

বক সেই এক পা তুলে বোবাকালা হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। কানই দেয়না বউয়ের কান্না-কাটিতে।

সে আসলে ভারী লোভী! একটাও মাছ দেবে না। শেষকালে মনের দুঃখে, বউ বলে—

'ঠিক আছে। সবাই তো আমাকে বকবে এখন মাছ না খেতে দিতে পারলে। তার চেয়ে আমি জলেই নেমে যাই, পদ্মফুল হয়ে ফুটে থাকি। আর আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আমাকে আর মাছ কুটতে, মাছ রাঁধতে হবে না। মাছেরাই সব আমার সঙ্গে খেলবে। বলে বউটি পায়ে পায়ে পুকুরের জলে নেমে গিয়ে খুব সুন্দর একটি পদ্মফুল হয়ে দশদিক আলো করে ফুটে রইলো। আমার কথাটি ফুরোলো।'

'ব্যাস গল্প শেষ?'

'আবার কি? পাখি তো হয়নি ফুল হয়েছে।'

'এসব দেখেও বকটার দুঃখু হোলো না? সে দুষ্টু তখনও বললো না, বউ মাছ দিচ্ছি এই নাও। গিয়ে রান্না করে শাশুড়িকে খাওয়াও? খুব স্বার্থপর তো? ওরে পদ্ম করে দিলো!'

'আর শাশুড়ি ননদরা ওকে খুঁজতে এলো না?'

'আর ওর বর? বরও খুঁজলো না? কেউ না?'

'জ্বালাতন— তবে শোন্' মা আবার সুরু করেন।

'বউ তো জলে নেমে গিয়ে পদ্মফুল হয়ে ফুটে রইলো। পদ্মটি কী সুন্দর দেখতে, দক্ষিণা বাতাসে হেলে দোলে, তার সুগন্ধে পুকুরপাড় ভরে গেল। সেই শোলমাছ তার সঙ্গে খেলা করতে এলো। পুঁটিমাছ, মৌরলামাছ, রুই, কাতলা, বেলে, মৃগেল, সবাই পদ্ম বউয়ের সঙ্গে খেলা করতে লাগলো জলের মধ্যে। মনের সুখে। এদিকে শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে! বউ কোথায় গেল? এই তো ছিল পুকুর পাড়ে? গেল কোথায়? কোন বাদাড়ে? দ্যাখ তো খুঁজে ঝোপে ঝাড়ে—লুকিয়ে আছে আড়ে পাড়ে। খাওয়া-দাওয়া হয় নি তো কারুর—রান্নাই হয়নি— সবাই অস্থির। কিন্তু খুঁজে পাবে কেমন করে? সে তো পদ্মফুল হয়ে গিয়েছে। ননদ এলো, খুঁজেই পেলো না। শাশুড়ি এলো। বককে ডেকে জিজ্ঞেস করলো—'বকমশায় বকমশায়। বউমা আমার গেল কোথায়?' বক নিশ্চুপ। কিছুই বলে না। শেষে তার বর এলো। বরকে দেখেই সেই পদ্মফুল থেকে এক ফোঁটা শিশির টুপ্ করে খসে পড়লো পদ্মপাতার ওপরে। বর সেটা দেখলে। আর দেখলে,

অসময়ে চৈত্রমাসে পদ্মফুল ফুটেছে। পদ্মফুলটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতেই সে ঠিক চিনতে পেরে গেল— 'আরে'? এই তো আমার সেই কমবুদ্ধির পদ্মবউ'? আহা, বেচারী ভালো মানুষ, ভয়ে, দুঃখে শেষে ফুল হয়ে পুকুরের মধ্যে লুকিয়েছে!' বর আদর করে তখন ডাকলে—'পদ্মবউ, সোনাবউ

কে বলেছে বুদ্ধি নেই'?
ঠিক করেছে ছেড়ে দিয়েছো
চোতমাসে শোল খেতে নেই

সেই থেকেই ফাল্গুন চোতে বাঙালিরা শোল মাছ খায়না।'

মা থামলেন। কৌটো খুলে এলাচ খেলেন।

'শেষ?'

'ব্যাস্'? এই টুকুই'?

'বউটা পদ্মফুলই থেকে গেল?'

'আরে মানুষ হবে না'? কোনোদিন না'?'

'না না, এ ভালো না। বদ্‌লে দাও।'

তখন্ মা বললেন—'বেশ। বরং এই রকম হোক'?

বরের ছড়া শুনে পদ্মবউয়ের ভয় কাটলো। সে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আবার পদ্মবউ হয়ে গিয়ে, সাঁতার কেটে ঘাটে চলে এলো। বউ ঘাটে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে শোলমাছও আপনিই চলে এসেছে। সেও এখন নির্ভীক। সে জানে 'চৈত্রমাসে শোলমাছ খেতে নেই'। বরকে দেখে বউ মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে, বললে—'এই যে তোমার শোলমাছ। বড্ড ছটফট্ করছিলো, তাই—' আদর করে বর বললে, 'পদ্মবউ, ভয় কিসের'? মায়া মমতা তো খুব ভালো জিনিস। তুমি বরং অন্য কিছু একটা আলু কুমড়ো যাহোক কিছু রান্না করে ফ্যালো তো, আমরা খেতে বসি।' বলে—বর গেল নাইতে। আমার গল্পটি ফুরোলো। পদ্মগাছটি মুড়োলো। পদ্মবউ জুড়োলো। এবার ঠিক হয়েছে তো'? যাও, চান করতে যাও। এবারে আমাদের সকলেরই নাওয়া-খাওয়ার সময়।' রান্নাঘর থেকে রোববারের মাংস রান্নার গন্ধ আসছে। টুম্পা নাছোড়।

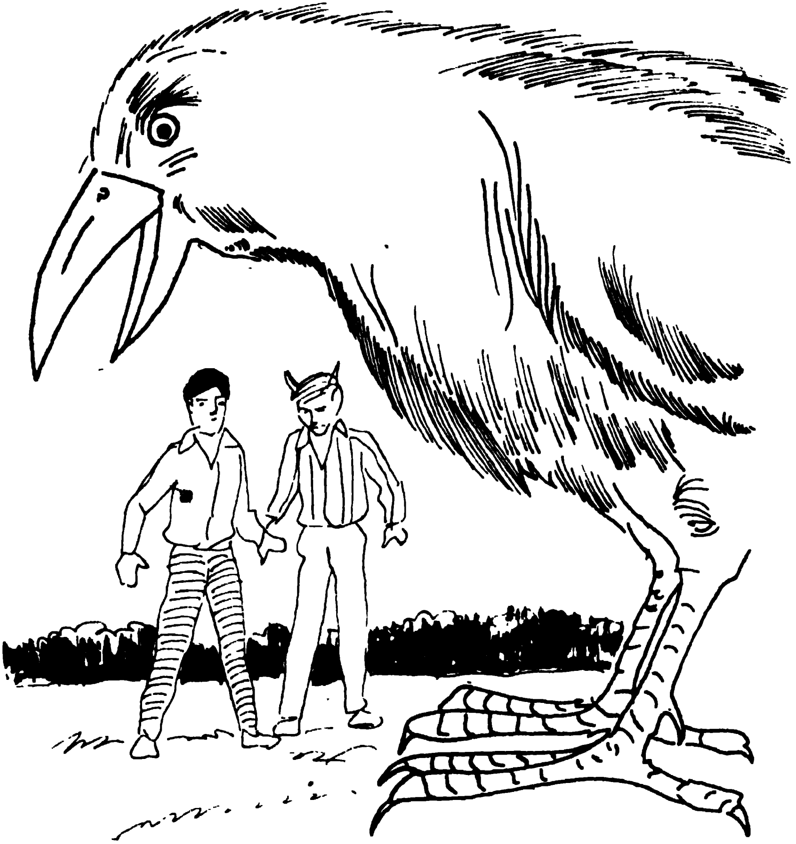
'কিন্তু সেই দুষ্টু বক'? লোভী বকটা'? যে মাছ দিল না'? তার শাস্তি হবে না?'

'শাস্তিও চাই?' মা বললেন, 'তাহলে বর যখন নাইতে গেল, বকটাকে

দেখেই তার পাখির মাংস খেতে ইচ্ছে হোলো। সে একটা গুলতি ছুঁড়ে বকটি মেরে, পালক টালক ছাড়িয়ে, কেটে কুটে বউকে এনে দিয়ে বললে—'মাছ নেই, বউ, ঠিক আছে আজ বরং মাংস হোক।' যেমন লোভী বক, যদি তখনই বউকে একটা মাছ দিয়ে দিত তাহলেই ওকে আর মরতে হোতনা। সাধে বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'?' কী? ওটা কেমন? এবার হয়েছে? ফাইন্যাল! আর বদলাতে পারবো না কিন্তু! এবার আমারও খুব খিদে পেয়ে গেছে।'

মা উঠে পড়লেন।





চাঁদনি রাতে কাকের গান

কিন্নর রায়

গান শুনেছেন কাকের ?

হাঁফ ছাড়ার জন্যে এসেছি কয়েকদিন। কলকাতায় থাকলেই ঝক্কি আর ঝামেলা। রিপোর্টার, ডাক্তার আর পুলিশ, এদের জন্যে যেন কোনো ছুটি থাকতে নেই। 'দৈনিক ভোরবেলা'-র রিপোর্টিং করতে করতে হাড়-মাস কালি। আজ কর্পোরেশান ইলেকশান, কাল খুন, পরশু নেতার পদত্যাগ, মাথার ভেতর সব সময় খবর করার চরকিবাজি।

এই বর্ষায় ভেবেছিলুম পুরী যাব, কাছাকাছির ভেতর সমুদ্র, কলকাতার দমবন্ধ ভাব নেই। একদম আকাশের দিকে পা তুলে শুয়ে শুয়ে কাটাব কয়েকদিন। খাওয়া বিশ্রাম ঘুম, মনে মনে ঠিকও করেছিলুম সেরকমই। হঠাৎ প্ল্যান দিয়েছি পাল্টে। আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যবাবু ছুটি নিচ্ছি, বাইরে যাচ্ছি শুনে বললেন, কোনারক চলে যাও। সূর্য মন্দিরের কিছু আগে চন্দ্রভাগা যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তার কাছাকাছি কলকাতার এক নামকরা রং কোম্পানির মালিকের ছোট একটা বাড়ি আছে। মালিক বিশেষ বন্ধু। এই বর্ষায় পুরী কোনারক সবই 'ডাল সিজন'। সুতরাং থাকার কোন অসুবিধা নেই।

সত্যবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে পেয়ে গেলেন রং কোম্পানির মালিককে। কথা হল। বাড়ি পাবার ব্যবস্থাও পাকা। ঠিক হল আমি পুরী হয়ে কোনারক যাব। পুরীতে একদিন কাটিয়ে তারপর এসেছি। বাসে পুরী। সেখান থেকে মোটর ভাড়া করে এইখানে।

চারপাশে ফাঁকা ফাঁকা। ছোট্ট একটা বাড়ি। একজন কেয়ারটেকার। চৌকিদারও একজন। রান্নাবান্না ভালোই, দুজনেই উড়িষ্যার মানুষ। ভালো বাংলা বুঝতে পারে। বাড়ির নাম 'রামধনু'।

এখান থেকে চন্দ্রভাগার মোহানা সামান্য দূরে। চৌকিদারের সাইকেলে রোজই বেড়াতে যাই। পাশেই সমুদ্র। সকাল সাড়ে আটটা নটা নাগাদ পুরী থেকে আসা ট্যুরিস্ট বাসেব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। একটার পর একটা। কোনারক সূর্য মন্দিরে যাবার আগে মানুষজনে এখানে চা-জিলিপি সিঙাড়া খান। বড় বড় ডাব পাওয়া যায়, ভালো শাঁস আর জল। একটা এক টাকা। মিনিট পনের দাঁড়ায় বাস। তখনই যা একটু জমজমাট। ব্যাচাকেনা। তারপর সব চুপ। গোটা তিনেক চা সিঙাড়া জিলিপির দোকান। দুটো ডাব বিক্রির চালাঘর। একটা পান বিড়ি সিগারেট ব্যাচার জায়গা।

ঘুম ভাঙে অনেক সকালে। একটা গোটা পাতিলেবু দেয়া আধ কাপেরও কম চা খেয়ে বাথরুম। বাইরে তখন ফুটিফুটি আলো। সামনের বাগানে পাখিদের প্রভাত বন্দনা। ইজিচেয়ার টেনে বারান্দায় আধশোয়া হই। হাই তুলতে তুলতে সবুজের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ি। দু একটা মশার কামড়, জেগে উঠি।

সূর্য তখন সোনালি আলোর চাদর জড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর গায়ে। আমার টোস্ট আর ডবল ডিমের পোচ এসে যায়। খেয়ে সাইকেল চালিয়ে সমুদ্রের পাড়ে। দুপাশে লম্বা লম্বা ঝাউগাছের মাথায় তখন রোদ্দুরের গুঁড়ো গুঁড়ো রং।

এখন, এই বর্ষায় বেড়াতে আসা মানুষ কিছু কম। সমুদ্রের পাড়ে সাইকেল

রেখে বালির ওপর বসে আছি। মেঘ আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে আকাশ। আলো ডুবে গেল মেঘের ভেতর। আর তখনই দেখতে পেলুম তাকে। পরে তার নাম জেনেছি স্যার ন্যায়বান।

একটু কুজো হয়ে হাঁটছিল। ল্যাগব্যাগে প্যান্ট, ঢলঢলে একটা কোট মতো গায়ে। মুখময় খাপচা খাপচা দাড়ি। লম্বা, কিন্তু ঘন নয়। মাথায় নুলিয়াদের তেকোনা টুপি, তালপাতার। এদেশী গ্রামের মানুষ যেমন ভাঁজ না করতে পারা তালপাতার ছাতা নেন, তেমনি ছাতা মাথার ওপর। চোখে কালো ঠুলি-চশমা, পায়ে কাঠের খড়ম।

মেঘমাখা আকাশ আর সমুদ্র এখন প্রায় এক। ঢেউ এগিয়ে আসছে পায়ের কাছে। সরে বসব ভাবছি, তার আগেই এই কিম্ভুত চেহারা। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে সমুদ্র অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়ে গেল আমায়। আর তখনই বৃষ্টি এলো। তাড়াতাড়ি উঠে সাইকেল তুলে নিয়ে ছুটব ভাবছি। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় কে যেন ডাকল ও মহাই, ভিজছেন কেন? ছাতার নিচে আসুন। ছাতার নিচে আসুন। বলতে বলতে নিজেই সেই তালপাতার ছাতা মেলে ধরল মাথার ওপর। সত্যি বলতে কি লোকটার গা থেকে, নাকি জামা থেকে বিশ্রি ছাগল ছাগল গন্ধ আসছিল। কোন রকমে নাম মুখ টিপে হাঁটছিলুম। জোরেই। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে আমার গোটা ডানদিক, সাইকেলও।

একটা চায়ের দোকানের ঝুপড়ির ভেতর ঢুকে কাঁপছি। সাইকেল বাইরেই রাখলাম। তালপাতার ছাতা সমেত ভেতরে ঢুকে সেই খড়ম ল্যাগব্যাগে প্যান্ট আর তালপাতার ছাতাঅলা লোকটা ঠুলি-চশমা খুলতে খুলতে তেমনই খচমচে গলায় বলল, আমার নাম ন্যায়বান। সবাই অবিশ্যি স্যার ন্যায়বান বলে ডাকে।

স্যার শব্দটা এমন ভাবে ভেসে এলো হাওয়ায়, মনে হল যেন গরম ফ্রাইপ্যানের ওপর ওমলেটের জন্যে গোলা ডিম পড়ল।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। মেঘের ডাক। চায়ের দোকানের গুমটির ভেতর কোনো আলো নেই। একটা ছোট উনোন জ্বলছে তার আঁচে দেখা যাচ্ছে চাওয়ালার ঝাপসা মতো গা, হাতের আঙুল, নাক আর চোখের একদিক। স্যার ন্যায়বানের দাড়ি, খাড়া খাড়া একটু অস্বাভাবিক বড় কানের ওপর আর দুচোখের ঝকঝকে মণি চোখে পড়ছে শুধু।

চা খান মহাই, শীত মরবে। আবার সেই ফ্রাইপ্যানে ডিমের গোলা ছাড়ার শব্দ।

ভিজে বেশ শীত শীতই করছে, তার ওপর সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া। বললুম, বেশ তো হোক।

স্যার ন্যায়বান তাড়াতাড়ি ওড়িয়া ভাষায় চা দিতে বলল। উনোনের আগুনে দেখলাম চাঅয়ালা ছেলেটার দুটো আঙুল কাচের গেলাসে চামচে নাড়ছে।

চা খেতে খেতে স্যার ন্যায়বান তত্ত্ব তালাশ নিল আমার। কোথায় থাকি, কবে এসেছি, কি করি।

বাইরে বৃষ্টি কমে আসছে। একটা যাত্রী বোঝাই বড় বাস এসে দাঁড়াল। স্যার ন্যায়বান কানের কাছে প্রায় মুখ লাগিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলল, চাঁদনি রাতে কাকের গান শুনছেন'?

লোকটা পাগল নাকি'? গান, তাও আবার কাকের! ওদিকে কান না দিয়ে চায়ের তলানিটুকু ভালো করে নেড়ে চিনি গুলে নিয়ে গলায় ঢালতে যাব, আবার সেই এক কথা, একই সুরে—চাঁদনি রাতে....।

গেলাসটা ঠকাস করে সামনের সরু বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রেখে বললুম, কাক আবার গান গায় নাকি'?

গায়, গায়। ভালো ওস্তাদের কাছে শিখলে পরেই গায়। তবে তার জন্যে চাই সমঝদার শ্রোতা।

বলেন কি'?

বেশ তো বিশ্বাস না হয়, আসুন না বিকেলবেলা সমুদ্রের পাড়ে। আড্ডা-টাড্ডা মেরে সন্ধেবেলা চলে যাবো আমার বাড়ি। বেশি তো দূর নয়, মাইল পাঁচেক। একটু ভেতরে এই যা। তাতে কি হল! আপনি রিপোর্টার মানুষ, ভালোই লাগবে। আমার ওখানেই খাবেন। তারপর ভালো করে চাঁদ উঠলে কাকেদের গান শুনে ফিরে আসবেন। যদি খারাপ না লাগে, থেকেও যেতে পারেন। না হলে আমার নিজের রিক্সা আছে, তাতে চাপিয়ে আপনাকে পৌঁছে দেব।

শুনেছি ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। ছুটিতে এসেও ছাড়ান নেই। শিকারি বাঘ যেমন মাংসের গন্ধে চনমনিয়ে ওঠে, জাত রিপোর্টারও তেমনি খবরের গন্ধ পেলে এক পায়ে খাড়া। ভেতরে ভেতরে লোভ, এমন খবর সত্যিই যদি নিয়ে যেতে পারি, তা হলে 'দৈনিক ভোরবেলা'র ফ্রন্ট পেজে খেয়ে যাবেই। এমনকি অ্যাংকার স্টোরি-ও (খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একদম নিচে যে তিন কলম চার কলম জুড়ে রিপোর্ট ছাপা হয়) হতে পারে।

চায়ের দাম দিতে যাচ্ছিলাম। স্যার ন্যায়বান এক ধমকে হটিয়ে দিল আমায়। পয়সা দিতে দিতে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলল, পঁচিশটা কাকের গান মহাই! জ্যোৎস্না রাতে। আ, হা! মার্ভেলাস।

বাইরে এখন আর বৃষ্টি নেই। দুখানা ট্যুরিস্ট বাস এসেছে পুরী থেকে।

এখান থেকে যাবে কোনারক। যাত্রীরা নেমে চা জিলিপি সিঙারা নিমকি খাচ্ছে। সাইকেলের সিট রুমালে মুছে প্যাডেলে চাপ। সোজা 'রামধনু'।

ও বাবা! ওর মাথায় শিং!

সারা দুপুর কাটল মোটামুটি উত্তেজনার ভেতর। তেমন ঘুমও এলো না। কচি মুরগীর ঝোল আর ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে নিলুম। সারাক্ষণই মাথার ভেতর স্যার ন্যায়বান। ন্যায়বান, আর তার গান গাওয়া পোষা কাকেদের ছবি নিতে পারলে দারুণ জমে যেত লেখা। ক্যামেরা আনি নি। দেখি, সেরকম বুঝলে কাল কোনারকে গিয়ে নিয়ে আসব কোনো স্টুডিওর ফটোগ্রাফার।

এইসব সাত সতের ভাবতে ভাবতেই বেলা তিনটে।

আবার লেবুচা। দাড়ি কামিয়ে, জামা কাপড় পরে, টর্চ, পেন আর নোটবই একটা ব্যাগে গুছিয়ে চৌকিদারের সাইকেলে সমুদ্রের পাড়ে।

এবেলা বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশ মেঘে সাজা। সকালের সেই চা দোকানে বসে বসে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে চাওয়ালা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করি ন্যায়বানের কথা।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় ও বললে, এই পাগলা মতো বুড়োটা এখানে আছে প্রায় বছর দুয়েক। কোথায় বাড়ি ওর কেউ জানে না। তবে মাঝে মধ্যে রাতবিরেতে সমুদ্রের পাড়ে দেখা যায়। হাতে জোরালো আলো, আর বড় সড় জাল। কি যেন টেনে তোলে সমুদ্র থেকে, নাকি জাল বেঁধে ভাসিয়ে দেয়, তাও জানি নে...।

কথা ফুরলো না। দোকানের সামনে ন্যায়বান। সেই সকালের পোশাক। শুধু খড়ম নেই, খালি পা। মাথায় তালপাতার টুপির বদলে একটা বড় লাল রুমাল বাঁধা।

কি এসে গেছেন! বেশ, বেশ। চলুন চা খাই।

হাতের গেলাস দেখালাম। আপত্তি করলাম। কে কার কথা শোনে!

মেঘলা মতন আলোয় আমার কেমন যেন মনে হল ন্যায়বানের রুমাল ঢাকা মাথায় উঁচিয়ে আছে ছোট্ট দুটি শিং। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে সাপের চলাফেরা। গা-শিরশির।

বোটকা গন্ধ ছড়িয়ে হাতের তালপাতার ছাতা সমেত দোকানের ভেতর চলে এলো। মনে মনে ভাবছি যাব কি যাব না। ঢোঁক চেপে বললাম, যেমন মেঘলা, রাতে আবার জ্যোৎস্না...।

কথা শেষ হল না। খুব থাকবে। খুব থাকবে জ্যোৎস্না-বলতে বলতে

বাঁশের খুঁটিতে একটা টোকা দিল ন্যায়বান। তারপর আবার বলল, আপনার জন্যেই মহাই খালি পায়ে নিজের রিক্সা নিজে প্যাডেল করে এলুম।

আর এক গেলাস চা খেতে খেতে বাইরে বিকেল সরে গেল। টুপ করে নেমে এলো অন্ধকার। ন্যায়বান বলল, চলুন, ওঠা যাক।

ন্যায়বান নিজের রিক্সা নিজে চালিয়ে যাচ্ছে। আমি সাইকেলে। অনেকবার রিক্সায় বসতে বলেছিল, রাজি হই নি। রিক্সা চলেছে, পেছনে সাইকেল। রিক্সার সিটে শোয়ানো সেই তালপাতার সাবেক ডিজাইনের ছাতা। দু'পাশে অন্ধকার রাস্তা। একটা দুটো বাড়ি। সেখান থেকে চুঁইয়ে আসা তেলের আলো। ঝাউগাছ, তাল গাছ, কৃষ্ণচূড়া আর নারকেল গাছ। তাদের গায়ে গায়ে লেপ্টে আছে জোনাকি। আমাদের গায়ে, কানের পিঠে, দুপাশে জোনাকির আসা যাওয়া।

গল্পের নটে গাছ

ঘড়ি দেখলুম, সাড়ে সাতটা। পৌঁছে গেছি বলেই মনে হল। কারণ ন্যায়বানের রিক্সা থেমেছে। সাইকেলও থামিয়ে দিলাম।

সামনে একটা ফালি সুড়ঙ্গ, অন্ধকার। টর্চ জ্বালালুম। সরু আলো কেটে দিল অন্ধকার। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিরক্তি তুলে ন্যায়বান বলল, আঃ, টর্চ জ্বালাবেন না। দুবার হাততালি দিল। দরজা গেল খুলে। ভারি লোহার দরজা। আমি স্পষ্ট দেখলুম থপ থপ করে যে জীবটি হারিকেন নিয়ে এলো, সে মানুষ নয়। তার ল্যাজ আছে, গায়ে লোম। আমার বুকের ভেতর শিরশিরানি।

হ্যারিকেন হাতে ল্যাজঅলা, থপথপে আগেআগে। পেছনে আমি আর ন্যায়বান। একটা বড়সড় ঘরের টেবিলে আলো রাখল থপথপে। এবার ন্যায়বান একটা হাততালি দিল। চলে গেল ল্যাজঅলা, থুপ থুপ করেই।

সাবেকি আমলের সোফার ওপর এলিয়ে বসতে বসতে ন্যায়বান বলল, ভালো করে ছড়িয়ে বসুন মহাই। চা আনতে বলেছি। আগে চা খান।

মিনিট দশের ভেতর চা হাজির। সেই থপথপে ল্যাজঅলার হাতে চায়ের ট্রে। তাতে বিস্কুট, চিনি লিকার দুধ। মিশিয়ে খেতে হবে। নজর করে দেখলুম ফুট তিনেক লম্বা বাঁদর বাঁদর চেহারার এক জানোয়ার। লম্বা ল্যাজ লুটোচ্ছে মাটিতে।

লিকারে চিনি দিতে দিতে দুটো তুড়ি দিল ন্যায়বান। হেলে দুলে চলে গেল ল্যাজঅলা। হাতে মুঠো করে ধরা ধুতির কোঁচের মতো ল্যাজ। আমি তো তাজ্জব।

চিত্রগুপ্তকে দেখে অবাক হবেন না। ও হাইব্রিড বাঁদর। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হিসেবে ভালো। এখন আমার গার্ড কাম কেয়ারটেকার। অর্ডার এসে গেলে, ভালো দাম পেলেই পাঠিয়ে দেব। আজকের রাতের খাওয়ার ওই যোগাড় করে রেখেছে। ফলাহার করব। ভালো পাকা কলা, আম কাঁঠাল আর আনারস। সারাদিন ঘুরে ঘুরে, এগাছে ওগাছে চড়ে সব সাজিয়ে রেখেছে চিত্রগুপ্ত। এখন খালি ধুয়ে কেটে....।

খাওয়া মাথায় উঠেছে। এখন পালাতে পারলে বাঁচি। বললাম, গান শুনব কখন।

ন্যায়বান সুরুত সুরুত করে চা খেতে খেতে বলল, দাঁড়ান। আগে রাত হক, চাঁদ উঠুক। আবার একটা চুমুক দিয়ে বলল, যাই বলুন চিত্রগুপ্ত চাটা কিন্তু খাসা বানিয়েছে।

কথায় কথায় ন্যায়বান জানাল নানান জগতের জীবজন্তুর ভেতর হাইব্রিড করিয়ে নতুন নতুন স্পিসিস তৈরির সাধনা তার। এরকম কিম্ভূত জন্তু তৈরি হলেই তাকে নানান বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে চালান করে দেয়া। কোথায় চালান করে দেয়া হয়? ব্যাপারটা কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে গেল। আমিও আপাতত আর এগোলাম না।

তারপর রাত বাড়লে আকাশে উঠে এলো চাঁদ। ঘোলা জ্যোৎস্নায় ন্যায়বানের পেছনে পেছনে অনেকটা বাগান পেরিয়ে আমি কাকেদের খাঁচার সামনে। চাঁদের আলো লেপ্টে আছে তাদের কালো ডানায়। পাতি কাকের সাইজের প্রায় দ্বিগুণ চেহারার এক একটা পাখি ঝটপট করে উঠল ডানা।

তারের জাল ঘেরা খাঁচার সামনে তিনটে হাততালি দিল ন্যায়বান। তারপর দুটো। তারপর একটা। সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশটা কাক ঝোলানো দাঁড়ে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে, কখনও ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুরু করল গান—

ক্ক ক্ক ক্ক ক্ক কা আ
ক্ক ক্ক ক্ক ক্ক কা আ
ক্কা ক্কা ক্কা ক্ক অ অ
ক্কা ক্কা ক্কা ক্ক অ
কা কা কা কা আ
কা—আ—আ

আবার ঘুরে ফিরে একই সুর।

জ্যোৎস্নায় হাততালি দিচ্ছে ন্যায়বান। সঙ্গে গলায় সা-রে-গা-মা। কাকেরা গাইছে।

হঠাৎ হাততালি থামল। সঙ্গে গান।

ন্যায়বান বলল, আমার এই কাকেরা জানেন, পাতিকাক বাজপাখি, দাঁড়কাক, কোকিল মিলিয়ে তৈরি। দাঁড়ান, ফর্মূলা বলছি।

বলতে বলতে ন্যায়বান খাঁচার দিকে আরও সরে গেল। কি যেন পাড়ছে। পাড়তে পাড়তে বলল, সপ্তাহে ওরা একদিন মাংস খায়। জ্যান্ত, টাটকা মাংস।

ন্যায়বান অন্ধকার থেকে আলোয়। হাতে একটা জাল মতো। বিপদের গন্ধ পেয়ে আমি দৌড়চ্ছি।

ও মহাই, কোথায় পালাচ্ছেন। দাঁড়ান। চিত্রগুপ্ত বড় রাগি। পেছনে না তাকিয়েও দেখতে পাচ্ছি ন্যায়বানের মাথার লাল রুমাল উড়ে গেছে, সেখানে পষ্ট দুটো শিং। তার হাতে আমাকে ধরার জন্যে জাল।

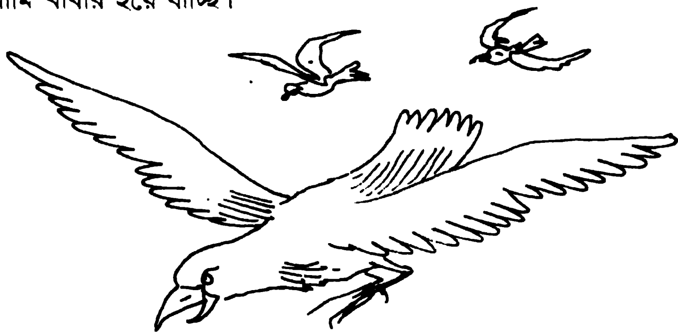
ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে আসছে। কাকের খাঁচায় দরজা খোলার শব্দ পেলাম। গান গাওয়া সেই ডানাওয়ালা মৃত্যু আমার পেছনে পেছনে।

টর্চ হারিয়েছে। এলোমেলো কোথায় ছুটছি কোনো ঠিকানা নেই।

তারপর কিসে একটা হোঁচট খেয়ে সোজা মুখ থুবড়ে মাটির ওপর। ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনছি। ডাক শুনতে পাচ্ছি। উঠতে পারছি না। পায়ে জোর নেই।

পিঠে ঠোঁটের ঠোক্কর পড়ল। মাংস খুবলে নিচ্ছে গায়ক পাখিরা। পঁচিশটা ধারালো ঠোঁট....।

আমি খাবার হয়ে যাচ্ছি।





ভূতুড়ে জমি

শচীন দাশ

নদীর ধারে ছোট একটা গ্রাম—নারায়ণপুর। এই গ্রামেরই শেষ প্রান্তে থাকে হরেন চাষী। কারও সাতে পাঁচে নেই। খুব ভাল মানুষ। শেষ রাতের দিকে ঘুম থেকে উঠেই লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায়। সারাদিন পরিশ্রম করে ফেরে সন্ধের দিকে। তারপর গাঁয়ের তেঁতুলতলায় আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করে ফিরে এসে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ কদিন হল হরেনের মন ভাল নেই। শুধু হরেন কেন, গোটা গ্রামের চাষীদের মুখেও নেমে এসেছে অন্ধকার। আষাঢ় গেল! শ্রাবণ গেল।

ভাদ্রের প্রথমে এসে এখনও বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। খাল বিল শুকিয়ে গেছে। নদীর বুকেও ঘন চড়া পড়তে শুরু করেছে। চাষবাস আর হবে না বোধহয়। বীজতলার ধান শুকিয়ে খটখটে। পাম্প চালিয়ে জল তুলবে, সে জলই বা পাবে কোথায়!

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন মাঠ থেকে একটু দেরী করেই ফিরছিল হরেন। এমন সময় কে যেন ওকে পেছন থেকে ডাকল— হরেন— এই হরেন—

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল হরেন। কে যেন ওকে ডাকছে না'? কিন্তু পেছন ফিরে তাকিয়ে কাউকে না দেখে বেশ অবাক হল। ভাবল, বোধহয় মনের ভুল। এই ভেবে যখন আবার হাঁটতে শুরু করেছে ঠিক তখুনি আবার সেই ডাকটা ভেসে এল। —এই হরেন— হরেন। দাঁড়া না বাপু। অত তাড়াহুড়ো করলে কি চলে! কখন থেকে ডাকছি।

এবারে রীতিমত চমকে উঠল হরেন। হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এসে পড়েছে সে। এমনিতেই জায়গাটা খুব নির্জন, তার ওপর সন্ধে হলে তো কথাই নেই। এদিকের রাস্তাটা আর মাড়াবে না কেউ। একটু দূরেই শ্মশান। শ্মশানের বড় শ্যাওড়া গাছটার নিচে নাকি সন্ধে থেকেই হাড় খটখটির নৃত্য শুরু হয়ে যায়। হাড় খটখটি মানে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে নাচতে শুরু করে কঙ্কালগুলো। ভয়ে সন্ধের পরে আর কেউ মড়াও পোড়াতে আসে না এদিকে। অথচ সেই রাস্তা ধরে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন এদিকে এসে পড়েছে সে খেয়াল নেই। খেয়াল হল এখন একটা অচেনা গলার স্বর শুনে।

মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেল হরেন। আর এমনি ভয়ে ভয়ে আশে পাশে তাকিয়ে যখন আর একবার খুঁজতে যাচ্ছিল ভাল করে, ঠিক তখুনি অন্ধকার ফুঁড়ে যেন একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল ওর সামনে। চুল উস্কোখুস্ক, খালি গা, পরনে এক ফালি কাপড়। চোখদুটো যেন মাঝে মাঝে ধকধক করে জ্বলছে।

হরেন কিছু বলার আগেই মূর্তিটি বলল, তুই আমাকে চিনতে পারবি না হরেন। আমি গয়েশপুরের বরদাচরণের ছোট ছেলে অলীকচরণ। এখন ওই ওদিকে থাকি—

বলে যেদিকে নির্দেশ করল, সে দিকেই তাকিয়েই চমকে উঠল হরেন। ওদিকে তো শ্মশান। তা শ্মশানে ওর বাড়ি নাকি'? তাছাড়া অলীকচরণ নামটাও যেন এখন চেনা চেনা মনে হচ্ছে হরেনের। খুব খাইয়ে লোক ছিল গয়েশপুরের

ওই অলীকচরণ। একবার খেতে বসে সাত আটজন লোকের ভাত একাই খেয়ে নিত সে। সেবার মাঠ থেকে ফেরার সময় আলের ওপরে সাপে কেটেছিল অলীকচরণকে। অনেক চেষ্টা করেও ওকে বাঁচাতে পারেননি বরদাচরণরা। অবশেষে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল যদি কোনো ওঝাটোঝার চোখে পড়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই বেঁচে ফিরে আসবে সে। কিন্তু ভাবনাই সার। এরপর কতদিন কেটে গেছে। অলীকচরণের ফিরে আসার কোনো খবরই পায়নি হরেনরা।

তবে কি এতদিন পরে হঠাৎ ফিরে এল সে। কিন্তু লোকটা যে বলছে শ্মশানের দিকে থাকে।

অলীকচরণ বলল, কি হল ভয় পেলি নাকি'? না—না ভয়ের কি! বেঁচে থাকতেও কেউ আমাকে ভয় পেত না, মরে গিয়েও কেউ দেখে ভয় পায় না। সবার ভালবাসা নিয়েই আছি বুঝলি। শুধু মাঝে মাঝে ওই যা ভীষণ কষ্ট—!

—কষ্ট! এতক্ষণে হরেনের মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এল।

অলীকচরণ বলল, হ্যাঁ রে ভীষণ কষ্ট হয় খাওয়ার কথা ভেবে। তা হ্যাঁ রে হরেন, তোর সঙ্গে যখন দেখাই হল তখন বলে ফেলি কথাটা। আমাকে একটু ভাত খাওয়াতে পারিস। কতদিন যে ভাত খাই না তোকে কি বলব। ওই শ্যাওড়া গাছে বসে শ্মশানের ওসব ছাইভস্ম খেয়ে শরীরটাই একদম মরে গেছে। কাউকে যে বলব তা তেমন লোকের দেখাই পাই না আজকাল। কাজেই তোকে যখন পেয়েছি—

কথায় কথায় হরেন ততক্ষণে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। মনে ভয় থাকলেও একটু একটু করে আবার সাহস পেতেও শুরু করেছে। সেই সাহস নিয়েই এবার আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু ভাত কোথায় পাব'? গোটা পরিবারই আজ দুদিন হল প্রায় উপোস দিয়ে বসে আছি। তার ওপর দুশ্চিন্তায় মাথার কোনো ঠিক নেই।

—কেন, কেন! তোর আবার দুশ্চিন্তা কিসের! নেই নেই করেও তো পাঁচ-সাত বিঘে জমি আছে তোর।

—তা আছে। কিন্তু আকাশের চেহারাটা দেখেছো! আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল অথচ এক ফোঁটা জল নেই।এদিকে খাল বিল শুকিয়ে গেছে। নদীর বুকে চড়া পড়তে শুরু করেছে। আর দু'দিন পরে তো লোকজন মরতে আরম্ভ করবে। তা এ অবস্থায় কারো মাথার ঠিক থাকে'?

একটু চুপ করে থেকে এবারে বলল অলীকচরণ,—তা সত্যি।

এটা অবশ্য আমি ভেবে দেখিনি। আচ্ছা হরেন, জমিতে লাঙল পড়েছে তোর'?

—বাহ্, পড়বে না। এখনো কেউ ফেলে রাখে, লাঙল দিয়ে মই লাগিয়ে জমি তো কবেই তৈরী করে রেখেছি। কিন্তু জল পেলাম কই! জল পেলে চারাগুলো এতদিনে যে বড় হয়ে যেত।

—আচ্ছা ঠিক আছে তুই কাল থেকেই চাষে লেগে পড় হরেন। তোর জমিতে জলের ব্যবস্থা করছি আমি।

হরেন বলল, জলই নেই তো ব্যবস্থা করবে কি করে'?

—সে আমি বুঝব। একটু গম্ভীর হয়ে বলল অলীকচরণ, তবে একটা কথা—তোর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করছি আমি। কিন্তু ক্ষেতের নতুন ধান উঠলে ওই চালের ভাত খাওয়াতে হবে আমাকে। পেট ভরে।

—ঠিক আছে সে আর এমন কথা কি! ক্ষেতে ধান হলে যত ইচ্ছে খেয়ো! কিন্তু একটা কথা—হরেন যেন এবারে আরও সাহসী হয়ে উঠল, আমার জমিতে শুধু ধান হলে লোকে কি আর তা আস্ত রাখবে। হতে না হতেই চিবিয়ে খাবে।

—না—না সে দায়িত্ব আমার—অলীকচরণ বলল, সেসব ব্যাপার তোকে ভাবতে হবে না। তুই এখন যা। কাল ভোরে উঠেই সোজা ক্ষেতে চলে যাস। গেলেই দেখবি তোর ক্ষেতের অবস্থা।

বলতে বলতে যেমন এসেছিল, তেমনি আচমকাই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অলীকচরণ।

একটু দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে এল হরেন। ঘটনাটা সব গুছিয়ে বলল ওর বউকে। বউ শুনে প্রথমে তো ভয়ে মরে আর কি! শেষে একটু একটু করে ভয় কেটে যেতেই বলে, কিন্তু খাবে কোথায়'? ভাতের থালা কি শ্মশানে দিয়ে আসতে হবে নাকি'?

—আরে না না। হরেন বোঝায়, রান্না করে আমাদের এই উঠোনেই ঝুড়ি ভর্তি করে রেখে দেব। একসময় নিজেই এসে নিয়ে যাবে ও।

কথাটা বউয়ের ঠিক মনঃপুত হয় না। তবু অতি কষ্টে মেনে নিয়ে একরকম ইচ্ছে করেই সামনে থেকে উঠে যায়। নানারকম ভাবে।

সেই রাতে হরেনের আর ঠিকমতো ঘুম এল না। শেষে আর থাকতে না পেরে রাত থাকতেই একসময় উঠে বেরিয়ে পড়ল সে। মাঠ পার হয়ে খাল ডিঙিয়ে আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষেতের দিকে রওনা হল।

কিন্তু কাছাকাছি যেতেই চমকে উঠল। আধো অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়

শুধু সবুজ আর সমুদ্র। এত সবুজ ধানের চারা কোথা থেকে এল তার জমিতে। তাও কি— প্রায় হাতখানেক উঁচু হয়ে শেষ রাতের বাতাসে এখন গাছগুলোর মাথা দুলছে।

অলীকচরণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে গতকালের সমস্ত কথাই পর পর এখন মনে পড়ে গেল ওর। তাহলে কি এসব ওই লোকটার কাণ্ড! তা হবে। ভাত খাওয়ার লোভে কালই তো বলেছিল, ওর ক্ষেতে ধান চাষ করার দায়িত্ব তার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এক রাতের ভেতরে এটা সম্ভব হল কি করে? অবশ্য ওদের পক্ষে সবই সম্ভব।

হাঁটতে হাঁটতে আলের ওপরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হরেন। হঠাৎ এক জায়গায় ডান পায়ের পাতাটা তার নরম মাটির ভেতরে দেবে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মনটা খুশিতে নেচে উঠল ওর। ইস্—! এখানে কত জল ! আর মাটি কি নরম! অথচ কাল পর্যন্ত ভাবা যায়নি এ মাটিতে আবার চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু তা তো হল, তবে একটু পরেই যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে গাঁয়ের সবাইকে কি জবাব দেবে হরেন! আশে পাশে সব জমিগুলোই তো ফাঁকা পড়ে আছে।

এ রকমই নানা কথা ভাবতে ভাবতে যখন আলের ওপর দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়েছে, সে-সময় হঠাৎ একটা ভারী গলার স্বরে চমকে উঠল।

—হরেন যে! আমার কথাটা মনে আছে তো?

হরেন বুঝল, অলীকচরণ। কিন্তু আশ্চর্য! লোকটা কোথায়!কাল তো দিব্যি সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অথচ এখন ভোরের আলোয় কোথাও তো তাকে দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে খোঁজার আগেই হরেনের ডানদিক থেকে আওয়াজটা আবার ভেসে এল, আমাকে চিনতে পারলি না বোধ হয়!

ডানদিকে তাকিয়েই হরেন বলল, না না চিনেছি। চিনবো না কেন? তবে দেখতে না পেয়ে অবাক হচ্ছিলাম। তুমি কোথায়?

—এই তো তোর ডানদিকেই দাঁড়িয়ে আছি। আসলে দিনের আলো ফুটলে আমাদের আর দেখা যায় না বুঝলি। দেখবি ওই সন্ধে থেকে। তা যাক গে। ক্ষেতের ধান উঠলে নতুন চালের ভাত খাওয়াতে ভুলিস না কিন্তু—

হরেন বলল, না, না ভুলব না। ভুলব কেন? তবে বলছিলাম কি সবাই যদি জিজ্ঞেস করে তবে কি বলব?

—কি আর বলবি? বুদ্ধি করে একটা কিছু বলে দিস—বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল অলীকচরণ। একটু পরেই আবার বলল, ঠিক আছে

এবার আমি যাই রে হরেন। আর মনে হয় বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না। লোকজনের গায়ের গন্ধ যেন টের পাচ্ছি। বোধ হয় কেউ এদিকে আসছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গিয়েই হরেন টের পেল কি যেন একটা তার পাশ থেকে সাৎ করে সরে গেল। তারপর হাওয়ার মতো কি যেন উড়ে গেল ওপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ফিরল সে। অলীকচরণ বলছিল, কেউ আসছে।

কেউ আসছে শুনে মুহূর্তেই ভয় পেয়ে গেল হরেন চাষী। ভাবল এবার তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই এসে নানান কথা জিজ্ঞেস করবে। তখন —! কি বলে সবাইকে বোঝাবে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই হরেনের নজরে পড়ল, নদীর পাড় ধরে কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে নেতাই আর বংশী মণ্ডল। কিন্তু এ কি—? হঠাৎ দুজনে ওরা দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করছে না? বংশীটা তো আঙুল তুলেও কি যেন দেখাচ্ছে এদিকে।

হরেন খুব চিন্তায় পড়ে গেল। কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে যেই খানিকটা আরও সামনে এগিয়েছে, সেই সময়েই ওরা কাছে এসে দাঁড়াল।

—এ কি হরেনদা! কি ব্যাপার বলো তো? তোমার জমিতে চারা হল কি করে?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হরেন বলল, কেন রোজ রাতে নদীর বালি খুঁড়ে জল তুলে জমিতে দিই। তবেই না চারাগুলো বড় হয়েছে।

---কি পাগলের মত বকছো। সত্যি কথাটা বলতো একবার।

হরেন বলে আবার সেই কথাটা। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না। হরেনের দিকে কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দৌড়ে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। যে শোনে সেই একবার করে দৌড়ে গিয়ে হরেনের জমির চারা দেখে আসে। দেখেই আবার হরেনের বাড়িতে যায়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অনেক কথা। উত্তর দিতে দিতে হরেনের মুখ ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু একটু পরেই যখন মোড়ল এসে ওকে ডাকা-ডাকি করতে থাকে তখন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে হরেনের।

হরেন তবু বুঝেসুঝে কথা বলে। মোড়লকে খুব খাতির করে ডেকে এনে ঘরে বসায়।

মোড়ল বলে, হ্যাঁ গো হরেন, জমি তো তোমার দেখে এলুম। তা এটা কি করে সম্ভব হল কও দেখি?

অল্প হেসে সবাইকে যেমন বলেছে মোড়লকেও ঠিক তেমনিই বলল হরেন।

কিন্তু মোড়ল এই উত্তরে খুশি হতে পারল না। বলল, সেটা তো সম্ভব নয় না তুমিও জান, আমিও জানি। আসল ব্যাপারটা কি কও দেখি?

কিন্তু রহস্যটা তবু ভেঙ্গে বলে না হরেন। এদিকে অনেক চেষ্টা করেও ভুলিয়ে ভালিয়ে শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা বের করতে না পেরে মোড়ল বলে, তবে একটা কথা তোমারে বলে রাখি হরেন। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। জল হওয়ার আর আশা নেই এবার। তাই চাষবাসও হবে না আর! তাই বলি কি তোমার একার জমিতে ধান হলে সে ধান কিন্তু সবাইকে এবার ভাগ করে নিতে দিও হরেন। না হলে যে সব মরে যাবে পটাপট।

হরেন হাসে। বিনীত হয়ে জানায়, আজ্ঞে তাই হবে মোড়ল খুড়ো—

মাস দুয়েক পরের কথা। হরেনের জমির ধান পেকে সোনালী হয়ে উঠেছে। যে দেখে সেই দাঁড়িয়ে পড়ে। যেমন মোটা ধানের গোছা,তেমনি পুরু এক একটা ধান! ধানের ভারে গাছগুলো সব ক্ষেতে নুইয়ে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য প্রত্যেকটা ধানই অক্ষত! চুরি তো দূরের কথা, পশুপাখী পর্যন্ত ক্ষেতে ঢুকে একবারের জন্যও ধানে মুখ দিতে পারেনি। দু একজন চেষ্টা করেছিল চুরি করতে। কিন্তু ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ তা মোড়লের কাছে গিয়েও বলেছে, হ্যাঁ মোড়ল খুড়ো, সত্যি বলছি হরেনের জমি যেন রাতে কারা পাহারা দেয়। ঠিক দেখা যায় না, তবে অস্পষ্ট কয়েকটা ছায়া মূর্তি যেন ক্ষেতের চারপাশে ঘোরে—

—যা যা ওসব হরেনের চালাকি। মোড়ল বলে, ধান পাহারা দেওয়ার জন্য হরেন ওসব লোক নিয়ে এসেছে।

—না মোড়ল খুড়ো, তা নয়। একদিন তো আমাদের নেড়া ধান কাটতে গিয়ে এমন একটা মূর্তি দেখল যে ঘরে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে ধুম জ্বর! সেই জ্বর এখনো ছাড়েনি।

মোড়ল বলে, কেন কি দেখেছিল সে?

—আজ্ঞে বিরাট একটা দৈত্যের মাথা। চোখ থেকে আগুন বেরোচ্ছে ধক ধক করে।

শুনে মোড়ল কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে। হুঁকোয় টান মারতে মারতে এক সময় নানা রকম চিন্তায় ডুবে যায়।

আর এমনি চিন্তা ভাবনায় যখন সাতপাঁচ ভাবছে গাঁয়ের লোক, ঠিক সেই সময়েই একদিন ভালোয় ভালোয় ক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে নিয়ে ঘরে তোলে হরেন।

হরেনের বউয়ের মুখে আর হাসি ধরে না। যাক্ তাহলে শেষ রক্ষেটা

হল। সব ধানই ঘরে আনতে পারা গেছে। এখন ঝাড়াই মাড়াই করে গোলায় তুলে রাখতে পারলেই হল। সারা বছরের জন্য আর ভাবনা নেই।

কিন্তু হরেনের বউ এরকম ভাবলেও ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম।

পরের দিন সন্ধেবেলায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখাতে গিয়ে বউ দেখল, কিছুটা দূরে প্রকাণ্ড বেল গাছটার ডালে বিশাল লম্বা লম্বা দুটো ঠ্যাং ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে। তাকাতেই ভয়ে কেঁপে উঠল হরেনের বউ। হাত থেকে প্রদীপটা ঝুপ করে পড়ে গিয়েই দপদপ করে নিভে গেল। উপায় না দেখে কোনোরকমে দৌড়ে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। হরেন ফিরলে জানালো ওকে কথাটা।

শুনেই আঁতকে উঠল হরেন। সর্বনাশ। বরদাচরণের ছেলে অলীকচরণ তার কথা রেখেছে। কিন্তু তার কথা তো রাখেনি সে। এখন উপায়?

সঙ্গে সঙ্গে বউকে ডেকে পরামর্শ করতে বসল হরেন। বলল, ঢেঁকিতে যখন কিছু নতুন ধান পাড় দেওয়া হয়েছে তখন তাই দিয়েই আজ ভাত রান্না করে দাও। আমি পুকুর থেকে মাছ ধরে আনি। গরম ভাতের সঙ্গে তাই ভেজে দিও কড়া করে—

বউ শুনে তো অবাক। বলে কি লোকটা! একটু সময় তাই হরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তুমি কি পাগল হলে? ওই দৈত্যটাকে খাওয়াতে পুরো একটা ধানের গোলা যে লেগে যাবে তোমার।

—তা লাগুক। হরেন বলে, এতবড় একটা উপকার করেছে আমার।

—তা করেছে তো কি হয়েছে। তুমিও করবে!

—মানে! অবাক হয়ে বউয়ের দিকে তাকায় হরেন।

বউ তখন আস্তে আস্তে ওকে নিচুস্বরে বলল, এক কাজ কর। ঘরে ছ'সাত বস্তা পুরোনো খুদ আছে। অসময়ের জন্য বেখে দিয়েছিলাম। কিছু নতুন চালের সঙ্গে ভাত ছড়িয়ে সেই পাঁচ মেশালি ভাত ঝুড়ি করে উঠোনের বেলতলায় নামিয়ে রেখে এল। ভাবল সকালে উঠেই দেখবে সব ফর্সা।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরতে পারল না হরেন। মাঝ-রাতেই জানলা ফাঁক করে দেখতে গেল অলীকচরণের খাওয়াটা। ভেবেছিল, দেখবে ঝুড়িটা এক হাতে ধরে আর এক হাতে হাপুস-হুপুস করে গোগ্রাসে খাচ্ছে অলীকচরণ। কিন্তু জানলাটা ফাঁক করতেই অবাক হল। ঝুড়িটার একপাশে নেমে এসে চুপচাপ ঝুড়ির ভাতের দিকেই তাকিয়ে আছে অলীকচরণ আর মাঝে মাঝে নজরটা এদিকে হরেনের ঘরের দিকে রাখছে।

হরেন ভাবল, কি জানি হয়তো টের পেয়ে গেছে ও জেগে আছে তাই

খেতে লজ্জা হচ্ছে। তা ছাড়া ও তো আর এখন জ্যান্ত মানুষ নয় যে আর একজন জ্যান্ত মানুষের উপস্থিতিতেই খেতে শুরু করবে। জানালাটা সাবধানে বন্ধ করে হরেন তাই চলে এল। ভাবল, থাক্ গে কি দরকার দেখার। ওর খাওয়ার কাজ ও ঠিক খেয়ে যাবে। কাল ভোরেই উঠে দেখবে সব ভাত খেয়ে নিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ঘরের ভেতরে এসে শুয়ে পড়ল হরেন।

কিন্তু সকালে উঠেই অবাক। বউয়ের কথায় বেলতলায় গিয়ে চমকে উঠল সে! কোথায় কি—? খুদ ভর্তি ঝুড়িগুলো ঠিক তেমনই পড়ে আছে। শুকিয়ে প্রায় কড়কড়ে। আর তার ওপরে যত রাজ্যের পিঁপড়ে ও কয়েকটা কাক।

মনে মনে বেশ দমে গেল হরেন। ব্যাপারটা কি—? অলীকচরণ কি তাহলে ভাত ছুঁয়েও দেখেনি! না কি শ্মশান ছেড়ে আর এদিকে আসেনি গতকাল? কিন্তু না! এসেছে তো। কাল রাতেই তো জানলা ফাঁক করে দেখেছিল তাকে। ঝুড়ি ভর্তি ভাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। তবে কি নতুন চালের ভাত দেওয়া হয়নি বলেই না খেয়ে চলে গেল।

কথাটা ভাবতেই এবারে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল হরেন। কি সর্বনেশে ব্যাপার হল। ওরা ভালয় যেমন ভালো, তেমনি খারাপ হলে কতদূর যে খারাপ হতে পারে—সে কথা অনেকের মুখেই শুনেছে হরেন। এখন যদি রেগে গিয়ে কিছু করে বসে।

ভয়ে ভয়ে কথাটা বউকে বলল হরেন। বউ শুনে উড়িয়ে দিল।

—তোমার যত কথা। এত ভয় কিসের শুনি? ও চলে গেছে যখন তখন ধরে নিতে পারো আর আসবে না।

—সত্যি বলছো?

—সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বলছি?

—না তা নয়। বলতে বলতে হরেন চুপ করে থাকে। মন থেকে তবু সন্দেহ যায় না। বার বার বাইরে যায়। গিয়ে বেলতলায় দাঁড়িয়ে অলীকচরণের জন্য অপেক্ষা করে। না পেয়ে অবাক হয়ে মাঠের দিকে যায়। শ্মশানের কাছ থেকেও ঘুরে আসে। কিন্তু অলীকচরণের দেখা নেই কোথাও।

শুধু সেদিনই নয়। এরপর আরও কয়েকটা দিন কেটে যায় পরপর। আস্তে আস্তে অলীকচরণের কথাটাও যেন মন থেকে মুছে যায় হরেনের। একেবারেই মনে থাকে না। শেষে একদিন বেমালুম ভুলে যায়।

তবে মনে পড়ে একদিন আচমকা। পরের বছর নতুন বর্ষার শুরুতে আশেপাশের জমিগুলোতে যখন জোরকদমে চারা বসানো শুরু হয় সেই সময়ে একদিন হঠাৎই মনে পড়ে যায় হরেনের।

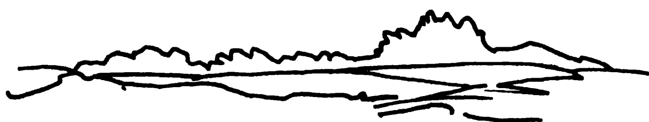
মনে পড়ার কারণও ছিল। নতুন বর্ষার শুরুতে সব জমিতে যখন চারা বসছে তখনো নিজের জমিতে লাঙলও দিয়ে উঠতে পারেনি হরেন। যে মাটিতে গতবার এত ধান হল সেই মাটিই এবারে হয়ে উঠেছে নিরেট পাথরের মতো। লাঙল চালালেও লোহার ফলা মাটিতে ঢোকে না।যাও বা ঢুকল, সে মাটিতে জল পড়েও ঠিক নরম হয় না মাটি। তাও অতিকষ্টে অনেক পরিশ্রমের পর জমি তৈরী করে তাতে চারা বসাল হরেন। কিন্তু সে চারা দুদিনেই শুকিয়ে লাল হয়ে গেল। মনে মনে তখন বেশ ভয় পেয়ে গেছে হরেন। শুধু তাই নয়। আচমকা অলীকচরণের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুঝেছে এ তার কাজ। এবারে সেই নতুন চালের ভাত খেতে না দেওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে অলীকচরণ।

কিন্তু কি আর করবে তখন।

জমির বুকে দিনরাত মাথা ঠুকতে লাগল হরেন। পাগলের মতো অলীকচরণকে খুঁজলো। যদি পাওয়া যায় একবার। তাহলে অন্তত ক্ষমা চেয়ে নেবে হরেন। বলবে এবার যত খুশি ভাত চায় খেতে দেবে সে। শুধু জমিতে এখন একটু জল দিক। চারাগুলোকে বাঁচিয়ে তুলুক। কিন্তু কোথায়— ! ডেকে ডেকে অলীকচরণের কোথাও সাড়া পেল না সে। তবু ঘুরতে লাগল পাগলের মতো।

এর কয়েকদিনের ভেতরেই এক সকালে গ্রামের লোক আবিষ্কার করল নিজের জমির ওপরেই মরে পড়ে আছে হরেন। চোখ দুটো খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছিল মৃত্যুর আগে কিছু একটা দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

এই ঘটনার পর বছর কেটে গেছে। হরেনের পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। তবে জমিটা আজও তেমনি নিষ্ফলা পড়ে আছে। চারদিকে জঙ্গল। বনতুলসী আর শেয়াকুলের কাঁটায় মাঝে মাঝে বেশ ছোটখাটো ঝোপ তৈরী হয়েছে। নতুন কোনো অচেনা লোক ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখে জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা বলে, ওটা পতিত জমি। ও জমিতে ফসল হয় না। কিন্তু এখনো যেসব বুড়োরা বেঁচে আছে তারা বলে ওটা ভুতুড়ে জমি। ও জমিতে আর ফসল হবে না কোনোদিন। কেননা অলীকচরণের অভিশাপে হরেনের আত্মা এখনো ওই জমির নিচে লুকিয়ে আছে।





টিউটর কালাচাঁদ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সাধু কালাচাঁদের জীবনটাই বিপদসংকুল। কোন কাজই তার জীবনে সহজে হয় না। সবাই পড়ে — পরীক্ষা দেয় — পাশ করে। কিন্তু কালাচাঁদের আর স্কুলের গণ্ডী পেরোনো হয় না। তার সহপাঠীরা এখন চাকরি করে। তাদের ছেলেদের অন্নপ্রাশন হয়। অন্নপ্রাশনের পর তারা বড় হয়ে ক্লাস থ্রি ফোরেও উঠেছে। অথচ কালাচাঁদ সেই ক্লাস টেনে। দশ বারো বছরের ওপর। এর ভেতর কতবার যে সিলেবাস পাল্টালো। জ্যামিতি উঠে গেল। সংস্কৃত চলে গেল। ইতিহাস ভূগোল জুড়ে গেল। কালাচাঁদও এর ভেতর বড় হ্যাফ-প্যান্ট

ছেড়ে খাটো ধুতি ধরেছে। সেলুন গিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে। শহরের এখনকার ক্লাস টেন জানেই না তাদের ব্যাচে এখনো এত প্রবীণ একজন স্টুডেন্ট আছেন। তারা কালাচাঁদকে জানে— তিনি গাঁয়ের দিকে কোন্ স্কুলে নাকি টিচার। শুধু বি টি পরীক্ষাটা দিতেই শহরে আসা। বড্ড গম্ভীর প্রকৃতির টিচার। কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেন না।

কালাচাঁদ আসলে তখনো রামনগরে তার মেশোর ব্যাংকে ক্যাশিয়ার। ক'মাসের টেম্পোরারি চাকরি। বন্যার পর সাময়িকভাবে একাজে লেগেছে কালাচাঁদ। জল নেমে চাদ্দিক শুকিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই কালাচাঁদের চাকরি যাবে।

এর ভেতর মায়ের চিঠি পেয়ে প্রথম মাইনে হওয়ার পর কালাচাঁদ নিজেদের শহরে গিয়েছে। সেখানে বাড়ি থেকে বড় একটা বের হয় না। মেশো বলে দিয়েছে — হুটহাট করে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলবি না। কি বলতে কি বলবি — তাহলে এই ক্যাশিয়ারের কাজটাও হারাবি। চাই কি হেড অফিসকে ভুজুং দিয়ে তোকে আমি ক্যাশিয়ারিতে পাকা করে নিতে পারি। বাড়ি যাচ্ছিস যা — কিন্তু পারতপক্ষে সেখানে বাইরের লোকের সামনে মুখ খুলবি না।

ছয়ছোট্ট শহর। ইলেকট্রিক, লেডিজ পার্ক, নদীর ঘাট, সিনেমা হল, পাবলিক লাইব্রেরি যেমন আছে — তেমনি শহরের বাইরেই ধানক্ষেত, হাইওয়ে, বটতলা, গরু চরার মাঠ, পল্লীমঙ্গল ইস্কুল আর ঘোলা ঘোলা মেঘে ঠাসা লেজঝোলা একটা আকাশও আছে। ফলে কারও মন খারাপ হলে সে একা একা ওদিকটায় ঘুরেও আসতে পারে। বিরক্ত করার কেউ নেই। মাঠের গরুরা তো আর কথা বলে না।

রামনগরে ক্যাশিয়ারির কাজ এমন কিছু কঠিন নয়। মেশোর দরকার ছিল একজন অতি বিশ্বাসী লোকের। কেননা, সাত দিনের টানা বৃষ্টিতে অফিস বন্ধ ছিল। অফিস ঘরে জল ঢুকে দাঁড়িয়ে যায়। জল বের করে যখন দিন দশেকের মাথায় অফিস খুললো মেশো-তখন সিন্দুকের ডালা খুলে দেখে-গাদা গাদা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল ভিজে আমসত্ত্ব হয়ে আছে।

সেগুলো অতি সাবধানে মোষের গাড়িতে বস্তায় বন্দী করে ভোর ভোর বেরোতে হয় কালাচাঁদকে। একটা আন্দাজী হিসেব আছে মেশোর। তা কোটি দেড়েক টাকা হবে। গুনে গেঁথে পুরোটা এখনো যোগ দেওয়া হয়নি। আগে তো শুকোক।

খেলারাম জানে ব্যাংকবাবুর বড়লোক আত্মীয় বড় অসুখের পর সাগরের হাওয়া খেতে এসেছে। সে কালাচাঁদকে মাটির বাঁধ অবন্দি নিয়ে যায়। সেটা

টপকালেই জলের গুড়ো মেশানো বঙ্গোপসাগরের হাওয়া বইছে সবসময়। পরিষ্কার রোদ্দুর। কালাচাঁদ মাদুর তোষক ভর্তি হালকা বস্তাটা নিয়ে বাঁধের ওপারে চলে যায়। খেলারাম জানে সারাদিন রোদ হাওয়া খেয়ে বাবু এপারে চলে আসেন। তখন সন্ধে সন্ধে তাকে এপারে গাড়িতে তুলে খেলারাম রামনগরে ফিরিয়ে আনে।

কালাচাঁদ এক এক সময় ভাবে — তার খাটাখাটুনির কথা খেলারাম যদি জানতো।

মাটির দোতলা সমান বাঁধটা টপকেই ওপারে গিয়ে কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসা ঝিনুক, পাথর, নুড়ি, শঙ্খ কুড়িয়ে এক জায়গায় করে।

তারপর ছাপানো আমসত্ত্বগুলো গরম বালিতে চেপে ধরে নুড়ি চাপা দিতে হয়। নজর রাখতে হয়— কোনটা উড়ে গেল কিনা। সবই তো একশো টাকার আমসত্ত্ব।

এর সঙ্গে এই মাসখানেক ধরে বঙ্গোপসাগরের সামনে বসে তাকে রাফখাতায় বড় বড় অঙ্ক কষতে হয়েছে রোজ। সামনে শুধু ধু-ধু জল। শুকোতে এনেছিলাম এত লক্ষ এত হাজার তত। শুকিয়ে নিয়ে সিন্দুকে তোলা হল এত লক্ষ তত হাজার। তাহলে শুকোনো বাকি কত ? সে এক এলাহি অঙ্ক। এক একটা সংখ্যার পিঠে, গন্ডায় গন্ডায় শূন্য।

তাই প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কালাচাঁদ মায়ের কাছে বিশ্রাম নিতে ছুটে এসেছে। বাবা আজকাল আর তার গায়ে হাত দেন না। ছেলে বড় হয়ে গেছে। শুধু দূর থেকে ভাবেন। আর কপাল চাপড়ান নিঃশব্দে।

এই অবস্থায় কালাচাঁদ ছুটিতে বাড়িতে এসে খায়দায় আর শুধু ঘুমোয়। বিকেল হলে শহরের শেষ দিকে নদীর পাড় ধরে বেড়াতে যায়। ভারি মাথাটা সাফ করে আনতে। তার মা বাবাকে পরিষ্কার বলেছে — চাকরে ছেলেকে এখন তুমি আর আগের মত জ্বালাতে পারবে না। ওকে নিজের মত থাকতে দাও। লক্ষ লক্ষ টাকার গোনাগুনতি — তাতে কালাচাঁদের মাথায় একটা চাপ ব্যথা সবসময়। মনে হয় টাকার গরমটা মেঘ হয়ে তালুতে উঠে জমে আছে। এই ব্যথাটা ছাড়াতেই কালাচাঁদ একা একা সন্ধের মুখে শহরের শেষদিকে গিয়ে আকাশটা দেখে — গরুদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রামনগরে ফিরলে — মেশো বলেছে — নিজে তাকে পড়াবে। যাতে কালাচাঁদ প্রাইভেটে স্কুল ফাইনালটা তরে যায়। সেসব পড়াশুনো শুরু করারও একটা ঝামেলা যাবে। তাই এখন থেকেই কালাচাঁদ যতটা পারে বিশুদ্ধ বাতাস

টেনে নিচ্ছিল বুকে — আর ধানক্ষেত, বটতলার পাশ দিয়ে ইভনিং ওয়াক করছিল। যাতে চোখ আর মনের ষোলআনা বিশ্রাম হয়।

হাঁটছিল আর কালাচাঁদ ভাবছিল — জীবনটা কি এইভাবেই কেটে যাবে ? কোন আনন্দ নেই। সাফল্য নেই। হয় বাবা-না হয় মেশোর ভয়ে সব সময় কাঁটা হয়ে থাকা। এই কি জীবন ? স্কুল ফাইনাল যে বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়াল আমার—

এ জীবন রাখারই বা কি মানে হয় ? এমন সময় পাশ দিয়ে তিন চারটি ছেলের মাথা ভেসে উঠলো।

বেড়াচ্ছেন স্যার ?

কালাচাঁদ স্রেফ 'হুঁ' বলে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। কেন যে ওরা স্যার বলছে — তা বুঝে উঠতে পারল না কালাচাঁদ।

আমরা এবার স্কুল ফাইনাল দিচ্ছি স্যার—

ভালোই তো। প্রিপারেশন কেমন ? মনে মনে বলল, স্যার বলে কেন ?

আমরা একদম অর্ডিনারি স্টুডেন্ট। আপনার গাইডেন্স পেলে স্যার—

আমি তো ক'দিনের জন্যে এসেছি মাত্র !

বি. টি দিয়ে চলে যাবেন ?

তাইতো ইচ্ছে। বলেই কালাচাঁদ জানতে চাইল, তোমরা জানলে কি করে ?

বি টি পরীক্ষার স্যারদের এই পথেই আগে আমরা হাঁটতে দেখেছি স্যার—

এইভাবেই চার থেকে পাঁচ— পাঁচ থেকে ছয় — জনা সাত আট ছেলের সঙ্গে বিকেলের দিকে শহরের বাইরে নির্জন মাঠের পাশে কালাচাঁদের দেখা হতে থাকলো। দু'একদিন অন্তর অন্তর। অন্য ইস্কুলের একজন স্যার যেমন হয়— কালাচাঁদ আস্তে আস্তে তাই হয়ে যাচ্ছিল।

কালাচাঁদ এখন একজন গম্ভীর — প্রবীণ টিচার। তাকে ভেবে চিন্তে জবাব দিতে হয়। পায়ে পাম্পসু। ধুতি পাঞ্জাবি। ব্যাংকে জয়েন করার আগে মেশো কিনে দিয়েছে। তার টিচারি আর গম্ভীর ভাবের সঙ্গে পোশাকটাও মিলে গেছে।

এক একদিন কালাচাঁদ মুখে মুখেই হাঁটতে হাঁটতে ইংরিজি এক্সপ্ল্যানেশন বলে দেয়। আবার কোনদিন বাতাসের ভেতর আঙুল গুঁজে দিয়ে ভূগোলের ইমপর্টান্ট ম্যাপ পয়েন্টিং করে। পাশেই ধানক্ষেত। একদিন সন্ধের মুখে মুছে যাওয়া সূর্যের মুখোমুখি এই ভাবেই কালাচাঁদ বাতাসের ভেতর ইন্ডিয়ার সামুদ্রিক বন্দরগুলো দেখাচ্ছিল। বাতাসে আঙুল নেড়ে নেড়ে।

হঠাৎ আঙুল বরাবর রাস্তার পাশের মাঠে একটা লোককে খুটো তুলে

গরু নিয়ে আসতে দেখে কালাচাঁদ থেমে গেল। মাই বয়েজ। এই সময়টা হিম পড়ে— তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল।

স্যার। হিম তো সেই কালীপুজোর পর। এখন কি?

কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। তোমাদের কচি মাথা — যে কোন সময় ঠান্ডা লাগতে পারে।

সেদিনই রাতে একসঙ্গে খেতে বসলে কালাচাঁদের বাবা হাতে গড়া রুটি দিয়ে বেগুনপোড়া গুটিয়ে নিয়ে জানতে চাইল, রোজ রোজ কী অত কথা বলিস ছেলেগুলোর সঙ্গে?

কালাচাঁদ খুক খুক করে কেশে জলের গ্লাস মুখে তুলে নিল।

কালাচাঁদের মা এগিয়ে এসে আরেক গ্লাস জল সামনে ধরলেন। তারপর কালাচাঁদের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আগে খেতে দেবে তো। না কার সঙ্গে কথা বলেছে সেটা জানা চাই এখুনি?

কালাচাঁদের বাবা তবু বলল, তোর ছুটি ফুরিয়ে যায়নি?

কালাচাঁদ নিজের খালি গ্লাসটা ঠক করে মেঝেতে রেখেই মায়ের হাতেরটা তুলে নিল।

পরদিনই সে বীজগণিতের দু'দুটো এক্সট্রা অবলীলায় মুখে মুখে বলে দিল।

ছেলেরা বলল, আপনি স্যার কোন সাবজেক্ট পড়ান?

এখন তো বাবা স্কুলের সব সাবজেক্টই দেখতে হয়। কেননা ইন্সটিটিউশনের প্রেস্টিজ আগে। তাই চাপও আমারই ওপর বেশি পড়ে।

আপনি একটা টিউটোরিয়াল খুলুন না এখানে—

মন্দ বলনি। কিন্তু ঘর পাবো কোথায়?

ঘরের কি দরকার? এই বটতলাতেই তো হতে পারে। আমরা তো মোটে সাতজন।

সেদিনই রাতে কালাচাঁদকে তার বাবা বলল, সন্ধেবেলা মাঠে বেড়াতে গিয়ে ছোট ছোট খোকাদের সঙ্গে কী তোর এত গুজুর গুজুর ঘুসুর ঘুসুর? দেখিস বাবা — ক'দিনের জন্যে ছুটিতে এসে কোন খেলা আবার খেলিস না যেন—

পরদিন কালাচাঁদ বেড়াতে বেরিয়ে ছেলেদের বলল, সময় তো অল্প। এখন আর টিউটোরিয়াল খোলা যাবে না। তার চেয়ে—

বলুন স্যার। বলুন স্যার।

আমার লাস্ট মিনিট সাজেশন বেরোয়—

ওটা আপনার লেখা স্যার? তাই বলুন! লেখা থাকে— বাই অ্যান এক্সপার্ট টিউটর—

হুঁ। একদম আমারই লেখা। ওটা তোমাদের আমি আগেই দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু—

কিন্তু কি? বলুন স্যার। বলুন স্যার—

এখন তো বইটা ছাপা হচ্ছে পাবলিশারের ঘরে। আগে থেকে লিক করার একটা খরচ খরচা আছে তো। অতগুলো সাবজেক্ট — আগে ভাগে লিক হলে পাবলিশারের ক্ষতি।

তা তো ঠিকই স্যার। টাকা তো লাগবেই।

বেশি না। সাতজন আছো— তোমরা মাথাপিছু একশো দিয়ে সাতশো টাকা যোগাড় কর। চাদ্দিকে পাবলিশারের স্পাই—

অতটাকা আমরা কোথায় পাবো স্যার? কে দেবে আমাদের?

সাতশো টাকা অত হয়ে গেল তোমাদের কাছে? সাতজন আছো। মাথা পিছু একশো করে। কতগুলো সাবজেক্ট ভাবো তো?

ওরা সাতজন একথায় থমকে গেল। সবাই বলে উঠলো— দরকার যখন যোগাড় তো করতেই হবে। পাবলিশার স্পাই লেলিয়ে দেয় নাকি?

ওরে বাবাঃ! দেয় মানে! চব্বিশঘন্টা চোখে চোখে রাখে আমায় — পাছে বই বেরোবার আগে কিছু লিক হয়ে যায়—

আপনার তো স্যার তাহলে ইভনিং ওয়াকে বেরিয়েও শান্তি নেই।

নেই তো।

এই সন্ধের মুখে ফাঁকা মাঠেও স্পাই ছড়িয়ে রেখেছে পাবলিশার?

তবে কি! হাজার হোক স্পাই তো। কোন ছদ্মবেশ নিয়ে কে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে তা জানার সাধ্য তোমাদেরও নেই— আমারও নেই। আমরা হলাম গিয়ে লিখে খাই। যাকে বলে লেখক। লেখকও বলতে পারো আমায়। তা আমরা রাইটাররা স্পাইদের অন্ধিসন্ধি জানবো কি করে? কি বল—

ঠিকই তো স্যার। লেখকরা আবার একটু ভুলো হয় স্যার—

তা তো আমরা কিছুটা ভুলো হয়েই থাকি। যাগ্গিয়ে — আসল কথা থেকে কতদূর সরে এসেছি দ্যাখো। ভুলো না হলে এমনটি হয়! সেই যে টাকার কথা কি বলছিলে?

সাতশো টাকা একসঙ্গে স্যার—

তা না হয় দুবারে দেবে। গোড়ায় চারশো। আর আসছে শনিবারের ভেতর বাকি তিনশো। হলো তো। চিন্তা কেটে গেল তো তোমাদের —কেমন কি না?

কিন্তু স্যার গোড়াতেই ওই চারশো।

তা তো দিতেই হবে। নগট টাকা দেবে—সঙ্গে সঙ্গে সিওর সাকসেসের নগদা নগদা সাজেশন পেয়ে যাবে। তোমাদের রেজাল্ট দেখে বাড়িতে স্কুলে সবাই অবাক হয়ে যাবে। আমার সাজেশন আর ফাইনালের কোশ্চেন — দেখবে সবই কমন পড়েছে।

আমাদের এমনই কপাল—ওই চারশো টাকাই বা কোথায় পাই?

চিন্তার কি! বাড়িতে ঝড়তি পড়তি চেয়ার, মিটসেফ, বুকর্যাক, জুতো, বাঁধানো প্রবাসী, ফুটো ছাতা, ভাঙা স্টোভ, তোবড়ানো টিফিনক্যারিয়ার, বাতিল থার্মোফ্লাস্ক — নেই এসব?

আছে স্যার। আছে—

তবে আর ভাবনা কিসের! ওগুলো তো আর কাজে লাগে না। কেউ খোঁজও করে না বাড়িতে।

চুপ করে তাকিয়ে থাকা একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে ভুলো মনের লেখক জানতে চাইলো, তুমি যে কিছু বলছো না?

বেচবার মত ওসব জিনিস আমার বাড়িতে নেই স্যার—

নেই তো কি হয়েছে। তোমায় তো এখন আর আমরা বাদ দিতে পারি না। তুমি আমাদের প্ল্যান সব জেনে ফেলেছো।

অন্য একজন বললো, ঠিকই বলে ফেলেছেন স্যার। ও যদি প্ল্যানটা লিক করে দেয় তো কেলেঙ্কারি।

একথা শুনে সন্ধের মুখে সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তার ভেতর কালাচাঁদ আরও গম্ভীর গলায় বলল, লিক নয়— আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি স্যার? কি স্যার?

ধরো কথা আদায় করতে পাবলিশারের স্পাইরা ওকে তুলে নিয়ে গেল। তখন কথা চেপে যেতে গিয়ে ও কি স্পাইদের হাত থেকে ফিরে আসবে! ওরা ফেরত দিলে দেবে ওর ডেডবডিটা।

অন্ধকারের ভেতরেই ছেলেগুলো একসঙ্গে বলে উঠলো, উঃ! তাহলে?

একটা উপায় আছে—

কি স্যার? কি স্যার?

পয়লা কিস্তির চারশো টাকার অভাবে ওকে আমাদের ব্যাপার থেকে বাইরে রাখা চলবে না।

কিন্তু স্যার, চারশো টাকাও তো কম নয়—

ব্যাবস্থা হয়ে যাবে— বলে কালাচাঁদ সেই ছেলেটির দিকে তাকালো — আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে এন্ডির চাদর, উলের মাফলার, সোয়েটার, জাম্পার

— এসব তো আছে?

তা আছে স্যার—। কম্বল আছে। বাবার মাঙ্কি টুপি আছে। দাদুর মোজা আর গ্লাভস আছে।

তবে আর চিন্তা কিসের। এখন গরমকাল। কেউ খোঁজ নেবে না, এই তো সময়— এখন ঝেড়ে দাও সব।

তাতেও চারশো টাকা হবে না স্যার।

একটু চেষ্টা কর। রেজাল্ট ভাল করতে হলে খাটতে হয়। মাফলার জাম্পার খুঁজতে গিয়ে চাই কি এক বয়ম পুরনো ঘি পেয়ে গেলে। সত্তর টাকা কে জি এখন। এইভাবেই দেখবে চারশো টাকা যোগাড় হয়ে যাচ্ছে। আমারও তো খরচখরচা আছে। নয়তো তোমাদের ওপর এতটা চাপ পড়তো না—

সে তো ঠিকই স্যার—

ছেলেটির কথাও শেষ হয়েছে— আর অমনি তাদের পেছন থেকে একজন আধবুড়ো মানুষের মুখ ভেসে উঠলো। খালি গা। কাঁধে গামছা। হাতে খুঁটো· সুদ্ধ গরুর দড়ি। দড়ির শেষে একটা কালো গরু। অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

লোকটি বললো, ও কালাচাঁদ — আবার কি খেলা শুরু করলি বাবা? ওরা সবে কচি স্কুল ফাইনাল। তুই আমার ছেলে হয়ে এসব আবার কি শুরু করলি?

ছেলেদের একজন জানতে চাইল, কে স্যার? আপনার বাবা?

কালাচাঁদ চাপা গলায় বলল, পাবলিশারের স্পাই। দেখছো না— কেমন সুন্দর ছদ্মবেশ!

ওরে বাবাঃ! স্পাই—

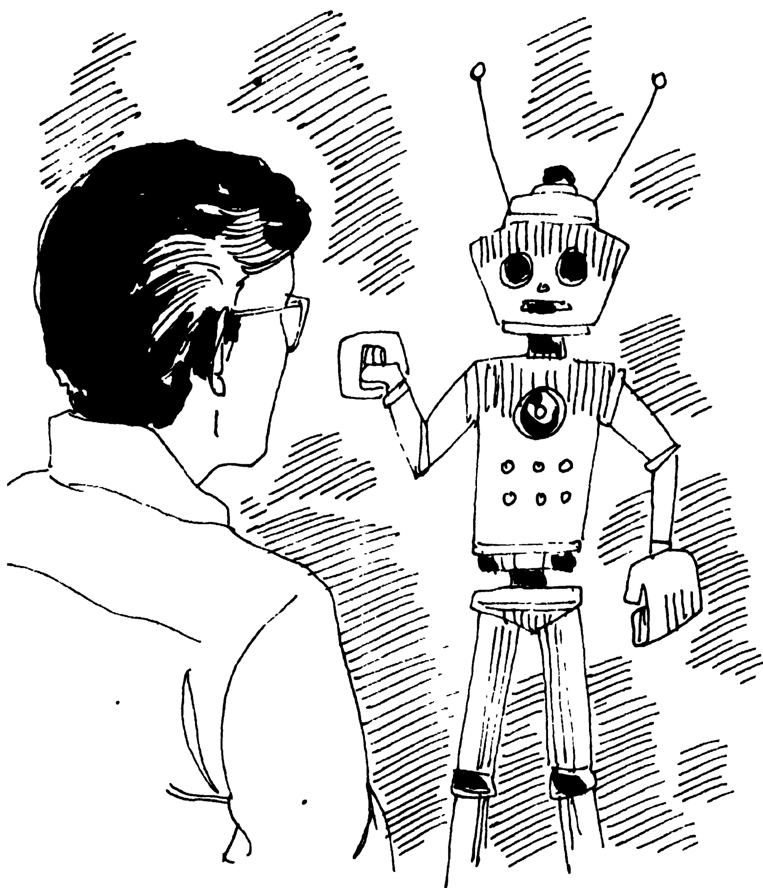
কালাচাঁদ বললো, তোমরা কেটে পড়—

ছেলেরা সটকানোর মুখে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, আপনি একা থাকলেন কিন্তু স্যার—

কালাচাঁদ অন্ধকারের ভেতর চেঁচিয়ে বলল, আমারই বাবার ছদ্মবেশে স্পাই—আমাকেই তো সামলাতে হবে। তোমরা এগোও—

ঠিক তখনই কালাচাঁদের বাবার হাত থেকে খুঁটো আর দড়ি হেঁচড়ে টেনে নিয়ে কালো গরুটা স্বাধীন হল। হয়েই সে সদ্য সটকানো সাত স্কুল ফাইনালীব পেছন ধাওয়া করলো।

ওরা সাতজনও দৌড়োচ্ছিল। দৌড়তে দৌড়তে ওদেরই একজন বলল, এটাও নিশ্চয়ই স্পাই গাই—



সেই সময়ের স্রোত

অনীশ দেব

লোকটাকে দেখে প্রথমেই আমার কেমন সন্দেহ হলো। পাহাড়ের কাছাকাছি জংলা ঝোপের পাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। মাথায় বাবরি চুল, চোখে ফ্রেমে বাঁধানো দু-টুকরো কাচ বসানো —তার ফাঁক দিয়ে দেখছে। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চামড়ায় অল্পসল্প ভাঁজ।

লোকটার পরণের পোশাক আরও বিচিত্র : রঙিন কাপড়ে তৈরী বুকের কাছে লাগানো ছোট ছোট চাকতি, কোমরে একটা কালো চামড়ার ফিতে বাঁধা। ফিতের ওপরে কাপড়ের রঙ ঘন নীল, আর নীচের কাপড়ের রঙ

সাদা। আমি যখন খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তখন হঠাৎই লোকটা আমাকে দেখতে পেলো, এবং ভীষণভাবে চমকে উঠলো।

এই পথে আমার আসার কথা নয়, কিন্তু আসতে বাধ্য হয়েছি। কারণ ঘন্টাখানেক আগে আমাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে মহাকাশযান পর্যবেক্ষণের পর্দায় একটা অকিঞ্চিৎকর ফুটকি ধরা পড়ে। সাধারণতঃ যে সব ছবি দেখা যায় তার চেয়ে এই ফুটকিটা আলাদা। সুতরাং অঞ্চলটা মোটামুটি অনুমান করে আমাদের চারজনের তৈরী বিশেষজ্ঞ দল অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে বেশিরভাগ পথটাই হোভারক্র্যাফট্-এ এসেছি। শুধু এই পাহাড়ী এলাকার রুক্ষ জমি ও জঙ্গলের কাছাকাছি এসে হোভারক্র্যাফট্ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছি।

আমার মুখোমুখি হয়েই লোকটা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলো। তারপর ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে — একেবারে আমার সামনে। অণুবীক্ষণ চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে হাত দুটো বুকের কাছে তুলে মাথাটা সামান্য ঝোঁকালো। অবশ্য আমি এর অর্থ বুঝলাম না— বোঝার কথাও নয়। কিন্তু, তারপর, লোকটা যে ভাষায় কথা বললো সেটা বুঝতে না পারলেও তার চিন্তাটা সরাসরি আমার মাথায় আঘাত করলো। এতে আমার অসুবিধে হবার কথা নয়, কারণ চিন্তাপ্রেক্ষণেই আমরা ভাব বিনিময় করে থাকি।

'আমি প্রফেসর সুধাবিন্দু দত্ত — উনিশশো নিরেনব্বই সাল থেকে আসছি।'

লোকটার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও, কথার অর্থটা কেমন যেন খটকা বাঁধালো।

সাধারণতঃ কোন ভিনগ্রহী এলে বলে যে, সে অমুক গ্রহ থেকে আসছে। কিন্তু '১৯৯৯ সাল থেকে আসছি' — কথাটা কেমন অদ্ভুত হেঁয়ালি ভরা। তবে একথাও ঠিক, প্রফেসার দত্তের চেহারায় ভিনগ্রহী ছাপের চেয়ে আমাদের সঙ্গেই মিলটা বেশি। এও বুঝলাম, প্রফেসর সুধানন্দ দত্ত ও তার যন্ত্রযানই আমাদের পর্যবেক্ষণ পর্দায় সেই অদ্ভুত ফুটকির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তার যন্ত্রযানটা গেলো কোথায়?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে প্রফেসর আবার বললো, 'হাজার বছরে পৃথিবীটা অনেক পালটে গেছে দেখছি! আপনার নাম কি?'

প্রফেসর দত্ত কি তাহলে সময় ভ্রমণে বেরিয়েছে? 'পৃথিবী' বলতে সে কি বলতে চাইছে এই গ্রহের কথা - নিজের গ্রহের কথা?

সুতরাং এবার আমি উত্তর দিলাম, 'প্রফেসর, আমার নাম এম — ১৩৬।

আমাদের মহাকাশযান পর্যবেক্ষণ পর্দায় একটা বিচিত্র চিহ্ন দেখে আমরা খোঁজ করতে বেরিয়েছি। আর, আপনি যে গ্রহকে পৃথিবী বলছেন, তাকে আমরা পি—৩ বলি। কারণ সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বের হিসেবে এই গ্রহ বা প্ল্যানেটের স্থান তৃতীয়—অর্থাৎ তিন নম্বর।'

'ও—সূর্যের নামটা তাহলে পালটায়নি দেখছি!' ছোট্ট করে বললো প্রফেসর দত্ত। তারপর তার চোখ আবার ফিরে এলো আমার শরীরে। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা ধাতব পোশাকটা দেখতে লাগলো বার বার, তারপর লক্ষ্য করলো আমার শিরস্ত্রাণ, স্বচ্ছ প্লাস্টিকে ঢাকা মুখ। অবশেষে সে প্রশ্ন করলো, 'এখন কি পৃথিবীর সবাই এই রকম পোশাক পরছে?'

'হ্যাঁ—বাইরের জীবাণু থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য।' উত্তর দিয়ে আমি পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'আপনিও তো চোখে কি একটা পরেছেন—'

প্রফেসর হাসলো, বললো, 'এটাকে চশমা বলে। চোখের দৃষ্টি কমজোরী হয়ে এলে এটা চোখে লাগাবার দরকার হয়।'

আবছাভাবে মনে পড়ল, আমাদের কেন্দ্রীয় জাদুঘরে এরকম জিনিস দেখেছি বটে।

প্রফেসর দত্ত আবার প্রশ্ন করলো, 'আমি এসেছি এখানকার পৃথিবী সম্পর্কে কিছু জানতে। কি কি পরিবর্তন এখানে এসেছে সময়ের তালে তালে। একে দেখছি পৃথিবীর নাম পাল্‌টে গেছে; তার ওপর আবার মানুষের নাম রাখার রীতিও গেছে বদলে।' ভুরু কুঁচকে তাকালো প্রফেসর, 'এ পরিবর্তন কি সারা পৃথিবী জুড়ে এসেছে?'

আমি এক মুহূর্ত সময় নিলাম ভাবতে। প্রফেসর দত্তকে ঠিক কতোটুকু বলা উচিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম, 'প্রফেসর, আপনাদের পৃথিবীর নাম কেন পালটেছে তা আপনাকে বলেছি। আর... আমার নামের রহস্য জানতে গেলে, আগে আপনাকে বলা দরকার যে গোটা পৃথিবীকে এখন ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে মোট ছাব্বিশটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলটা হলো "এম" অঞ্চল। এছাড়া এখন সব পুরুষের বাইরের চেহারা ও দৈহিক ক্ষমতা হুবহু এক। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।' একটু থামলাম আমি। তারপর আবার বলতে শুরু করলাম 'এই সমতা সম্ভব হয়েছে একটাই কারণে; এখন কৃত্রিম উপায়ে আমাদের জন্ম হয়, এবং হুবহু একই কৃত্রিম পরিবেশে আমরা মানুষ হই। তারপর চোদ্দ বছর বয়েস হলেই সমস্ত ছেলেমেয়ের দৈহিক ক্ষমতা সমান হয়ে যায়—বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার আর কোন তারতম্য হয় না। যেটুকু তফাৎ হয়, সেটা শুধু বুদ্ধিতে—"

প্রফেসর সুধাবিন্দু দত্ত বোধহয় অবাক হলো। কি ভেবে চোখ থেকে খুলে ফেললো চশমাটা ; তারপর আবার চোখে দিলো। বললো, 'তার মানে এখন জয়-পরাজয়, ভালোমন্দ, সবই বিচার হয় বুদ্ধির ভিত্তিতে ?

আমি উত্তর দিলাম, 'ঠিক তাই। এবং সেই বুদ্ধিও মাপা হয় প্রতি বছরে। তখন ঐ আই, কিউ. বা ইন্‌টেলিজেন্স্ কোশেন্ট হয়ে যায় পরিচয়-সংখ্যা। যেমন আমার আই. কিউ. এই বছরে ১৩৬। সুতরাং অঞ্চল ও বুদ্ধির পরিচয় মিলিয়ে আমার নাম, এম-১৩৬।' একটু হেসে আরও যোগ করলাম, 'বলা যায় না, সামনের বছরেই হয়তো আমার বুদ্ধিসুদ্ধি পালটে গিয়ে আমার নামটাও পালটে যাবে!'

প্রফেসর কি যেন ভাবছিলেন। একইভাবে চিন্তা করতে করতে প্রশ্ন করলেন, 'এতে দুজন মানুষের একই নাম হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই ?'

আমি মনে মনে হাসলাম, বললাম, 'আপনাদের সময়ে এটা হতো, হয়তো প্রায়ই হতো। কিন্তু আমাদের এই পি-৩ এ তা সম্ভব নয়। কারণ, দুটো কোন প্রাণীর আই.কিউ. কখনও সমান হয় না। সামান্যতম তফাৎ সেখানে থাকবেই। তাছাড়া, এই আই.কিউ. নির্ভুলভাবে মেপে দেয় আমাদের কেন্দ্রীয় কম্পিউটার।'

লক্ষ্য করিনি, প্রফেসর দত্ত কখন যেন তার পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই বের করে নিয়ে তাতে কি সব টুকে নিচ্ছে। আমার বেশ মজাই লাগলো। ইস্ কতো কষ্ট করেই না বেচারা প্রফেসর এতো সব তথ্য টুকে নিচ্ছে। কিন্তু পরে যখন—থাক সে কথা।

লেখা শেষ করে প্রফেসর মুখ তুলে তাকালো, বললো, 'আর কোন গুরুত্বপুর্ণ তথ্য ?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'স্পন্দনশীল সৌরজগতের তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব এখন চৌদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ, নিরানব্বই হাজার আট কিলোমিটার—অর্থাৎ, আগের চেয়ে প্রায় হাজার কিলোমিটার কমে গেছে। সেই কারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরও সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

'তাছাড়া—আমরা এখন কৃত্রিম খাবার খাই, সময় মেপে প্রতিটি কাজ করি, নক্ষত্র অভিযান নিয়ে গবেষণা করছি—'

শেষ কথাটুকু বলতে গিয়েই আমার মনে পড়ে গেলো পর্দায় দেখা সেই অদ্ভুত ফুটকিটার কথা। এখানে অনুসন্ধান করতে এসে আমি শুধু প্রফেসর দত্তকেই খুঁজে পেয়েছি, কোন যন্ত্রযান তো পাইনি! সেটা তাহলে গেলো কোথায় ? সুতরাং নোটবইয়ের পাতায় নিবিষ্ট প্রফেসরকে প্রশ্ন করলাম, 'যার

খোঁজে আমি এসেছি, সেটাই কিন্তু এখনও দেখতে পাইনি, প্রফেসর দত্ত; আপনার টাইম-মেশিনটা কোথায়?'

প্রফেসর বিব্রত হয়ে পড়ল। যেন একটু লজ্জা পেয়েই বললো, 'এম—১৩৬, আমি একটা নয়, এক সঙ্গে দু-দুটো বিপদে পড়েছি। প্রথমতঃ, আমার টাইম-মেশিনে কোনো গোলমাল হওয়ায়, একা আমি হাজার বছর ভবিষ্যতে না এসে আমার সঙ্গে আমার টাইম-মেশিনটাও চলে এসেছে।' কথা থামিয়ে চশমা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো প্রফেসর।

থাকতে না পেরে আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'দ্বিতীয় বিপদটা কি?'

প্রফেসর দত্ত আমার চোখে তাকালো, বললো, 'এই ২৯৯৯ সালে এসে পৌঁছনোর পর আমার মেশিনের ভেতর একটা গোলযোগ দেখা দেয়। সেটার মেরামত করতে গিয়ে দেখি কন্ট্রোলের দুটো তার কেব্‌ল্‌ ফল্‌ট্‌ হয়ে একেবারে পুড়ে গেছে। ভাবছিলাম, এখানকার কারো সাহায্য চাইবো এমন সময় আপনার দেখা পেলাম।' একটু থেমে প্রফেসর আবার বললো, 'যদি দুটো তার দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়—'

নোটবইয়ে লেখালিখির সময় আমার যেমন হাসি পেয়েছিলো, এখনও তাই পেলো। প্রফেসরকে বললাম, 'তার আমি দিতে পারি, তবে সে তারে আপনার কোন কাজ হবে না—'

প্রফেসর আমার কথায় আমলই দিলো না। বললো, 'খুব কাজ হবে। কই, দেখি—'

অগত্যা আমার কোমরে বাঁধা ছোট্ট ক্যাবিনেট থেকে ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের পাওয়ার প্যাকটা বের করলাম। এখন কেন্দ্রে খবর পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং পাওয়ার প্যাক থেকে জড়ানো তারটা খুলে নিয়ে প্রফেসরকে দিলাম। সেটা নিয়ে সে হন্তদন্ত হয়ে ঝোপের আড়ালে রওনা দিলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। লক্ষ্য প্রফেসরের টাইম-মেশিন।

টাইম-মেশিনটার চেহারায় কল্পনায় যা মনে হয় তার চেয়ে অনেক ছোটখাটো এবং পরিপাটি। প্রফেসর দত্ত দাড়িতে বার দুয়েক হাত বুলিয়ে মেশিনের ওপর তার নিয়ে ঝুঁকে পড়লো। কন্ট্রোল প্যানেলের নিচে কিছুক্ষণ খুট-খাট করে, দাঁত দিয়ে তার কেটে, কখনও বা জোড়া দিয়ে, কিছুক্ষণ পর প্রফেসর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাসি মুখে ঘুরে তাকালো আমার দিকে। তারপর আঙ্গুল উঁচিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া পোড়া তারের টুকরো দুটো দেখালো। আমিও উত্তরে হাসলাম।

টাইম-মেশিনের খাটো সীটে জম্পেস করে বসল প্রফেসর। আমাকে বিদায়

জানিয়ে সবকিছু দেখে নিয়ে সম্ভবতঃ অতীতে ফিরে যাবার বোতাম টিপলো। একটা ঝম্ ধরা শব্দ হলো পলকের জন্য। প্রফেসর সমেত টাইম-মেশিনও অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সে এক অণুপলের জন্য। আমার দেওয়া তারের টুকরো দুটো এক মুহূর্ত শূন্যে ভেসে থেকে পড়ে গেলো মাটিতে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আবির্ভূত হলো প্রফেসর সুধাবিন্দু দত্ত ও তার টাইম-মেশিন। প্রফেসর হতভম্ব ও হতবুদ্ধি হয়ে মেশিনে বসে আছে। সে ১৯৯৯ সালে ফিরে যেতে পারেনি।

আমি একটু হেসে প্রফেসরের কাছে এগিয়ে গেলাম। তারের টুকরো দুটো তুলে নিয়ে তার চোখের সামনে ধরে বললাম, 'প্রফেসর, এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে আমার দেওয়া তারে আপনার কোন কাজ হবে না। কারণ, অতীত থেকে কোন জিনিস ভবিষ্যতে আসতে পারে যখন তখন কিন্তু ভবিষ্যৎ থেকে কোন জিনিস কখনোই অতীতে নিয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং এই তার দুটোও যেতে পারেনি, আর আপনার টাইম-মেশিনও আবার বিকল হয়ে গেছে।'

বাড়তে বাড়তে প্রফেসরের বিস্ময় এখন শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। তাকে আরও অবাক করে দেবার জন্য বললাম, দেখি, আপনার নোটবইটা দিন তো—'

চলমান ছবির মতো টাইম-মেশিন থেকে নেমে এলো প্রফেসর। নোটবইটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। নোটবইটা খুলে দেখি যা ভেবেছি তাই। প্রফেসরের নেওয়া সমস্ত নোট মিলিয়ে গিয়ে পাতাগুলো সাদা হয়ে গেছে। প্রফেসরকে সেটা দেখালাম, বললাম, 'এমনকি কোন লেখাও অতীতে নিয়ে যাওয়া যায় না। কারণ, সময়ের স্রোত চিরকালই ভবিষ্যতের দিক।'

হতাশ হয়ে চিৎকার করে উঠলো প্রফেসর দত্ত, 'তাহলে কি আমি কোনদিনই ১৯৯৯ সালে ফিরতে পারবো না?'

গম্ভীর স্বরে আমি বললাম, 'মনে হয়, না। তবু চলুন, জাদুঘরে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি—'

হাত ধরে প্রফেসরকে নিয়ে চললাম আমার হোভার ক্র্যাফ্টের দিকে। কিন্তু যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো প্রফেসর, বললো, 'জাদুঘরে? জাদুঘরে গিয়ে কি হবে?'

একটু হেসে উত্তর দিলাম, 'দেখা যাক, ওখানে কমপক্ষে হাজার বছরের পুরোনো কোন তার পাওয়া যায় কিনা। একমাত্র তাহলে আপনার টাইম-মেশিন সত্যিকারের সারানো যাবে। আপনিও ফিরে যেতে পারবেন আপনার সময়ে।'

আবার রওনা হয়ে পড়লাম আমরা দুজনে।



জোকার

অজেয় রায়

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিজয় বাড়ি পৌঁছল। স্ত্রী সুরমা তখনো খায়নি। বাবলু শুয়েছে সবে। বাবার গলা পেয়ে সে বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে ফুর্তিতে ডাক দিল—'বাবা।'

বিজয় ব্যাগ থেকে সদ্য কেনা একটা টিনের খেলনা মোটরগাড়ি বের করে বাবলুর হাতে দিতেই সে মহা উৎসাহে চাবি ঘুরিয়ে দম দিয়ে দিয়ে ঘরময় ছোটাতে লাগল গাড়িটা।

সুরমা চটপট কয়েকখানা হাত রুটি তৈরি করতে বসে গেল। ডাল তরকারি যা আছে দু'জনের হয়ে যাবে ভাগাভাগি করে।

মিনিট পনেরো বাদে সুরমা তাড়া দিল বাবলুকে, 'এবার শুয়ে পড়। রাত হয়েছে। গাড়ি তো পালাচ্ছে না।'

বিজয় ততক্ষণে সার্টপ্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি গেঞ্জি গায়ে খুশি মুখে ছেলেকে দেখছে রান্নাঘরের সামনে টুলে বসে। সুরমা খানিক বাদে ফের তাড়া লাগায়, 'আর না, এবার শুয়ে পড় বাবলু। সকালে উঠতে পারবে না নইলে। স্কুল আছে বাধ্য হয়ে বিজয়ও সায় দেয়, 'হ্যাঁ বাবা রাত হয়েছে, এবার শোও।'

বাবলু গাড়ি চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে উৎসুক চোখে বিজয়ের পানে তাকিয়ে বলে, 'বাবা তুমি, কাল থাকবে তো?'

'নাঃ।' কাল সকালেই যেতে হবে। বিজয়ের মুখে বিষন্নতার ছোঁয়া।

'কেন বাবা? থাক না কাল' বাবলুর কণ্ঠে মিনতি, 'আমি কাগজের এরোপ্লেন বানাতে শিখেছি কেমন। দেখাব কাল।

বিজয় ম্লান মুখে ঘাড় নাড়ে, 'উঁহু বড্ড কাজ।'

বাবলু আর বেশি বায়না করে না। সে জানে তার বাবা এমনি মাঝে মাঝে হঠাৎ বাড়ি আসে। বাবার নাকি ঘোরার চাকরি। কেবলই ঘুরতে হয় দেশে দেশে। বছরে একবার ছুটি পায় দিন দশেক। বাবলু আর তার মা দু'জনে থাকে বাড়িতে। বাবলু পড়ে ক্লাস টু-তে।

মোটরটা সযত্নে কাগজের বাক্সে ভরতে ভরতে বাবলু সহসা বলে ওঠে, 'জান বাবা, একটা খুব ভাল সার্কাস এসেছে হুগলীতে। আমাদের ইস্কুল থেকে বলেছে একদিন নিয়ে যাবে দেখাতে।'

শুনেই চমকে ওঠে বিজয়, 'এ্যাঁ; কবে?'

বড়দিদিমণি বলছিলেন আসচে রোববার। তিন টাকা করে লাগবে টিকিটের জন্যে, আর ট্রেন ভাড়া। জুবিলি সার্কাস। খুব নামকরা। আমাদের ক্লাসের পিন্টু দেখে এসেছে ওর বাড়ির সঙ্গে। অনেক বাঘ সিংহ আছে। জোকারগুলোও নাকি দারুণ। বাবা আমি যাব?'

'বেশ যেও।' একটু থতমত খেয়েই সম্মতি দেয় বিজয়।

'সকালে আমি ওঠার আগে যেও না কিন্তু।' উৎফুল্ল বাবলু গাড়ি হাতে লাফাতে লাফাতে চলে যায় শুতে।

রুটি সেঁকতে সেঁকতে সুরমা স্বামীর গম্ভীর মুখ পানে চেয়ে বলে, 'কি ভাবছ? ভয় হচ্ছে?'

বিজয় ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলে, 'হুঁ মানে'—

'ভয় নেই' সুরমা হেসে ভরসা দেয়, 'চিনতে পারবে না। না বলে দিলে কেউ চিনবে না। এমন কি আমিও না।'

'তা বটে।' বিজয়ের মনের মেঘ অনেকখানি কেটে যায়।

ছেলের এই সার্কাস দেখার বিষয়ে বিজয়ের কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার কারণটা কি বুঝতে হলে তার জীবনের কিছু গোপন খবর দেওয়া দরকার।

এখানে বিজয়ের প্রতিবেশীরা জানে যে বিজয় চাকরি করে। কোনও সার্কাস কোম্পানিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সার্কাস পার্টির সঙ্গে কেবল ঘুরতে হয়। ছুটি মেলে খুব কম। তবে ঠিক কোন সার্কাসে কাজ করে বিজয় তা সঠিক জানে না কেউ। বিজয় হেসে বলে—'এক কোম্পানিতে তো বেশি দিন থাকি না। প্রায়ই বদলাই।' কেউ প্রশ্ন করলে একটা ভুল নাম বলে দেয়। আর সে সার্কাস এ অঞ্চলে আসে না কস্মিনকালে।

এই চাকরির ব্যাপারটাই বিজয়ের জীবনে এক গোপন রহস্য। সে সার্কাসে কাজ করে খাঁটি সত্যি। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নয়। সে একজন জোকার। সার্কাস জগতের বাইরে তার আত্মীয় বন্ধুরা-প্রতিবেশীরা কেউ জানে না তার চাকরির আসল পরিচয়, শুধুমাত্র দু'জন ছাড়া। তার স্ত্রী সুরমা এবং মামাতো ভাই প্রসাদ।

সার্কাসে জিমনাস্টিক্সের খেলা দেখাত বিজয়। তাই থেকে জোকার বনে যাওয়া জীবনে তার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি সে।

বছর সাতেক আগে একদিন তাদের সার্কাসে তিনজনের মধ্যে দু'জন জোকার অসুস্থ হয়ে পড়ে। ম্যানেজার বিজয়কে বলেন, 'তুমি আজ জোকার সেজে কাজ চালিয়ে দাও। মাত্র একজন জোকার নিয়ে কি শো জমে?'

বিজয়ের আমুদে স্বভাব। মজার অঙ্গভঙ্গি করা এবং লোকের নকল দেখানোর বিদ্যের খবর জানতেন ম্যানেজার। বিজয় খুশি হয়েই মেক-আপ নিয়ে জোকার সেজে নামে সেদিন। আর চুটিয়ে রগড় করে। দর্শকদের মাতিয়ে দেয় বিচিত্র সব কান্ডকারখানা দেখিয়ে আর মজাদার কথায়। ব্যাস, ম্যানেজার মশাইয়ের হুকুম হয় এবার থেকে তোমায় নিয়মিত জোকার হতে হবে।

'না না', আপত্তি জানিয়েছিল বিজয়, 'আমি জিমনাস্টিক্স শিখেছি।'

'তাতে কি?' দাবড়ে দেন ম্যানেজার, 'আরে জোকারের পার্টেই তোমার আসল ট্যালেন্ট। জোকাব সেজেই দু-চারটে জিমনাস্টিক্সের কসরৎ দেখিও। তাতে জমবে বেশি। আর জুনিয়ারদের জিমনাস্টিক্স ট্রেনিং দিও প্র্যাকটিসের সময়। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

বাধ্য হয়ে বিজয় মেনে নেয় তার নতুন কাজ। তবে জোকার হিসেবে তার খ্যাতি বাড়ে দিন দিন। এখন অনেক নাম করা সার্কাস তাকে নিতে চায় জোকার রূপে। কিন্তু তার এই জোকার পরিচয় বাইরে প্রকাশে বিজয়ের ভীষণ সংকোচ। বাবলু বড় হবার পর এই লজ্জাটা বেড়েছে। খুব ভয় আত্মীয় পরিচিতরা জানলে কি ভাববে'? সবার চোখে ছোট হয়ে যাবে সে।

বিজয় এখন যে সার্কাসে কাজ করে সেটা মস্ত দল। খুব বড় শহর ছাড়া তারা ডেরা ফেলে না। তবে এ বছর কোম্পানীর লাভ হয়নি তেমন। তাই বর্ষার শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাবার মুখে পার্টিটা খানিক ছোট করে কিছু কিছু মফস্বল ছোট শহরে ছাউনি ফেলছে। সেই হেতুই হুগলীতে আগমন। ফলে বাবলুর স্কুল থেকে সার্কাসে যাবার প্রোগাম।

গাঁয়ের ছেলে বিজয় ছিল দামাল দুরন্ত। পড়াশুনায় মন ছিল না তার। ক্লাস এইটের বেজাল্ট বেরুল। বিজয় ফেল্। বাবার মারের ভয়ে বাড়ি ফিরল না। পালাল গ্রাম ছেড়ে। সোজা কলকাতা। তারপর নানান ধান্দায় পেট চালিয়ে ভাগ্যচক্রে ঢোকে এক সার্কাসে। প্রথমে গতরে খাটা মজুর। পরে জিমনাস্টিক্স শিখে প্লেয়ার অর্থাৎ খেলোয়াড়। আপাতত জোকার।

পালানোর বছর দুই বাদে সে বাড়িতে মাকে চিঠি দিয়েছিল। মাঝে মাঝে কিছু টাকাও পাঠিয়েছে মায়ের নামে। তবে বাবা যদ্দিন বেঁচে ছিল দেশে ফেরেনি। খানিক অভিমানে, খানিক রাগী বাপের ভয়ে। বাবা মারা যাবার পর গ্রামে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে প্রতি বছব। ফি মাসে টাকা পাঠিয়েছে মাকে। বছর দুই হল মা মারা গেছে। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কও এখন ছিন্ন। সুরমাও কাজ করত সার্কাসে। টান টান তারের ওপর ছাতা হাতে ব্যালান্সের খেলা এবং আরও টুকিটাকি জিমনাস্টিক্স দেখাত। বিয়ের পর সুরমাকে নিয়ে দেশে গিয়েছিল মাকে বৌ দেখাতে। সুরমার ব্যবহারে খুশি হয়েছিল মা।

বিয়ের মাস ছয়েক বাদে একদিন প্র্যাকটিসের সময় পড়ে গিয়ে সুরমা গুরুতর আঘাত পায়। সে খেলা ছাড়তে বাধ্য হয়!

বাবলুর বয়স এক বছর না হতেই সুরমা ঠিক করে যে সে আর ছেলেকে নিয়ে সার্কাসের সঙ্গে থাকবে না। ছেলে সার্কাসের পরিবেশে মানুষ হোক বিজয় সুরমা দু'জনেই চাইত না। তাদের ইচ্ছে বাবলু বেশ লেখাপড়া শিখে সার্কাসে নয়, অন্য কোথাও কাজ করবে।

মাসতুতো ভাই প্রসাদের পরামর্শে তার বাড়ির কাছে বাসা ভাড়া নিয়ে বৌ-ছেলেকে রাখে বিজয়। প্রসাদ আর তার স্ত্রীর ভরসাতে। জায়গাটা আধা

শহর। ওখান থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে হাওড়া সোয়া ঘন্টার পথ। হুগলী যেতে লাগে মিনিট কুড়ি। স্টেশন থেকে বিজয়ের বাসা মাইল দেড়েক।

বিজয় স্ত্রীকে বলেছে যে আর বড়জোর দু'তিন বছর। হাতে কিছু পয়সা জমবে। তখন সার্কাস ছেড়ে কোনও ব্যবসা শুরু করবে। কি করা যায় পরামর্শ করছি প্রসাদের সঙ্গে। ছেলে সেয়ানা হবার আগেই ছাড়তে হবে এই জোকার বৃত্তি। প্রতিবার বাড়ি আসার সময় বিজয়ের মনে কাঁটার মতন খচখচ করে অস্বস্তিটা। বিজয় নিজেকে তাই যথাসাধ্য গুটিয়ে রাখে এখানে।

ছুটিতে বাড়ি এলে বিজয় বড় একটা বেরোয় না। ওই দোকান বাজার গেলে পথে পাড়ার দু'চারজনের একটু যা নমস্কার ও কুশল বিনিময়। ছুটিতে এলে বিজয় একমাত্র প্রসাদের বাড়িতে যায়।

বিজয় বা সুরমার আত্মীয় স্বজন খুব কম। যে-কজন বা আছে এড়িয়ে চলে তাদের। বড়জোর কালেভদ্রে চিঠির আদানপ্রদান। কারণটা ওই বিজয়ের পেশা। পাছে জানাজানি হয়ে যায়। হুগলীতে এসে অবধি বিজয় খুব সাবধানে থাকে। সার্কাসের ঘেরার বাইরে যায় না পারতপক্ষে।

রবিবার দুটোর শো-য়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের যাওয়া আসার পথে পর্দার আড়াল থেকে উকি দিয়ে বিজয় দেখল ভর্তি গ্যালারির এক জায়গায় বসে এক দঙ্গল নীল-সাদা ইউনিফর্ম পরা ছোট ছেলেমেয়ে, উদগ্রীব বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছে। বাবলুও রয়েছে তাদের মাঝে।

এ্যারেনায় ঢোকার আগে বিজয়ের বুক দুর দুর করে। এমনটা হয় না কখনো। মেক-আপ নিলেই সে বরং চনমন করে লোক হাসাবার ইচ্ছেয়। আজ কেন এই দ্বিধা? বাবলু কি চিনে ফেলবে?

অন্য দু'জন জোকারের সঙ্গে এ্যারেনায় ঢুকে বিজয় খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল। বারদুয়েক এদিকসেদিক পায়চারী করে নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে গেরেমভারি পোজে ঘাড় বেঁকিয়ে সঙ্গী দু'জনের তামাসা দেখতে লাগল। আড়চোখে লক্ষ্য করে বাবলুকে। বাবলু মাঝে মাঝে তার দিকেও চাইছে বটে তবে তাকে চিনতে পারার লক্ষণ নেই। খানিক নিঃসন্দেহ হয়ে বুঝি তার ধ্যানভঙ্গ হল। সে এবার এগুলো খেলা দেখাতে।

বিজয়ের মাথায় ধাঁ করে খেলে গেল—এটা স্পেশাল শো। কারণ স্পেশাল দর্শক হাজির। আজ আমি দেখাব স্পেশাল ফর্ম।

দড়িঘেরা গন্ডির মাঝে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে চওড়া কার্ণিসওলা কিম্ভুত টুপিখানা খুলে হাতে নিয়ে ঝুঁকে সে কুর্নিশ জানায় দর্শকদের।

তারপর তার উদ্ভট বিচিত্র ব্যাপার স্যাপার দেখে ঘনঘন পটাপট হাততালি

বাজে। হা-হা- হি-হি অট্টহাসিতে যতই গড়ায় দর্শক, ততই মাস্টার ট্যাড়স অর্থাৎ বিজয়ের উৎসাহ বাড়ে।

শো-এর শেষে বিজয়ের সহজোকার হারু ওরফে মাস্টার-পোটাটো ব্যাজার মুখে মন্তব্য করল ; 'কিরে বিজয়, আজ যে খুব জোশ্ দেখছি'? একাই মাৎ করে দিলি। ম্যানেজার তোকে স্পেশাল বোনাস টোনাস দেবে বলেচে নাকি'?"

বিজয় বুঝল, হারু চটেছে। সে কাঁচুমাচু হেসে বলে, 'নারে ভাই। কেমন মুড এসে গেল। রাগ করিসনে। পরের শো-য়ে তোরা কেদরানি দেখাস যত-খুশি। আমি বরং একটু রেস্ট নেব।'

পাঁচ দিন বাদে তুমুল ঝড়বৃষ্টির কারণে সেকেন্ড শো বন্ধ হয়ে যেতে বিজয় ম্যানেজারের থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল তাড়াতাড়ি। বাবলুর দেখা পেতে তার মন ছটফট করছে।

বিজয় বাড়ি ঢুকতেই বাবলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ; 'মা বাবা এসেচে।'

বাবলুর হাতে একটা চকোলেট গুঁজে দিয়ে পোশাক পালটিয়ে এক কাপ চা নিয়ে বিজয় জুৎ করে বসল রান্না ঘরের সামনে দাওয়ায়। সুরমা ব্যস্ত হল খাবার বানাতে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিস্পৃহ স্বরে বিজয় জিজ্ঞেস করে বাবলুকে। 'সার্কাস দেখলি'?'

বাবলু লাফিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ বাবা দেখচি। উঃ দারুণ সার্কাস। বাঘ সিংহ আছে অনেকগুলো। হাতি-ঘোড়া, টিয়াপাখির খেলা। ট্রাপিজের খেলা কতরকম! তবে সব চেয়ে কি ভাল জান'? জোকার! মাস্টার ট্যাড়স নামে একটা জোকারের খেলা দুর্দান্ত। উঃ কি মজার!'

'তাই বুঝি'?' বিজয়ের মন্তব্য।

'হ্যাঁ বাবা সত্যি!'

'কেমন দেখতে জোকারটি'?'

লম্বা কুঁজো। গায়ে তাপ্পি মারা ডোরাকাটা ঢলঢলে জ্যামাপ্যান্ট। এত বড় উল্টোমুখো জুতো পরে এঁকেবেঁকে হাঁটে। মাথায় টোকার মতন মস্ত টুপি। গোটা মুখখানা হলুদ সাদা কালো রঙে এমন আঁকা যে দেখলেই হাসি পায়। চোখ দুটো গোলা গোল। ক্যান ক্যানে গলায় এমন মজার মজার কথা বলছিল আর অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড করছিল যে কি বলব! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গিছল সবার'—

'কি রকম কান্ড।' বিজয় উসকোয়।

'সে যে কতরকম! ঘোড়ার খেলা হবার পরেই ও একটা গাধা এনে উল্টো মুখে তার পিঠে চেপে বসতেই গাধাটা ছুট দিল। তখন ট্যাড়সের কি চেঁচানি—

পড়ে যাব। ওরে বাবা। রোক্‌কে রোক্‌কে। থাম বেটা থাম্‌।'

ট্যাড়সের মাথার টুপি উড়ে গেল। কয়েকবার পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে সামলে নিল। শেষে গাধাকে যেই ফুচকা খাওয়াবে বলে প্রমিস করল, অমনি গাধাটা থেমে গেল। তার আগে ঘাস ছোলা খাওয়াবে বলেছিল, গাধাটা কিন্তু থামেনি। পুলিশে নালিশ করবে বলে ভয় দেখাতে রেগেমেগে আরও লাফাতে লেগেছিল।'

হি হি করে একচোট হেসে নেয় বাবলু। ফের বলে—

'শূন্যে ট্রাপিজের খেলার সময় ও কি করল জান? টুপি খুলে, দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে যেই ওধার থেকে একজন প্লেয়ার দুলে কাছে এসেছে অমনি মেরেছে লাফ তাকে লক্ষ্য করে। ব্যাস তার পা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর কি চিৎকার—বাঁচাও বাঁচাও। দমকল; দমকল। আবার অন্য একজন প্লেয়ার দোলনায় ঝুলে কাছে আসতেই ও ছিটকে গিয়ে তার দু'হাত ধরে ফেলে দুলতে লাগল। আর অমনি দুলতে দুলতে যার হাত ধরে আছে তার সঙ্গে যা তা বলে ঝগড়া লাগাতে প্লেয়ারটা রেগে গিয়ে ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতেই ট্যাড়স একটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল নিচে নেটের ওপর। আরও কত যে মজার খেলা ওর মাথা থেকে বেরুচ্ছিল। আরও দুজন জোকার ছিল কিন্তু মাস্টার ট্যাড়সের কাছে কেউ লাগে না।'

বিজয় সকৌতুকে শোনে।

বাবলু বলে চলে, 'জান ট্যাড়স একটা ফাটা কাঠ নিয়ে পেছনে ফটাস ফটাস করে মারছিল আর যা খুশি হুকুম করছিল বাংলা হিন্দী ইংরিজিতে। কেউ অবশ্য মানছিল না ওর কথা। তাই চটে গিয়ে ও সবাইকে জেলে দেব, বলে ভয় দেখাচ্ছিল। অন্য সব প্লেয়ারদেরও যা নকল দেখাচ্ছিল না! তাদের হাঁটা-চলা, খেলা, কথা বলা। সব কিছুর কমিক। মেয়ে প্লেয়ারগুলোকে যা খচাচ্ছিল কি বলব। ওকে ছাতা নিয়ে মারতে তাড়া করেছিল একটা মেয়ে।

'একবার ওর হাতের কাঠটা আমাদের দিকে তাক করে এমন ভড়কি দিল যেন ছুঁড়ছে। আমরা তো ভয়ে মাথা ঢেকে ফেলেছি। বড়দিদিমণি অবধি ভয়ে উল্টে পড়ছিলেন আরকি। ট্যাড়স হে হে করে হেসে ভেংচি কেটে চলে গেল।

'জান বাবা, সবাই বলছিল বড় সার্কাস ছাড়া এমন জোকার থাকে না। অঙ্কের দিদিমণি বলছিলেন ওই জোকাররা নাকি সত্যি সত্যি ভাল খেলা জানে। এমন করে যেন বোকা হাবা লোক। ওটা আসলে ভান। বাবা সত্যি নাকি?'

'হুঁ তাই শুনেছি।' হাসি চেপে গম্ভীর বদনে জানায় বিজয়।

‘বাবা তুমি কি কাল থাকবে?’

‘নারে।’

বাবলু কাছে এসে বাপের গায়ে হাত রেখে আবদার করে—‘থাক না। কাল তোমার সঙ্গে আর একবার সার্কাসটা দেখতে যাব। আমাদের ক্লাসের অনেকে বাড়ির লোকের সঙ্গে আরও একবার সার্কাস দেখে এসেচে। মাকে কত বলছি নিয়ে যেতে। যাচ্ছে না। আর কারও সঙ্গে যেতেও দিচ্ছে না।’

বিজয় বিষণ্ন ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘উঁহু ছুটি নেই। কাল যেতেই হবে।’

বাবলু জোর করে না। যদিও তার মুখ একটু করুণ হয়। খানিক চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলে, ‘বাবা তুমি ওদিকে গেলে সার্কাসটা দেখে নিও। বেশিদিন আর থাকবে না।’

‘বেশ সুবিধে হলে দেখে নেব’, বলল বিজয়।

বাবলু হঠাৎ হাত মুখ নেড়ে খুশিতে ডগমগিয়ে বলে ওঠে—

‘বাবা আমি বড় হলে জোকার হব! মাস্টার ট্যাড়সের মতন জোকার।’

‘এ্যা!’ চমকায় বিজয়।

‘জান বাবা, কেষ্টদা বলছিল, অমন খেলা দেখানো যারতার কর্ম নয়। সাধনা চাই। সাধনা মানে কি বাবা?’

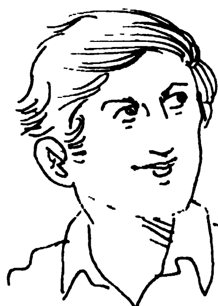
‘ইয়ে, মানে চেষ্টা।’ বিজয় থতমত।

‘আমি পারব না বাবা? খুব শক্ত?’

‘না তা কেন?’ বিজয় উত্তর এড়ায়।

বাবলু শুতে যাও। আগে লেখাপড়া। পরে অন্য চিন্তা।’ সুরমা ধমক দেয়। ‘তুমি দেখে নিও, আমি ঠিক অমনি হব’, বলতে বলতে বাবলু নিজের বিছানায় গিয়ে ঢোকে।

বিজয় দেখে স্ত্রীর চোখে চাপা হাসির ছটা। খুশি ও গর্বে তার বুক ভরে যায়।





রাজার আংটি ও জগাই

প্রফুল্ল রায়

পহেলগাঁও-এর এই উঁচু-নিচু রাস্তাটার দুধারে লাইন দিয়ে হোটেল, টুরিস্ট লজ, আর নানা ধরনের দোকানপাট। দোকানগুলোর ঝকঝকে কাচের আলমারিতে সাজান রয়েছে দারুণ দারুণ কাশ্মীরি শাল, পশমের টুপি, কোট, কাঠের আর পাথরের তৈরি কত রকমের যে জিনিস। দেখলেই সব কিনে ফেলতে ইচ্ছে করে।

বাঁ দিকের হোটেলের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে লীডার নদী। তার নীল

জল পাথরে ধাক্কা খেয়ে একটানা ঝুমঝুম শব্দ করে যাচ্ছে। মনে হয় সারাদিন সারারাত নদীটা কত্থক নাচ নেচে চলেছে।

নদীর পর যতদূর চোখ যায় ছবির মত সাজান অগুনতি পাহাড়। পাহাড় শুধু নদীর দিকেই নেই; সামনে পেছনে বা ডান দিকে সব জায়গাতেই পাহাড় আর পাহাড়। তাদের গায়ে কত যে গাছ—পাইন, দেবদারু, উইলো। এইসব গাছ আকাশের দিকে রাজার মত মাথা তুলে রয়েছে।

এখন বিকেল। সূর্যটাকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না; বাঁ দিকের পাহাড়গুলোর আড়ালে সেটা নেমে গেছে। শুধু উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায় একটুখানি সোনালি রোদ চিকচিক করছে।

কিন্তু কাশ্মীরের এই উপত্যকায় ঐ রোদটুকুও আর বেশীক্ষণ থাকবে না। ঝুপ করে একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে; বিশেষ করে এই অক্টোবর মাসে।

বাতাস এর মধ্যেই ভীষণ ঠান্ডা হয়ে গেছে। কনকনে হিম উঠে আসছে চারপাশ থেকে। মাসখানেক পরেই যে কাশ্মীরে বরফ পড়তে শুরু করবে, এখনই তা টের পাওয়া যায়।

মা আর বাবার সঙ্গে পহেলগাঁও-এর রাস্তায় বেড়াচ্ছিল রুকু। ওদের তিনজনের পরনেই দামী দামী গরম পোষাক। মাথায় পশমের টুপি। পায়ে উলের মোজা চকচকে জুতো।

রুকুদের পেছন পেছন হাঁটছিল জগাই। তার গায়ে খুব সস্তা দামের জামা-প্যান্ট আর রোঁয়াওলা মোটা উলের পুল-ওভার; পায়ে পুরোন কেডস। এতে কাশ্মীরের ঠান্ডা ঠেকান যায় না। ছেলেটা শীতে কাঁপছিল।

রুকু আর জগাই একবয়সী হবে; দুজনের এগার চলছে। লম্বায় দুজনেই সমান সমান।

রুকু কলকাতার একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। খুব যত্নে থাকে বলে তার স্বাস্থ্য চমৎকার। গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তার কোন ভাইবোন নেই।

আর জগাই রোগা, কালো। সে-ও একসময় স্কুলে পড়ত; কিন্তু হঠাৎ মা-বাবা মরে যাওয়ায় দু বছর আগে রুকুদের বাড়ি কাজ করতে এসেছিল। তারপর থেকে ওখানেই আছে। পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। কাজ না করলে কে তাকে খাওয়াবে?

দিনরাত খেটেও রুকুদের বাড়ির কাউকে খুশি করতে পারে না জগাই। সারাক্ষণ সে বকুনি খায়। সব চাইতে বেশি বকাবকি করে রুকু। ছেলেটা য়েমন রাগী, তেমন হিংসুটে। একটুতেই ক্ষেপে উঠে চেচাঁতে থাকে। মা-বাবা আদর দিয়ে দিয়ে তাকে মাথায় তুলে ফেলেছে।

এইসব কারণে সবসময় মনমরা হয়ে থাকে জগাই। ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ছেলেটার বড় দুঃখ।

এই অক্টোবর মাসে কলকাতায় যখন মাইক বাজিয়ে, আলোয় আলোয় চারদিক ভরে দিয়ে পুজো হচ্ছে তখন রুকুরা যে দুম করে কাশ্মীর বেড়াতে এল তার পেছনে একটা দারুণ ঘটনা রয়েছে।

ঠিক চারমাস আগে, সেই জুনের শুরুতে সন্ধেবেলা রুকু মা-বাবার সঙ্গে লেকে বেড়াতে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে জগাইও ছিল।

কলকাতায় থাকলে রোজই বিকেলে দু'ঘণ্টা লেকে বেড়ায় রুকুরা। জগাইকে ওদের সঙ্গে একটা বাস্কেট নিয়ে যেতে হয়। রুকুর বাবার কিছুক্ষণ পর পর কফি, রুকুর মায়ের চা আর রুকুর ওভালটিন খাওয়ার অভ্যেস। জগাইর বাস্কেটে তিনটে বড় ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ থাকে।

সেদিন সারা লোকটা একটা একপাক ঘুরে ওরা যখন স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে লেক গার্ডেনসের দিকে যেতে যেতে বাঁধান ব্রিজটার ওপর এসে উঠেছে সেই সময় নিচের জলে ঝপাং করে একটা শব্দ হল। মনে হল কেউ পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চিৎকার শোনা গেল। আর তক্ষুনি জলে আরেকবার ঝপাং শব্দ। জগাই বাস্কেটটা নামিয়ে রেখে তীরের মত ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে খুব ভাল সাঁতার জানে।

লেকের এদিকটায় লোকজন বেশি ছিল না। আশেপাশের রাস্তায় আলোগুলোও কেন যেন সেদিন জ্বলেনি; খুব সম্ভব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিজটার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে একটা অবাঙালী ফ্যামিলি দম বন্ধ করে তাকিয়েছিলেন। একজন মাঝবয়সী মহিলা সমানে কাঁদছিলেন। তাঁর পাশে যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। কী যে তিনি করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না।

রুকুরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেন ওঁরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, কেন মহিলাটি কাঁদছেন আর কেনই বা বাস্কেট-টাস্কেট ফেলে জগাই ওভাবে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বোঝা যাচ্ছিল না।

রুকুরা বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বয়স্ক লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী হয়েছে বলুন তো? আমরা কি কোনভাবে সাহায্য [illegible] পারি?

ভদ্রলোক যা বলেছিলেন [illegible]। ওরা দিনকয়েক আগে কাশ্মীর থেকে কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। সেদিন এসেছিলেন লেকে। ঘুরতে ঘুরতে এই ব্রিজের ওপর আসতেই তাঁদের ছ বছরের ছোট ছেলে হঠাৎ

রেলিংয়ে উঠে কী যেন দেখতে গিয়ে পড়ে যায়। তারপরেই একটি ছেলে দৌড়ে এসে জলে লাফিয়ে পড়ে।

বোঝা গিয়েছিল, ছোট ছেলেটাকে পড়তে দেখে জগাই লেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সত্যিই তাই, একটু পরেই একটা বাচ্চাকে টানতে টানতে পাড়ে নিয়ে আসে সে। বাচ্চাটার তখন জ্ঞান নেই।

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরেন। ভদ্রলোক বলেন, এক্ষুণি একজন ডাক্তার দরকার। আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না—

—চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি।

রুকুর বাবা জগাই, রুকু এবং তার মাকে বাড়ি পাঠিয়ে তক্ষুণি ট্যাক্সি ডেকে ওঁদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ভাল করে দেখে একটা ইঞ্জেকসান দিতেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

এভাবে সাহায্য করার জন্য ভদ্রলোক রুকুর বাবার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। বলেছিলেন, আপনাদের জন্যে আমার ছেলেটিকে ফিরে পেলাম। এ উপকার কোনদিন ভুলব না।

রুকুর বাবা বলেছিলেন, আমি এমন কিছুই করিনি। যে কেউ এটুকু করত। আপনারা এখানে কোথায় উঠেছেন?

একটা বিখ্যাত ফাইভ-স্টার হোটেলের নাম করেছিলেন ভদ্রলোক। রুকুর বাবা তাঁদের সেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হোটেলের দিকে যেতে যেতে ভদ্রলোকটির পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর নাম আনোয়ার করিম। শ্রীনগরে তাঁদের বাড়ি। আপেল, আখরোট এবং বাদামের বাগান আছে পনেরটা। এছাড়া, কাশ্মীরি সালের ব্যবসা আছে। তা ছাড়া বড় বড় হাউসবোট রয়েছে কুড়িটা; সেগুলো ডাল লেকে ভাড়া খাটে।

বোঝা যাচ্ছিল, আনোয়ার সাহেব খুবই বড়লোক। তিনি রুকুর বাবার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নিয়েছিলেন।

হোটেলের কাছে পৌঁছে হঠাৎ আনোয়ার সাহেবের কী মনে পড়তে ভীষণ ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, আরে, সেই ছেলেটিকে তো কিছুই বলে আসা হল না। বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। ওর জন্যে আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল।

—কার কথা বলছেন?

—যে আমার ছেলে মকবুলকে জল থেকে তুলে এনেছে। ও না হলে

মকবুলকে বাঁচানই যেত না। ঐ ছেলেটি কে?

চট্ করে কি ভেবে নিয়ে রুকুর বাবা বলেছিলেন, আমার ছেলে রুকু। ওর জন্যে কিচ্ছু করতে হবে না। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা তো একটা ডিউটি। খুব ছোটবেলা থেকে ওকে আমরা এই শিক্ষাই দিয়েছি।

—চমৎকার ছেলে আপনার। কাল বিকেলে আপনার বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসব।

—নিশ্চয়ই আসবেন।

পরের দিন আনোয়ার সাহেব প্রচুর মিষ্টি আর দামী দামী কেক নিয়ে রুকুদের লেক গার্ডেনসের বাড়ি এলেন। রুকুর সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুব খুশি। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কতবার যে আশীর্বাদ করলেন। কাল আবছা অন্ধকারে কে তাঁর ছেলেকে লেকের জল থেকে তুলে এনেছিল বুঝতে পারেননি। তাছাড়া তখন তাঁর মনের যা অবস্থা অন্যদিকে তাকাবার মত সময় ছিল না।

আগের দিন হোটেলে আনোয়ার সাহেবদের পৌঁছে দিয়ে এসেই রুকুর বাবা রুকুকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, জগাই না, সে-ই মকবুলকে জল থেকে তুলে এনেছে। এ নিয়ে আনোয়ার সাহেব যখন তাকে আদর টাদর করবেন তখন সে যেন আঙুল বাড়িয়ে জগাইকে দেখিয়ে না দেয়।

ওরা ইংরেজীতে কথা বলছিল। জগাই ইংরেজী না জানলেও কাল জল থেকে সেই ছোট ছেলেটাকে তুলে আনার ব্যাপারেই যে কথা হচ্ছিল, সেটা বুঝতে পেরেছে। দেখতে দেখতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল জগাইর।

আনোয়ার সাহেব যে রুকুদের জন্য কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, অক্টোবর মাসে পুজোর ছুটিতে তাদের কাশ্মীরে নিয়ে যাবেন। পুরো ছুটিটা রুকুরা সেখানে কাটিয়ে আসবে। শ্রীনগরের সুন্দর সুন্দর হ্রদ, বাগান ইত্যাদি তো তারা দেখবেই। তাছাড়া সোনমার্গ, ওলমার্গ, চন্দনবাড়ি, তেজোয়াস বা পহেলগাঁওয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। কাশ্মীরে যা যা দেখবার আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন আনোয়ার সাহেব। শুধু তাই না, ডাল লেকে কদিন হাউসবোটেও থাকবে রুকুরা, ঝিলম নদীতে ট্রাউট মাছ ধরবে। ইচ্ছে হলে গুলমার্গে বরফের ওপর স্কীও করে আসবে।

কলকাতা থেকে কাশ্মীরে ফিরে জুলাই মাসের গোড়াতেই ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। রুকুর বাবা অনেক আগে আগেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলেন। জগাইকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক নয়, তাই তার টিকিটও করা হয়েছে।

অক্টোবরে পুজোর ছুটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রুকুরা কাশ্মীরে চলে এসেছে। প্রথমে শ্রীনগরে আনোয়ার সাহেবের বাড়িতে কদিন থেকে ওখানকার সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছে রুকুরা। তারপর আনোয়ার সাহেব শ্রীনগর থেকেই ফোনেই পহেলগাঁওয়ের এক হোটেলে একটা ভাল স্যুইট 'বুক' করে নিজের একখানা গাড়ি আর লোক দিয়ে রুকুদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। গাড়িটা রুকুদের কাছেই থাকবে, সঙ্গে যে লোকটাকে দিয়েছেন সে হবে ওদের ড্রাইভার এবং গাইড। তার নাম জামশিদ। চন্দনবাড়ির দিকে যতদূর যাওয়া যায় জামশিদ রুকুদের নিয়ে যাবে।

ব্যবসার কাজে আটকে যাওয়ার আনোয়ার সাহেব রুকুদের সঙ্গে পহেলগাঁওয়ে আসতে পারেনি। সেজন্য রুকুর মা এবং বাবার কাছে বার বার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

পরিষ্কার ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল রুকুরা। রাস্তায় এবং দুধারের দোকানগুলোতে প্রচুর লোকজন। এদের বেশির ভাগই টুরিস্ট। বাঙালী, শিখ, মারাঠী, গুজরাতি, রাজস্থানী—সারা ভারতের লোক তো এসেছেই, আমেরিকা, ইওরোপ এবং ফার ইস্ট থেকেও অগুনতি টুরিস্ট এসেছে। প্রায় সবারই গলায় ঝুলছে একটা করে ক্যামেরা।

রাস্তাটা উটের পিঠের মত খানিকটা উঁচুতে উঠেই যেখানে ঢালের দিকে নেমে গেছে, সেখানে আসতেই ঘোড়াওয়ালা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ইধর সাহাব, ইধর আইয়ে। বহোত আচ্ছা 'তেজ' ঘোড়া হ্যায় হামারা—

এখানে রাস্তার ধারে পাইনগাছগুলোর নিচে অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুগুলোর পিঠে বসবার জন্য নরম গদি, আর গলায় দড়ি বাঁধা। দড়ির একটা মাথা তাদের মালিকরা ধরে রয়েছে।

সকাল-বিকেল ঘোড়াওলারা টুরিস্টদের ডাকাডাকি করে, তাদের টাট্টুগুলোর পিঠে তুলে দু তিন ফার্লং ঘুরিয়ে আনে। এজন্য মোটামুটি ভালই পয়সা পায়। কার টাট্টু কত তেজী, কত ভাল দৌড়তে পারে, অনবরত তা চিৎকার করে করে জানাতে থাকে।

তিনদিন, পহেলগাঁওয়ে এসেছে রুকুরা; তিনদিনই টাট্টুতে চড়েছে।

রুকু বলল, বাবা, ঘোড়ায় চড়ব।

রুকুর বাবারও সেই ইচ্ছাই ছিল। তিনটে ঘোড়া ভাড়া করে ফেললেন তিনি। একটা রুকুর জন্যে, একটা তার মায়ের জন্যে আর একটাতে তিনি চড়বেন।

জগাইর জন্য কোনদিনই টাট্টু নেওয়া হয় না। রুকুরা ঘোড়ায় চড়ে যতক্ষণ

না ফিরে আসে, সে এই পাইনগাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজও দাঁড়িয়ে রইল।

রুকুদের তিনটে ঘোড়া পহেলগাঁওয়ের চকচকে রাস্তায় খট খট শব্দ তুলে একসময় দুরের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুকুদের পর এল আরো কয়েকজন টুরিস্ট, বার-চোদ্দটা টাট্টু ভাড়া করে সেগুলোর পিঠে চড়ে চলে গেল।

পাইনগাছের তলায় এখন আর বেশি ঘোড়া নেই। খুব বেশি হলে চার-পাঁচটা।

দূরে উঁচু গাছগুলোর মাথায় এখন আর রোদ নেই। সন্ধে নামতে শুরু করেছে। আবছা অন্ধকারে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। বাতাসে আরো বেশি করে হিমের গুঁড়ো মিশে গেছে। তার ছোঁয়ায় চামড়া যেন কেটে কেটে যাবে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জগাই মনে নেই। কার ডাকে চমকে উঠে ডানপাশে তাকাতেই দেখতে পেল একটা ঘোড়াওলা তার টাট্টুটাকে নিয়ে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘোড়াওলা একজন যুবক; ভারি সুন্দর তার চেহারা।

এক ঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে আছে জগাই; তাছাড়া তিন-চার দিন ধরে রোজ এখানে আসছে। ঘোড়াওলাদের সবাই মুখচেনা হয়ে গেছে কিন্তু একে আগে আর কখনো দেখেছে বলে মনে হল না। জগাই একটু অবাকই হল।

চোখের ইশারায় অচেনা ঘোড়াওলা জগাইকে টাট্টুর পিঠে চড়তে বলল।

জগাই বেশ ভয়ই পেল। তারপর জামার পকেট দেখিয়ে জানাল তার পয়সা নেই।

ঘোড়াওলা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল, না থাক পয়সা। রোজ তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাক। চল আজ তোমাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

হিন্দীটা ভালই বোঝে জগাই। কেন না কলকাতায় রুকুদের দোকান বাজার সে-ই করে। ট্যাক্সিওলা, রিক্সাওলা, আইসক্রিমওলাদের তাকেই ডেকে আনতে হয়। ওদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে বলতে ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছে সে।

জগাইর লোভও হল, আবার ভয়ও হল। ভয়ের কারণ রুকুরা এসে তাকে দেখতে না পেলে ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ঘোড়ওলা তাকে টাট্টুতে চড়িয়ে দিল। জগাই না না করতে করতে নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই টাট্টু সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল।

এমনিতে টাট্টুরা আস্তে আস্তে দৌড়য়। কিন্তু জগাইর টাট্টু দারুণ জোরে

ছুটছে। আগে কখনো ঘোড়ায় চড়েনি সে; ভয়ে টাট্টুর গলা জড়িয়ে ধরল সে। সেই অবস্থাতেই একবার পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু ঘোড়াওলাটাকে কোথাও দেখা গেল না, চোখের পলকে সে উধাও হয়ে গেছে।

খানিকটা যাবার পর, আগে যে টাট্টুগুলো টুরিস্টদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—তাদের দেখতে পেল জগাই। ওদের মধ্যে রুকুরা রয়েছে।

রুকুরাও ওকে দেখতে পেয়েছে। রুকুর বাবা চেঁচিয়ে বললেন, এই জগাই ঘোড়ায় উঠেছিস যে! এত বড় সাহস তোমার আমাদের না বলে টাট্টুতে চড়েছ! শিগগির নাম—বোঝা গেল, বাড়ির চাকর ঘোড়ায় চড়ায় তিনি ভীষণ রেগে গেছেন।

নামতে পারছি না— জগাই কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই তার টাট্টু দুরন্ত গতিতে রুকুদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল।

তারপর টাট্টুটা কখন যে ধবধবে সাদা, কেশরওলা বিরাট এক আরবী ঘোড়া হয়ে গেছে, জগাই জানে না।

একসময় চাঁদ উঠল। দুধের মত জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

হঠাৎ জগাইয়ের চোখে পড়ল, তার ঘোড়াটা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটছে না। গাছপালা উপত্যকা আর লীডার নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

উড়তে উড়তে অনেকক্ষণ পর টুক করে নিচে নেমে একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যায় এটা রাজার বাড়ি।

প্রকান্ড ফটকের সামনে বিরাট চেহারার দারোয়ানেরা কাঁধে খোলা তলোয়ার এবং বর্শা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ফটকের ভেতর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে প্রচুর আলো আর প্রচুর মানুষ।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল জগাইয়ের। এমন ভয় জীবনে সে আর কখনো পায়নি। পহেলগাঁয়ের সেই টাট্টুটা যে বিরাট ধবধবে আরবী ঘোড়া হয়ে যাবে, তারপর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তাকে এই রাজবাড়ির সামনে নিয়ে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল। এখান থেকে আর কি কোনদিন সে ফিরতে পারবে?

কী করবে যখন জগাই বুঝে উঠতে পারছে না সেই সময় কোত্থেকে যেন ক-টা লোক—তাদের মাথায় পাগড়ি, গায়ে দামী পোশাক—ছুটতে ছুটতে এসে জগাইকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ভেতরে একটা ঘরে নিয়ে গেল।

এ বাড়িতে বিজলি বাতি নেই। চারদিকে শুধু ঝাড় লণ্ঠন; সেগুলোর ভেতর নানা রঙের মোম জ্বলছে।

লোকগুলো খুব যত্ন করে গরম জলে তার হাত পা ধুইয়ে, বাজে জামাপ্যাণ্ট ছাড়িয়ে চমৎকার পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর আরেকটা ঘরে এনে

কতরকমের ভাল ভাল খাবার আর ফল খাওয়াল! এমন খাবার-দাবার জীবনে চোখেই দেখেনি জগাই।

ভয়টা অনেক কেটে এসেছিল জগাইর। সে একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি?

লোকটা বলল, কাশ্মীরের রাজার।

—আমাকে এখানে আনা হল কেন?

—রাজামশাই নিজেই তা বলবেন।

কাশ্মীরের রাজা কেউ আছেন কিনা, জগাই জানে না। কেন তিনি তাকে একটা বহুরূপী ঘোড়া পাঠিয়ে ধরে আনলেন তা-ই বা কে জানে। সেই ভয়টা আবার নতুন করে ফিরে এল। ভয়ে তার বুক গুরগুর করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরেক দল লোক এসে তাকে একটা প্রকান্ড হলঘরে নিয়ে এল। এখানকার জাঁকজমক দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল জগাইর।

ঢুকবার মুখে যে বিরাট দরজাটা রয়েছে, সেখান থেকে পুরু লাল গালিচা একেবারে শেষ প্রান্তের উঁচু বেদী পর্যন্ত পাতা রয়েছে। দুধারে অনেকে বসে আছেন। এঁদের পোশাক, মাথার পাগড়ি, গলার হার ইত্যাদি দেখে বোঝা যায়, এঁরা বিরাট বিরাট লোক।

গালিচার ওপর দুপাশে হাতে রুপোর থালায় সাদা সুগন্ধি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা। একটি মেয়ে এসে তাকে দুরে বেদীর দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সে যত এগুচ্ছে দু পাশের মেয়েরা তার মাথায় ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

জগাই জানে না এটা রাজদরবার। একসময় দরবারের শেষ মাথায় বেদীর কাছে পৌঁছে যায় সে।

বেদীর ওপর সোনার সিংহাসনে যিনি বসে আছেন দেখামাত্র বোঝা যায় তিনিই রাজা। এই দরবারে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবার থেকে তিনি সুন্দর। সব চাইতে দামী পোশাক তাঁর পরনে; মাথায় যে মুকুটটা রয়েছে তাতে কত যে হীরেপান্না মণিমুক্তো! তাঁর পাশে আর একটা সিংহাসনে ফাঁকা পড়ে আছে; সেটাও সোনার।

রাজা নিজে জগাইর হাত ধরে পাশের সিংহাসনে বসালেন। তারপর মিষ্টি করে হেসে তাকে বললেন, ঘোড়ায় চড়ে আসতে কষ্ট হয়নি?

মাথা নাড়ল জগাই—হয়নি।

—ভাল করে পেট ভরে খেয়েছ?

ঘাড় কাত করে জগাই জানাল, খেয়েছে। আস্তে আস্তে তার ভয় কাটতে লাগল!

রাজা এবার দরবারের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, আগে আপনাদের এই ছেলেটির পরিচয় দিই। এর নাম জগাই। ও বড় দুঃখী।

তারপর জগাই কোথায় থাকে কী করে এবং কিভাবে মকবুলকে বাঁচিয়েছে এবং ওকে ঠকিয়ে কিভাবে ওর কৃতিত্ব রুকুর বাবা কায়দা করে নিজের ছেলেকে দিয়েছেন—সব জানিয়ে রাজা বলতে লাগলেন, এমন একটি ভাল ছেলে যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একজনকে বাঁচিয়েছে তার জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত। কাশ্মীরে এসে মনে দুঃখ নিয়ে জগাই ফিরে যাবে, এ হতে পারে না। আপনারা কী বলেন?

সবাই মাথা নেড়ে জানালেন, নিশ্চয়ই কিছু করা উচিত।

রাজা বললেন, আমি জগাইকে কাশ্মীরের মানুষের তরফ থেকে ওর ভাল কাজের জন্য এই আংটিটা দিতে চাই। নিজের আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে জগাইর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জগাই উঠে দাঁড়িয়ে আংটিটা নিয়ে রাজাকে প্রণাম করল। সে শুনেছে কেউ কিছু দিলে প্রণাম করতে হয়।

ওটা পরে ফেল।—রাজা বললেন,—এই আংটিটা যাদু আংটি। এর কাছে যা চাইবে তাই পাবে। তবে লোভ করে বেশি কিছু চাইবে না। তা হলে আংটিটা হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ রুকুদের কথা মনে পড়ল জগাইর। আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, আমি যাদের কাছে থাকি তারা সবসময় বকে, চোখ পাকিয়ে কথা বলে।

—মনে মনে আংটিটাকে বল; দেখবে ওরা ভাল ব্যবহার করবে।

একটু সাহস করে জগাই এবার বলল, আমি যে মকবুলকে বাঁচিয়েছি, এই কথাটা আনোয়ার সাহেবকে ওরা জানাবে?

—আংটিকে বললেই জানাবে।

—ছেলেবেলায় মা-বাবা মরে যাবার পর আর পড়তে পারিনি। আমার ইচ্ছে স্কুলে ভর্তি হব।

—আংটিকে জানালেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

একসময় রাজদরবারে জগাইর সংবর্ধনা শেষ হল। রাজা জগাইকে বললেন, যাও, এবার গিয়ে শুয়ে পড়। ঘোড়ায় চড়ে অনেকটা দূর থেকে আসছ। দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত।

জগাই বলল, আমি ফিরে যাব কি করে?

—সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

রাজার ইশারায় দুটো লোক এসে জগাইকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বিরাট খাটে ধবধবে নরম বিছানায় গরম লেপের ভেতর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল, জগাই দেখল পহেলগাঁওয়ের সেই হোটেলের সামনের বাগানে বেতের চেয়ারে বসে আছে। আনোয়ার সাহেব এখানেই তাদের জন্য ঘর ভাড়া করেছেন। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। আর তাকে ঘিরে রুকুরা তো দাঁড়িয়ে আছেই; হোটেলের লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে। কাল সারারাত সে ফিরে না আসায় সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল।

কিভাবে ঘুমের ঘোরে এখানে চলে এসেছে জগাই বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ কর্কশ গলায় রুকুর বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, সমস্ত রাত কোথায় ছিলি রে পাজি বজ্জাত ছোকরা'?

জগাই চমকে উঠল। রুকুর বাবা, মা আর রুকু তার দিকে ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আংটির কথা মনে পড়ে গেল জগাইর। দেখল, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে রাজার দেওয়া আংটিটা রয়েছে। তবে ওরা যে দামী পোশাক পরিয়েছিল সেটা নেই। সে যা চায় মনে মনে আংটিটাকে জানাল।

তক্ষুণি মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে গেল রুকুদের। রুকুর মা আর বাবা কাছে এসে খুব নরম গলায় বললেন, সারা রাত তোর জন্যে ঘুমোতে পারেনি বাবা। কী দুশ্চিন্তায় যে কেটেছে! চল চল ঘরে চল—

রুকু বলল, মা ঠান্ডায় জগাইর বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ওকে আমার কোট আর সোয়েটার দাও—

রুকুর মা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোরটা পরুক। কলকাতায় গিয়েই ওকে নতুন কোট-টোট করিয়ে দেব।

এমন সুন্দর ব্যবহার রুকুদের কাছ থেকে আগে আর কখনো পায়নি জগাই।

এর দুদিন বাদে শ্রীনগরে ফিরে রুকুর বাবা আনোয়ার সাহেবকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর ছেলে রুকু নয়, কলকাতার লেক থেকে মকবুলকে বাঁচিয়েছে জগাই।

আরো দু সপ্তাহ পর কলকাতায় ফিরে জগাইর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন রুকুর মা আর বাবা। এখন দুটো মাস সে বাড়িতেই পড়বে; জানুয়ারি পড়লেই তাকে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে।

কাছে কেউ না থাকলে আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জগাই। তখনই কাশ্মীরের রাজার মুখ মনে পড়ে। তাঁর কথা যতবার ভাবে, দুচোখ জলে ভরে যায়।



বদন দারোগার বৃত্তান্ত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দুঁদে দারোগা বদনচন্দ্র সেই কুসুমডি থেকে বদলি হয়ে এলেন কিনা এই ন্যাড়া বেলতলা। একে ন্যাড়া বেলতলায়, তায় আবার বদনচন্দ্র। যোগে যোগ যাকে বলে। ন্যাড়া বেলতলার লোকেরা যেমন ট্যাটা, বদন দারোগাও তেমনই দুঁদে।

পুরাতন দারোগার কাছ থেকে দফতর বুঝে দিয়ে নতুন দারোগা বদনচন্দ্র একদিন এলাকা পরিদর্শনে বেরোলেন। সঙ্গে চলল কনস্টেবল দুখিরাম। তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে তেল পুড়িয়ে সরকারি জিপে নয়, পায়ে হেঁটে।

ন্যাড়া বেলতলা ছোট্ট জায়গা। এইসব জায়গায় থানার দারোগা মানেই সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। তাই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে কেউ আবার মিনমিনে গলায় "নমস্কার দারোগাবাবু, নমস্কার দারোগাবাবু" করতে লাগল। যারা জুয়াড়ি, তারা বলতে লাগল, "আমাদের কথা একটু মনে রাখবেন হুজুর।" বলে সেলাম ঠুকতে লাগল। বদন দারোগা কিন্তু কারও দিকেই তাকালেন না। দুখিরামকে নিয়ে সোজা গিয়ে মাছের বাজারে ঢুকলেন। একটা লোক মাছ বিক্রি করছিল। পচা মাছ। বদন দারোগা মাছের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মাছের দাম কীরকম হে?"

লোকটি বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, "আজ্ঞে হুজুর, বরফ-চাপা মাছ। এর আর কী দাম? পঁচিশ টাকা কিলো।"

"বটে? তা বাবাজীবন, কাল থেকে এই বাজারে এইরকম মাছ নিয়ে আর কিন্তু এসো না। যদি আসো, আমি কিন্তু পঁচিশ টাকা কিলোর বদলে পঁচিশ ঘা কিলিয়ে যাব। মনে থাকবে?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"পারলে টাটকা মাছ আনবে। না পারলে আনবে না।"

"টাটকা মাছের অনেক দাম হুজুর। গরিবদুখি লোকেরা কিনে খেতে পারে না। সেইজন্যই...।"

বদনবাবু তখন পাশের লোকের কাছে চলে গেছেন। সেই লোকটি পুকুরের টাটকা কাতলা মাছ একটা এনেছিল। মাছটা খাবি খাচ্ছে তখনও। দেখে লোভ হল খুব। বললেন, "এই মাছের দাম কত করে হে চাঁদু?"

মাছওয়ালা নববধুর মতো লাজুক-লাজুক মুখ করে বলল, "আজ্ঞে, আমার নাম চাঁদু নয়, খাঁদু। এই মাছ ষাট টাকা কিলো।"

"বলো কী? তা ওজন কত?"

"পাক্কা দু' কিলো আড়াই শো।"

"যাও। ওটা এক্ষুনি গিয়ে আমার কোয়ার্টারে দিয়ে এসো।" বলে চলে গেলেন।

অন্য মাছওয়ালারা বলল, "যা, যা, দেরি করিসনি। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে অজস্র ঘা। ওপরওয়ালাকে হাতে রাখতে হয় সব সময়। নেহাত একটা মাছ বই তো নয়। আগে দিয়ে আয়।"

লোকটি বিক্রিবাটা ফেলে রেখে মাছ নিয়ে চলে গেল।

দারোগাবাবু ঘুরতে-ঘুরতে চলে গেলেন এবার অন্যদিকে। বাজার ছাড়িয়ে

বড় রাস্তা পেরিয়ে একেবারে মাঠের দিকে। কিছুক্ষণ প্রকৃতির দৃশ্য দেখলেন, তারপর যেদিকে লোকের বসতি খুব ঘন সেইদিকে এলেন। হঠাৎ দেখলেন মোড়ের মাথার কল থেকে একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে একঘড়া জল নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। দারোগাবাবু দুখিরামকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কাদের গো? চেনো একে?"

দুখিরাম বলল, "তা আর চিনব না? বাঁড়ুজ্যেদের। কেন হুজুর?"

"নাঃ। বেশ দেখতে কিনা, তাই।"

দুখিরাম বলল, "শুধু কি দেখতে? রূপে গুণে অমন মেয়ে হয় না। যেমন লেখাপড়ায় তেমনই কাজেকর্মে!"

"মেয়েটি তো বড় হয়েছে। বিয়ে-থা'র চেষ্টা করছে ওর বাবা?"

"আজ্ঞে না। এই তো দু'মাস আগে বাঁড়ুজ্যেমশাই রিটায়ার করলেন। এখনও পেনসনের টাকাপয়সা কিছু পাননি।"

"হুঁ। চলো তো ওদের বাড়ি।"

"আজ্ঞে হুজুর!"

"যেতে বলছি, চলো।"

"চলুন তবে।"

দুখিরাম ভয়ে-ভয়েই কথাটা বলল। সবে তো নতুন এসেছেন দারোগাবাবু, তাই মর্জি বোঝা ভার। কিন্তু কেন যে উনি যেতে চাইছেন তা ওর মাথায় ঢুকল না। মেয়েটিকে দেখতে ভাল, দারোগাবাবুও বিয়ে করেননি। তাই কি? কিন্তু বয়সের তো ফারাক অনেক। একেবারে মেয়ের বয়সী। যাই হোক, দারোগাবাবুকে নিয়ে দুখিরাম মেয়েটির বাড়িতে এসে হাজির হল।

সাতসকালে গেরস্তবাড়িতে পুলিশ দেখেই তো চক্ষুস্থির সকলের। বাঁড়ুজ্যেমশাই সভয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "আসুন আসুন, সার! তা এই গরিবের বাড়িতে কী মনে করে? কোনও অপরাধ-টপরাধ...?

বদন দারোগা গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা আপনার ভাড়া বাড়ি, না নিজের বাড়ি?"

"আজ্ঞে, নিজের বাড়ি।"

"তার মানেই স্থায়ী বাসিন্দা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"আমার এক ছেলে এক মেয়ে।"

"মেয়েটিকে তো দেখেছি। কলে জল নিচ্ছিল। ছেলে কোথায়? ওকে ডাকুন।"

ডাকার আগেই ছেলেটি এসে নতমস্তকে দাঁড়াল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে।

দারোগাবাবু বললেন, "কী নাম হে তোমার?"

ছেলেটি ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আমার নাম শিবু।"

"পড়াশোনা করেছ কিছু?"

"আমি বি.এ. পাশ করে বসে আছি।"

"তার মানে গ্র্যাজুয়েট?"

"আজ্ঞে সার!"

"বলি কাজকর্ম কিছু করছ?"

ছেলের হয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই এবার বললেন, "একেবারে বেকার বসে আছে সার। দেখে দিন না একটা কাজকর্ম।"

"কাজ দেব বলেই তো আমি এসেছি। আপনার ছেলের কাজ হবে রোজ সকাল-সন্ধে মোড়ের মাথায় কল থেকে বালতি-বালতি জল তুলে ঘরে আনা।"

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, "তার মানে?"

শিবুও সবিস্ময়ে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বদনবাবু বললেন, "তুমি একটা জোয়ান ছেলে, ঘরে বসে আছ, আর বোনটাকে পাঠিয়েছ কলে জল আনতে? লজ্জা করে না?"

"না, মানে।"

"চ্যা-য়্যা-প্। ফের যদি কোনওদিন দেখি ওই মেয়ে কলে গেছে জল আনতে, তা হলে বাপ-বেটা, দু'জনকেই ধরে চাবকাব। আমার নাম বদনচন্দ্র, কিন্তু অন্যের বদন বিগড়ে দেওয়ার জন্যই আমি।"

বদনবাবু চলে এলেন।

কোয়ার্টারে ফিরে এসেই দেখলেন মাছ এসে গেছে। কিন্তু একা মানুষ তিনি। দু'কিলো আড়াইশো মাছ কেমন করে খাবেন? তাই একবার তাকিয়ে দেখে হনহন করে চলে গেলেন থানার অদূরে একটি বাড়ির দিকে। দরজায় টকটক শব্দ করতেই ঘোমটা-টানা একটি বউ বেরিয়ে এসে বলল, "কাকে চাই?" বলেই দু'হাত পিছিয়ে গেল। দেখল সাক্ষাৎ যম দাঁড়িয়ে আছে সামনে। চাপা গলায় অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল বউটির মুখ থেকে, "ও বাবা! পুলিশ।"

বদন দারোগা বললেন, "হ্যাঁ, পুলিশ। আমি এই থানার নতুন দারোগা। আচ্ছা, এই বাড়ির সামনে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দিনরাত ছুটোছুটি করতে দেখি, ওরা কাদের?"

ঘোমটা-টানা বউ লাজুক-লাজুক মুখে বলল, "কেন বলুন তো?"

"ওদের মাকে একটু দরকার।"

"আমি ওদের মা।"

"অ। তা ছেলেমেয়েগুলোকে এইরকম ভেক-এ রাখেন কেন? এমন ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, আর কী ছিরি?"

" কী করব, অভাবের সংসার। দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"আমার তিন ছেলে, দুই মেয়ে।"

"বুঝেছি। এদের বাবাই তা হলে এক বছর হল নিরুদ্দেশ।"

"আপনি তো সবই জানেন দেখছি। কারখানায় লকআউট হয়ে গেল। অভাবের তাড়নায় বাড়িতে ঝগড়াঝাটি করে সেই যে গেল মানুষটা, আর ফিরল না।"

"আমার কনস্টেবল দুখিরামের মুখে আমি সব শুনেছি। তা যাক গে, যে-জন্য এসেছিলাম। একটা হতচ্ছাড়া মাছওয়ালা আমার কোয়ার্টারে অ্যাত্তবড় একটা মাছ ফেলে দিয়ে গেছে। অতবড় মাছ তো আমার একার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। আর ও মাছ আমি রাঁধতেও পারব না। তাই বলছিলাম কি, তুমি মা ওটার একটা গতি করো। আমার কোয়ার্টারে আজ তোমার নেমন্তন্ন। মাছের মাথাটা আমার জন্য রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পেট ভরে দুটো মাছ-ভাত খেয়ে এসো।"

বউটি কোনও উত্তর না দিয়ে নত বদনে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

বদন দারোগা বললেন, "কোনও সঙ্কোচ কোরো না মা। তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। কেননা আমিও একসময় গরিবের ছেলে ছিলুম। আমার ওখানে রান্নার সরঞ্জাম সবই আছে। শুধু একটা ধারালো বঁটি নিয়ে লেগে পড়ো। দুখিরাম তোমাকে সাহায্য করবে।" দারোগাবাবু এবার হাতের রুলটাকে ঘোরাতে-ঘোরাতে আপন-মনেই শিস দিতে-দিতে চলে গেলেন থানার দিকে। আর ছেলেপুলের মা সেদিকে তাকিয়ে নীরবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে আঁচলের খুঁটে জল মুছে উঠোনে নামল আঁশবঁটি আনতে।

ভর সন্ধেবেলা দুখিরামকে দিয়ে মাছওয়ালা খাঁদুকে ডাকিয়ে আনালেন দারোগাবাবু।

খাঁদু এলে দারোগাবাবু বললেন, "সকালে তুমি মাছ দিয়ে গেলে, কই

দাম নিতে এলে না তো?"

খাঁদুর তো নাকটাই তখন খ্যাঁদা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। একে পুলিশের লোক, তায় আবার থানার দারোগা। তাঁর কাছে চাইবে দাম? ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, "এজ্ঞে, কী যে বলেন সার, সামান্য ক'পয়সার মাছ, তার আবার দাম?"

বদনবাবু মুচকি হেসে বললেন, "সামান্য ক'পয়সা কী গো? ষাট টাকা কেজি হলে দু'কিলো আড়াইশো মাছের দাম হয় একশো কুড়ি আর পনেরো অর্থাৎ একশো পঁয়ত্রিশ টাকা।"

" তা হোক। ও আপনাকে আমি খেতে দিয়েছি।"

বদনবাবু ডাকলেন, "দুখিরাম!"

"বলুন।"

"লোকটাকে লকআপে ঢোকাও।"

খাঁদু তো হকচকিয়ে গেল, এ-এ-এ আপনার কীরকম সুবিচার হল দারোগাবাবু? আমি কোথায় আপনাকে ভালবেসে অতবড় একটা মাছ খাওয়ালাম, আর আপনি কিনা আমাকে হাজতে পুরছেন?"

"এইটাই তো কলির ধর্ম।"

"কিন্তু আমার অপরাধ কোথায়?"

"তোমার অপরাধ চুরির। কার পুকুরের মাছ কীভাবে ধরলে, সেসব না জানালে তো তোমাকে আমি ছাড়ছি না বাছাধন।"

খাঁদু পায়ে ধরতে গেল দারোগাবাবুর, "হুজুর বিশ্বাস করুন, কারও পুকুরের মাছই আমি চুরি করিনি।"

বদনবাবু তখন ঠাস করে একটা চড় মারলেন খাঁদুর গালে, "তা হলে কি তোমার বাবার জমিদারি থেকে মাছটা নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ালে?"

খাঁদু গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "আজ্ঞে হুজুর, ও আমার কেনা মাছ।"

বদন দারোগা খাঁদুর চুলের মুঠি ধরে বললেন, "আমি তোমার কাছে মাছ খেতে চেয়েছিলাম। ঘুষ খেতে নয়। তুমি আমাকে বিনি পয়সায় মাছ খাইয়ে হাত করতে এসেছিলে তাই না? ভবিষ্যতে আর কখনও এই চেষ্টা করলে তোমার বদন আমি বিগড়ে দেব।" বলেই দুখিরামকে বললেন, "ঢোকা ব্যাটাকে।"

দুখিরাম খাঁদুকে লকআপে পুরল।

খাঁদু তো কেঁদেকেটে একশা করল, "আমার অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে।

আর কখনও এ ভুল করব না।

বদন দারোগা নিজের ঘরে এসে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দুখিরামকে বললেন, "লোকটাকে এক কাপ চা আর বিস্কুট দে। ঘন্টা দুই বাদে ওকে ছেড়ে দিবি। আর বলে দিবি, যাওয়ার সময় আমার কাছ থেকে মাছের দামটা যেন নিয়ে যায়।"

দুখিরাম দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো ছানাবড়া করে একবার শুধু ঘাড়টা নাড়ল। তারপর চলে গেল চা আনতে।

ন্যাড়া বেলতলা এই অঞ্চলের মধ্যে নামকরা জায়গা। নিত্য নতুন ঝামেলা লেগেই থাকে এখানে। প্রশাসনও তাই বেছে-বেছে বদন দারোগাকেই এখানে পাঠিয়েছেন। বদনবাবু হলেন দুঁদে দারোগা। কয়েক মাসের মধ্যে এলাকার মানুষগুলোকে চিনে নিতে তাঁর একটুও অসুবিধা হয়নি। দুষ্ট লোকেরাও বদন দারোগাকে হাড়ে-হাড়ে চিনে গেছে। কেননা এ লোক এককাট্টা এবং জেদি। সর্বোপরি ঘুষখোর নন। অপরাধ জগতের মানুষগুলোর ঠেক তিনি বেশ ভালরকমই জানেন। তাই সশরীরে নিজেই সেখানে হানা দেন। ফলে সুবিধাবাদীদের এখন বাড়া ভাতে ছাই।

একদিন সকালে হঠাৎ হল কি, এলাকায় কয়েকজন তাবড়-তাবড় ব্যক্তি দল বেঁধে থানায় এসে হাজির হলেন। বদনবাবু তখন আয়েস করে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চা খাচ্ছিলেন। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন তাঁদের দিকে। তারপর হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আরে আসুন আসুন ধর্মরাজবাবু, যম দত্ত! চিত্রগুপ্তবাবু! বলি হঠাৎ সব দল বেঁধে ব্যাপারটা কী? জীবনকেষ্টবাবুও আছেন দেখছি।"

ধর্মরাজবাবু বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয়। আমরা আপনার নামে ওপরওয়ালার কাছে অভিযোগ করছি।"

বদনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! তিনি তো সবই দেখছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনিই হলেন সর্বময় কর্তা। তাঁর কাছে অভিযোগ!"

"সে-ওপরওয়ালা নয়। আপনার ওপরওয়ালা।"

"অ। তা কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনি এই এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন।"

"সে কী মশাই! এ তো চির অশান্তির জায়গা। শান্তি এখানে ছিল কবে?"

"কোনদিনই ছিল না। আর ছিল না বলেই তো আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। আপনি কি জানেন, আজকাল এখানকার অবস্থা এমন হয়েছে যে,

মেয়েরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারছে না। ব্ল্যাকাররা প্রকাশ্যে সিনেমার টিকিট চড়া দামে ব্ল্যাক করছে। পাড়ায়-পাড়ায় গুণ্ডামি, মস্তানি বাড়ছে। খুনিরা গেরস্তকে খুনের হুমকি দিচ্ছে।"

"তাই নাকি? আর কিছু?"

"আর কিছু মানে? বলি আর কিছুর বাকিটা কী রইল?"

বদনবাবু হেসে বললেন, "দেখুন এসব ছোটখাটো ব্যাপার। এরকম তো হতেই পারে। দিনকাল যা খারাপ পড়েছে এখন মেয়েরা যখন বাইরে বেরোবে তখন গার্জেনরা কেউ সঙ্গে থাকলেই হয়। আর সিনেমার টিকিট? আপনারা বেশি দাম দিয়ে টিকিট না কাটলেই দেখবেন ব্ল্যাকাররা অন্য পথ ধরেছে। পাড়ায় মস্তানি যারা করে, তারা তো আপনাদেরই বাড়ির ছেলে। তাদের একটু কনট্রোলে রাখলেই পারেন।"

তৈল ব্যবসায়ী যম দত্ত মুখ খুললেন এবার, "দেখুন, এইসব বলে আপনি আপনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনি কাউকে মাছ খাইয়ে, কাউকে ঘি খাইয়ে, কাউকে চকোলেট খাইয়ে নিজেকে খুব লাইট করে ফেলেছেন। এবার একটু কঠোর হন। পুলিশ যদি শক্ত না হয় তা হলে সাধারণ লোকের ভীতি থাকবে কেন? আপনার কাজ হচ্ছে দুর্নীতি দূর করা। সিন ক্রিয়েট করা নয়।"

বদনবাবু বললেন, "আমি তো এই ক'মাস এসেছি মশাই। প্রথম পদক্ষেপেই তো অনেকটা কাজ এগিয়েছি। এই যে ধর্মরাজবাবু, ওঁর রেশন দোকানে জাল বাটখারায় কম ওজনে লোককে জিনিস দিতেন, সেটা ধরেছি। লরি করে রাতের অন্ধকারে রেশনের চাল, গম, বাইরে পাচার করতেন, সেটা বন্ধ করেছি। কী ধর্মরাজবাবু, সেদিনের চড়টার কথা মনে আছে তো?"

ধর্মরাজবাবু গাঁক করে উঠলেন, "বলতে আপনার লজ্জা করছে না মশাই? আমি আপনার বাপের বয়সী লোক, আমার গালে আপনি চড় মারলেন?"

"আহা-হা। চটছেন কেন? ওটা তো নামেই চড়। আসলে আপনার আঁতে আমি ঘা দিয়েছি।"

যম দত্ত বললেন, "এ কি সত্যি?"

"এ কখনও মিথ্যে হয়? আপনারা বাস্তুঘুঘুরা সব জেনেশুনেও এমন করেন কেন? আমার উচিত ছিল ওঁকে একটা কেস দিয়ে চালান করে দেওয়া। তবে সেটা করিনি। ওঁকে একবার আমি সুযোগ দিয়েছি।"

যম দত্ত বললেন, "এ তো বড় অন্যায়।"

"ন্যায়-অন্যায়টা এই বাজারে কে বোঝে বলুন না? এই যে আপনি সরষের

তেলে শেয়ালকাঁটা মিশিয়ে থাকেন। ব্যাপারটা কি আমি জানি না ভেবেছেন? বাগে পেলেই একদিন খপ করে ধরব আপনাকে। এমন ধরব যে একেবারে মোক্ষম ধরা।"

কেলো বোস বললেন, "তা ধরুন। তাতে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু গুণ্ডা বদমাশদের আপনি কী করবেন?"

"আপনাদের মতন মহানুভব ব্যক্তিরা থাকতে আমার সাধ্য কী যে ওদের কিছু করি? এই তো সেদিন কালী প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে দু'দলে কী মারামারিটা না করল। যে ক'টাকে পারলাম আমি নিয়ে এসে লক আপে পুরলাম। আপনিই না একজন বিধায়ককে ডেকে এনে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন তাদের?"

"গেছি তো। তাতে হয়েছেটা কী? পাড়ার ছেলে, আমরা যদি না আসি তো আসবেটা কে? তা ছাড়া ওদেরও তো একটু ভাল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।"

"আরে সেই সুযোগ তো আমিও সকলকে দিচ্ছি। লোকে আগে চুনোপুঁটি মেরে তারপরে রাঘব বোয়াল ধরে। আমি প্রথমেই রাঘব বোয়াল ধরেছি। এই যে আমাদের জীবনকেষ্ট বিষয়ী দাঁড়িয়ে আছেন। মোড়ের মাথায় দিব্যি কেমন স্টেশনারি দোকানটি সাজিয়ে রেখেছেন। ভেতরে ভেতরে জাল বেবিফুডের কারবার করে উনি যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিলেন, সে-খবর রাখতেন কেউ? ধরলুম একদিন হাতেনাতে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ। আরও যে জিনিস বেরোল দোকান থেকে তা আর এত লোকের সামনে বলব না। নেহাত ওঁর স্ত্রী আমার পায়ে ধরলেন, তাই....। তা যাক গে। আপনারা সবাই যখন এত করে বলছেন তখন এবার থেকে আমি পুলিশের মতোই ব্যবহার করব।"

জীবনকেষ্টবাবু মাথা হেঁট করলেন।

যম দত্ত বললেন, "আমি চলি।"

" আরে যাবেন বইকী। এই তো এলেন। আপনার বড় ছেলে মাধাই দত্ত না কী যেন নাম? ওকে কিন্তু একটু সাবধান করে দেবেন। ফের যদি....।"

যম দত্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

এবার মধ্যবয়সী চিত্রগুপ্তবাবু এসে একটা কাগজ বদন দারোগার হাতে দিয়ে বললেন, "'এই দেখুন। এর পরেও কি বলবেন আপনার এলাকায় কোনও নাগরিকের নিরাপত্তা আছে?"

বদনবাবু কাগজে চোখ বুলিয়েই বললেন, "হুম। এ তো দেখছি আপনাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।"

"তা হলে? কীরকম লিখেছে একবার দেখুন, "বাবা চিত্রগুপ্ত, আগামী দু-তিনদিন একটু ভাল-মন্দ চর্ব-চোষ্য খেয়ে নাও। তারপর তোমার লাইফ লাইন আমরা ফিউজ করে দেব।"

বদনবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, "এ তো সাঙ্ঘাতিক চিঠি।"

"তবে? আমার নিরাপত্তার কী হবে?"

"আরে রাখুন মশাই আপনার নিরাপত্তা। যারা এই চিঠি দিয়েছে তাদের আপনি চেনেন?"

"জাস্ট লাইক এ ফুল। আপনি পাগল নাকি মশাই। কী করে চিনব তাদের?"

বদনবাবু গালে হাত দিয়ে বললেন, "তাও তো বটে। তবে যে-করেই হোক, এদের কিন্তু খুঁজে বার করতেই হবে। আপনার মতো একজন বর্ণ ক্রিমিন্যালকে যারা ঝুঁকি নিয়ে অপসারণ করতে চায় তারা তো আমাদের অ্যাসেট মশাই।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন চিত্রগুপ্ত, "কী বললেন? আমাকে যারা খুন করবে তারা আপনাদের অ্যাসেট?"

"নিশ্চয়ই। আপনার দোকানের প্রত্যেকটি ওষুধ জাল। ওই ওষুধ আর ইনজেকশনের প্রভাবে এ-পর্যন্ত কত লোক মরেছে তার একটা তালিকা দেব? আপনাকে আমি এখনও ধরিনি। যেদিন ধরব সেদিন রক্তচক্কর দেখিয়ে ছাড়ব।"

চিত্রগুপ্ত বললেন, "বটে? ঠিক আছে।" বলেই অন্যদের বললেন, "চলো, চলো হে সব। এইভাবে আমাদের অপমান? এর শোধ আমরাও নেব।"

সবাই বললেন, "নেবই তো। নেবই তো।"

ধর্মরাজবাবু যেতে-যেতে বললেন, "শুনুন দারোগাবাবু! যদি বাঁচতে চান তা হলে আমাদের হাতে হাত মেলান। আপনার মতো ঢের-ঢের দারোগা আমরা দেখেছি। আপনাকে তাড়াবার জন্য দরকার হলে আমরা কমিশনারের কাছে যাব, মন্ত্রীর কাছে যাব। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করবেন না, বুঝেছেন?"

বদনবাবু হেসে বললেন, "খুব বুঝেছি। আর এও জানি জলে কুমির থাকে, তা হলে তার সঙ্গে বাদ করলেও কামড়াবে, না করলেও কামড়াবে। কুমিরের স্বভাবই কামড়ানো।"

ওরা চলে গেলে দারোগাবাবু খুব ঠাণ্ডা গলায় ডাকলেন, "দুখিরাম।"

"বলুন হুজুর।"

"নেবুর দোকান থেকে একটা মাইক ভাড়া করে নিয়ে এসো তো। আর ড্রাইভারকে বলো আমার জিপটা বার করতে।"

দুখিরাম অবাক হয়ে গেল। কেননা এই ক'মাসের মধ্যে, সম্ভবত এই প্রথম, জিপে চাপবেন দারোগাবাবু। তা চাপুন, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু মাইক কী হবে?

মাইক যে কী হবে তা খানিক বাদেই বোঝা গেল।

দুখিরাম ছাড়াও আরও দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে বদন দারোগা জিপে করে ন্যাড়া বেলতলার মোড়ে এলেন। এই জায়গাটা এখানকার মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট এবং বিপজ্জনক। বদন দারোগাকে জিপে চাপতে দেখে তো এলাকার সবাই অবাক। কেননা এমন দৃশ্য দেখা যায় না। বদন দারোগা জিপে বসে মাইকে বলতে লাগলেন: "শুনুন, আমি বদনচন্দ্র দারোগা। এখানকার অধিবাসীদের বলছি। আমি এখানে আসার পর থেকে আপনাদের সঙ্গে এযাবৎকাল বন্ধুর মতো ব্যবহার করছি। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক আপনারা আমার ভদ্র ব্যবহারের মর্যাদা দিতে পারেননি। আজই আপনাদের কয়েকজন মান্যগণ্য ব্যক্তি আমাকে আমার প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা জানিয়ে এসেছেন। তাই আমি আজ থেকেই আমার মতো হচ্ছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক। তাই কোনও অজুহাতেই আমার এলাকার অশান্তি আমি আর বরদাস্ত করব না। আমি হচ্ছি আগুনের মতো ঠাণ্ডা আর বরফের মতো গরম। ব্যাপারটা যদি আপনাদের বোধগম্য না হয় তা হলে মানেটা উলটে নিন, ঠিকই বুঝতে পারবেন। আজই সকালে আমি খবর পেলুম আমাদের চিত্রগুপ্তবাবুকে কে বা কারা যেন হত্যার হুমকি দিয়েছে। যেই দিক, কাজটা কিন্তু খুব খারাপ। কী হবে একটা লোককে খুন করে? পাঁঠা কাটলেও যা, মানুষ খুন করলেও তাই। তা ছাড়া এটা কিন্তু খুব লজ্জার কথা। চিত্রগুপ্ত যদি খুন হন, ধর্মরাজ যদি জেলে থাকেন, যম যদি প্রাণভয়ে আর্তনাদ করেন, এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে? তাই বলি কি, আপনারা এখন থেকেই এলাকার শান্তি বজায় রাখুন। কেউ চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়বেন না, বা চা খাওয়া হয়ে গেলে অযথা দোকানে বসে না থেকে দামটি মিটিয়ে কেটে পড়বেন। মনে রাখবেন, যত কিছু গণ্ডগোলের মূল কেন্দ্র কিন্তু ওই চায়ের দোকানগুলো। আপনারা সিনেমা দেখুন। কিন্তু শপথ করুন, টিকিট না পেলে বেশি দাম দিয়ে বাইরের লোকেদের কাছ থেকে টিকিট কাটবেন না। তা হলেই দেখবেন যারা ওই কাজ করে তারা একদিন কেটে পড়েছে। আর আপনিও লাইনে দাঁড়িয়ে দিব্যি টিকিটটি পেয়ে গেছেন। আমার তরুণ বন্ধুরা! তোমরা চাঁদা তুলে কাদা-পুজো বন্ধ করো। নেহাত যদি করতেই হয় তা হলে বাপ-দাদার পয়সায় করো। ঠেলা রিকশা দাঁড়

করিয়ে, হকার ফেরিওয়ালাদের কাছ্ থেকে চাঁদা আদায় ঠিক কাজ নয়। তোমরা...।"

সবাই শুনতে লাগল চুপ করে। বদন দারোগা এই একই কথা পাড়ায়-পাড়ায় বলে বেড়ালেন সারাটি দিন ধরে। তারপর রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে যে বইটি তিনি পড়তে লাগলেন তার নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দারোগাবাবু দেখলেন পাড়ার দু'জন মাতব্বর কেনারাম আর বেচারামবাবু পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি ঘুসোঘুসি করে থানায় এসেছেন ডায়েরি লেখাতে।

বদন দারোগা দেখেই জ্বলে উঠলেন, "কাল আমি অত করে বলে এলাম, আমি শান্তিপ্রিয় লোক, আমার এলাকায় কেউ অশান্তি করবেন না, আর আপনারা ঠিক সেই কাজই করে বসে আছেন? ব্যাপারটা কী?"

কেনারাম বললেন, "আমি ওঁকে বারবার মানা করেছি ওঁর মুরগি যেন আমার উঠোনে না আসে, তা উনি শোনেন না। ঠিক মুরগিগুলো ছেড়ে দেন। আর ওগুলো আমার ঘরেদোরে পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে যায়। সেই রাগে আমি ওঁর একটা মুরগি কাল খেয়ে ফেলেছি।"

"তাতে হয়েছেটা কী।"

"উনি আমাকে গালাগালি করেছেন।"

"খুব অন্যায় কথা। তা হ্যাঁ মশাই, আপনার মুরগি আপনি সামলান না কেন?"

বেচারাম বললেন, "কেন সামলাব? উনি কি ওঁর ছাগল বেঁধে রাখেন? আমার অত কষ্টের পালংশাক যে মুড়িয়ে খেয়ে গেল?"

"বটে? তা এখন আমাকে কী করতে হবে?"

উনি আমার গায়ে হাত দিয়েছেন। আমার ছেলেদের সামনে আমার দুটো কান মলে দিয়েছেন।"

"আর উনি যে আমার মেয়েদের সামনে আমার মাথায় চাঁটি মারলেন, তার বেলা?"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আপনাদের ঝামেলা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। আমি ডায়েরি-ফায়েরি লিখি না মশাই। কেননা, আমার হাতের লেখা খুব খারাপ। এখন আপনারা দয়া করে এই খাঁচাঘরে একবার ঢুকুন দেখি।"

"অ্যাঁ! আপনি আমাদের লকআপে ঢোকাবেন?"

"দুখিরাম!"

"হুজুর।"

"এঁদের দু'জনকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকাও।"

দু'জনে এবার লাফালাফি শুরু করে দিলেন, "এ আপনার কীরকম বিচার মশাই? আমরা এলুম কোথায় একটা সুবিচার চাইতে, তার জায়গায় আপনি আমাদের হাজতে পুরলেন?"

কেনারাম বললেন, "আপনি কি জানেন আজ বেলা দশটার মধ্যে আমাকে একবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে?"

বেচারাম বললেন, " আমি যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে মধুপুর যাব কথা দিয়েছিলাম। আমার ট্রেন ফেল হয়ে যাবে যে?"

বদন দারোগা বললেন, "সেটা আমার কাছে আসবার আগে একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল।"

ভদ্রলোক রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

বদনবাবু বললেন, "দুখিরাম, সেপাইদের বলে দাও এঁদের বাড়ির লোকেদের যেন থানার ধারেকাছে আসতে দেওয়া না হয়। আর তুমি একটু বেশি করে চা নিয়ে এসো। দুটো ভাঁড়ও বেশি চেয়ে আনবে।" .

দুখিরাম চলে গেল।

লকআপের ভেতর থেকে কেনারাম বললেন, "সার, শুনছেন! মানে বলছিলাম কি.... ?"

"কিচ্ছু বলবেন না। যা শোনবার রাত্রিবেলা শুনব।"

"সে কি সার! এইভাবে আমাদের সারাটা দিন আটকে থাকতে হবে নাকি?"

"থাকলেই বা ক্ষতিটা কী? এটা কিন্তু অত্যন্ত নিরাপদ জায়গা।"

একটু পরেই দুখিরাম চা নিয়ে এল। বদনবাবু চা খেতে-খেতে বললেন, "আপনারা খাবেন কেউ?"

কেনারাম বললেন, "তা একটু পেলে মন্দ হয় না।"

দুখিরাম চা দিতে যাচ্ছিল।

দারোগাবাবু বললেন, "না থাক। চা খেয়ে আর কাজ নেই। একেই তো পুলিশের বদনাম। পরে হয়তো বলবেন কী খাওয়াতে কী খাইয়ে দিয়েছে।"

বেচারাম বললেন, "না না। চায়ে কী যায়-আসে?"

"খুব আসে-যায়। আপনারা হলেন কেউটে সাপের জাত। আপনাদের বিশ্বাস আছে?"

"তবে এক গেলাস জল দিন।"

"সন্ধের আগে নয়। চা নয়, জল নয়, কোনও খাদ্য নয়। সন্ধের পর

যেটা খাওয়াব, সেটা হল রুলের গুঁতো। তিনদিন এইরকম চলবে। তারপর ভেবে দেখব আপনাদের কী ব্যবস্থা করা যায়।"

"ততক্ষণে তো আমরা মরে যাব।"

"আপদ যাবে।"

"অ্যাঁ! আমরা মরে গেলে আপদ যাবে? ঠিক আছে। একবার বেরোই আমরা এর ভেতর থেকে, তারপর আপনার নামে যদি মানহানির মোকদ্দমা না করি তো কী কথাই বলেছি।"

"আপনারা আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করতে পারেন। তাতে আমার কিছু এসে যাবে না।" বলে চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন দারোগাবাবু।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে কেনারাম আর বেচারাম বললেন, "সার, আমরা আপনার বাবার বয়সী লোক। আপনার দুটি পায়ে পড়ছি। এবারের মতন আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই মিটমাট করে নিচ্ছি। আর কখনও আমরা এইরকম ঝুটঝামেলা নিয়ে আপনার কাছে আসব না।"

দারোগাবাবু বললেন, "যা বলছেন তা সজ্ঞানে বলছেন তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সার।"

"যান। এবারের মতন ছেড়ে দিলুম। পাড়াতেও সকলকে বলে দেবেন এই সমস্ত খুচরো কেলেঙ্কারি নিয়ে অযথা যেন আমাকে বিরক্ত করতে না আসে কেউ।" বলেই ডাকলেন, "দুখিরাম।"

"হুজুর।"

"ছেড়ে দাও এঁদের।"

ছাড়া পেয়ে কেনারাম আর বেচারামবাবু তো ধুতি সামলাতে-সামলাতে দৌড় দিলেন।

সেদিনটা মোটামুটিভাবেই কাটল। পরদিন সকালে আর-এক ঝামেলা।

বদন দারোগা থানার সামনের বাগানে দুখিরামকে নিয়ে ফুলগাছ বসাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন একদল লোক থানার দিকে আসছে। তারা আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে সার। এইমাত্র ন্যাড়া বেলতলার মোড়ে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে কালো পোশাক পরা পাঁচজন লোক নেমে এসে হঠাৎ কয়েকজনকে বেধড়ক পিটিয়ে গেল।"

"সে কী! কেউ ধরতে পারল না তাদের?"

"কে ধরবে? এক-একটা অসুর সব।"

"কই, চলুন তো দেখি?"

দারোগাবাবু সকলকে নিয়ে ন্যাড়া বেলতলার মোড়ে এলেন। সেখানে তখন লোকজন হইহই করছে। আর প্রায় দশ-বারোজন লোক হাত-পা ভাঙা অবস্থায় ফাটা মাথা নিয়ে বসে আছে।

বদন দারোগা দেখেই বললেন, 'ওরে বাবা। এ যে দেখছি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে সব। তা কী থেকে কী হল শুনি?"

যারা মার খেয়েছিল তারা বলল, "আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না সার। চায়ের দোকানে বসে চা খেতে-খেতে কাগজের খবরগুলো পড়ে নিজেদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি করছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে ওরা ঢুকে পড়ে এইরকম একটা প্যানিক করে দিয়ে গেল।"

তাই বলুন। আপনারা তা হলে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিলেন? কাল আমি অত করে বলে গেলাম এইসব আর করবেন না। ঠিক সেই কাজই করলেন আপনারা? আমার কথাটা যদি একবারও শুনতেন, আজ তা হলে এস দশাটা হত না।"

"এখন আমরা কী করব সার?"

"কী আর করবেন? হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকবেন।"

"কিন্তু ওরা কারা?"

"আমি কী করে জানব? মার খেলেন আপনারা। তাদের চিনতেও পারলেন না, ধরতেও পারলেন না। আমার পক্ষে কি বলা সম্ভব? হয়তো ওরা অন্য গ্রহের লোক। উল্কাপাতের ফলে এসে হাজির হয়েছে। তা যাক গে, খুব সাবধান। আর কেউ যেন চায়ের দোকানে ঢুকে ভুলেও রাজনীতি করবেন না, বুঝেছেন?"

সবাই চোখ বড়-বড় করে ঘাড় নাড়ল। ভাবটা এই, বুঝেছি মানে? বেশ হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি সব।

এর পর থেকে চায়ের দোকানে লোক আসে, বসে, চা খায়, চলে যায়। কেউ বা ট্যারা চোখে কুতকুতিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একবার চোখ বুলিয়েই সরে পড়ে। কিন্তু দিনকতক বাদেই আবার একটা কাণ্ড। বেলা তখন দশটা। মেয়েরা সবে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। শিক্ষিত বেকারের দল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মাথা খুঁড়ে এসে রকে বসে পা দোলাচ্ছে। হঠাৎ সেই কালো অ্যাম্বাসাডার। আর কালো পোশাক-পরা পাঁচ-দশজন লোক। চোখের পলকে তারা ছেলেগুলোর ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'-দশ মিনিটের ব্যাপার। কুড়ি-বাইশটি ছেলেকে দুমড়ে-মুচড়ে আধমরা করে উধাও হয়ে গেল তারা।

বদন দারোগা সবই শুনলেন। শুনে আক্ষেপের সুরে বললেন, "এ তো হতে পারে। আমি তো বলেই ছিলাম রকবাজি একদম বন্ধ। শুনবেন না যখন, তখন নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনুন। তা কাকে-কাকে ধরতে হবে বলুন?"

"ধরবেন কাকে? তারা যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।"

"আজ থেকে তা হলে রকবাজি বন্ধ।"

"বন্ধ।"

"আড্ডাটা তা হলে?"

"ঘরের বৈঠকখানায় অথবা বাড়ির ছাদে হবে।"

"শুভবুদ্ধি হোক।"

বদন দারোগ চলে গেলেন। চলে তো গেলেন। কিন্তু রবিবার সন্ধের সময় যা হয়ে গেল তা এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। পাড়ার সিনেমা হলে একটা দারুণ ছবি এসেছিল। দু' টাকার টিকিট পাঁচ টাকায় হুড়হুড় বিক্রি হচ্ছিল। হঠাৎ কালো অ্যাম্বাসাডার। সেই প্যাঁচার মতো কালো-কালো লোক। আর বেধড়ক মার। বেশি দামে যারা টিকিট বেচছিল তাদের হাতগুলো শুধু প্যাকাটির মতো পট-পট করে ভেঙে দিল তারা। আর যারা সেই টিকিট কাটছিল তাদের বরাতে মার।

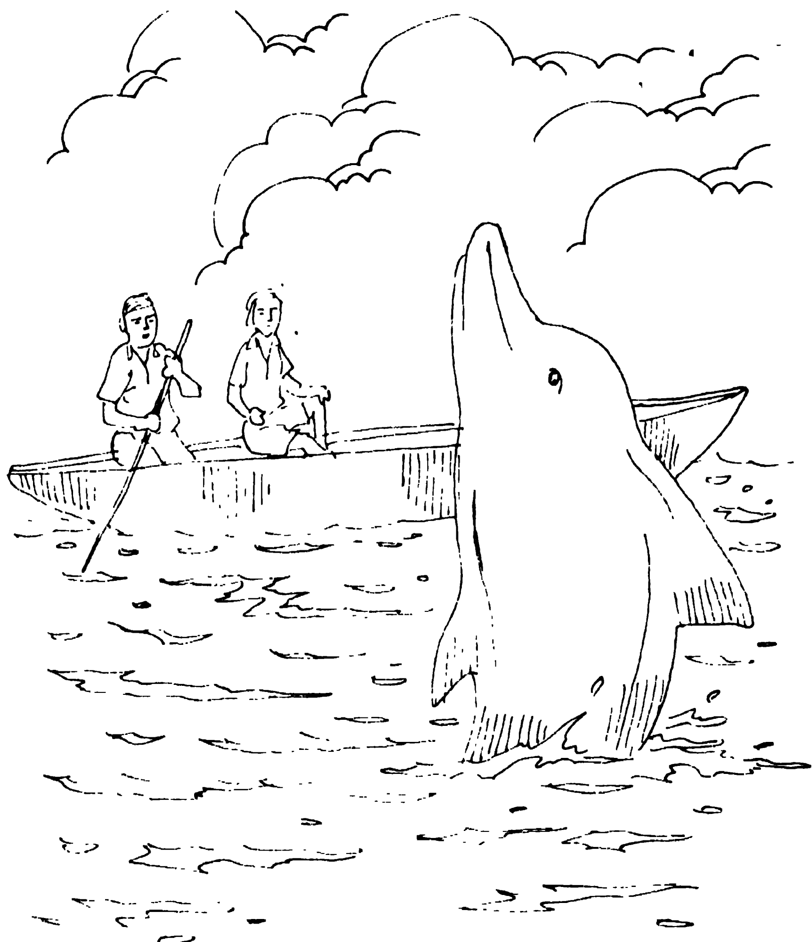
খবর গেল বদন দারোগার কাছে। বদন দারোগা খুবই অনুতাপের সঙ্গে বললেন, "কী নিষ্ঠুর বলো তো, ওরা এখন থেকে তা হলে...?

সবাই বলল, "সিনেমা দেখা বন্ধ।"

"না। বেশি দাম দিয়ে সিনেমার টিকিট কেনা এবং বেচা বন্ধ।"

সত্যি-সত্যিই ন্যাড়া বেলতলার মানুষরা সেইদিন থেকে একটা অন্য ধরনের বন্‌ধ শুরু করল। ভারত বন্‌ধ নয়। বাংলা বন্‌ধ নয়। সভ্যসমাজে অসভ্যতা বন্‌ধ। চায়ের দোকানে রাজনীতি বন্‌ধ। রকে বসে রকবাজি বন্‌ধ। বেশি দামে সিনেমার টিকিট কাটা বন্‌ধ। চাঁদা তুলে বারোয়ারি পুজো বন্‌ধ। পুজোটা অবশ্য একেবারেই বন্ধ নয়। যেখানে দশটা হত সেখানে একটা হল। গেরস্তরা নিজেরাই টাকা-পয়সা জোগাড় করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে লাগল মায়ের পুজো। কাজেই এই বন্‌ধের প্রভাবে ন্যাড়া বেলতলায় এখন আর কোনও ঝামেলা নেই। শুধু তাই নয়, এই বন্‌ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কালো অ্যাম্বাসাডারে চেপে সেই কালো প্যাঁচাদের আবির্ভাবও বন্ধ হয়ে গেল।

বদন দারোগা মনের আনন্দে তাই দুখিরামকে নিয়ে ন্যাড়া বেলতলায় ঘুরে বেড়ান। কারও বদন বিগড়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজনও আর হয় না তাঁর। বলতে গেলে দুখিরামকে নিয়ে সুখেই তাঁর দিন কাটে।



পুজোর সময়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখের ওপর রোদ্দুর এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেলো। পুজোর দালান থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে চমকে উঠে বসে জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম। যা ভেবেছি, শিউলিতলায় একটাও ফুল নেই।

এক লাফে খাট থেকে নেমে সোজা বাগানে। গাছেও ফুল নেই। গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পেড়ে নিয়ে গেছে। আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম গাছটার দিকে আমার খুব কান্না পাচ্ছিলো। চোখ পড়লো বারান্দায় বসে থাকা মিতার

ওপর। ওর চোখে জল। বললো, ছোড়দা দ্যাখ একটাও ফুল নেই। বাসু সব নিয়ে গেছে।

বাসু ভীষণ দুষ্টু ছেলে। হেন অন্যায় কাজ নেই ও করে না। সুযোগ পেলেই আমাদের বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে যায়, খেলার মাঠ থেকে বল নিয়ে দেখি গাছে উঠে পাখির বাসা থেকে ছানা পেড়ে আনে পুষব বলে। ঐ টুকু ছানা মাকে ছাড়া কখনো বাঁচে! মরে যায়। এই সব দুষ্টুমির জন্যে বাসুর ওপর সক্কলেরই রাগ। মা বলেন, ওর সঙ্গে একদম মিশবে না।

বাসু জানতো, আমরা রোজ সকালে শিউলি ফুল কুড়োই। আমাদের বাগানের এক কোণে রাস্তার দিকে শিউলি গাছটা। বেশ বড়। কতো যে ফুল ফোটে। রোজ সন্ধ্যে থেকে সারা বাড়ি মিষ্টি গন্ধে ম ম করে। শিউলির গন্ধ পেলেই আমাদের মন ভালো হয়ে যায়। পুজো এসে গেছে।

মিতা বললো, কাল যদি ও মহালয়া শুনতে আসে তাহলে বাড়িতে ঢুকতে দেবো না।

মা তাহলে ভীষণ রাগ করবেন। মা বলেন কেউ বাড়িতে এলে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হয়।

ও আমাদের সব ফুল নিয়ে গেলো কেন?

সব ফুল নিয়ে গেছে বলে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু মিতার চোখে জল দেখে বললাম, কাল আমরা খুব ভোরে উঠে সব ফুল কুড়িয়ে নেবো। চল একবার দালানে যাই। ঠাকুর কতদুর হলো দেখি।

চল...। আমরা বাইরের ঘরের পেছনের দিকে দালানে গিয়ে ঢুকলাম। বিশাল পুজোর দালান। লর্ড হেস্টিংসের সময় তৈরী। গোল গোল ইঁট। তখন তো সিমেন্ট ছিলো না। তাই চুন-সুরকীর গাঁথনি। প্রায় চারতলা সমান উঁচু। দালানের সামনের দিকে ঠাকুর গড়া হচ্ছে। ননী পাল আর একটু বেলা হলে আসবে। মিতা বললো, সাদা রং দেওয়া হয়েছে। এইবার আসল রং দেবে—তাই না রে ছোড়দা।

হ্যাঁ। তারপর চক্ষুদান। সব শেষে গর্জন তেল লাগিয়ে পঞ্চমীর দিন ঠাকুর তোলা হবে।

আষাঢ় মাসে রথের দিন কাঠামো কাটার মুহূর্ত থেকে ঠাকুর তৈরীর সাক্ষী আমরা। কাঠ দিয়ে কাঠামো তৈরী করা, তারপর খড় বাঁধা। মাটি চাপানো। তারপর দো মেটানো। এরপর মুন্ডু বসানো। আর তারপর মাটির প্রলেপ দিয়ে সাদা রং লাগানো। এরপর যে ঠাকুরের যে রং তাই দেওয়া হবে। আমরা সব জানি।

হঠাৎ কালীদি এসে হাজির।— ঠিক জানি তোমরা এখানে। মা ডাকছেন। শীগগির চলো। দুধ খেতে হবে না। মাস্টারমশাইয়ের আসার সময় হয়ে গেছে যে।

আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। এখন দুধ খেয়ে পড়তে বসতে হবে। সত্যি বড়রা এতো নিষ্ঠুর হয়।

আমাদের বাইরের ঘরটা একটা ফুটবল মাঠের মতো বড়। তার দু'পাশে আবার দুটো লম্বা ঘর আছে। আমরা দুধ-টুধ খেয়ে রাস্তার দিককার সরু ঘরে গিয়ে বই খাতা নিয়ে বসেছি। পড়তে ইচ্ছে করছে না। দালানে দুর্গা ঠাকুর থাকলে কী আর পড়া-টড়া হয়। হঠাৎ বাসু একটা ঝুড়ি রেখে বললো, এই নে — সব তোদের।

আমরা 'থ'। এক ঝুড়ি শিউলি ফুল।

এত্তো! কোথায় পেলে বাসুদা ?

পাড়ায় যতো গাছ ছিলো সব গাছ থেকে কুড়িয়েছি।

শিউলির মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আনন্দে মিতার চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। এতো শিউলি ফুল আমরা কোনদিন পাইনি। মিতা বললো, সব ফুল আমাদের দিয়ে দিলে ?

আমার আর কী হবে। তোরাই নিয়ে নে। তোদের গাছের ফুলও আছে।

আমাদের গাছের ফুলগুলো নিলে কেন ? আমরা কুড়োতে পারলাম না।

কাল তোরা চ্যালেঞ্জ করলি কেন।

তাই তো, আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল বিকেলে ফুটবল খেলার পর বাসু বলেছিলো, আমি যে কোন বাড়ি থেকে ফুল তুলে নিতে পারি।

আমাদের বাড়ি থেকেও ?

আমার কথা শুনে বাসু হাসলো। বললো, তোদের বাড়ি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে! ঠিক আছে কাল দেখিস।

পারবেই না, আমরা ভোর বেলায় উঠে সব ফুল কুড়িয়ে নেবো। ঐ হাসির মধ্যে যে পাল্টা চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে ছিলো তা আমরা বুঝতে পারিনি। আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বাসু যে কোন ফাঁকে চলে গেলো বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখি মাস্টারমশাই এসে গেছেন।

একী !এখানে এতো শিউলি ফুল কেন ?

রেখে আসবো ? মিতা জিজ্ঞেস করলো।

না, থাক। গন্ধটা তো ভালোই। মাস্টারমশাই আমাদের হোমটাস্কের খাতা দেখতে লাগলেন। মিতা ইসারা করলো। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখলাম

ননীপাল যাচ্ছে। পুজোর দালানে যেতে পারলে ভালো হতো। মা দুর্গার গায়ে আজ বোধহয় সাদার ওপর হলুদ রং দেবে।কিন্তু উপায় নেই। মাস্টারমশাই ভীষণ রেগে যাবেন। আমরা অবশ্য জানি মাস্টারমশাই একটু পরেই বাড়ির মধ্যে যাবেন।.বসিরহাট থেকে কি কি আনতে হবে তার লিস্ট বানাবেন। মাস্টারমশাই বসিরহাট কোর্টে কাজ করেন। সাইকেলে যাওয়া আসা করেন। আমরা অপেক্ষা করে আছি। কালীদি কখন চা আনবে। চা খেয়েই মাস্টারমশাই উঠবেন। আমরাও পুজোর দালানে ছুটবো। মহালয়ার আগের দিন। পড়তে ইচ্ছে করে? আজ বিকেলে আবার মাদার বুড়ো আসবে। সুন্দরবনের দিকে কোথায় যেন থাকে। মহালয়ার আগের দিন আসে, কালীপুজো মিটিয়ে ফিরে যায়। বাড়িসুদ্ধু সক্কলে আসে। ওরাই কয়েক পুরুষ ধরে পুজোর সব কাজ করে আসছে। আমাদের কাছে ওরা ভি.আই.পি। ওরা আসবে বলে দুপুরের পর থেকে আমরা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হাসনাবাদের কাটা খালের মুখটা পার হলেই আমরা নৌকাটা দেখতে পাই। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে। সত্যি মাদারবুড়োরা না এলে মনেই হয় না পুজো এসে গেছে।

কালীদি চা আনতেই আমরা নড়ে চড়ে বসলাম। মাস্টারমশাই ওঠার সময় হয়ে গেছে। আমরা জানি, রেডিওর জন্যে মাস্টারমশাই আজ নতুন ব্যাটারি আনবেন। এই অঞ্চলে আমাদের বাড়ি ছাড়া কোথাও রেডিও নেই। মহালয়া শুনতে পাড়া সুদ্দু সক্কলে আসবেন। ভোরবেলায় উঠে আবার ডাকতে যেতে হবে। আমাদের কী কম কাজ! স্কুলে ছুটি থাকলে বেশ হতো।

মাস্টারমশাই আমাদের পড়তে বলে উঠে গেলেন। আমরাও এক ছুটে দালানে। ননীপাল আমাদের দেখে হাসলো। তারপর মা দুগ্গার গায়ের সাদা রং-এ হলুদ রং বুলোতে লাগলো। মিতা জিজ্ঞেস করলো, জয়া বিজয়া কই?

বাড়িতে তৈরী হচ্ছে— নিয়ে আসবো।

কবে?

ষষ্ঠীর দিন!

কালীদি এসে তাড়া দিলো, মা ডাকছেন। চান করতে চলো। স্কুলে যেতে হবে।

স্কুলের ঘন্টাগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেলো। বিকেলে বাড়ি ফিরে কোন রকমে একটা কিছু খেয়েই সোজা দালানে। ফাঁকা। কেউ নেই। ঠাকুররা সব রং মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মস্ত বড় নদী। এখন জোয়ার। জল কানায় কানায়। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেও কাদা আসে না। ভাটার সময় জল নেমে যায়। তখন এক হাঁটু কাদা। আমি জলের ধারে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে

তাকিয়ে ছিলাম। ওদের নৌকাটা প্রথমে একটা বিন্দুর মতো দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে হতে পরিষ্কার দেখা যায়। আমি চমকে ফিরে তাকালাম। বাসু ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকাটা নিয়ে আসছে। নৌকা চড়বি ?

না, জানতে পারলে মা বকবেন।

এখানে তো কেউ নেই। কে বলবে ?

আমি চারদিকটা দেখলাম। সত্যি কেউ নেই। দূরে স্বর্ণময়ী শ্মশান দেখা যাচ্ছে। বটগাছটা দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই দেখে আমি নৌকোয় উঠে পড়লাম। পাড় ঘেঁসে নৌকাটা ভেড়ালো। বললো, ঐ দ্যাখ...। ওর আঙ্গুলের লক্ষ্যে তাকাতেই দেখি রাম-লক্ষ্মণ ভুস করে জলের ওপর মাথা তুলেই ডুব দিলো। তারপর তীর বেগে এগিয়ে এলো আমাদের নৌকার দুপাশে আমাদের নৌকার দিকে। ওরা এখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। যেন আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কিন্তু তাই। ওরা আমাদের পাহারাই দেয়। আমাদের এই ইচ্ছামতী নদীতে যা কামোট! কামোট বড় ভয়ঙ্কর। হাঙ্গরই তো। একটু ছোট আকারের। আমরা বলি হাঙ্গরের ছোটভাই। তা রাম- লক্ষ্মণ থাকলে কামোট আমাদের ধারে কাছে আসতে পারবে না। রাম- লক্ষ্মণ শুশুক। ওরা আমাদের বন্ধু। রামের মাথায় একটা সাদা তিলক আছে। তাই দেখলেই চেনা যায়। ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। জলের ওপর লাফিয়ে ওঠে। ডিগবাজি খায়। কতো কী যে করে। আমরা ততোক্ষণে শ্মশানঘাট পেরিয়ে গেছি। হঠাৎ দূরে একটা ছোট নৌকোর ওপর চোখ পড়লো। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, বাসু ঐ দ্যাখ, মাদাররা আসছে। আমার উত্তেজনা দেখে বাসু হাসলো। বললো, তুই বড্ড ছেলেমানুষ। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। আমায় ছেলে মানুষ বলছো কেন ? আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। সিক্সে উঠবো। আমি ছেলেমানুষ। আহা উনি যেন কতো বড়। মাত্তর দু'বছরের। বাসু বললো, শশ্মানে একটা আস্ত খুলি দেখে এসেছি। যাবি ?

মাদারদারা আসছে যে।

ওরা তো পালিয়ে যাবে না। কালীপুজো অবধি থাকবে। তার চেয়ে চল বটগাছের ঝুরিতে মড়ার খুলিটা বেঁধে দিই। চারটে ঝুলছে। ওটা হলে পাঁচটা হবে।

তবে চল।

বাসু নৌকাটা ঘুরিয়ে নিল। আমি জলে হাত দিলাম। রাম সোঁ সোঁ করে এগিয়ে এলো। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। কালীদি বলেছে, শুশুকের ছিটোনো জল হাতে লাগলে হাত পচে যাবে। তাই শুনে বাসু খুব হেসেছিলো। তারপর

রাম লক্ষ্মণের ভুস করে ছিটোন জল সারা গায়ে মেখে বলেছিলো, পচে যায় কিনা দেখিস।

সত্যিই কিন্তু কিছু হয়নি। আমি বুঝেছিলাম ওসব বাজে কথা। তবু কেন জানি না, এখনো রাম-লক্ষ্মণ জল ছিটোলে হাত সরিয়ে নিই।

শ্মশান ঘাটে নৌকো বেঁধে আমরা নেমে এলাম। ভেড়ি পেরিয়ে নেমে গেলাম শ্মশানে। একদম ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। বাসু তার লুকনো জায়গা থেকে খুলিটা নিয়ে এলো। তারপর বটগাছের একটা ঝুরিতে বেঁধে দিলো। হুহু করে বাতাস যখন বয় তখন সেই বাতাস মড়ার খুলির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে শিসের মতো একটা আওয়াজ তোলে। লোকে ভয় পায়। ভাবে কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। বাসু হাসে। রাত্তিরে ও মাঝে মাঝে শ্মশান ঘরটার ছাদের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে থাকে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর ভয় করে না?

কিসের ভয়? সাপের?

না ভূতের।

বাসু হাসতে শুরু করলো। বললো, ভূতটুত সব বাজে কথা। তবে হ্যাঁ, সাপের ভয় আছে এখানে। সেই জন্যেই তো এই লাঠিটা হাতে রাখি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই তো ভূত নেই?

পাগলা নাকি। দ্যাখ, মানুষ মরলে তো ভূত হবে৷ তাহলে আজ অবধি কতো মানুষ মরে গেছে। সবাই ভূত হয়ে গেলে তারা থাকবে কোথায়? একটু পরেই শাঁখ বাজবে। শাঁখ বাজার আগেই বাড়ি ঢুকতে হবে। তা না হলে মা ভীষণ বকবেন।

আমি বললাম, বাসু চল বাড়ি যাই।

নৌকাটা জল থেকে তুলতে হবে না।

কোথায় রাখবি?

যেখানে থাকে। দক্ষিণবাড়িতলায়। ওদের মহিষ এসে গেছে।

মহিষ?

হ্যাঁ, নবমীর দিন বলি দেবে না।

আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। এই বলি টলির ব্যাপারগুলো আমি একদম সহ্য করতে পারি না। অথচ পুজো মানেই বলি। দক্ষিণ বাড়ি আর পুবের বাড়িতে শুধু ছাগল বলি না মহিষ বলিও হবে। মহিষটা বাঁধা থাকে। বিচালি খায়। দেখে আমার যে কী কষ্ট হয়। বেচারা জানেও না, দুদিন পরে ওকে বলি দেওয়া হবে। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। যেখানটায় খাঁড়ার

কোপ পড়বে সেখানটায় হাত দি। আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে। চোখে জল এসে যায়। ঠাকুর না দেখে ফিরে আসি। কখনো বলি দেওয়া দেখতে যাই। বাসু যায়। ফিরে এসে আবার গল্প করে। ওর চেয়ে আমাদের বলিদান অনেক ভালো। ছাগল হলো চালকুমড়ো আর মহিষ আখ! মাদারদাই খাঁড়া নিয়ে চালকুমড়ো আর আখ বলি দেয়। ঐ বলিদান দেখতে একটুও কষ্ট হয় না।

হঠাৎ দূর থেকে শাঁখের শব্দ কানে এলো।

বাসু আমি যাচ্ছি। বলেই ছুটতে শুরু করলাম। শাঁখ বাজার পর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে মা যদি আমাদের না দেখেন তাহলে আর দেখতে হবে না। খুকুটা রেডি থাকে। আমাদের না দেখলেই নালিশ করবে। মেজদার নামে কিছু বলার সাহস ওর নেই। এমন মার খাবে। আজ অবশ্য মিতা ওকে অনেক শিউলি ফুল দিয়েছে, নালিশ নাও করতে পারে। তবু চান্স নেওয়া যায় না। আমি জোরে ছুটতে লাগলাম।

(দুই)

ঘুমের ঘোরে ক্রিং ক্রিং শব্দ কানে আসছিলো। আমি পাশ ফিরে শুলাম।

নমা গায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে শুরু করলেন, ওরে ওঠ ওঠ। অ্যালার্ম বাজছে। এক্ষুনি রেডিওয় মহালয়া শুরু হবে। ডাকবি না সকলকে?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘুমটা ছাড়ে নি। হাই তুলতে তুলতে চোখে মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম আকাশ ভরা তারা। বেশ অন্ধকার চারিদিকে। বাগানের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি শিউলি তলাটা সাদা হয়ে আছে। শিউলি ফুলের হলুদ ডগাগুলো দেখা যাচ্ছে। গাছ থেকে টুপ টাপ করে ফুল পড়ছে। শিশির পড়ে ফুলগুলো ভিজে ভিজে। আজ শিউলি ফুল কুড়ুবার তাড়া নেই। ছুটলাম প্রথমে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। সেখান থেকে এসে বড় পিসিমা। ওপাশে মেজদি। তারপর ছবিদির মাকে ডেকে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেলাম রেডিওতে শাঁখ বাজছে। মহালয়া শুরু হয়ে গেলো। এক্ষুনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর চণ্ডীপাঠ শুনতে পাবো। আমাদের বড় ঘর ভরে গেছে। রেডিওটা খুব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় মাদুর পাতা। আমি নমার পাশে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই নমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বো। নমার সারা শরীরে বাত। খুব ব্যথা তবু কিচ্ছু বলেন না। আমার যতো আব্দার নমা আর দাদুর কাছে। দাদু নমার ছোট দেওর। সম্পর্কে কাকা হলেও আমরা দাদু বলেই ডাকি জন্ম থেকেই। নমা বাবার কেমন যেন বোন হন। ওঁরা আমাদের বাড়িতেই থাকেন। দাদুর সঙ্গে রোজ বাজারে যাই।

এক একদিন জোর করেই মালাই বরফ খাই। সেদিন বাড়ি আসতেই মা বলেন, বলাই বাবু আজ আবার বাবলুকে মালাইবরফ কিনে দিয়েছেন!

দাদু চুপ। আমি ভেবে পাই না মা কী করে যে কিছু জেনে যান। যদি অসুখ করে? আমি কিন্তু ওঁকে বলে দেবো।

• ছোটকাকিমা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। বললেন, ওসব ছাই পাঁশ খাস কেন! আমার সঙ্গে কলকাতায় চল, আমাদের শোভাবাজারে খুব ভালো আইসক্রিম পাওয়া যায়। তোকে খাওয়াবো।

আমি কথা না বলে আস্তে আস্তে পিছু হটছি। গলিতে একবার ঢুকতে পারলে আর আমায় পায় কে! দাদুকে বকার পর আমার পালা। তার আগেই আমি হাওয়া। সেদিন তো স্কুল বন্ধ। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আর এদিকে আসবো না। মালাই বরফ খাওয়ার কথা মা ততক্ষণে ভুলে যাবেন। ওদিকে তখন মা দুর্গাকে ঠাকুররা সব অস্ত্র দিচ্ছেন। সেই অস্ত্র দিয়ে অসুর বধ হবে। আমারও দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। শুম্ভ নিশুম্ভর সঙ্গে মা দুগ্গার যুদ্ধুর আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো, ঘর তখন ফাঁকা। মহালয়া শুনে যে যার বাড়ি ফিরে গেছেন। আমি সোজা দালানে চলে গেলাম। ফাঁকা দালান। আমি ঠাকুরের পেছন দিয়ে মধ্যের দালানে গিয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। লক্ষ্মী পেঁচাটা গম্ভীর মুখে বসে আছে। মনে হলো পেঁচাটা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জানি, ও কিচ্ছু দেখছে না। চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ওরা রোদ সহ্য করতে পারে না।

কি ছোটবাবু, কাল যে তোমায় দেখলাম না। মাদারদার গলায় চমকে তাকালাম। ওদের দেখলেই আমি খুশি হয়ে উঠি। কতো গল্প যে ওরা জানে। তা ছাড়া পুজোর পর খুরিটুরি সব মাদারদা আমাদের দেয়। বলিদানের পর আখের একটা অংশ তো আমার প্রাপ্য।

কাল যে বাসু ধরে নিয়ে গেলো।

কোথায়?

শ্মশানঘাটে।

আর একটা মড়ার খুলি পেয়েছো বুঝি। কটা হলো?

পাঁচটা। আচ্ছা মাদারদা, বাসু বলছিলো ভূতটুত সব বাজে কথা। তুমি যে বলো বোধন গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকেন। রোজ রাত্তিরে দালানে এসে খড়ম পরে হাঁটেন। শব্দ শোনা যায়। বাসু বলে, সোরেল ছোটাছুটি করে তার শব্দ। আমি একদিন বাইরের ঘরে দাদুর কাছে শুয়েছিলাম। শব্দ শুনে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। হঠাৎ নাকে এলো চালের গন্ধ। বুঝলাম, সত্যিই সোরেল।

মাদারদা উত্তর দিলো না। নারায়ণ ঘরে ঘট পাতা হবে আজ। তার যোগাড় করছে। এক্ষুণি ঢাকি এসে পড়বে। সনৎদা ওর বাবার বাবার সঙ্গে পুজো করতে আসবেন। পুজো হবে দু'বেলা। ভিজে আলোচাল, দুধ, কলা, চিনি আর বাতাসা দিয়ে মাখা প্রসাদ এক দলা করে পাবো। সনৎদা লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় নাড়ু দেবে।

মাদারদা এবার কাদের পুজো ?

বড় তরফের !

তার মানে কানাইবাবুদের। তা যাদেরই হোক না কেন। পুজোটা তো আমি আমাদেরই ভাবি। বিশ্বাসই হয় না এটা আমাদের পুজো নয়। আমরা যে এই ঘোষবাড়িতে ভাড়া থাকি তা মনেই থাকে না।

আমি বললাম, থিয়েটারের এই সিনগুলোয় বেশি হাত দিও না।

কেন ?

সেদিন একটা মস্তবড সাপ দেখেছি। গোখরো মনে হলো।

কি করে বুঝলে ?

বাঃ, মাথায় খড়মের ছাপ দেখলাম যে।

তাই তো ! তুমি দেখছি সব জানো ছোটবাবু।

আমি খুশি হয়ে পড়লাম। বললাম, আরো একটা কথা জানি।

কি ?

রানুদি নাকি ভূত হয়ে আছে।

চুপ চুপ। কাউকে বোল না।

কেন ? নিতাই আমায় বললো যে।

কী বললো ?

মানুবাবু ওপরে গিয়ে শুয়েছিলেন। মাঝরাত্তিরে ওঁকে বকে ঝকে রানুদি নিচে নামিয়ে দিয়েছে।

সেই মুহূর্তে মিতা দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো। বললো, মা খেতে দিয়েছেন।

ছুটির দিন। মাস্টারমশাই প্রায় দশটা পর্যন্ত পড়ালেন। ততোক্ষণে পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেছে। সারাদিন খেলা হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। আমাদের ক্লাব মিলন সমিতিও নাম দিয়েছে। খোকনদা, ভাইটিনদা, দেশো, বিশে, মিনি, আছে দলে। বাসুও খেলছে। আমি বারান্দায় বসে খেলা দেখছিলাম। একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা। মিলন সমিতি ফাইনালে উঠবেই। পাড়ার বড়রাও এসে খেলা দেখছেন। মাঠের ঠিক উল্টো দিকে ঘোষবাড়ির একটা ছোট ফ্ল্যাটে আমাদের স্কুলের ড্রিল স্যার থাকেন।

বিজয়কৃষ্ণ আইচ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে উনি মাস্টারদার দলে ছিলেন। ওঁর কাছে আমরা মাস্টারদা সূর্য সেনের গল্প শুনতাম। দেখলাম উনিও বারান্দায় বেরিয়ে এসে খেলা দেখছেন। ঠিক তখনই বড় বড় জালায় গঙ্গার জল আসতে আরম্ভ করলো। পুজোর জন্যে লাগবে। নারায়ণঘরে জালাগুলো রাখা থাকবে। পুজোর সময় খরচ হবে। বাকিটা সারা বছর ধরে নারায়ণ পুজোয় লাগবে। জালাগুলো নিয়ে দেউড়ি দিয়ে ঢুকে, চক পার হয়ে লোকগুলো নারায়ণঘরে চলে গেলো। নারায়ণঘরে জালাগুলোর পেছনে আমি একদিন মস্তবড় একটা সাপ দেখেছিলাম। তারপর থেকে আর ওঘরে ঢুকি নি।

মহালয়ার দিনটা খেলার মাঠেই কেটে গেলো। সকাল থেকে সন্ধ্যে। আমার অবশ্য বেশিক্ষণ মাঠে থাকার উপায় ছিলো না। মা রাগ করবেন।

এরপর দিনগুলো বড় তাড়াতাড়ি কাটে। স্কুলে পুজোর ছুটির মেজাজ। দালানে ঠাকুর তৈরী শেষ পর্যায়ে। আমরা অপেক্ষা করে আছি, কবে ঠাকুরের চোখ আঁকা হবে। ননী পাল বলে, চোখ আঁকা বলতে নেই, বলতে হয় চক্ষুদান। ওর কথা আমাদের কাছে বেদবাক্য। আমি ঠাকুরের পেছন দিকটায় উঁকি মেরে দেখি, সেখানে খড় মাটি। সামনেটা কী সুন্দর কিন্তু পেছনটা! আমি ভেবে কুল কিনারা পাই না। পুজোর সময় সনৎদা আর ওঁর বাবা তো ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। মা দুর্গা, কার্তিক, গণেশদাদা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর এমনকি কি ঐ সিংহ, ময়ূর, হাঁস, ইঁদুর, পেঁচা সাপ সব জীবন্ত হয়ে উঠবে। তাহলে কেন ঠাকুরের পেছন দিকটায় খড়টড় দেখা যাবে? ননীপালকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দেয় নি। এমন ভাব করলো, আমার কথাটা যেন শুনতেই পায় নি। একদিন সনৎদা ঝুড়ি থেকে একটা নারকেল নাড়ু বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়লো।

এখন রোজ সন্ধ্যে বেলাটা আমাদের কাছে উত্তেজনাপূর্ণ। মাস্টারমশাই কোনদিন বসিরহাট থেকে জামা প্যান্ট, কোনদিন জুতো, কোনদিন ধুতি শাড়ি কিনে আনছেন। আমরা একটু হাত টাত দিয়ে, গন্ধ শুঁকে রেখে দিই। পরার জন্যে প্রাণ বেরিয়ে যায়। উপায় নেই। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যেবেলায় নতুন জামা প্যান্ট পরে বোধনতলায় যাব। অন্যদিন দুপুর বেলাতেও ওখানে যেতে ভয় করে। ব্রহ্মদৈত্য থাকেন তো ঐ বেলগাছে। কিন্তু বোধনের দিন আমাদের সাহস দেখে কে! সকাল থেকে কতোবার যে যাই। বেলগাছতলাটা পরিষ্কার হচ্ছে। ঘাসটাস কেটে গোবর লেপে দেওয়া হয়। বিকেলবেলায় চেয়ার পেতে দেওয়া হয়। পুজো হবে সেই সন্ধ্যে বেলায় আমরা কিন্তু বিকেল থেকে বসে থাকি। বেলগাছটার পাশে নারায়ণের ঘর। সেই সাপটা আছে। সেদিন কিন্তু

একটুও ভয় করে না।

বেলগাছতলা থেকে ইচ্ছামতী নদী দেখা যায়। বিকেলবেলায় ছুটতে ছুটতে চলে যাই। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে খুব জোরে ফুঁ দিই। তীক্ষ্ন শিসের মতো শব্দ হয়। পর পর তিন বার শিস দেবার পরই হুস করে জলের ওপর মাথা তোলে রাম-লক্ষ্মণ। জল কেটে তরতর করে এগিয়ে আসে ডাঙ্গার দিকে। এক একদিন আমার পকেটে মুড়ি থাকে। জলে ছড়িয়ে দিই। ওরা গবগব করে খায়। তখনই কানে আসে ঢাকের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে বোধনতলায়।

মাঝে পুজোর দালানে ছুটে যাই। ননীপাল আপন মনে ঠাকুরদের গর্জন তেল মাখাচ্ছে। তেলটা মাখানোর পর চকচক করে। কখন মিতা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। ওর গলা শুনে চমকে উঠলাম, ঐ দ্যাখ জয়া বিজয়া!

আজতো আনতেই হবে। একটু পরেই ঠাকুর তোলা হবে মধ্যের দালানের বেদীর ওপর। বেদী মানে মস্ত বড় খাট। চারপাশটা কাঠের রেলিং দেওয়া। দুর্গাপুজো আর কালীপুজোর সময় ঠাকুর ওর ওপর থাকেন। সারা বছর খাটটা একভাবে পড়ে থাকে। আমরা কখনোই ওর ওপর উঠি না। একবার বাসু উঠেছিল। আমরা শিউরে উঠেছিলাম। পাপ হবে যে! বাসু খাটের ওপর লাফাতে লাফাতে চেঁচাচ্ছিলো, কই পাপ হচ্ছে, কই পাপ হচ্ছে।

আমি বললাম, পাপ কী দেখা যায়।

যায়ই তো! ঐ যে গতবার শীতের সময় সেই বুড়িকে তুই তোর গায়ের চাদরটা দিয়েছিলি তার শীত করছে বলে এটা হচ্ছে পুণ্য।

ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেলো। শীতকাল। সবে ক্রিকেট খেলা শেষ হয়েছে। সন্ধ্যে হয় হয়। এবার বাড়ি যাবো। অনেকক্ষণ বল করেছি। তাই গরম লাগছে। আমাদের বারান্দার ওপর একটা বুড়ি বসে বসে কাঁপছিলো। খুব শীত করছিলো তার। আমার কী যেন মনে হলো। গা থেকে চাদরটা নিয়ে মুড়ি দিয়ে বললাম, এটা তুমি গায় দাও। বুড়ি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। খুশিতে ওর চোখ দুটো চকচক করেছিলো। বাড়ি ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, চাদর কই!

সত্যি কথাই বললাম। মা কিন্তু কিছু বলেন নি। আর একটা চাদর বের করে দিয়েছিলেন। কালিদির কাছে শুনেছিলাম, বুড়ির জন্যে মা অনেক খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বাসু তখনো খাটের ওপর লাফাচ্ছে। আমায় আনমনা দেখে চুপ করে

ছিলো। ওর দিকে তাকাতে দেখে বললো, আর পাপ কী বল তো!

কী?

ঐ যে সেবার খোকনদারা বটগাছ কেটে ফেললো ঐটা পাপ। ঐ যে সেবার গরিব মানুষদের ধরে মারা হলো ঐটা পাপ।

বাসু যে কী বলে! ওর কথার মানে আমি সব বুঝতে পারি না। ওকে আমার তো ভালো লাগে। কিন্তু সকলে বলেন, ও ভীষণ দুষ্টু, মাষ্টারমশাই বলেন, ওর সঙ্গে মিশবে না।

তা বাসুর পাল্লায় পড়ে আমিও মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করি। সেবার যা হয়েছিলো না!

শ্মশানঘাটে যাত্রা ছিলো। আমরা বাইরের বারান্দায় মাদুর পেতে হেরিকেনের আলোয় পড়ছিলাম। মাস্টারমশাই আসেন নি। আমরা জানি, আজ আর আসবেন না। এখনো যে বসিরহাট থেকেই ফেরেন নি। শ্মশানঘাট থেকে যাত্রার কনসার্টের শব্দ ভেসে আসছে। যাত্রা দেখতে যাবার জন্যে ফেরেন নি। আমরা বই খাতা খুলে রেখে গল্প করছিলাম। হঠাৎ বাসু এসে সিঁড়ির ওপর বসলো। আমি চমকে উঠলাম। ধারে কাছে খুকু নেই তো। বাসুকে দেখলে ও মার কাছে গিয়ে নালিশ করবে। বাসুকে মা খুব একটা অপছন্দ করেন না। ওর জন্যে প্রায়ই খাবার টাবার দেন। কিন্তু পড়ার সময় বিরক্ত করলে খুব রেগে যাবেন।

বাসু বললো, এই, আঁখড়ায় যাবি?

কেন সেখানে কী?

ভয় দেখাবো।

কাদের?

যাত্রা দেখে ফিরবে যারা তাদের।

কী করে....;

আখড়ায় কাঠের গৌর নিতাই আছে না। একটা বের করে এনে রাস্তার পাশে গাছের গায় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবো। তারপর দেখবি কী মজা হয়। ভূত ভেবে ভয় পাবে সকলে।

গৌর নিতাই যে ভীষণ ভার।

তাই তো তোকে ডাকছি, দুজনে ধরাধরি করে বের করতে হবে। একা পারবো না!

মিতাকে বললাম, কাউকে বলিস না। এক্ষুনি আসছি।

আমি জানি না। মা যদি ডাকেন?

রাস্তায় নেমে তুই আলোটা দেখাবি। আমি এক ছুটে চলে আসবো।

আমি আর বাসু আখড়ার দিকে চললাম। ভোদদাদের বাড়ির সামনে আখড়া। এখন আর কেউ থাকে না। এক সময় অনেক বোষ্টম বোষ্টমি ওখানে থাকতো। গমগম করতো আখড়াটা। গান হতো। পুজো হতো। জন্মাষ্টমীর সময় উৎসব হতো। এখন আর কিচ্ছু হয় না। ওরা সব কোথায় যে চলে গেছে। আমার এখনও কানে বাজে ওদের গান— ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লহো গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে....

আমি আর বাসু এসে ধরাধরি করে একটা মূর্তি এনে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। চাঁদের আলো গিয়ে পড়লো মূর্তিটার ওপর, মূর্তির পরনের ধুতিটা ঢেকে দিলাম। রাস্তা দিয়ে গেলে চোখ পড়বেই। আর চোখ পড়লে....

আমরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেলাম। আমাদের বাড়ির বারান্দায় থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে। নিচের ধাপে বসলে পরিষ্কার দেখা যাবে, তাই সেখানে বসে দেখতে লাগলাম, কে প্রথম ভয় পায়।

বেশ খানিকক্ষণ বসার পর হঠাৎ দেখি একটা আলো এগিয়ে আসছে। আলোটার গতি দেখে বুঝলাম, সাইকেল। তারপরই মনে হলো, এতো মাস্টারমশাই। চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ মাস্টারমশাই।

আমি উঠে যাচ্ছিলাম। বাসু হাত টেনে ধরলো। বললো। দ্যাখ না কী মজা হয়।

আমি ঘামছি। আমায় দেখতে পেলে আর দেখতে হবে না। বললাম, মাস্টারমশাই ভয়ই পাবেন না। কী দেখবো, তার চেয়ে আমি যাই!

ঐ দ্যাখ!

সাইকেলটা থেমে গেছে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মাস্টারমশাইকে চেনা যাচ্ছে। দেখলাম, সাইকেলের সামনে থেকে গোল টর্চটা খুলে নিয়ে উনি মূর্তিটা দেখতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ দেখার পর সাইকেলটা রেখে এক পা, দু পা করে এগিয়ে গেলেন মূর্তিটার দিকে, তারপর মূর্তিটার মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এসে সাইকেলে উঠলেন, ক্রিং ক্রিং করে দুবার বেল বাজিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমি এক ছুটে ঘরে। বাসু গিয়ে ঢুকলো পুজোর দালানে। সব মজাই মাটি। কী দরকার ছিলো মাস্টারমশাইয়ের ঐ সময় আসার। তা মাস্টারমশাই ভয় না পেলেও সেদিন রাত্তিরে নাকি যাত্রা দেখে ফেরার সময় অনেকেই ভয় পেয়েছিলেন। দু'তিন জন নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এ সব অবশ্য বাসুর খবর।

তবে পরদিন সকালে মূর্তিটা বাইরে দেখে পাড়ায় খুব হৈ চৈ হয়েছিলো। আর কাজটা যে কার তাও বুঝতে কারো বাকি ছিলো না।

সপ্তমীর দিন ভোরবেলায় ঢাকের শব্দে ঘুম ভাঙলো। মুখটা কোনরকমে ধুয়ে ছুটলাম দালানে। কলা বৌকে চান করানো হয়ে গেছে। লাল পাড় কাপড় পরিয়ে কলা বৌকে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো গণেশ দাদার পাশে।

মা দুগ্গার দিকে তাকিয়ে চোখ আর সরাতেই পারি না। কী সুন্দর দেখতে। টানা টানা বড় দুটি চোখ। মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হলো, মা দুগ্গা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা কী করে হবে। পুজো আরম্ভ হয় নি। ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাহলে?

চকের দিকে তাকালাম। বলিদানের জায়গাটায় সামিয়ানা টাঙানো। বালি দিয়ে জায়গাটা একটু উঁচু করা। ঐখানে চালকুমড়ো আর আখ বলি দেওয়া হবে। পুজোর দালানটা এখন ফাঁকা। কানাইবাবুদের পেছন বাড়িটা গমগম করছে। কাল রাত্তিরে কলকাতা থেকে সক্কলে এসেছেন। এই সময় যে যেখানেই থাকুন না — সবাই বাড়ি আসেন। আমাদের বাড়িও একটু পরে ভরে যাবে। দাদা এসে গেছেন। দিদি জামাইবাবু আসবেন আর একটু পরে।

আমি দালান থেকে বেরিয়ে দেখে এলাম। আজও অনেক রুগী এসে বসে আছে। বাবা মুখ টুখ ধুয়ে, খেয়ে দেয়ে এসে ওদের দেখবেন। তারপর যাবেন ডাক্তারখানায়। সেখান থেকে কারো কারো বাড়ি রুগী দেখে ফিরতে সেই দুপুর।

আজ তাড়াতাড়ি চান করে নতুন জামা প্যান্ট পরে আমরা বেরুবো। ঠাকুর দেখতেও যেতে পারি। পুজোর দালান থেকে ভেসে আসছে সনৎদার বাবা দুখীরামবাবুর মন্ত্রপাঠ। ধুপ্ ধুনো গন্ধ, নীল আকাশে সাদা মেঘ আমাদের মনে আনন্দের হিল্লোল তোলে। দাদা কাল পুজোবার্ষিকী এনেছেন। সেটা পড়তে হবে।

আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমিও নেমে পড়লাম। বড়রা এসে এক এক করে বারান্দায় বসছেন। এখন ওঁদের আড্ডা শুরু হবে, চলবে সেই দুপুর পর্যন্ত। বাসুও মাঠে ছিলো। আমায় দেখে এগিয়ে এলো। ওর পরনে নতুন হাফ প্যান্ট আর সার্ট। বললো, নদীর ধারে যাবি?

সে কী। খেলবি না?

চল না!

আমরা দুজনে ছুটতে শুরু করলাম। ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। চারদিকটা

কিরকম যেন নতুন নতুন লাগছে। বাসু বললো, চল ভেড়ির ওপর দিকে দক্ষিণবাড়ি যাই। ওখানে ঠাকুর দেখে পশ্চিমবাড়ি যাবো।

আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম। ভেড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে দক্ষিণবাড়ির খিড়কির দরজায়। ওখান দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে হাজির হলাম পুজোর দালানে। পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। দালানের নিচে এক জায়গায় অনেকগুলো কালো ছাগল আর একটা মহিষ রয়েছে। ওদিকে তাকাতেই আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। কেন যে পুজোর সময় এই সব বলি টলি দেওয়া হয়!

বাসু চল।

বাসু আমার দিকে তাকালো। কি বুঝলো জানি না। বললো, তাই চল!

আমরা দুজনে ফিরে চললাম।

সারাদিন গল্পগুজব, পুজোবার্ষিকী পড়তে পড়তে কোন সময় যে সন্ধে গড়িয়ে গেলো বুঝতেই পারি নি।

তিন

অষ্টমীর দিন সকালে আমরা বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ বাসু দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিলো। আমি দেখতে পাই নি। মিতা বললো, ছোড়দা ঐ দ্যাখ।

বাসু হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি উঠে গেলাম। এখন আমরা নির্ভয়ে বেরুতে পারি! জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করার, অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। কাছে গিয়ে বাসুর দিকে তাকাতেই বুঝলাম, একটা কিছু ঘটেছে। বাসুর মুখ রাগে থমথম করছে। আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো রাস্তায়। তারপর বললো, শীগগির চল। রামকে ওরা ধরেছে।

মানে?

রাম জেলেদের জালে ধরা পড়েছে। জেলেরা ছেড়ে দিচ্ছিলো। দুটো লোক এসে বলছে, তারা টাকা দেবে, শুশুকটা ওদের ধরে দিতে হবে।

কেন?

মেরে ওর মাংস খাবে।

সে কী!

আমি তীরবেগে ছুটতে শুরু করলাম। বাসুও ছুটছে। আমাদের ঐভাবে ছুটতে দেখে মাঠে যারা খেলছিলো তারাও আমাদের পেছনে ছুটে আসতে লাগলো, ওরা বুঝেছে, একটা কিছু হয়েছে।

নদীর ধারে লোক দুটো তখনো জেলেদের সঙ্গে কথা বলছে। ষণ্ডা গুণ্ডা

টাইপের লোক দুটো। ওরা টাকার লোভ দেখাচ্ছে। জেলেরা রাজী হচ্ছে না বলে টাকার অংক বাড়িয়ে চলেছে।

রাম তখনো নদীতে জালে আটকে আছে। আমরা সোজা নদীর ধারে চলে গেলাম। বাসু জলে নামছে। জেলেদের আমরা চিনি। যার জালে রাম আটকে গেছে তার নাম পরমেশ্বর, আমি চিনেছি। লোকটাকে পাত্তা দিলাম না, বললাম, পরমেশ্বর রামকে ছেড়ে দাও।

না দেবে না!

ততক্ষণে ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে এসে গেছে। লোকটা আমায় চোখ রাঙাচ্ছে দেখে ওরা তাকে ঘিরে ধরলো। সকালবেলায় যাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তাঁরাও এক এক করে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাসু যে জলে নেমে জালের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলো পরমেশ্বর দেখেছিলো। কিছু বলে নি। বাসুকে জালে দেখে আমি দৌড়ে গেলাম। বললাম, বাসু জাল খুলে রামকে ছেড়ে দে।

বাসু বললো, দ্যাখ না কী করি।

লোক দুটো এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা ঘিরে থাকায় পারলো না। বাসু জাল খুলে রামকে ডাকলো। বাসুকে চিনতে রামের কোন অসুবিধে হলো না। সে এগিয়ে এলো।

বাসু বললো, জালটা খুলে দিলে মাছগুলোও বেরিয়ে যাবে। পুজোর দিন, পরমেশ্বরের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাহলে কী করবি?

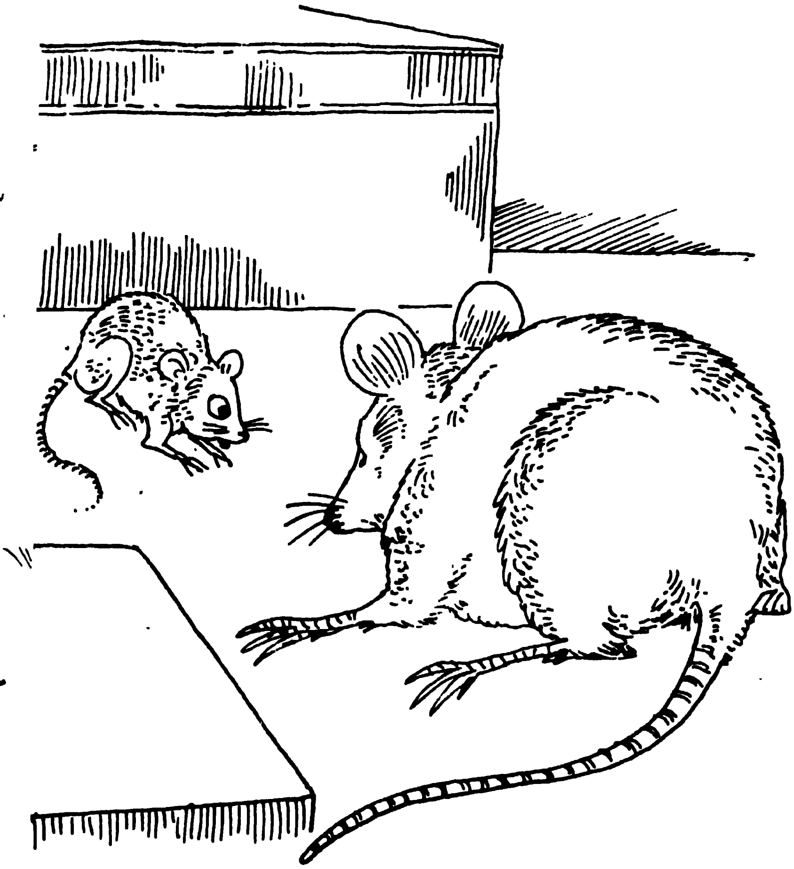
এই দ্যাখ।

হঠাৎ দেখলাম, বাসু লাফিয়ে উঠে জাল পেরিয়ে নদীর ওপাশে পড়লো। তারপরই একইভাবে লাফিয়ে উঠে জলে পড়লো রাম।

বাসু ডাঙায় উঠে এলো। আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম। লোক দুটো ততক্ষণে পালিয়ে গেছে।

আমরা ফিরে চললাম। বাসুর নতুন জামা প্যান্ট ভিজে গেছে। সেদিকে কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ও তখন রাজ্যজয় করে ফিরছে। সত্যিই রাজ্য জয় করেছে বাসু। দুষ্টু লোকদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে রামকে।

একটু আগে যে দুঃখকষ্ট আর আশঙ্কা আমাদের মন ঘিরে ধরছিলো এখন তা আর নেই। পুজোর আনন্দে আবার আমরা মেতে উঠলাম।



পাঁচফোড়ন ও তার বন্ধুরা

অধীর বিশ্বাস

ওই যে শুরু হয়ে গেল। আরে বাবা, ঘরের আলোটা নিভতে দে। এখনও বালবের সরু তারটায় আলোর আভা রয়েছে। অন্ধকারটা একটু জমাট বাঁধুক। ঘরের লোকজন একটু আয়েস করে বালিশে মাথা রাখুক। তারপর যা-খুশি কর। তখন শব্দটব্দ যতই হোক লেপ-কাঁথার ওম্ ছেড়ে আর উঠতে চাইবে না। এমন উড়োতাড়া করে মানুষের মন বিষিয়ে দিলে কবে একপাতা 'র‍্যাট কিল' এনে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে কাঁদবারও সময় পাওয়া যাবে না তখন।

কতদিন পই পই করে ওই পাঁচফোড়ন নেংটিকে সতর্ক করেছে ওর বন্ধুবান্ধব আর ধেড়ে-ইঁদুরের মা। কিন্তু কিছুতেই আমল দ্যায় না সেসব কথায়। ভাবে, কী জানি কী বলছে আবার! যেদিন ফাঁদে পড়বে, সেদিনই বুঝবে মজা।—আজও খুব বিরক্ত হয় ধেড়ে-ইঁদুর। আজ আর বক বক করে না। নিজের মনে কথা কয়। ভাবে, কী দরকার! আজকালকার নেংটির দল সব। শেষে হয়তো মুখের উপরই দুটো বাজে কথা শুনিয়ে দিল। সেটা কিন্তু খুব খারাপ লাগবে। তারচেয়ে বাবা চুপচাপ থাকো। বোবার শত্রু নেই।

বাড়ির মালিকরা এমনিতেই রেগে আছে ইঁদুরের উপর। এবারের শীত আসার আগেই একদিন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিতে মানুষজনের দোষ কেন, প্রাণিকুলেরই হাড়-কাঁপুনি দশা। বাধ্য হয়ে এই বাড়ির মানুষদের মা তাঁর ছেলেপুলেদের গায়ে কাঁথা দিতে বস্তার মুখ খুললেন। আর খুলতেই পালাতে পথ পায় না ইঁদুরগুলো। ছোট বড় মেজো—নানান আকারের ইঁদুর। যে যেখানে পারল ছুটেমুটে লুকিয়ে গেল। বাড়ির মা হাঁউমাউ করতে থাকেন। এদিকে মা-ইঁদুরের সে এক সমস্যা।

ক'দিন আগে বাচ্চা হয়েছে তার। চোখ ফোটেনি একটারও। লালচে-লালচে ওই একটুকুন ছানাদের নিয়ে বিপদের আর সীমা নেই। কাছাকাছি তার জাতের কেউ ছিল না। থাকলে, বলত একটা একটা বাচ্চা মুখে তুলে অন্য যে কোনও জায়গায় নিয়ে অন্তত প্রাণে বাঁচুক। সেটা বলতে পারেনি। কপালের জোর আছে। নয়তো, ওই যাত্রায় তার বেঁচে-যাওয়া চাড্ডিখানিক কথা নয়।

সেবার না-হয় অন্যরকম আবহাওয়া ছিল। ছোটকর্তা বলেছিলেন বিষ, নয়তো ইঁদুরকলের কথা। শেষে আর কোনওটাই আসেনি বাড়িতে। বাড়ির মা বলেছিলেন অবশ্য জ্ঞানীর মতন কথাটা। বিষ খাবারের সঙ্গেই দিতে হবে। সেটা যদি ইঁদুরের বদলে আমাদের বাচ্চা-ই খেয়ে ফেলে! পরিকল্পনাটা বানচাল হলেও রাগ তো আর মন থেকে মুছে যাবার নয়। বেশি বেতামিজ আচরণ দেখতে অগত্যা র‍্যাট কিল। যদি আনেন তো ওই ছোটকর্তা-ই। সুতরাং সাধু সাবধান।

এই ঘরে যখন প্রথম পা রেখেছিল মা-ইঁদুর, তখনও ঘরে বেড়া লাগানো হয়নি। উপরে টালির চাল। নীচে দশটা খুঁটি। আর একটা কাঁঠাল তক্তার খাট। ব্যস। ওতেই ইঁদুরটা গুটি গুটি পায়ে এসে খাটের পায়ার আড়ালে বসবার শুরু করে। আজ কত ইঁদুরের সংসার। তার মধ্যেও কয়েক শরিক। ছানাপোনা নেংটির দল। কত রকমের আচরণ তাদের। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো নড়াচড়া করে।

পুরনো দিনের কথা শুধু মানুষরা কেন, ইঁদুরদেরও মনে ফিরে ফিরে আসে। বয়স যত বাড়বে, সব প্রাণীরই হয়তো আগেকার সেইসব ঘটনা মনে পড়ে যায়। আজ যেমন পড়ছে। সেই ইঁদুর মা হয়ে বুড়ি হয়েছে। তারপর অনেক ইঁদুর এসে আস্তানা গড়েছে। সেই ঘরেরও কত পরিবর্তন। এ-ঘরে ইলেকট্রিকের বাতি এল। লেপ-কাঁথা রাখার বড় বাক্স। তাদেরই ভয়ে দুই দুটো মিটসেফ। তবু জিনিসপত্র এখানে ওখানে পড়ে থাকে। কোনও কোনও খাবার জিনিস তুলতে বাড়ির মা ভুলে যান। ভুলে গেলেই এইসব ইঁদুররা দৌড়ে গিয়ে মোড়ক খোলে। হিড়হিড় কবে টেনে নিয়ে যায়। নিক। কিন্তু অবস্থা বুঝে তো নিতে হবে।

একদিন এমনি করেই একটা পাঁচফোড়নের মোড়ক নিয়ে গিয়ে সে কী অপ। অপ মানে অপমান। ইঁদুরাও কিছু কিছু কথাবার্তা মানুষের মতন এমন ছোট করে নেয়। ওর বন্ধুরা বেজায় হাসাহাসি করেছিল। সেই থেকে বাড়িটার তিনটি ঘর্বের ইঁদুরদের কাছে ওর নাম হয়ে গেল পাঁচফোড়ন-ইঁদুর। লজ্জারই কথা ও আগ-বাড়িয়ে সব কিছু করতে যায়। কিছুতে জেতে। কিছুতে ঠকে। ঠকার ভাগই বেশি। বলে রাখা ভাল, এই নামে যদি কেউ ডাকে তা হলে বুঝতে হবে ওকে খ্যাপাচ্ছে। তাতে করে পাঁচফোড়ন রেগে যায়। এখানকার যা কাণ্ডকারখানা এতে কিন্তু ধেড়ে ইঁদুর-মা কিছু বলল না। মনে মনে কিছু ধারণা নিল শুধু। মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল আরে, একটু সবুর কর।

সত্যি বলতে কি, মা-ইঁদুরটার আজকাল চোখের খিদে হয়েছে। পেট ভরে গেল খেতে খেতে তবু বুঝি মনে হয়, আর একটু হলে ভাল হত। বয়স হয়েছে তো! খিদে-চোখে কাঠের বাক্সের তলায় এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু পাঁচফোড়নটা যখন মুখে দিয়ে কাগজের পুঁটুলিটা নিয়ে যাচ্ছে আর কিছু বলা যায় না। না-বলতে পেরে এই-সব কথা মনে হল।

এখন ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার ঘিরে ধরেছে। বালবের তার দূরে থাক, বালবটাকেই আর দেখতে পাচ্ছে না ধেড়ে মা। ধীরে ধীরে বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে ছুঁক ছুঁক গন্ধ শুঁকে ঘুরে বেড়ায় এ-ঘর ও-ঘর। যাতায়াতের একটাই দরজা। ধেড়ে-মা ভারী শরীরটা নিয়ে বড় ঘরের মেঝেয় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দুই-পা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করে ঘুম কতটা গভীর। নাঃ, এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। পায়ের দিকের খাট বেয়ে মশারির কোলে বসে এবার নিশ্চিন্ত হল। মানুষের আর দোষ কী। সারাদিন খাটা-খাটুনি। এই রাত্তিরে লেপের তলায় ঢুকলে আপনিতেই চোখ জুড়ে আসে। তার ওপর শীতের রোদে ওম-করানো লেপ-বালিশ। ওর তলায় যা আরাম। ধেড়ে-মা

মাঝে মাঝেই ওম পেতে এমন পায়ের দিকের বাড়তি লেপের তলায় গিয়ে শরীরটা গরম করে আসে। তখন অবশ্য সাবধানে থাকতে হয়। যদি পায়ের চাপে পড়ে যায় সে আর এক বিপদ। ইচ্ছে হল লেপটা উঁচু করে সেঁধিয়ে যেতে কিন্তু তার আগেই কীসের যেন একটা গন্ধ ভেসে এল। ধেড়ে-মা নাক তুলে এদিক ওদিক করে। হ্যাঁ, গন্ধটা মাথার দিক থেকেই আসছে। ইঁদুর-মা লেপের আশা ত্যাগ করে মশারির ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে যায়।

খাটটায় তিনটে বালিশ। মাঝে বাচ্চাটা হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। লেপ থেকে ও অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে। ওর কল্যানেই অনেক খাবার পাওয়া যায়। যেসব বিস্কুট মিষ্টি ক্যাডবেরি খাক, তার থেকে একটু পড়বেই। ঘর যখন নিরিবিলি, মানুষজন না থাকলে টুক্ করে বাক্সের তলা থেকে কেউ না কেউ এসে নিয়ে পালায়। পাঁচফোড়নের ঝোঁক আবার খোলা খাবারের চেয়ে মোড়কের দিকেই বেশি। সুতরাং ওকে নিয়ে অতটা নয়। ভয় অন্য সব পুঁচকে-ইঁদুরদের। ধেড়ে-মা ভারী শরীর নিয়ে বেরোতে না বেরোতেই অন্যটা এসে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। বাক্সের কোল-ঘেঁষে যেটা পড়ে সেটাই যা কপালে জোটে। যাক সেসব। ওদের সঙ্গে তো আর কম্পিটিশনে যাওয়া যায় না। গন্ধটা মশারীর ভিতর থেকেই আসছে। খাবার ছাড়া অমন গন্ধ আসতেই পারে না।

ধেড়ে ইঁদুর-মা এখন মাথার দিকে। আয়েস করে বসল এবার। ওর মনে ফুর্তি বুঝি ধরে না। সামনে সাত রাজার ধন। বাচ্চাটার বালিশ-লাগোয়া হনুমান হাতি আর রাজহাঁস। একটা খেলনা-গাড়িও সঙ্গে আছে। আর ওটা কী? গুলি লজেন্সের খোলা প্যাকেট। ধেড়ে-মার খুব লোভী দৃষ্টি। সামনে এমন প্যাকেট রেখে পাঁচফোড়নের কথা মনে হচ্ছে। ও কত তৎপর। সেই মোড়ক নিয়ে পালানো দেখে সত্যিই তার হিংসে লাগে। সেই সুযোগ এখন চোখের সামনে।

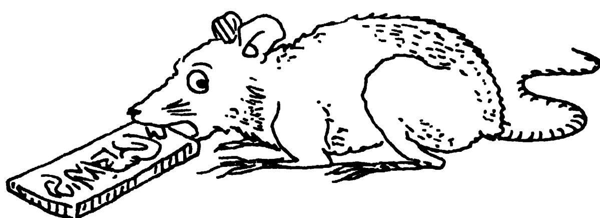
ইচ্ছে হল একবার বাচ্চাটার বালিশে মাথা রেখে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। করলও তাই। এরপর আর বেশি নড়াচড়া করল না মা ইঁদুর। যদি লেজ লেগে এদের গায়ে সুড়সুড়ি লাগে। মশারি গুজে দিলে সেই বস্তা থেকে লেপ বার করার মতন বিপদ আসতে পারে। সেসব ঝুঁকি নিল না। জেমস লজেন্সের প্যাকেট কামড়ে ধরে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই ফিরতে লাগল। এই ফিরতে গিয়ে গুলি লজেন্স একটা একটা করে বেরিয়ে নড়ে। বিছানায় পড়ছে বলে কোনও শব্দ হয় না। মশারির তলার ফাঁক দিয়ে নামতে গিয়ে প্যাকেটের লজেন্স পড়ার টুপটাপ শব্দ। এতে করে এরা কিন্তু কেউই জাগল

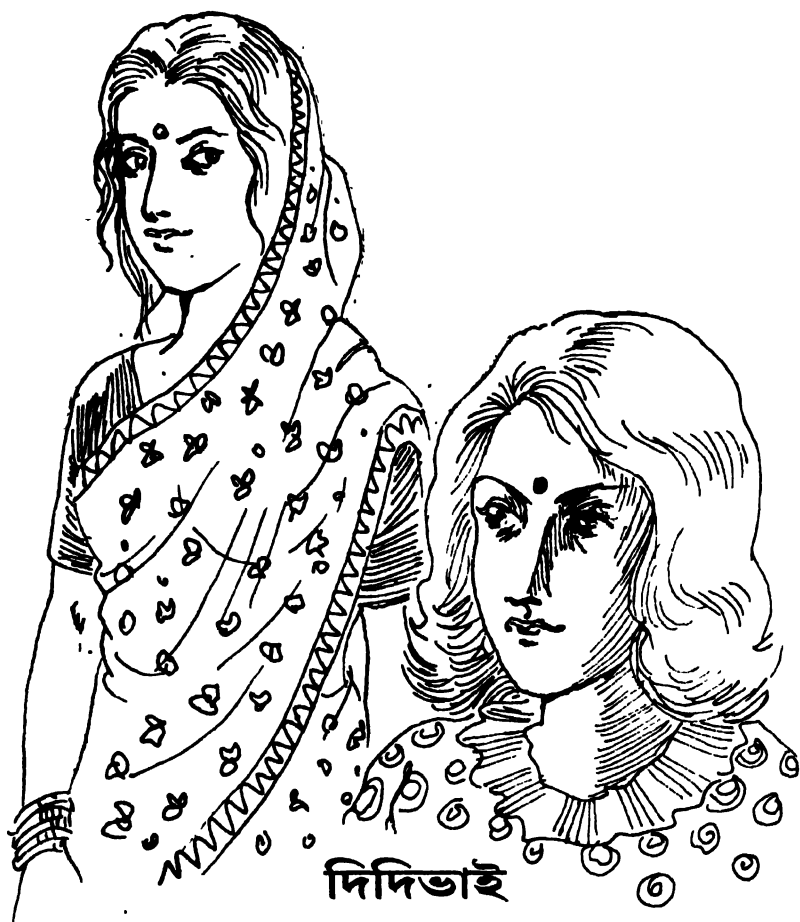
না। শব্দ পেল দু'চারটে নেংটির দল। মুহূর্তেই ছুটে এসেছে তারা। মেঝের উপর দিয়ে ধেড়ে-মা খস খস শব্দ করে জেমসের প্যাকেট নিয়ে যায়। তখনও যা দু'একটা ছিল তা মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর দেওয়ামাত্র নেংটির দল মুখে পুরে তৃপ্তির শব্দ তোলে—আঃ। দারুণ দারুণ।

ধেড়ে-মার সেদিকে নজর নেই। মনে মনে ভাবছে আরও কত লজেন্সই না আছে। প্যাকেটে কুর কুর খর খর শব্দ হচ্ছে। আর একটুখানিক। চৌকাঠটা পেরোলেই বড় বাক্স। বাক্সের তলায় কষ্ট করে নিয়ে গেলে আর দেখতে হবে না।

অনেকটা সময় পার করে, অনেকটাই যত্ন নিয়ে বাক্সের তলায় পৌঁছানো গেল শেষে। মা-ইঁদুরের এই শীতের দিনেও কেমন যেন ঘাম বেরোচ্ছে। বেরোক। পরিশ্রম করার সুফল আছে। জেমস প্যাকেটের উপর শরীরটা তুলে একটু বিশ্রাম করা যাক। প্যাকেটটা বেজায় কষ্ট দিচ্ছে। এখন আর দুষ্ট নেংটির দলবল এসেও তেমন সুবিধে করতে পারবে না। এ কী। প্যাকেটটা এমন মাটির সঙ্গে ব'সে গেল কেন? ধেড়ে-মা অনেক কসরত করে জাল ফেলে মাছ-হাতড়ানোর মতন হাতড়াতে টের পেল, একটা লজেন্সও নেই।

এদিকে রাত শেষ হয়ে এসেছে। কাক-কুলি ডাকছে। ওর খুব মন খারাপ করল। ধীরে ধীরে বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে অনেকটা সাহস নিয়ে চৌকাঠে উঠে দ্যাখে ঘরের মেঝেটা একদম পরিষ্কার, চকচকে। ঘরের কোনও প্রান্তেই আর আওয়াজ নেই। মুলিবাঁশের সিলিঙের উপর দিয়ে কয়েকটা নেংটি হুটোপুটি করছে। কেন যে অত আনন্দ ফুর্তি সে কি আর বোঝে না? ধেড়ে ইঁদুরের মা তখন বাক্সের তলায় যেতে যেতে বলে, "খুব বাড় বেড়েছিস। ছোটকর্তা উঠুক আজ। তার ছেলের আস্ত একটা জেমস লজেন্সের প্যাকেট।"





দিদিভাই

প্রণব সেন

চারদিকে কালো ধোঁয়া। আগুন জ্বলছে এখনও। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভেসে ভেসে গিলে ফেলছে নীল আকাশ। সেই অন্ধকারে কখন হারিয়ে গেছে মানুষের শেষ করুণ আর্তনাদ। মাটির বুকে ছড়ানো ইঁট, পাথর, ইস্পাতের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বের করে আনা হচ্ছে আগুনে ঝলসানো শুধু বিকৃত, মৃত মানুষের শরীর। যেন দলা দলা মাংসপিণ্ড। ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে গোরস্থানের দিকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কারা যেন বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে। অসংখ্য মৃত মানুষের মধ্যে ভেসে উঠলো একটি ফুটফুটে শিশুর মুখ। বছর

দশেক তার বয়স। নিষ্পাপ আর পবিত্র। উত্তাপে শরীর ঝলসে গেলেও মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। চোখদুটো আকাশের দিকে। হয়তো নালিশ জানাতে চাইছে ঈশ্বরের কাছে। যারা কেড়ে নিয়েছে জীবন, তাদের তুমি ক্ষমা করো না কখনও।

টিভির পর্দায় ভেসে উঠছে একের পর এক ছবি। বুলু হঠাৎ উঠে টিভি বন্ধ করে দিল। মৃত্যুর এমন ছবি ও আর দেখতে চায় না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। বুলু কাঁদছে আর দু-হাতে চোখ কচলাচ্ছে। বাপি বুলুর এই আচমকা কাণ্ডে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে বুলু! কাঁদছ কেন?

বাপিকে দু-হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। ফোঁপানোর সাথে সাথে ওর শরীরও কাঁপছে। বাপি গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

ওকে মারলো কেন? ও কি করেছে?

ওরা কেউ কিছু করেনি বুলু। তবু ওদের মরতে হলো। আকাশ থেকে বোমা ফেলেছে তার আঘাতেই ঘরবাড়ি সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ওরা যে সকলে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেইজন্যেই ওরা মারা গেছে। যুদ্ধে কত নিরীহ মানুষ যে মারা যায় তার কোনও হিসেব নেই।

যুদ্ধ শুরু হবার পর বুলু কতবার দেখেছে টিভিতে এমন দৃশ্য। আকাশে দানবের মতো গর্জন করে বিমান উড়ছে। রাশি রাশি বোমা নেমে আসছে নীচে। মাটি কাঁপিয়ে জ্বলে উঠছে আগুন আর ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক।

বুলু কি ভেবে বলল, যারা আকাশ থেকে বোমা ফেলে মেরেছে, তাদের কি একটুও কষ্ট হয় না? কষ্ট হয় কি না জানেন না বাপি। কষ্ট হলে কেউ কি মানুষ মারার খেলায় মেতে উঠতে পারে? পৃথিবীর বুকে কত যুদ্ধ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। এত মৃত্যু দেখেও তো যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি মানুষ। যদি সত্যিই কষ্ট পেতো, তবে কি যুদ্ধ করার কথা কেউ ভাবতো? বুলুর প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন, হয়তো কষ্ট হয় না।

কেন কষ্ট হয় না বাপি?

জানি না বুলু। কেউ জানে না এর উত্তর কি হতে পারে।

বুলু আর কোনও প্রশ্ন করেনি। বাপির কাছ থেকে উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বুজেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! বুলু স্পষ্ট দেখতে পেল সেই ছোট্ট মেয়ের মুখটা। ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে

উঠেছে। চোখ দুটো স্থির। শুধু তাকিয়ে আছে বুলুর দিকে। কোনো কথা বলছে না। বুলু কথা বলতে যাবে ঠিক তখনই হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এই সময়ে মামনি এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ো না। একটু পরেই খেতে দেব।

বুলু উঠে তাকিয়ে বলল, মামনি জানো, সেই মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এসেছিল। আমি যেই কথা বলতে যাব অমনি কোথায় হারিয়ে গেল। ও কোথায় গেল মামনি?

কার কথা বলছে বুলু! কোন্ মেয়েটা এসেছিল ওর কাছে। মামনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাকে দেখেছ? কেউ তো আসেনি তোমার কাছে!

তুমি দেখতে পাওনি। আমি ওকে স্পষ্ট দেখেছি। আসলে তুমি তো ওকে চেনোই না।

বুলুর কথাগুলো কেমন খাপছাড়া মনে হলো মামনির। ঘাবড়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বাপিও শুনেছেন বুলুর কথা। উনি ঘরে এসে বুলুর পাশে বসে কপালে হাতে রেখে বললেন, তোমার কাছে ও আসবে কি করে? ও যে মারা গেছে। তাছাড়া তুমি তো টিভিতে ওর ছবি দেখেছ। ও তোমাকে চিনবে কি করে?

আমাকে ও ঠিক চিনেছে। আমি যে বুঝতে পেরেছি ওর কত কষ্ট হয়েছে, তাই তো আমার কাছে এসেছিল।

হয়তো তাই বুলু। তুমি ওকে নিয়ে ভেবে ভেবে আর কষ্ট পেও না। উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। তোমাকে গল্প শোনাই। টেনিদার গল্প। তুমি তো নিজেই পছন্দ করে পরশুদিন কিনে নিয়ে এসেছ বুক-ফেয়ার থেকে।

মামনি তাড়াতাড়ি আলমারি থেকে বইটা বের করলেন। বাপি বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বুলুকে বললেন, এই দেখো তোমার টেনিদার কাণ্ড। একসারসাইজ ক্লাবের জন্য টাকা তুলতে ভোরবেলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।— জাগো রে নগরবাসী— ডন দাও, ভাঁজো রে ডামবেল, খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল।

ভালো লাগছে না বুলুর। ঘন ঘন হাই তুলছে। হয়তো ঘুম পেয়েছে। টেনিদা ওর খুব প্রিয়। কিন্তু তার গল্প শুনতেও ওর মন চাইছে না। বারবার মনে পড়ছে ওই মেয়েটার মুখ। ওকি আবার আসবে? কখন আসবে?

মামনি বললেন, রাত হয়েছে। সাড়ে দশটা বাজে। এখন আর গল্প নয়। এবার খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। স্কুল আছে।

গল্প-শোনানো বন্ধ করলেন বাপি। ডাইনিং টেবিলে বসে একটাও কথা বলেনি বুলু। খেতেও তেমন ইচ্ছে করছিল না। খিদে নেই।

বুলু এসে শুলো বিছানায়। মামনি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে এলেন। ঘরের আলো নিভিয়ে পাশে শুতেই বুলু মামনির কোলের কাছে এগিয়ে এল। কেন এমন করছে বুলু? ওকে দুহাতে জড়িয়ে আরো কাছে টেনে নিলেন।

মামনি সারারাত ঠিকমতো ঘুমাতে পারেননি। খুবই আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। ঘুমের মধ্যেই বারবার চোখ মেলে দেখছেন ওকে। রাতে হঠাৎ জেগে উঠে না আবার কোনও অঘটন ঘটিয়ে বসে। একটা অজানা অপরিচিত মেয়ের জন্য কেন ওর এত ভাবনা? অবশ্য সারারাত শান্ত হয়েই ঘুমিয়েছে বুলু। একবারের জন্যও জাগেনি।

ভোরবেলায় মামনি উঠে পড়েছেন। বুলুকে ডাকেননি। ও আরও একটু ঘুমাক। মামনি বুলুর কপালে চুমু দিয়ে বললেন, বড্ড দুষ্টু হয়েছে।

এখন ছটা বাজে। বাপি গেছেন বাজারে। কাগজওয়ালা দোতলায় ওঠে না। কাগজটা পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। বারান্দায় এসে পড়ে। প্রতিদিনের মতো আজও বুলু ঘর থেকে ছুটে গেল বারান্দায় কাগজ কুড়িয়ে আনতে। কাগজ খুলতেই প্রথম পাতায় দেখতে পেলো সেই মেয়েটার ছবি। তাকিয়ে আছে বুলুর দিকে। বলু সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল, মামানি দেখে যাও ওর ছবি। কিন্তু এমন করে ও কাঁদছে কেন?

মামনি এসেই বুলুর হাত থেকে কাগজ কেড়ে নিয়ে বললেন, কে তোমাকে বলেছে এটা ওরই ছবি?

আমি ঠিক জানি মামনি। তুমি ভালো করে দেখো। আমি যে চিনতে পেরেছি।

ওর ছবি হলেই বা তোমার কি? তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। একটু পরেই তো স্কুলের গাড়ি এসে যাবে।

বুলু আর কিছু বলেনি। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মামনি বুঝলেন, বুলুর মনে সত্যিই কত কষ্ট জমে আছে। তবু বললেন, বসে না থেকে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে এসো।

স্কুলের গাড়ি এলো। বুলু চলে গেল স্কুলে। আজ আর বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করতে পারেনি। ক্লাসে বসে জানলা দিয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। বাতাসে ভেসে যাচ্ছে টুকরো টুকরো মেঘ। তাদের গায়ে গায়ে খেলে বেড়াচ্ছে রোদ্দুর। কিন্তু বুলু খুঁজছে সেই মুখ। তবে কি মেঘেরা

ওকে আড়ালে ঢেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে। আর ওকে দেখতে পাবে না বুলু?

স্কুল ছুটি হলে কারো সঙ্গে কথা বলেনি বুলু। বাসে উঠে একপাশে বসে ছিল। বন্ধুরা খুব অবাক হয়েছে। ওরা ভেবেছে বুলু হয়তো বাড়িতে দুষ্টুমি করার জন্য বকুনি খেয়েছে। তাই এত চুপচাপ।

দুপুরে একটু ঘুমোয় বুলু। না ঘুমালে সন্ধে হলেই ঘুম পেয়ে যায়। পড়তে বসে ঢুলতে থাকে। আজ কিন্তু চোখে ঘুম নেই। একবার মনে হলো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে। তারও তো উপায় নেই। মামনি বকাবকি করবেন। তাই চোখ বুজে শুয়ে রইল। ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না কেন? তবে কি সত্যিই ও ভুলে গেছে বুলুকে? তবে ওর কথা ভাববে না বুলু। অভিমান জেগে উঠলো মনে।

রাতে সংবাদ শুনতে টিভি চালিয়েছেন বাপি। যুদ্ধের সংবাদ। আকাশে জঙ্গী বিমান আর বোমাবর্ষণ। নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ছবি টিভির পর্দা জুড়ে। বুলু হাত দিয়ে দু-চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল, টিভি বন্ধ করে দাও বাপি। ওর কান্নাভরা চোখ আমি দেখতে চাই না।

বাপি টিভি বন্ধ করে দিলেন। মামনি বললেন, যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য আর কখনো টিভি চালিও না। এসব ছবি দেখে ওর চোখ-মুখের অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে আমার খুব ভয় করে।

রাতে ঘুমের মধ্যে বুলু দেখতে পেল সেই মেয়েটি মাথার কাছে এসে বসেছে। বুলুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলছে, আমার ছোট্ট ভাইটি, তুমি চোখ মেলে দেখো আমি এসেছি তোমার কাছে। আমাকে তুমি খুঁজেছ সারাদিন ধরে আমি জানি। আমার শরীরটা যে আগুনে একেবারে ঝলসে গেছে। মাঝে মাঝে এত যন্ত্রণা হয়, আমি সহ্য করতে পারি না। ছটফট করি আর চিৎকার করে কাঁদি। বুলুর মাথা কোলে তুলে নিয়ে কপালে চুমু দিল। বুলু বলল, দিদিভাই, তুমি কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়।

আমি জানি। কিন্তু আমি কি করবো বলো। ওরা দায়ী, যারা বিমান থেকে বোমা ফেলে ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে মেরেছে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো দিদিভাই। বুলুকে বলল, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। যদি পারি তো আবার কাল আসবো তোমার কাছে।

চলে গেল। বুলু ছাড়তে চায়নি। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন? বুলু চিৎকার করে উঠল, তুমি চলে যেন না দিদিভাই। আর একটু গল্প করো।

মামনি লাফিয়ে উঠলেন, বুলুর চিৎকারে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেছেই। কি হয়েছে বুলু?

আমার দিদিভাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন মামনি?

মামনি বুঝলেন স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। বললেন, এত রাতে কে আসবে তোমার কাছে? ঘুমিয়ে পড়ো।

বুলু ঘুমাতে পারেনি। খোলা জানলা দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালো। আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারার মেলা। মিটমিটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের বুকে। চারদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ বুলু শুনতে পেল বোমারু বিমানের কান ফাটানো শব্দ। আকাশ, বাতাস, মাটি-পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে চলেছে। আতঙ্কে শিউরে উঠল বুলু। দিদিভাই এখন কোথায়? হয়তো যন্ত্রণায় কাঁদছে। বুলু বালিশে মুখ গুঁজে দিল। তার চোখেও কান্না জমেছে।





আংটির দাগ

পঞ্চানন মালাকর

পাশের ঘরে পেনুমামাকে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে শোনা গেল-হ্যালো। কথা বলছি। কে বলছেন? ও আপনি। তাই নাকি? কখন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না? আচ্ছা। আমি এক্ষুনি বেরোচ্ছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি।

পেনুমামা আসলে আমার ছোটমামা। ভালো নাম পিনাক পানি রুদ্র। সংক্ষেপে লেখে পিনাক রুদ্র। পেশায় ডাক্তার, নেশায় রহস্যভেদী। আমি তার বড়ো ভক্ত। তাই যখনই সুযোগ পাই ছোটমামার কাছে চলে আসি।

এবারও মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে কদিনের জন্যে ছুটি কাটাতে এসেছি। মামা এখানে একাই থাকে। মামার সর্বকাজের লোক ভণ্টে দা রান্না থেকে বাড়ির সব কাজ একাই করে। মামা তার নিজের কাজ নিয়েই পড়ে থাকে।

বসার ঘরে বসে একটা রহস্য কাহিনী পড়ছি। পেনুমামাকে ফোনে কথা বলতে শুনে কান খাড়া হয়ে উঠল। কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। ফোন রেখে পেনুমামা এ ঘরে চলে এল। আমাকে কৌতূহলী দেখে টিপ্পনি কাটল, কী। কুট্টি, গোয়েন্দা। রহস্যের আঁচ পেয়েছ মনে হচ্ছে ?

উত্তরে আমি মৃদু হাসলাম। পেনুমামা ধপাস করে আমার পাশে বসে পড়ল, তা চল । তুমিই না হয় রহস্যের জাল সড়াবে। দেখি কেমন গোয়েন্দা হয়েছ।

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, তা রহস্যটা কি বলবে তো ?

বলছি বৎস। ধীরে। এসব ক্ষেত্রে অত ব্যস্ত হলে চলে না। অধীর আগ্রহ নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। পেনুম.. আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, একটা খুন হয়েছে।

কোথায় ?

দমদমে। এক্ষুনি বেরোতে হবে । চল কুট্টি গোয়েন্দা একবার ঘুরেই আসি। বলেই উঠে পড়ল।

যেতে যেতে সংক্ষেপে পেনুমামা ঘটনাটা বলল। দমদমের এক ধনী ব্যবসায়ী গতরাতে তার ঘরে খুন হয়েছেন। ডাক্তার এবং পুলিশ অফিসার এসে দেখেছেন। গলায় আঙুলের দাগ দেখে অনুমান করছেন কেউ তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে মেরেছে।

ঘটনাস্থলে যেতে মিনিট দশেক সময় লাগল। জায়গাটা আসলে শহরতলীর একটি নির্জন প্রান্ত। এখানে বাড়িঘর তেমন গড়ে ওঠেনি।

বাড়িটা বেশ রুচি সম্পন্ন। আধুনিক কায়দায় তৈরি। সামনেই লন। লন শেষ করে গাড়ি বারান্দা। কিছু ইউক্যালিপটাস গাছে বাড়িটিকে সুন্দর লাগছে। গেটের সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গেটের পাশে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার পাশে কিছু কৌতূহলী লোক এসে জড়ো হয়েছে। পেনুমামা পুলিশের কাছে পরিচয় দিতেই আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিল।

বসার ঘরে থানার ও.সি, পেনুমামার চেনা বয়স্ক ডাক্তার গুহ ও একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। পেনুমামাকে দেখে ডাঃ গুহ বলে উঠলেন, এই তো পিনাক এসে গেছে।

থানার ও সি পেনুমামাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, আরে, আসুন ডঃ রুদ্র। আপনার জন্যেই বসে আছি। আপনি আসছেন শুনে একটু নিশ্চিন্ত হলাম।

পেনুমামা উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে বলল, এ আমার ভাগ্নে। এখন আমার সহকারী।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। আমি চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। পেনুমামা ও. সিকে বলল, চলুন আগে দেখে আসি।

বেশ তাই চলুন। ও.সি মি. দাস উঠলেন, আপনারা একটু বসুন। আমরা আসছি।

পেনুমামা আমাকে বলল, আয়রে ফটকে।

আমরা তিনজনে মৃতের ঘরে এলাম। ঘরের সামনে একজন কনেস্টবল বসে আছে। বেশ বড় ঘর। একপাশে বিশাল খাট। খাটের ওপরে আস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পড়ে আছেন বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিছানা এলোমেলো, মনে হয় মরার আছে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে।

পেনুমামা প্রথমে মৃত অবনীবাবুকে খুঁটিয়ে দেখল। মি. দাস ঘরের অন্যদিকটা আর একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখছিলেন। পেনুমামা মৃতের ওপরে ঝুঁকে কি যেন দেখছিলেন। তারপরেই পকেট থেকে রুমাল বের করে মৃতের ডান হাতের আঙুলের ফাঁক থেকে কি একটা তুলে নিল।

রুমালটা জড়িয়ে পকেটে রেখে ঘরটা ঘুরে দেখল। ঘরের এক কোণে একটি টি-টেবিল ঘিরে চারটি সোফা-চেয়ার। টেবিলে একটা অ্যাসট্রেও রয়েছে। তাতে কিছু সিগারেটের পোড়া অংশের, একটা চুরুটের পোড়া টুকরোও রয়েছে।

পেনুমামা এবার কথা বলল, আচ্ছা মি. দাস। কাল রাতে-এ বাড়িতে কে কে ছিল?

মি. দাস বললেন, অবনীবাবু ছাড়া বাড়িতে তার সব সময়ের চাকর কৃষ্ণপদ আর সেক্রেটারি সোমনাথ সাহা থাকে। কাল এরা দুজন কেউই ছিল না। কৃষ্ণপদ সকালে ফিরেছে। এসেই ডাক্তার গুহকে এবং থানায় খবর দিয়েছে।

আর সেক্রেটারি?

এখনো ফেরেনি।

কোথায় গেছে জানতে পেরেছেন?

না। তবে কৃষ্ণপদ বলল, গতকাল অবনীবাবুই তাকে কোথায় যেন কাজে পাঠিয়েছেন।

ও! পেনুমামা কি যেন ভাবল খানিক। তারপর বলল, আচ্ছা মি. দাস। অবনী বাবুর আর কে আছে?

ছেলে আছে শুনলাম। একমাত্র ছেলে। সে তো এখন বিদেশে। স্ত্রী বছর সাতেক হল মারা গেছেন। একাই থাকতেন। ছেলের সঙ্গেও নাকি বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই।

ঠিক আছে। আমরা এ ঘরেই বসছি। আপনি কৃষ্ণপদকে একবার ডাকুন। ওকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করি।

মিঃ দাস বেরিয়ে গিয়ে কৃষ্ণপদকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরেই ঘরে ঢুকল বছর চল্লিশ বয়সের একটি লোক। পেনুমামা কৃষ্ণপদকে আপাদমস্তক দেখল। পরনে খাটো ধুতি। গায়ে একটা ফতুয়া ধরনের জামা। গায়ের রঙ কালো। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। মুখটা শুকিয়ে গেছে। একটু ভয়ও পেয়েছে মনে হল।

তুমি এ বাড়িতে কত বছর কাজ করছ?

দশ বছর হুজুর।

কি কি কাজ কর?

আজ্ঞে আমি বাবুর রান্না থেকে সব কাজই করি। শুধু বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করার একজন ঠিকে ঝি আছে।

সে আসেনি আজ?

এসেছিল। পুলিশ দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

কাল তুমি ছিলে না কেন?

খবর এসেছিল ছেলেটার জ্বর ; তাই কাল রাতে বাবুকে বলে বাড়িতে গিয়েছিলাম ছেলেকে দেখতে।

তোমার বাড়ি কোথায়?

মধ্যমগ্রাম।

কখন গিয়েছিলে?

কাল রাত নটা পঞ্চাশের ট্রেনে।

এখান থেকে কটায় বেরিয়েছিলে?

সাড়ে নটা নাগাদ।

আচ্ছা কৃষ্ণপদ, তুমি যাওয়ার আগে অবনীবাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

হ্যাঁ। এসেছিলেন।

কে?

সন্ধে নাগাদ উকিল বাবু; তারপর লাহিড়ি বাবু।

তারা কখন চলে যান?

উকিল বাবুতো বাবুর সঙ্গে আর লাহিড়ি বাবুর সঙ্গে কি কাগজপত্র নিয়ে কথাবার্তা বলে সাড়ে সাতটা নাগাদ চলে যান।

আর লাহিড়ি বাবু?

তা আজ্ঞে আমার তো ঠিক সময়টা মনে নেই। হয়তো সাড়ে আটটা হবে। আসলে—

কি কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল কৃষ্ণপদ। পেনুমামা তাকে থামতে দেখে বলল, আসলে কী—

লাহিড়িবাবু আমাকে সিগ্রেট কিনে আনতে টাকা দিলেন। আমি দোকান থেকে ফিরে দেখি উনি চলে গেছেন।

ও! তা সে সিগারেটের প্যাকেট তুমি কি করলে?

আমি বাবুকে এসে বলতে, উনি টেবিলে রেখে যেতে বললেন। তাই করলাম।

পেনুমামা মি. দাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, এ ঘরে কোনো সিগারেটের প্যাকেট ছিল?

না! না তো। মি. দাসের উত্তর শুনে পেনুমামা কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মনিব সিগারেট খেতেন?

আজ্ঞে না! বাবুর কোনো নেশা ছিল না। ও! পেনুমামা কি ভেবে বলল, তা হলে সে সিগারেটের প্যাকেট কি পরে এসে লাহিড়িবাবু নিয়ে গেছিলেন?

তা বলতে পারবো না বাবু।

বেশ। অ্যাসট্রের দিকে চোখ রেখে পেনুমামা প্রশ্ন করে, অবনীবাবুর পরিচিত কেউ চুরুট খান?

হ্যাঁ। বাবুর বন্ধু উকিল বাবু খান।

ঠিক আছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পেনুমামা বলল, আজ সকালে তুমি কখন ফিরে এলে?

সকাল সাতটায়।

তুমি কি অবনীবাবুকে মৃত অবস্থায় প্রথম দেখ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার মানে এ বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি তোমার কাছে ছিল?

হ্যাঁ বাবু।

দেখা মাত্রই কি পুলিশে খবর দিয়েছ?

না বাবু। আমি ডাক্তার বাবুকে ফোনে খবর দি। ডাক্তার বাবুর ফোন নম্বরটাই আমি জানি। বাবুর শরীর খারাপ হলে বাবু মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করতে বলত।

থানায় কে খবর দেয়?

ডাক্তারবাবু এসে দেখেই থানায় খবর দিলেন।

আচ্ছা! তুমি এবার যেতে পারো।

কৃষ্ণপদ চলে যাবার পরে পেনুমামা উঠে দাঁড়াল। বলল, চলুন মি. দাস। বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

আমরা ঘর থেকে বাইরে আসতেই দেখলাম সদর দরজা দিয়ে হাতে ঝোলানো একটি ব্যাগ নিয়ে বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন মুখে বাড়িতে ঢুকলেন। পুলিশ দেখে কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হল। দিশেহারা মানুষের মত প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার, কি হয়েছে?

ও.সি.মি দাস উল্টে প্রশ্ন করলেন, আপনি! আপনি কে?

আমার নাম সোমনাথ সাহা।

ওঃ আপনিই সোমনাথ বাবু? জানেন আপনার মনিব কাল রাতে খুন হয়েছেন।

সে কি? গলা কেঁপে গেল সোমনাথ বাবুর। অসহায় ভঙ্গিতে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অস্বাভাবিক এলোমেলো স্বরে প্রশ্ন করলেন, কখন? কিভাবে?

এবার পেনুমামা এগিয়ে গেল। বলল, সবই জানতে পারবেন। তার আগে আপনাকে কটা প্রশ্ন করতে চাই।

সোমনাথবাবু পেনুমামার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। মি. দাস বললেন, ইনি পিনাকি রুদ্র! অবনী বাবুর খুনের তদন্ত করছেন।

নমস্কার। সোমনাথ বাবুর চোখে কেমন তাচ্ছিল্য মেশানো দৃষ্টি, আপনি ডিটেকটিভ?

না! আমি রহস্যের জট খোলার কাজ করি। আর সেজন্যই আপনারও একটা জবানবন্দী নেওয়া দরকার।

কিন্তু আমি তো কাল থেকে ছিলামই না। কিছুই জানি না।

সে জানি। তবুও এসব ক্ষেত্রে সকলের সাহায্যের দরকার হয়। বিশেষ করে আপনি যখন অবনীবাবুর সেক্রেটারি। আপনার কাছ থেকে তার বিষয়ে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

বেশ বলুন কি জানতে চান?

আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? কে খুন করতে পারে?

আমি কি করে বলব? আমি তার ব্যবসায়ের কাজে সাহায্য করি। ব্যক্তিগত বিষয়ে তো কিছু জানি না।

ধরুন তাঁর খুনের পেছনে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো শত্রুতা যদি কারো সঙ্গে থেকে থাকে।

না! তাঁর সঙ্গে কারো শত্রুতা ছিল বলে আমার জানা নেই। স্যার ছিলেন খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ।

পেনুমামা তাঁকে প্রশ্ন করল, আপনি কত বছর অবনীবাবুর কাছে কাজ

তা প্রায় সাত বছর।

গতকাল আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

স্যার আমাকে ব্যবসার কাজে কৃষ্ণনগর পাঠিয়েছিলেন।

কখন ফিরলেন?

আমি তো এখন সেখান থেকেই আসছি।

ও, আচ্ছা! কৃষ্ণনগর থেকে কটার ট্রেন ধরেছেন?

ভোর পাঁচটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন।

কথা বলতে বলতে পেনুমামা সোমনাথবাবুকে ভালো করে দেখছিল। পেনুমামা যে কোনো মানুষকে এভাবে দেখেই বুঝতে চেষ্টা করে মানুষটি কেমন প্রকৃতির হতে পারে। আরো কয়েকটা মামুলি প্রশ্নের পরে বলল, ঠিক আছে। পরে দরকার হলে আবার কথা বলব। কথা শেষ করে মি. দাসকে বলল, এখন আমাদের জানতে হবে অবনীবাবুর ঘরে কারা এসেছিলেন।

কিছু মনে করবেন না। আমি কিছু কথা বলতে চাই। ডাক্তার গুহর পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক কথা বললেন, আসলে আমি নিজেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। তাই নিজে থেকেই কথাটা জানাতে চাই।

পেনুমামা ভদ্রলোকের দিকে ফিরল। আমরাও কৌতূহলী হলাম। ভদ্রলোকের বয়সও অবনীবাবুর কাছাকাছিই হবে। মাথার চুল সাদা। ফর্সা রঙ। স্বাস্থ্য একটু রোগাটে ধরনের। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম প্রিয়তোষ ঘোষ। আমি অবনীর বন্ধুও বটে; আবার ওর আইনজীবীও বটে।

বলুন কি বলতে চান? পেনুমামা একটা চেয়ার টেনে বসল।

প্রিয়তোষ বাবু বললেন, গতকাল রাতে অবনীর ঘরে আমি এবং লাহিড়ি দুজনেই ছিলাম। ওর একটা নতুন ব্যবসার জন্যে সন্ধে নাগাদ একটা ডিড

করি। লাহিড়ি এবং অবনী পার্টনারশিপে একটা কারখানা করতে চায়। সেজন্য গতকাল ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা তুলেছিল অবনী। আজ ওদের জমি রেজিস্ট্রি করার কথা। অবনী আর লাহিড়ি দুজনেরই আসানসোল যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালে যে এভাবে ওর মৃত্যু সংবাদ পাব ভাবিনি।

আপনি কি করে জানতে পারলেন?

আমি তো এ পাড়াতেই থাকি। সকালে আমার বাড়ির কাজের মেয়েটির কাছে খবর পেয়েই ছুটে এলাম।

ও! পেনুমামা বলল, লাহিড়ি বাবুর সঙ্গে অবনীবাবুর আসানসোল যাওয়ার কথা ছিল। অথচ আজ লাহিড়িবাবু অবনীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। আশ্চর্য তো!

আমিও তাই ভাবছি। প্রিয়ব্রত বললেন, আমি খবরটা পেয়ে ওর বাড়িতে ফোন করেছিলাম কিন্তু লাহিড়ি বাড়িতে নেই। ভোরবেলা বাইরে চলে গেছে।

সে কি? পেনুমামার ভ্রূকুঁচকে গেল। মি. দাসকে বলল, লাহিড়িবাবু ফিরলে একটু খবর নেবেন তো। দরকার হলে আমাকেও জানাবেন।

আচ্ছ মি. ঘোষ, ডিড করার পর আপনারা মানে, আপনি ও লাহিড়ি কখন চলে যান?

সে তো সন্ধেবেলা। আমি সাড়ে সাতটা নাগাদ চলে যাই। অবনী আবার রাতে আসতে বলে। তাই রাত দশটা নাগাদ এসেছিলাম। লাহিড়িও এসেছিলেন। তিনজন বসে একটু আড্ডা দিয়েছিলাম।

রাতে কখন চলে যান?

আমি পৌনে বারোটা নাগাদ। লাহিড়ি আমার পরে—কখন তা বলতে পারব না।

ঠিক আছে। আপাতত আর কিছু জানার নেই। এবার চলুন মি. দাস ঘরগুলি একটু ঘুরে দেখে আসি।

প্রথমে আমরা গেলাম কৃষ্ণপদর ঘরে। ঘরটা রান্নাঘরের পাশেই। ছোট্ট ঘর। একটা তক্তোপোষ পাতা। এক পাশে দড়িতে তার জামা কাপড় ঝোলানো। পেনুমামা ঘুরে ঘুরে সব দেখল। কৃষ্ণপদ অপরাধীর মত পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণপদর ঘর দেখে ফিরে এসে পেনুমামা সোমনাথবাবুকে বলল, সোমনাথবাবু, আপনার ঘরটা একটু দেখব।

আমার ঘর? সন্দিগ্ধ চোখে সোমনাথবাবু পেনুমামার প্রশ্নে কেমন অবাক হয়। পরমুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে, বেশ চলুন। ব্যাগটা হাতে তুলে নেন।

সোমনাথ বাবুর ঘর বাড়ির পশ্চিম কোণে বারান্দার শেষ প্রান্তে। ল্যাচ-কী খুলে দিলেন সোমনাথবাবু। আমরা ঘরে ঢুকলাম। ঘরটি মোটামুটি বড়ই; তবে ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা চৌকিতে বিছানা পাতা। একপাশে একটা আলনা। দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। তার পাশেই টয়লেট। পেনুমামা টয়লেটের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে আবার বন্ধ করে দিল। সোমনাথ বাবু ব্যাগ হাতে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পেনুমামা বলল, আরে। আপনি বাইরে থেকে এসেছেন। এবার ফ্রেশ হয়ে নিন। বলতে বলতে চলে গেল ঘরের পশ্চিম দেয়ালের কাছে। সেখানে একটা দরজা। বন্ধ। দরজাটার দিকে চেয়ে পেনুমামা বলল, এ দরজাটা কি বন্ধই থাকে?

হ্যাঁ! ওটা বন্ধই থাকে। ব্যবহার করা হয় না।

এটা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়?

হ্যাঁ। বাইরের বাগানে যাওয়া যায়। তবে আমার দরকার হয় না। বহুদিন ধরে বন্ধ আছে।

দরজাটা খুঁটিয়ে দেখে পেনুমামা প্রশ্ন করল, বলুন তো সোমনাথ বাবু, দরজাটা কি কাঠের তৈরি?

কাঠের!

হ্যাঁ। পেনুমামার প্রশ্ন শুনে সোমনাথবাবুর মতো আমিও অবাক হলাম। এসেছে খুনের তদন্ত করতে, আর জানতে চাইছে দরজাটা কি কাঠের তৈরি। সোমনাথ বাবু বললেন, তা তো বলতে পারছি না।

ঠিক আছে। চলি। বলেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমরাও বাইরে এলাম। তদন্তের কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ করে পেনুমামা বসার ঘরে এসে ডাঃ গুহকে বলল, চলুন কাকাবাবু। আমাদের আর থাকার দরকার নেই। এবার বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার আগে আর পেনুমামার সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগ হল না। এর মধ্যে একবার হাসপাতাল ঘুরে এসেছে। খাবার টেবিলে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। মুখ দেখেই বুঝলাম কিছু ভাবছে। এ সময়ে কথা বলে রেগে যায় খুব। চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লাম। খাওয়া দাওয়ার পরে একটা বই নিয়ে বাইরের ঘরে সোফায় গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। দেখলাম পেনুমামা তৈরি হয়ে কোথায় বেরুচ্ছে। আমাকে বলল, আমি একটু বেরুচ্ছিরে ফটকে।

কোথায় যাচ্ছ?

এই একটু কাজ আছে। জবাবটা এড়িয়ে গেল বুঝলাম। আমার কৌতূহল আন্দাজ করে মনে হয় শেষে বলল, একবার থানায় মি. দাসের সঙ্গে দেখা করব। ফিরতে রাত হবে। রাতে কথা বলব।

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল পেনুমামা। আমি কিছুক্ষণ অবনীবাবুর খুনের ঘটনা নিয়ে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল চারটে নাগাদ। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। পরীক্ষার তাড়া থাকায় অনেকদিন দুপুরে এমন ঘুমুইনি। চোখে মুখে জল দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসলাম। মাথার ভেতরে অবনীবাবুর ঘটনাটাই ঘুরছিল। কে খুন করতে পারে। যে-ই করুক। জানাশোনা কেউ। গতকাল রাতে একা পেয়ে খুন করেছে। মোটিভ কি ? একটা মোটিভ মনে হয় বোঝা যাচ্ছে। প্রিয়তোষবাবু বলেছিলেন, গত কাল ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা তুলেছিলেন। সে টাকার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। আলমারি খুলে দেখা গেছে সেখানে কোনো টাকা নেই, তার মানে টাকাটার জন্যে খুন হলেন অবনীবাবু। কিন্তু টাকার কথা কে কে জানতেন। প্রিয়তোষ বাবু, অবনীবাবুর বন্ধু কিরণ লাহিড়ি ? সোমনাথ বাবু জানতেন কি ? অবশ্য সোমনাথ তো বাইরে গিয়েছিলেন। কিছুই মাথায় আসছে না। খুনি বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে খুন করেছে বোঝা যাচ্ছে। কোনো প্রমাণই খুনি রেখে যায়নি। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে কিরণ লাহিড়িকে। গতকাল রাতে কিরণ লাহিড়ি অবনীবাবুর কাছে এসেছিলেন। এদিকে সকালেই তিনি কোথায় চলে গেছেন। অবনীবাবুর আলমারির টাকাও উধাও। কিন্তু প্রমাণ না পেলে তো কাউকে দোষী বলা ঠিক নয়। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, কৃষ্ণপদ বা সোমনাথবাবু রাতের অন্ধকারে ফিরে এসে কাজ হাসিল করে চলে গেছে। ওদের পক্ষে সুবিধা, বাড়ির চাবির ডুপ্লিকেট দুজনের কাছেই থাকে। কিন্তু সেখানেও তো প্রমাণ করতে হবে। নাহ্, এভাবে উল্টোপাল্টা ভেবে কিছু হবে না। পেনুমামা না ফিরলে কিছু উদ্ধার সম্ভব নয়। ও.সি-র সঙ্গে কথা বলে পেনুমামা যদি নতুন কোনো সূত্র পায় তাহলে ভাবনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

পেনুমামা ফিরল রাত সাড়ে নটায়। এসেই পোশাক ছেড়ে টয়লেটে ঢুকল। কোনো কথা বলার সুযোগই পেলাম না। অবশ্য সুযোগ পেলেও কোনো লাভ হত না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনো সমাধান সূত্রই পায়নি।

কারো সঙ্গেই তেমন কথা না বলে রাতের খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে চুপি চুপি পেনুমামার ঘরে ঢুকলাম। দেখি খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল। কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসল। বলল, আয়রে ফটকে।

পেনুমামাব পড়ার টেবিলে সামনের চেয়ারটায় বসলাম। কিছু জিজ্ঞেস কবতে সাহস হল না। পেনুমামাকে ভালো করেই চিনি। নিজের থেকে কিছু না বললে শত প্রশ্ন করেও কিছু জানা যাবে না। উল্টে রেগে যাবে। সিগারেট টানতে টানতে পেনুমামা আবার চিন্তায় ডুবে গেল। বসে বসে ভাবছি, কি এমন জটিল চিন্তায় ডুবে আছে পেনুমামা। কিছুক্ষণ পরে সিগারেট শেষ করে কথা বলল, বুঝলি ফটকে। কেসটা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে। থানায় খোঁজ নিয়ে জানলাম অবনীবাবুর বন্ধু লাহিড়ির আচরণটাই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। লাহিড়ি একা কোথায় চলে গেছে আর এখনো ফিরে আসেনি।

আমারও লাহিড়িকেই সন্দেহ হচ্ছে পেনুমামা।

কিন্তু সন্দেহ হলে তো কিছু করা যাবে না। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ফরেনসিক রিপোর্টে যদি কোনো সূত্র মেলে তবে এগোতে সুবিধা হবে। অবশ্য কিরণ লাহিড়িকে একবার জেরা করার দরকার। মি. দাসকে বলে এলাম, লাহিড়ি ফিরলে যেন আমাকে খবর দেন।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ থানা থেকে ফোন এল। মি. দাস জানালেন, গতকাল রাতে কিরণ লাহিড়ি ফিরেছেন। একটু পরেই তাকে নিয়ে হাজির হচ্ছেন জানিয়ে দিলেন। পেনুমামা আমাকে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে বলে নিজের ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকল। বলে গেল, ওরা এলে যেন ওকে ডেকে দি।

খুব বেশি সময় হল না। মি. দাস একজন দীর্ঘদেহী ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকলেন। বয়স অবনীবাবুর মতোই হবে। দেখে মনে হল বেশ শক্ত সমর্থ। ফর্সা লোমস হাতে একটা কালো দামী ঘড়ি চোখ কেড়ে নেয়। তাদের ঘরে বসতে বললাম। মি. দাস বললেন, তোমার মামা কোথায়?

ল্যাবরেটারিতে কি করছে যেন। বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি। আমি মামার ছোট্ট গবেষণা ঘরে উঁকি দিতেই বলল, এসে গেছে। চল। বলেই বাঁ হাতে কি একটা তরল পদার্থ মেখে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বসার ঘরে ঢুকতেই মি. দাস বললেন, আসুন। পরিচয় করিয়ে দি। ইনি মিঃ কিরণ লাহিড়ি; মৃত অবনীবাবুর বন্ধু। মি. লাহিড়ি উঠে হাত জোড় করে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন, পেনুমামা প্রতি নমস্কারের দিকে না গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। কিবণবাবুও নমস্কার নামিয়ে হাত বাড়ালেন। পেনুমামা ডানহাতে সেক্‌হ্যাণ্ড করতে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ওর ডানহাতের কব্জিটা চেপে ধরল। ধরেই একটা ভুল হয়েছে এমন একটা ভাব করে বলল, এই যাঃ; আপনার হাতে একটা লোশন লেগে গেল। দাঁড়ান মুছে দিচ্ছি। বলে পকেট

থেকে তার আনকোরা সাদা রুমালটা বের করে কিরণবাবুর হাতের কব্জিটা মুছিয়ে দিল। এমন ভাবে মোছালো, যেন কিছু একটা কাজ থেকে তুলে নিল। আমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম দু'তিনটি হাতের লোম রুমালের সঙ্গে উঠে এল।

কিরণবাবুকে বসতে বলে উল্টোদিকের সোফায় বসে পেনুমামা তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, অবনীবাবুর এই আনফরচুনেট মার্ডার হওয়ার কথা তিনি রাতে এসে জানতে পারেন। তিনি ভাবতেই পারছেন না। আগের রাতে তিনি এবং প্রিয়তোষ অবনীবাবুর ঘরে বসে আড্ডা দিয়েছেন। পরদিন ভোরে তাদের নতুন কারখানার জন্য জমির ব্যাপারে কথা বলতে বাইরে চলে যান। এসে খবর পেলেন—এই ঘটনা।

কিন্তু, শুনলাম আপনার সঙ্গে অবনীবাবুরও যাওয়ার কথা ছিল?

পেনুমামার প্রশ্নে সায় দিলেন তিনি, হ্যাঁ। সেই রকম কথাই ছিল। কিন্তু আমি রাতে যখন ওর বাড়ি থেকে চলে আসি তখন ঠিক হয়, জমিটা এখন কেনা হচ্ছে না। সে জন্য অবনী যাবে না; আমি গিয়ে জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে পিছিয়ে আসব। তাই একা গিয়েছিলাম।

পেনুমামা বলল, অবনীবাবু মারা যাবার আগের দিন ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা তুলেছিলেন। আপনি এবং প্রিয়তোষবাবু ছাড়া কে জানে সে কথা?

সোমনাথ জানে। সে-ই তো অবনীর সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল।

টাকাটা কি জন্য তোলা হয়?

কারখানার জমি কেনার জন্য।

জমি যখন কেনা হচ্ছে না, তখন টাকাটা নিয়ে কি করলেন অবনীবাবু?

পরের দিনই ব্যাঙ্কে জমা দেবে বলেছিল।

কিন্তু সে সুযোগ তিনি পাননি। টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না।

কিরণ লাহিড়ি গলায় জোর এনে বললেন, তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে খুনিই টাকাটা নিয়ে গেছে।

তাই তো মনে হচ্ছে। পেনুমামা লাহিড়িবাবুকে প্রশ্ন করল, কাল রাতে আপনি কখন চলে যান?

আমি রাত আটটা নাগাদ বাড়ি যাই। অবনী অনুরোধ করে তাই পরে আবার এসে আড্ডা দিয়ে যাই।

কখন শেষবার যান?

রাত সাড়ে এগারোটার পরে।

প্রিয়তোষ বাবু কখন যান?

প্রিয়তোষ চলে যায় সাড়ে দশটা নাগাদ।

ঠিক আছে। এখন আর নয়। পরে দরকার হলে জানাব।

ওরা চলে যেতেই পেনুমামা আবার তার গবেষণা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সারাদিন ধরে পেনুমামা কি সব কাজে খুব ব্যস্ত থাকল। সকালের কাগজ পড়ার সময় পেল না। রাতে খাওয়ার পরে কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা খবর দেখে বলল, আরে এ কি?

আমি চোখ তুললাম, কি হল?

এই দেখ না। ট্রেনে চালের বস্তা তুলতে দেয়নি বলে গতকাল সকালে চাল পাচারকারিরা কৃষ্ণনগরে ট্রেন লাইন অবরোধ করে রাখে।

এ তো প্রায়ই হচ্ছে। সামান্য কারণে ট্রেন অবরোধ করা তো প্রত্যেক দিনেরই কাজ।

দেশটার হল কি।

আমি ওসব কথায় তেমন উৎসাহ পেলাম না। অবনীবাবুর খুনের কিনারা কিছু করতে পারলে?

না রে? সবাই সত্য কথা বলছে না। কেউ কেউ কিছু গোপন করছে তাতেই জটটা আরো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে মনে হয় একটা রাস্তা এবার পেয়ে গেছি।

তাই! সাগ্রহে বললাম, তা হলে কালই খুনি ধরা পড়বে?

না। কাল নয়। পেনুমামা বলল, কাল আমি সকালে একটু বাইরে যাব। ফিরে এসে বলতে পারব। কারণ খুনের ব্যাপারে এখনো একটু কুয়াশা রয়েছে। ওটা আশা করি কালকের মধ্যে হয়ে যাবে।

আর কথা হল না। বুঝলাম আরও একটা দিন ধৈর্য করে থাকতেই হবে।

সকাল বেলা পেনুমামা তৈরি হয়ে বেরুতে যাবে; এমন সময় দেখেতে পেল সোমনাথবাবু আসছে। তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটারির দিকে পা বাঁড়িয়ে বলল, সোমনাথবাবু আসছেন। তুই ঘরে বসাবি। আমি আসছি।

আমি আদেশ পালন করলাম। একটু পরে পেনুমামা ঘরে এল। সোমনাথবাবু তাকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই উচ্ছ্বল আতিশয্যে পেনুমামা ডানহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, আরে সোমনাথবাবু। এবারও ডানহাতে সেক্‌হ্যান্ড করার সুযোগে বাঁ হাতে সোমনাথবাবুর ডানহাতের কব্জি চেপে ধরে ভুল হয়েছে এমন ভাব করে বলল, এ হে-হে। আপনার হাতে একটা লোশন লেগে গেল। দাঁড়ান মুছিয়ে দিচ্ছি।

বলেই পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে হাতের কব্জি মোছার সুযোগে কয়েকগোছা লোম রুমালে তুলে নিল। রুমালটা পকেটে পুরতে পুরতে বলল, তারপর এত ভোরে কি মনে করে'?

আপনাকে দুটি কথা বলতে এলাম।

কি কথা'?

কিরণ লাহিড়ির বিষয়ে একটু নজর রাখবেন। আমার বিশ্বাস অবনীবাবুর টাকাটার লোভেই----

তাই নাকি। পেনুমামা একটা নকল ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলল, এ বিষয়ে বলে আপনি সত্যিই খুব উপকাব করলেন। মনে হচ্ছে কেসটা সহজ হয়ে এল। ঠিক আছে। আসা কবি দু'একদিনের মধ্যেই খুনিকে বের করব। আপনার ইনফরমেশনের জন্য ধন্যবাদ।

আমি তাহলে চলি।

আচ্ছা। আসুন।

সোমনাথবাবুকে বিদায় দিয়ে আর দেরি করল না পেনুমামা। রাতে ফিরবে বলে বেরিয়ে পড়ল।

অনেক বাতে বাড়ি ফবে পেনুমামা ও. সি. কে ফোন করল। পরদিন সন্ধ্যায় অবনীবাবুর বাড়িতেই সবাইকে হাজির থাকতে বলল। খুনের কিনারা হয়ে গেছে বুঝলাম।

আমবা যখন অবনী বাবুর বাড়ি পৌঁছুলাম তখন অন্য সকলেই এসে গেছেন। ও. সি, মি. দাস. প্রিয়তোষবাবু, কিরণ লাহিড়ি। ডাঃ গুহকে খবব দিয়েছিল, তিনিও এসেছেন। সোমনাথবাবু আর কৃষ্ণপদ তো রয়েছেই। বাইরে পুলিশের গাড়িতে দুজন ; ঘরের দরজায় দুজন কনস্টবল মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা গিয়ে বসতেই মি. দাস বললেন, সবাই এসে গেছে। এবার বলুন কে খুন করেছে ; হাতকড়াটা পরিয়ে নিয়ে যাই।

পেনুমামা মৃদু হাসল, বলছি-বলছি। ঘটনাটা না বললে কেস সাজাবেন কি করে'?

বেশ বলুন।

পেনুমামা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা সবাই আছেন। কি করে অবনীবাবু খুন হয়েছেন জানতে আগ্রহ হচ্ছে নিশ্চয়। অবশ্য একজন বাদে। তিনিই জানেন কি ভাবে মারা হয়েছে অবনীবাবুকে। তিনি ইচ্ছে করলে স্বীকার করতে পারেন।

কেউ কোনো কথা বলল না। এ-ওর মুখেব দিকে চেয়ে দেখছিল। ঘবের

মধ্যে কোনো শব্দ নেই। পেনুমামা নীরবতা ভঙ্গ করল। বেশ তাহলে আমাকেই বলতে হচ্ছে। শুনুন—

যেদিন অবনীবাবু খুন হন সেদিন তার ঘরে এসেছিলেন প্রিয়তোষবাবু এবং কিরণবাবু। রাতে তারা এক সঙ্গে বসে আড্ডা দেন। প্রিয়তোষ বাবুর চুরুটের পোড়া টুকরো আর লাহিড়িবাবুর সিগারেটের টুকরো সেকথা বলে। অথচ অবনীবাবুকে গলা টিপে মারা হলেও, তার গলায় আঙুলের দাগ পাওয়া গেলেও কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি। খুনি হাতে পাতলা গ্লাভস পরে নিয়েছিলেন। মজার বিষয় ; খুনি কোথাও কোনো প্রমাণ রেখে যাননি।

বলে পেনুমামা সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সবার চোখেই সমান উৎকণ্ঠা। পেনুমামা বলল, খুনের ক্ষেত্রে একটা মোটিভ থাকে। এ ক্ষেত্রেও আছে। খুন হওয়ার আগের দিন অবনীবাবু ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা তোলেন। তাদের নতুন কারখানার জমি কেনার জন্য। পরের দিন ভোরে টাকা নিয়ে অবনীবাবু এবং কিরণবাবুর আসানসোল যাওয়ার কথা। কিন্তু রাতের বেলা তাদের প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা হয়। ঠিক হয় অবনীবাবু যাবেন না, লাহিড়ি একা গিয়ে রেজিস্ট্রির দিনটা পিছিয়ে আসবেন। মি. লাহিড়ি! আমি ঠিক বলছি তো?

হ্যাঁ ঠিকই।

কিন্তু আপনি একটু মিথ্যা কথা বলেছেন। পেনুমামা লাহিড়িকে বলল, সেদিন আপনি টাকাটা নিয়েই আসানসোলে জমি রেজিস্ট্রি করতেই গিয়েছিলেন।

মিথ্যা কেন হবে? জমি রেজিস্ট্রি হয়নি আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

খোঁজ নিয়েছি মি. লাহিড়ি। পেনুমামার কণ্ঠ কঠিন শোনাল, জমি রেজিস্ট্রি হয়নি অন্য কারণে। জমির মালিকের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাই তারাই রেজিস্ট্রির দিন পিছিয়ে দেয়। আপনি টাকাটা আসানসোলের একটি ব্যাঙ্কে আপনারই নামে জমা দিয়ে চলে আসেন। ফিরে এসে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। কারণ আপনি টাকা নিয়েছেন সে কথা তো অবনীবাবু ছাড়া আর কেউ জানেন না। ঠিক বলছি তো?

গলা শুকিয়ে গেছে মি. লাহিড়ির। আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ-মানে -না! ইয়ে-মানে একথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন এর সঙ্গে খুনের কোনো সম্পর্ক নেই।

বেশ আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম। পেনুমামা বলল, খুনি অবনীবাবুকে

খুব সাবধানে খুন করলেও একটা চিহ্ন থেকে গেছে। অবনীবাবুর ডান হাতের অনামিকায় একটা মোটা ঘোড়ার নালের আংটি ছিল। আংটিটা পিটিয়ে তৈরি। তেমনভাবে তার জোড়টা মেশেনি। তার জোড়ের জায়গায় একটা ফাটল ছিল। খুনি যখন পেছন থেকে এসে তাঁর গলা টিপে ধরে তখন তিনি বাঁচার তাগিদে দুহাত দিয়ে খুনির দুহাতের কব্জি চেপে ধরেন। একটু ধ্বস্তাধস্তি হয়। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার আশায় তাঁর হাতের আংটি এত জোরে চেপে বসে যে খুনির কব্জিতে একটা কালসিটে দাগ পড়ে যায়। আর আংটির জোড়ের ফাঁকে লেগে থাকে দুটি ছোট্ট লোম। সে লোম আমি ফরেনসিকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করাই। মি. লাহিড়ি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে; আমার বাড়িতে আপনার কব্জিতে ভুল করে একটা লোশন লেগে গেলে রুমালে মুছিয়ে দিয়েছিলাম। রুমালে আপনার হাতের লোমের নমুনা নিয়েছিলাম।

কিরণ লাহিড়ি অসহায় হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, -আ-আ-মা-মার হাতের লোম। কিন্তু আমার হাতে আংটির দাগ— আমি কিছু ভাবতে পারছি না। হতাশ হয়ে বসে পড়েন তিনি।

না। আপনার হাতের কব্জিতে কোনো আংটির দাগ পাওয়ার কথা নয়। কারণ খুনের প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পরে এ ধরনের দাগ থাকার কথা নয়। অবশ্য আপনার হাতের লোম পরীক্ষা করে খুনির লোমের সঙ্গে মেলেনি। মিলেছে আমি যার কব্জিতে একটা ছোট্ট কালসিটে দাগ দেখেছিলাম বলেই সোমনাথবাবুর দিকে গিয়ে পেনুমামা বলল, কি বলেন সোমনাথ বাবু! আপনার হাতে একটা কালসিটে দাগ দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে?

সোমনাথবাবু রুক্ষস্বরে বললেন, কি আবোল তাবোল বলছেন। আমি তো ছিলামই না। আমি খুন করেছি প্রমাণ কি?

প্রমাণ আছে সোমনাথবাবু। পেনুমামা সহাস্যে বলল, নিজের মিথ্যা কথায় আপনি ধরা পড়ে গেছেন।

কি কথা? আন্দাজে ঢিল মারলেই হল?

আপনি নিজেই বলেছেন সেদিন সকালে কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেন ধরে ফিরেছেন।

ঠিকই তো!

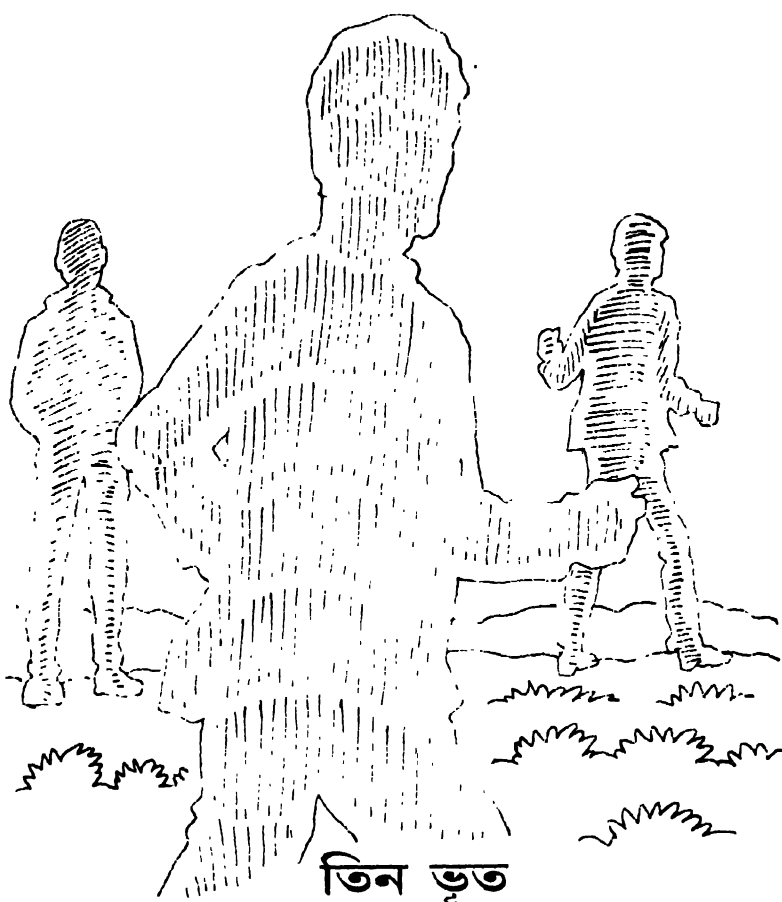
কিন্তু সেদিন সকালে কৃষ্ণনগর থেকে কোনো ট্রেনই ছাড়েনি। কৃষ্ণনগরে ট্রেন অবরোধ করা হয়েছিল। গতকালের খবরের কাগজেই ছোট্ট খবরটা পড়ে আমার সন্দেহ ঢুকে যায়। আর তাছাড়া সেদিন আপনার টয়লেট দেখে বুঝেছিলাম রাতে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি কৃষ্ণনগরে ছিলেন অথচ আপনার ঘরের টয়লেট রাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

মিথ্যে কথা ! আমি আপনাদের সামনেই বাড়িতে এসেছি। সবাই জানে।

তা জানে। তবে একথা জানে না যে আপনি রাতের অন্ধকারে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। আপনার ঘরের পশ্চিমদিকের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ দেখেই আমার কেমন খট্‌কা লাগে। আপনি বলেছেন দরজাটা ব্যবহৃত হয় না। অথচ সেইদিন খোলা হয়েছিল। আমি কাঠ দেখার ভান করে দেখেছিলাম ধুলোর ওপরে হাতের দাগ পড়ে আছে। ওই পথেই ঘরে ঢোকেন এবং কাজ শেষ করে ভোরের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ভোরে বেড়ানো আপনার প্রতিদিনের অভ্যেস তাই ও পথে যখন বেরিয়ে যান, কেউ দেখতে পেলে সন্দেহ করত না। যদিও কেউ আপনাকে দেখতে পায়নি। তবে যে জন্য আপনার অন্নদাতাকে খুন করলেন তা তো পেলেনই না ; উল্টে মানুষটিকে এভাবে মেবে ফেললেন। কারণ টাকাটা তো তার আগেই লাহিড়িবাবু নিয়ে গেছেন, যা আপনি জানতেন না।

দুহাতে মুখ চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন সোমনাথবাবু। মি. দাস এগিয়ে এসে তাঁর হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিলেন।





তিন ভূত

অলোক বসাক

একসময় দু'চারটে গ্রাম খুঁজলে একটা করে অ্যামেচার যাত্রাপার্টির হদিশ মিলত। খাইখরচা আর সামান্য কিছু টাকাকড়ি পেলেই ওরা গাঁয়ে গাঁয়ে যাত্রাপালা গাইতে যেত। তারপর প্যালাট্যালা তুলে মালাফালা ডেকে রোজগণ্ডা পুষিয়ে নিত।

আমাদের যাত্রাপার্টির নাম ছিল ঝাঁইঝাঁই অপেরা। আশুবাবুর দল। এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে গায়েন বায়েন যোগাড় করে অনেক খেটেখুটে আশুবাবু দল গড়েছেন। আশেপশের তিন চারটে জেলায় দলের খুব নাম ডাক। বাকসীর

ঝাঁইঝাঁই অপেরা পালা গাইতে গেলে দশ গাঁয়ের লোক মাঠঘাট টপকে ছুটে আসে।

একবার মেদিনীপুরের এক গাঁ থেকে যাত্রাপালা গাইবার ডাক এল গাঁয়ের নাম শুনে হেবোর তো ভির্মি লাগে লাগে অবস্থা। বলে আমাকে কেটে কুঁচিয়ে ফেলবার ব্যাবোসতা করলেও আমি ও গাঁয়ে যাত্রা গাইতে যাবুনি।

হেবো আমাদের দলের একনম্বর ছেলেমেয়ে। ছেলে হয়ে মেয়ে সাজে। সাজগোজ করলে কারুর সাধ্যি নেই ওকে ছেলে বলে ধরে। চলনে বলনেও আস্ত মেয়ে। ও যদি না যায় তো যাত্রাফাত্রা মাঠে মারা যাবে।

ওর হাভভাব দেখে বায়েনমাস্টার হরিদা তো ঘাবড়ে গেলেন। আশুবাবু না থাকলে হরিদাই দলের সব। বললেন, কেন, যাবিনি কেন?

কেন যাবুনি? গিয়ে কি মরব নাকি! ওর পাশের গাঁয়েই তো আমার মামার বাড়ি। ওই গাঁ ফেলে তবেই আমার মামার বাড়ি যেতে হয়। ওই গাঁয়ে শুধু ভূত আর ভূত। শাঁকচুন্নি আর ঝামড়ির তো ছড়াছড়ি।

হরিদা বললেন, তাই নাকি! তা গেলে তো আমরা দল বেঁধে যাবো। একা একা গেলে না হয় কথা ছিল।

হরিদার পর ধোনোদা, তারপর পটলদা, এর বোঝানো শেষ হয় তো ও বোঝায়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যাবুনি তো যাবুনি। হেবোর এক গোঁ। শেষমেশ আশুদা এসে এটাসেটা বলেটলে রাজি করান।

অত বাক্সপ্যাটরা তার ওপর প্রায় কুড়িজনের দল। একটা নৌকোয় মোটেই কুলোবার কথা নয়। একটু খুঁজে পেতে দু খান নৌকো ভাড়া করা হল। একটা নৌকোয় তোলা হল বাক্সপ্যাটরা। বাক্সপ্যাটরা সরিয়ে সরিয়ে জায়গা করে নিলেন আশুদা আর হরিদা। অন্য নৌকোয় গায়েন বায়েন মিলিয়ে আমরা কুড়িজন। সকালে যখন নৌকো ছাড়া হল তখন নদীতে একেবারে হাঁইপাঁই জোয়ার। মুখের সামনে যা পায় তাই টেনে নিয়ে যায় সাঁইসাঁই করে। নৌকো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে এগিয়ে চলল। আমরা কুড়িজন ছিলুম ঝোড়ো মাঝির নৌকোয়। ওর আসল নাম খগেন মণ্ডল। বাকসীঘাটের সেরা মাঝি। নৌকো চালায় ঝড়ের গতিতে। তাই ওর ঘেটো নাম ঝোড়ো মাঝি। বাকসী ঘাটে একডাকে সব্বাই ঝোড়ো মাঝিকে চেনে। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। নৌকো খানিক যাবার পর ঝোড়ো মাঝি বলল, কাল যদি ফেরার সময় ভাটা পাই তো তরতরিয়ে ঘাটে ফিরে আসব।

নৌকো ঘাটে ভিড়বার কথা ছিল সন্ধে হব হব সময়ে। তারপর ওখান থেকে ক্রোশখানেক হাঁটাপথ পেরিয়ে সেই গাঁ। কিন্তু জোয়ারের টান থাকায়

নৌকো যখন ঘাটে ভিড়ল তখন সূয্যিমামা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে নাবি নাবি করছে। আশুদার হাতেই যা একটা ঘড়ি ছিল। নৌকো থেকে ডাঙায় উঠে বললেন, সন্ধে হতে এখনও একঘণ্টা বাকি।

বাক্সপ্যাটরা নামাতে টামাতে আরও আধঘণ্টা কাটল। হেবো আর হেরো দুজনের গলায়গলায় ভাব। ওরা নৌকো থেকে নেমে নিজেদের বাক্সপ্যাটরা নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে টুকিটাকি কথা বলছিল। হঠাৎ একদল কচিকাঁচা হৈ চৈ করতে করতে একখানা গরুর গাড়ির পিছন পিছন এসে থামল। সঙ্গে জনা চারেক জোয়ান ছেলে। ওরা এগিয়ে এসে বললে, আশুবাবু বাক্সফাক্স সব এই গরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিন। এসব আপনাদের বইতে হবেনি।

আশুবাবু বললেন, নাও হে নাও তোমাদের আর ঘাড়ে করে বইতে হল না। যার যা আছে সব গরুর গাড়িতে চাপিয়ে দাও।

গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে আমরা গাড়ির পিছু পিছু হাঁটা দিলুম। খানিক যাওয়াব পর হেরো বলল, ওর পেটে খুব লাগছে।

কি রে, কোন অসুবিধে হচ্ছে নাকি!

আমা.. কথা শুনে হেরো বিচ্ছিরি বোকার মত চোখে ভ্যাবলাকান্তর মত আমার দিকে তাকাল।

আশুদা হাতকয়েক আগেই ছিলেন, সঙ্গে হরিদা। বললাম, আশুদা, হেরোকে নিয়মে পেয়েছে।

আশুদা, হরিদাময় দলের সব্বাই জানে যাত্রা গাইতে বেরোলেই রাস্তায় হেরোর কম করে বারদুয়েক পেট গোলমাল করে। আশুদা বললেন, এ আর নতুন কি! তুই ওর সঙ্গে থাক। আমরা এগোই।

হেবো মিনমিন করে বলল, আমিও থাকব

কথাটা বোধহয় আশুদার কানে গেসল, উনি ঘাড় না ঘুরিয়েই বললেন, ঠিক আছে গলায়গলায় ভাব যখন থাকো। দেখো যাত্রা না মাটি হযে যায়। কাজ সেরে ঝপাঝপ চলে এসো

ওরা গরুর গাড়ির পিছু পিছু চলল। এদিকে আমি, হেবো আর হেরো। মাইলখানেক যেতে না যেতেই হেরোকে তৃতীয়বার পেটের ব্যথা কমাতে যেতে হল। সূয্যিমামার বদলে চাঁদমামা পুব আকাশ বেয়ে তরতর করে আকাশের মাথায় উঠে আসছে। পূর্ণিমার চাঁদ। একথালা খাঁটি দুধের মত। জ্যোছনায় চাদ্দিক ফিম ফুটে গেছে।

হেবো আমার থেকে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট। বললে, বিশুদা, কি হবে। যাত্রা কি মাটি হয়ে যাবে নাকি! দলের নাম যে গোল্লায় যাবে!

যদি ঠিক সময়ে যেতে না পারি তাহলে যাত্রা একেবারে মাটি। লোকজনের ইট পাটকেলের ঘায়ে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে। বললাম, ও-ই যে দূরে চারপাঁচটা আলো দেখছিস ওটা হল বারোয়ারী তলা। ওখেনেই যাত্রা হবে। মাঠ পেরিয়ে তালপুকুর। পুকুর পেরিয়ে আবার মাঠ। তারপর যাত্রাতলা। অন্যরাস্তা দিয়ে গেলে আরও দূর। অনেক দূর। ঘুরতে ঘুরতে যাত্রা মাটি।

একটু ভেবেটেবে হেবো বলল, ভূত কি ঝামড়ি এসব কিছু নেই তো!

তোর কেবল এক কথা ভূত আর ভূত। ভূত কি যেখানে সেখানে বসে আছে না কি বল তো! তাছাড়া আমরা তিনজন আছি।

থাকি যদি তিনজন

ভূত প্রেত কোনজন?

জানিস কি এটা? না জানলে জেনে রাখ। চল ভাই যত ভয় পাবি ভয়ও তত পেয়ে বসবে।

হেরো বলল, অত ভয় কিসের? চল আমি আছি। দেখি ভূত আসে না ঝামড়ি আসে।

গাছ নেই পালা নেই শুধু মাঠ আর মাঠ। মাঠভর্তি জ্যোছনা। মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই, সোঁ সোঁ হাওয়ার শব্দ। মাঠ পেরিয়েই তালপুকুর। পুকুর ফেলে যাত্রাতলা যেতে আর একটা ছোট মাঠ। পুকুরপাড়ে এসেই হেবো চিৎকার করে উঠল, ঝা-ম-ড়ি। ওইরকম আচমকা চিৎকারে হেরো আর আমি ঘাবড়ে গিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলুম।

ওই দ্যাখো শিবুদা, ওই মোটা একটা গাছ দেখতে পাচ্ছো ওর পাশেই ঝামড়িটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই তালপুকুর।

হেরো ভূতফুতে বিশ্বাসই করে না। সেও বলল। বিশুদা, আমি খুব ছোটবেলায় হীরুদের বাঁশতলায় একবার ঝামড়ি দেখেছিলুম। এটাকে ঠিক সেরকম লাগছে।

যে ভূতফুত বিশ্বাস করে না সেই যখন বলছে তখন আমি কি করে এগোই। ভেতর ভেতর আমিও ভয়ে কাঁপছি, একে এই টি টি মাঠ তারওপর কিনা ঝামড়ি। হেরো বললে আচ্ছা দেখাই যাক। বলে একখানা ঢিল ছুঁড়ল। ওমা! ঝামড়ি নড়েও না, চড়েও ন।

কি রে কি বুঝলি?

কিছুই তো বুঝছিনি।

হঠাৎ হু হু করে হাওয়া বইতে শুরু করল। অমনি হেরো আমাদের পিছনে সরে এসে বলল, দ্যাখো বিশুদা দ্যাখো, ঝামড়িটা কেমন হাত নাড়ছে।

ভালো করে দেখেটেখে আমি শক্ত দেখে একখানা মাটির ঢিল তুলে জোরসে ছুঁড়ে দিলুম। দূর ছাই, ঢিলটা ওকে পাশ কাটিয়ে একপারে কুব করে তাল পুকুরের জলে। কি করা যায়! বললাম একজন গিয়ে দেখে আসলেই তো ব্যাপারটা চুকে যায়। যদি ঝামড়িই হয় তো সে ব্যাটা একজনের ঘাড়ই মটকাবে। তারপর না হয় লোকজন ডেকে ও ব্যাটাকে শায়েস্তা করা যাবে।

হেরো বলল, বিশুদা, কিন্তু ওই ঝামড়ির হাতে ঘাড় তুলে দিতে যাবে কে?

কেন! তুই তো ওসব ঝামড়ি ফামড়ি বিশ্বাস করিসনি!

তা ঠিক, কিন্তু ভয়ে আবার যদি পেট ব্যথা করে! তার থেকে হেবো.....

সঙ্গে সঙ্গে হেবো বলল, হায় হায়, আমি ঝামড়ির কাছে গেলে ছেলেমেয়ের পার্ট করবে কে? আমার পার্ট কি তোর মুখস্থ আছে নাকি!

তা নেই। কিন্তু যাবেটা কে বল।

আমি একটু ভেবেটেবে বললুম, দ্যাখ, ও হল একা, আমরা হলুম তিনজন। আমাদের সঙ্গে মোটেই পাবার কথা নয়। পিছিয়ে গেলে ও লাই পেয়ে যাবে। তখন আলাদা আলাদা করে তিনজনেরই ঘাড় মটকাবে

একেবারে খাঁটি কথা বলেছ বিশুদা। বল কি করা যায়! হেবোটা না ভীরুর গাছ

যাক ওসব বাদ দে। মরলে তিনজনই মরবো চল তিনজনে ভয়ানক আওয়াজ তুলে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝামড়িটাকে জাপটে ধরি। তারপর। দুমদাম মার। মারের ওপর মার। দেখি ও ব্যাটার কত ক্ষমতা।

আমার কথায় দুজনে রাজি হয়ে গেল। ওমা! যাও এক ঝমেলা মিটল তো শুরু হল এক ঝামেলা। হেবো বলল, সে সবার পিছনে থাকবে! হেরো আর আমি বললাম, ঠিক আছে তাই।

দেরি করলেই দেরি। তিনজনে ভয়ানক আওয়াজ তুলে দৌড়ে গিয়ে ধরলাম ব্যাটাকে জাপটে। যেই না ধরা অমনি তিনজনেই তালপুকুরের জলে। জলে কাদায় একেবারে নাকানি চোবানি জলকাদা মেখে হাঁকডি মাকড়ি করে পুকুরের পাড় বেয়ে দৌড়ে একেবারে যাত্রাতলা। লোকজনের ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে সোজা সাজঘরে।

তিনজনের এরকম অবস্থা দেখে তো সব্বাই হাঁ। আমি পুরো ব্যাপারটা বললুম

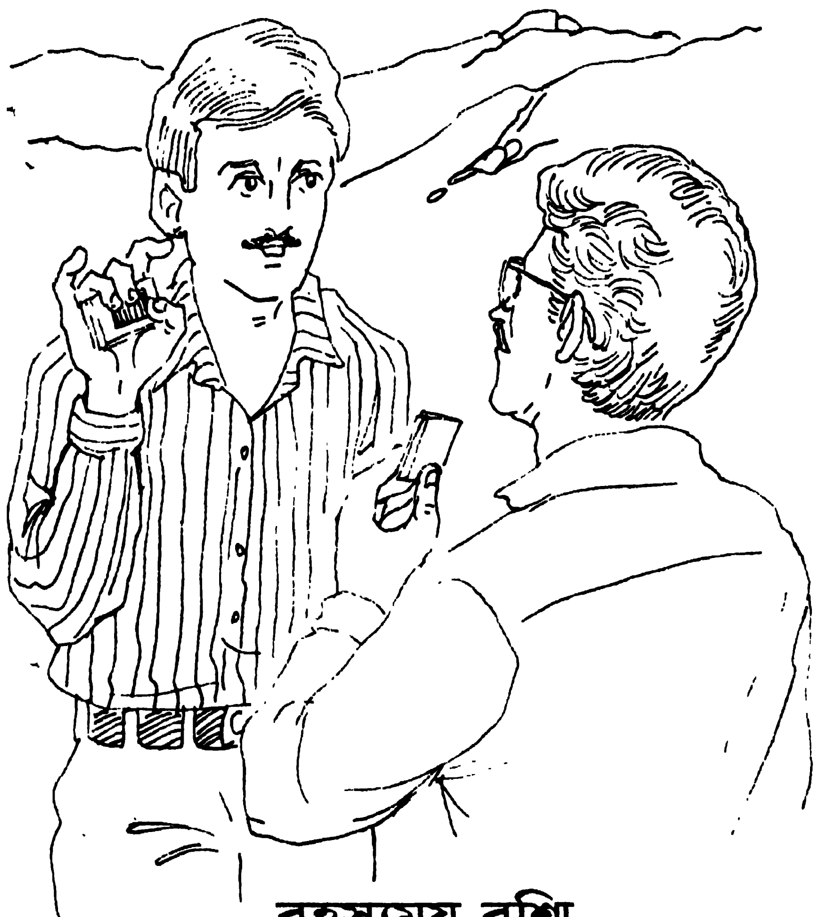
হেরো বলল, আশুদা আমিই ব্যাটাকে আগে ধরেছিলুম। ও! গায়ে শুধু কাঁটা আর কাঁটা। কাঁটা ফুটে আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। ওকে এখনই শায়েস্তা করা দরকার ও ব্যাটা পুকুরেই আছে।

আশুবাবু সব শুনে টুনে বললেন, ঠিক আছে চল আগে ও ব্যাটাকে শায়েস্তা করা যাক্ তারপর যাত্রা। আমাদের কথা শুনতে সাজঘরের আশেপাশে অনেক ভিড় জমে গিয়েছিল। আমাদের কথাটথা শুনে যে যা পেল হাতে নিয়ে আমাদের পিছু নিল। সে এক হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড। ভূত হোক আর ঝামড়িই হোক ব্যাটাকে বাগে পেলে একেবারে পিটিয়ে চিঁড়ে করে দেবে।

তালপুকুরের ধারে গিয়ে হেরো চিৎকার করে উঠল, ওই দেখুন ওই তো ব্যাটা জলে ভাসছে। একেবারে পুকুরের পাড়ে। লাঠিসোটা নিয়ে রে রে করে সবাই ছুটল। হরিদা যেই না আলোটা তুলে ধরেছে অমনি আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। ওমা! কোথায় ভূত কোথায় ঝামড়ি! আশুবাবু তো ধমকে উঠলেন। একখানা মরা খেজুর গাছকে জাপটেজুপটে ধরে একেবারে কাদায় জলে! ছি! ছি!

ভূত দেখতে এসে তো সবাই গড়াগড়ি। সে কি লজ্জা। একেবারে দুকান কেটে হেসে গড়াগড়ি। তিনজনের কারুর মুখে কথা নেই। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আশুদা হাতের আলোটা আমাদের মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, কি ভূতের ছিরি! অমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠল।





রহস্যময় রশ্মি

হান্নান আহসান

কাকামণি, তারপর কি হল?

তো সেই ভয়ংকর রাক্ষুসী রাইফেলের শেষ গুলিটাও ঢক করে গিলে ফেললো।

গিলে ফেললো?

তবে আর কী; তারপর ঠিক এক মিনিট তের সেকেণ্ড পরে দুম ফটাস! রাক্ষসীর কলসীর মতো কুম্ভকর্ণ পেটটা চৌচির।

রাক্ষসী মরে গেল?

রাক্ষসী আবার মরে! বাব্বা, কী দারুণ হুলুস্থুলু কাণ্ড! ছিঁড়ে যাওয়া পেট থেকে বেরিয়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে ছানা রাক্ষসী। হাজার ওয়াটের বাল্বের মতো তাদের এ একটা চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে আলো। মুহূর্তের মধ্যে ভোম্বলগড়ের দুর্গটা সাদা জোছনায় ভরে উঠল।

ছানা রাক্ষসীরা কোথায় গেল? কী করল?

এইবার আরও মজা। দুর্গের সিংহদ্বারে উঠে সমবেত চিৎকার করে উঠল তারা। চিৎকারের ভাষা প্রথম বুঝতে পারিনি। কান একটু সজাগ করতেই শোনা গেল— উরিবাব্বা! বলছে—

ছককড়ি ছককড়ি ফককড়ি ফা
কিল মেরে ভেঙে দেব হাত ঠ্যাঙ পা।

এইবার ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলুম আমরা। মনে হল, গ্রীষ্মকালের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে কী রকম শীতের প্রকোপে কুঁকড়ে উঠছি। কী করি, কোথায় যাই ভাবতে ভাবতেই কর্কশ চিৎকারে সঙ্গীদের জানালুম, পালাও — এদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে পালাও।

মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্য গেল বদলে। স্বপ্নেও ভাবিনি আমার এই ভয় জড়ানো কণ্ঠস্বরে ওরা পিল পিল করে পিছু ছুট দেবে।

ছুটে কোথায় লুকালো তারা?

ছুটছে তো ছুটছে। যেন ম্যারাথন রেস। আমাদের কৌতূহলও গেল বেড়ে। পেছন পেছন আমরাও লাগালুম দৌড়। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কাদের গলায় সোনার মেডেল শোভা পায়।

অরিন্দম বিজ্ঞানের ছাত্র, অসম সাহসী বললে কম বলা হবে, হয়তো আরও কিছু হাঁফাতে হাঁফাতে আমাকে বললো, ব্যাপারটা ভারি মজার! না, শেষ পর্য্যন্ত কী হয় দেখে তবে ফিরবো। মনে হচ্ছে, নির্ঘাৎ ওরা ভয় পেয়েছে। নচেৎ এমন ভীরুতা কেন।

আমি বললুম, হান্ড্রেড পারসেন্ট সঠিক তুই। অজয়, নীলু এবং পার্থও আমাকে সমর্থন করল।

বাব্বা, তা কী হয়। সোনার মেডেল কেন, ব্রোঞ্জও গলায় উঠল না। যেন হাওয়া ছুট। পিছিয়ে পড়লুম প্রায় মাইলখানেক। ওরা গিয়ে ঢুকলো একটি ভাঙা পোড়ো দোতালা বাড়ির মধ্যে।

হেলতে দুলতে শ্বাস টানতে টানতে আমরাও পৌঁছে গেলুম বাড়িটার সামনে। কবে ছোটবেলায় স্কুল স্পোর্টসে ছুটেছিলুম— এখন কী ছাই এমন দৌড় সহ্য হয়! বাপরে বাপ, যেন জিভটা তেষ্টায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

অজয়কে বললুম, কী করবি?

সঙ্গে সঙ্গে পার্থ বলে উঠলো, দেখ, এভাবে আর্মর্ডলেস হয়ে না ঢোকাই ভালো, তারচেয়ে প্রত্যেকের হাতে দুটো করে আধলা ইট থাক, কী বলিস?

সবাই আমার মুখের দিকে তাকাল। অর্থাৎ আমি বললেই কোন বাধা থাকে না। তো, বললুম, সেটাই মনে হয় ভালো হবে। হাতে দু একটা লাঠি থাকলেও মন্দ হতো না।

নীলু 'পেয়েছি' বলে ছুটে গিয়ে একটা ভাঙা দেওয়ালের ইটের ফাঁক থেকে বেশ মোটাসোটা একটা লাঠি নিয়ে এলো।

কাকামণি, ঘরের মধ্যে ঢুকলে তোমরা?

তারপর শোননা, সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। স্যাঁতসেঁতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সবে মাঝখানে এসেছি অমনি রাক্ষসীগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল—

ছক্কড়ি ছক্কড়ি ফক্কড়ি ফা
হাড় খাবো মাস খাবো নাক খাবো না।

এতক্ষণ ধরে বুকে যে পরিমাণ সাহস সঞ্চয় করে রেখেছিলুম, মুহূর্তের মধ্যে তা দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেল। শুধু আমার কেন, প্রত্যেকের পা এমনভাবে কাঁপতে শুরু করে দিল যে, মনে হলো কাঠের সিঁড়িটা তখনই ভেঙে পড়বে।

সমানে কান ফাটানো চিৎকার। কোন বিরাম নেই। আমরাও ভ্যাবাচ্যাকা মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর কী করলে?

এবার, সাংঘাতিক ব্যাপার। সব ছানা রাক্ষসী একসঙ্গে হ্যাঁচ্চো করতেই চমকিয়ে উঠে পার্থ কাঠের সিঁড়ির নীচে চলে গেল। মনে হল, চোটটা ভালোই হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি থেকে নেমে এলুম আমরা। ঘুরে পার্থকে তুলতে গিয়েই পিলে চমকে উঠলো। পেট ছিঁড়ে রাক্ষসীটা কখন যে সিঁড়ির নীচে চলে এসেছিল, খেয়াল করিনি। আর পড়বে তো পড়বে একেবারে ফাটা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে পার্থ। দেখে চক্ষু সব চড়ক গাছ আমাদের। তিড়িং করে লাফ দিয়ে অন্ততঃ সাড়ে উনত্রিশ ফুট পেছনে চলে গেলুম। এখন ভাবি, ওটা যদি অলিম্পিক গেমস্ হত, অবধারিতভাবে বিশ্বরেকর্ড কপালে জুটত।

ভয়ে আমাদের পেছিয়ে যেতে দেখে পার্থ দাঁত খিঁচিয়ে একটা বিকট আওয়াজ করলো। সেই আওয়াজে আরও পাঁচ হাত ঠিক্‌রে দূরে গিয়ে পড়লুম সকলে।

তারপর চোখ কপালে তুলে চাইলুম সিঁড়ির দিকে। উহ্ সে কী দুঃসহ অবস্থা। দেখি, পার্থ প্রাণপণে রাক্ষসীর গলা চেপে ধরেছে আর পাজী রাক্ষসীটা কেবলই গোঁঙাচ্ছে। তবু তার কাছে যেতে ভরসা হল না। এমনিভাবে চললো অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ল ধাড়ি রাক্ষসী। জিভ বের করে পার্থও পড়ে রইল সেখানে। এবার আরও ভয় পেলুম, যদি পার্থর কিছু হয়!

ছুটে গিয়ে ধরাধরি করে তাকে তুলে আনলুম বাইরে। নাড়ি টিপে দেখলুম স্পন্দন স্তব্ধ হয়নি। বিস্তর সেবা শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরলো। একটু সুস্থ হতেই পার্থ বললো, সব ব্যাপারগুলো আমার কাছে কেমন রহস্য লাগছে। ছানা রাক্ষসীগুলো কোথায় গেল এবার দেখা দরকার।

পার্থর কথা শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো আমার। বললুম, মাই ডিয়ার পার্থ ভাই, থাক, অনেক বাহাদুরি হয়েছে, চল, তারচেয়ে মায়ের কোলে ফিরে যাই। কেন আর তাদের বুক ফাটা কান্নার ব্যবস্থা করি।

পার্থ এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললো, নারে, আর কোন ভয় নেই। ওরা যে দারুণ ভীতু তা পুরোপুরি আমার বোঝা হয়ে গেছে। চল, বলেই হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আবার সিঁড়ির ধাপে পা রাখল পার্থ। পেছনে অন্য সবাই আর দ্বিরুক্তি করলো না।

বাব্বা, ছানা রাক্ষসীর কাছে চলে গেলে তোমরা?

তারপর ঘরে ঢুকে যা দেখলুম, উচ্ছ্বাসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলুম। পার্থ চিল চেঁচানো গলায় অনুরণন তুললো, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম। নীলু, পার্থ, অজয় দে আমার সোনার মেডেল দে। থৈ থৈ নাচতে নাচতে বলে চলল পার্থ— উই আর দ্য গ্রেটেস্ট, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ।

সামনে অজয়কে অতিক্রম করে এসে পার্থর কাঁধে হাত রেখে বললুম, পার্থ, হয়েছে থাম এবার। একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। অরিন্দম, যা এগিয়ে গিয়ে দেখ।

অরিন্দমের পরিচয় কেবল বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সম্প্রতি একটি মৌলিক গবেষণায় ও আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। ওর মেধা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জবাব নেই। গত জুনে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যাপলায়েড ফিজিক্সের প্রধান মি. হোয়াইট স্কনের আমন্ত্রণে সেখানে ও থিসিস পড়ে এসেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতায় খবরও বেরিয়েছে ওকে নিয়ে। ভারতীয় হিসেবে সর্বোপরি ওর বন্ধু হিসেবে আমাদেরও সুখানুভূতিটা স্বভাবতই দুর্জয়।

এগিয়ে গেল অরিন্দম। বাঁটহীন ছাতা সামান্য খুলে উল্টে রাখলে যেমন দেখায়, গোটা বার তের মূর্তি সেরকমই পড়ে রয়েছে। একটা মূর্তি হাতে

তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো অরিন্দম। সূক্ষ্ম লেন্সটাও চশমার ফ্রেমে আটকে নিল। আমরা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট পাঁচ দেখার পর হঠাৎ-ই ও গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ থেকে লেন্সসহ চশমাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, বাইরে চল।

বাধ্য ছাত্রের মতো আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। মহূর্তের মধ্যে একেবারে অট্টহাসির বান ছুটে গেল অরিন্দমের মুখে। প্রায় এক মিনিট পরে হাসি থামিয়ে জানাল, ভয়ের কিছু নেই। ওই ছানা রাক্ষসীগুলো এই ছদ্মবেশ পাল্টেছে। মা রাক্ষসীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এদেরও জীবনবায়ু নির্গত হয়েছে। বলেই দ্রুতপদে ও সিঁড়ির নীচে চলে গেল। পেছন পেছন আমরাও গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর আমাদের সবারই চোখ সেই বুড়ো রাক্ষসীর দিকে পড়তেই দেখলুম— ছানাদের মতো সেও ঐরকম উল্টো ছাতার মতো পড়ে রয়েছে।

অরিন্দম আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে এবার হেসে উঠলো তারপর ব্যাগ থেকে একটা তোয়ালে বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ঘরের মধ্যে থেকে সব ছাতা গুলোকে নিয়ে আয়।

সবাই আবার সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলুম এবং চটপট তোয়ালেতে ভরে চারটে খুঁট বেঁধে ফেললুম। বাইরে বেরিয়ে এসে লক্ষ্য করলুম অরিন্দম সিঁড়ির নীচে নেই। যতই হোক, মানুষ তো, ভয়ে আমার লোমকূপ আলগা হয়ে উঠলো। অরিন্দম বলে চিৎকার করতে করতে উঠোনে নেমে এলাম।

অরিন্দম ভাঙা দেওয়ালের পাশ থেকে নিঃশব্দে আমাদের সামনে বেরিয়ে এলো। মুখে বিজয়ের হাসি।

আমি বললুম, কী ব্যাপার বিজ্ঞানী?

ছাতাগুলো নিয়ে এসেছিস তো? অরিন্দম বললো, ঝটপট খুলে ফেল দেখি।

অজয় তোয়ালের খুঁট খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। দেখলুম, ছাতাগুলো সোনালী দেশলাই বাক্সে পরিণত হয়ে গেছে। অরিন্দমের হাতেও সেরকম একটা দেশলাই। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ওটাই ধাড়ি রাক্ষসী।

অরিন্দম দেশলাইগুলো তুলে নিয়ে নিজের ব্যাগে রাখলো। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাদের দিল।

আমি বললুম, আমি তো স্মোক করি না।

অরিন্দম হেসে বললো, আজ দিনটা অন্ততঃ কর।

তোমরা এরপর চলে এলে কাকামণি?

হ্যাঁ, বাড়ি ফিরে এলুম। আসার সময় অরিন্দম আমাদের বলে দিয়েছিল,

আমরা যেন এক মাস আটাশ দিন কেউই তার সঙ্গে দেখা না করি।

সেদিন 'কেন' জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আজ ঠিক একমাস ঊনত্রিশ দিন। গতরাতে ভাবছিলুম, নিশ্চয়ই অরিন্দম আমাদের অন্য কোন নতুন সংবাদ দেবে। কিন্তু তা আর ওর কাছে গিয়ে জানতে হল না।

কেন, কী করে জানলে ?

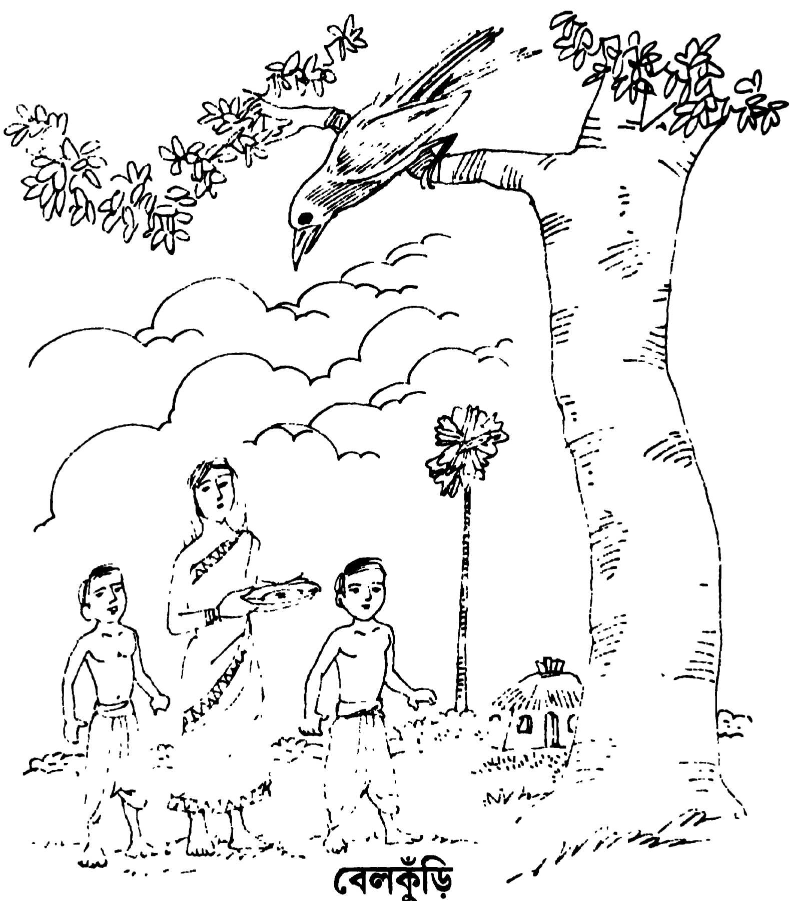
সেইটেই তো বলার জন্য এত গল্প। ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের ফার্স্ট লিড নিউজে চোখ রাখতেই চমকে উঠলুম— বর্ষসেরা বিজ্ঞানী অরিন্দম মজুমদার— এই দেখ মামণি।

মামণি নিউজে চোখ রাখলো।

নিউইয়র্ক, ২৮ জুন, (এ এফ পি) ভারতীয় বিজ্ঞানী অরিন্দম মজুমদার বর্ষসেরা বিজ্ঞানীর সম্মান পেয়েছেন। প্রতি বছর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি মৌলিক গবেষণা কাজের জন্য এই সম্মান প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ্য, অরিন্দমবাবু গ্রহান্তরের একটি জীব থেকে আবিষ্কার করেছেন এক ধরনের হলুদ রশ্মি যার সাহায্যে দেহে ক্যান্সারের জীবাণু আছে কিনা সেকেণ্ডের ব্যবধানে জানা যাবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হার্ডওয়েল এই সংবাদে উচ্ছ্বাসিত হয়ে জানিয়েছেন, অরিন্দম মজুমদারের কৃতিত্ব নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সমান। শ্রী মজুমদার আগামী মঙ্গলবার দেশে ফিরছেন।

আমার বুঝতে অসুবিধে হল না, গ্রহান্তরের জীব মানেই ঐ রাক্ষসীরা। চিন্তা করে নিলুম মুহূর্তের মধ্যে ; অরিন্দম দেশে ফিরছে— ওকে আটকে রাখতে পারবো তো '?





বেলকুঁড়ি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই আমার ভাই-বোনেরা একটা কাক খুঁজে বেড়াচ্ছি। গাঁয়ে এত কাক, গেল কোথায় সব!

বাড়িতে চৈত্র-সংক্রান্তি। আট রকমের শাক, তিতের ডাল, উচ্ছেভাজা, মুগের ডাল, টকের ডাল আর লাবড়া, এদিন কাকিমা-জেঠিমাদের সকাল থেকে ধোয়া-মোছা, কাচাকাচি আর সারাক্ষণ শোরগোল—বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা এসে গেছে দূর দূর গাঁ থেকে। সংক্রান্তির মেলা সাতদিন ধরে। ঠাকুমা'র ঘরে সুগন্ধ আতপ চালের ভাত আর এদিনে সবার নিরামিষ

ভোজন, তার আগে কাক-ভোজন। আমরা জানি কাক খুঁজে না পেলে অন্ন জুটবে না। আমাদের একটাই কাজ, কোথায় আছেন তেনারা খুঁজে দ্যাখো। পড়াশোনা নেই, সকাল থেকে ছাড়াগোরু হয়ে আছি আমরা, একটা কাক যদি খুঁজে না পাই বড়ই বিভ্রাট।

বালি ব্যাটাদের দেমাক দ্যাখো! ঠিক বুঝে ফেলেছে গেরস্তের বাড়ি-বাড়ি আজ তাদের ভোজ। রোজ তেড়েফুঁড়ে এটা-ওটা নিয়ে উড়ে যায়, ব্যাটারা সাধু সেজে বসে আছে।

আমাদের সব বিশাল-বিশাল টিনের ঘর। কাক চালে বসে থাকবে না, ভাবাই যায় না। কামরাঙা গাছের নীচে গেলাম না নেই।

শুধু ডাকছি, "কা-কা।"

কা-কা ডাকলে ঠিক উড়ে আসবে। বৈঠকখানার বারান্দায় দেখি ঠাকুরদা বসে আছেন। কানে কম শোনেন। চোখে কম দ্যাখেন। পঞ্চুকাকা তাঁকে তামাক সাজিয়ে দিচ্ছে। কারণ, কাল থেকে নতুন বছর শুরু হবে। সকাল থেকেই আসবে মানুষজন। মেলায় যাবার মুখে ঠাকুরদা'র পায়ে গড় হয়ে যাবে।

ঠাকুরদা লাঠিটা খুঁজলেন। আমরা ঠাকুরদাকে বেশি পাত্তা দিই না, বুড়ো মানুষ, আমাদের সাড়া পেলেই "কে রে? মলিন নাকি! আয় ভাই, হাতটা ধর। দিঘির পাড়ে ঘুরিয়ে আনবি।" ঠুকে-ঠুকে কাঁহাতক হাঁটা যায়। আর বকর-বকর, এটা কী, ওটা কী, চাঁপাফুলের গন্ধ? পুকুরে বেশ জিয়ল মাছ পড়েছে, অর্জুন গাছে নতুন পাতা এসেছে, মাদার গাছে ফুল... গোপাটে কাদের গোরু চরছে রে? সবই ঠাকুরদা যেন দেখতে পান। কম দেখতে পান, বলেন, আসলে সজনী-ডাক্তার বলে গেছেন দৃষ্টিশক্তি গেছে। ঠাকুরদা মানতে রাজি নন। ভুলভাল বলেন, আবার ঠিকঠাকও বলেন, দ্যাখেন কি দ্যাখেন না বুঝতেই পারি না।

পা- দিয়ে যাবার সময় ঠাকুরদা বললেন, "কাক সব মেলায় চলে গেছে বুঝলি। ...ত ব- মেলা, সবাই যাবে, তারা যাবে না!"

"যেতেই পারে।"

অসীমা বলল, "তা হলে কী হবে?"

বড়দা বলল, "ধস ঠাকুরদা চোখেই দেখতে পায় না। জানবে কী করে কোথায় কাকেরা গেছে।"

নিরু বলল, "দ্যাখ ওই দ্যাখ, ও মা কী বিশাল..."

আর তখনই দেখি একটা বিশাল কালো ঘোড়া আসছে। গলায় রং-বেরঙের

কড়ির মালা, পায়ে ঘুঙুর ঝমঝম করে বাজছে।

সকাল থেকেই আমাদের আজকে নানারকমভাবে অপ্রস্তুত হবার পালা। কাক দিয়ে শুরু হয়েছে, কী দিয়ে শেষ হবে জানি না। ঘোড়ার লাগাম ধরে লোকটা উঠে এল। কালো জোব্বা গায়। মাথায় কালো টুপি। পা খালি। ঘোড়সওয়ার সে। মেলায় যাবার আগে দিঘির পাড়ে ঘোড়া নিয়ে উঠে আসছে।

ঠাকুরদা বললেন, "বনমালী আসছে মনে হয়। বনমালীর ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বাজছে!" যেন তিনি একটা তাজা ঘোড়ার মতো নিজেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। পঞ্চুকাকার হেপাজতে সকালটা ঠাকুরদার কাটে। পঞ্চুকাকাই বললেন, "নিবারণ আসছে। বনমালী না।"

নিবারণ তার ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ঠিক ঠাকুরদার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। গড় হয়ে বলল, "মুখে দুটা চানা দ্যান ঠাউরদা। মাথায় হাত রাখেন।"

আসলে সবাই যে-যার মতো মেলায় রওনা হয়েছে। মেলা আজ থেকেই শুরু। বিশাল মাঠে তাঁবু পড়ছে। ঘোড়দৌড় হবে। নিবারণ বড় বেশি সকাল সকাল উঠে এসেছে বাড়িতে। চৈত্র মাসে শেষ হয়ে গেলে নিমেব-ছায়ার মতো ঠাণ্ডা থাকে। সেই ঠাণ্ডায় দাদু নিবাবণের মাথায় হাত রাখলেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে বললেন। সবাই আসবে, যেমন বছরকার দিন শুরু হবার আগে প্রাচীন বৃক্ষের মতো এক জীর্ণ বটের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাওয়া। কিংবা দিঘির পাড়ে গাছের ছায়ায় এখন এভাবে একের পর-এক সব ঘোড়া আর তার সওয়ার উঠে আসবে। ঠাকুরদা ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে পড়ে থাকবেন, কিন্তু আমাদের যে একটা কাক চাই। ঠাকুবদা ঘোড়া, আমাদের কাক।

তারপরই উঠে আসছে কালু শেখের ঘোড়া।

লাল রঙের ঘোড়া। কপালে তাজিয়, পায়ে লাল শালু, ঘোড়ার গলায় নীল-সবুজ রুমাল, আর ঝকঝক করছে রুপোর মেডেল। দোয়া চায় বুড়ো মানুষটার। কালু শেখের পরনে লুঙ্গি। সে ঘোড়াটাকে মাঠের উপর কদম দিয়ে দিঘির পাড়ে উঠে আসছে। পিঠে বসে, সে খুশিমতো ঘোড়াটাকে একই জায়গায় তিন-চারবার পাক খাওয়াল। বৈঠকখানার সামনে এলে ঘোড়াটা দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল।

এসব দেখার আশ্চর্য মজা আছে। আমাদের মনেই নেই, কাক খুঁজে ডেকে এনে গাছের ডালে লোভ দেখিয়ে বসিয়ে রাখা। বড় ধুরন্ধর মনে হচ্ছে কাক। ঘোড়াটা আমাদের দায়িত্বের কথাও ভুলিয়ে দিল।

একটা ঘোড়া; তারপর দুটো ঘোড়া, তার আরও সব বিচিত্র রঙের ঘোড়া দিঘির পাড়ে উঠে এসেছে।

নিরু বলল, "এই কালুদাদা, ঘোড়ায় চড়ে এলে, মাথার উপর কাক উড়ে আসেনি!"

কালুদাদা অবাক। সে আমাদের চেনে। প্রতি বছরই সংক্রান্তির দিন সে আসে দোয়া ভিক্ষা করতে। মানুষের বিশ্বাস যে কত রকমের হয়! মসজিদে আজু করে নামাজ পড়ে সে উঠে এসেছে দিঘির পাড়ে। ঘোড়াগুলি, আজ রাতে দিঘির পাড়ে থাকবে। বার-বাড়িতে সবাই আজ অন্ন-প্রসাদ নেবে। কালু বিশ্বাস শুধু বাদ থাকে। সে একটা হাঁড়ি পুড়িয়ে ভাত আর আলুর বর্তা বানিয়ে খায়। দিঘির জলে সাঁঝবেলায় দেখা যায়, ধোঁয়া উঠছে—জলে আগুনের প্রতিবিম্ব—আর কত গাছপালা পাখি, শুধু কাকগুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চোখে-চোখে রাখতে বলেছে, কাক দেখলেই যেন বাড়িতে খবর দিই। আর তখনই দেখলাম কয়েতবেল গাছে একটা কাক এসে উড়ে বসেছে। একজনের কাজ খবর দেওয়া, পাওয়া গেছে। কয়েতবেল গাছটায় একটা কাক উড়ে এসে বসেছে। আর আমাদের কাজ চুপচাপ গাছটার নীচে বসে থাকা। পাহারা দেওয়া। কোথায় না আবার উড়ে চলে যায়!

কাকটা উড়লে, আমরা প্রায় উড়তে থাকি। কাকটা গিয়ে বসে আছে শিমুলগাছের ডালে। এ-সময় শিমুল ফুল ফোটে। লাল রং—আর গাছের বিশাল কাণ্ডে বড়-বড় গুটির মতো কাঁটা। চৈত্রের রোদ, শিমুলের ফুল, ডালে কালো কাক, নীচে আমরা।

শিমুল গাছের মগডালে বসে আছে কাকটা। এত উপরে যে আমাদের ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে হচ্ছে। আর আমরা ডাকছি অবুকে খবর দে। ঠাম্মাকে খবর দে। কাকভোজনের কাজটা ছোটদেরই দায়িত্বে থাকে। বাড়িতে এত কাজ, কে কখন আর সময় করে উঠবে। এ ছাড়া বোধহয় কাকেরা ছোটদের ভয়ও পায় না। কাকের এমন উপদ্রব হয় বর্ষাকালে যে, একবার নমু বাইরের উঠোনে মোয়া খাচ্ছিল। কোত্থেকে উড়ে এল কাক, মোয়া নিয়ে উধাও। খারাব স্বভাব।

আর তখন নমুর কান্নাকাটি। একটা কাক মোয়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। গাছের মগডালে পার হয়ে ট্যাবার পুকুর পাড়ের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। আমার বোনের উপর কাকের এমন শত্রুতা সহ্য হয়নি। তারপর কাক দেখলেই আমরা তেড়ে যেতাম। গুলতি বানিয়ে ফেললাম। কাদা-মাটি ছেনে গুলি আগুনে পুড়িয়ে লোহার মতো শক্ত হলে তাই দিয়ে কাকের নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। ঝোপেঝাড়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকি আর ডালে এলে বসলেই, পটাস। ঠ্যাং-খোঁড়া কাকের সংখ্যা বেড়ে গেল। চোখ-কানা কাকের সংখ্যা বেড়ে

গেল। কাকের শাস্তিবিধানের এত সব উপায় বের করার পরও উপদ্রব কমেনি। পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং মারতে নেই, মারলে পাপ হয়, যদি কিছু একটা হয় আমাদের সেই ভয়টাও আছে।

তবু কেন যে কাক দেখলেই গুলতি ছুঁড়ি, বুঝি না।

একবার একটা কাক গাছ থেকে ফলের মতো টুপ করে পড়ে গেল।

মাথায় লেগেছে।

চিত হয়ে পড়ে থাকল। কাক মারতে নানাবিধ ওষুধও প্রয়োগ করা হয়। চটপটি বাজি, পিঠের ভিতর লুকিয়ে ছুঁড়ে দাও, দেখবে একের-পর-এক সব মরে পড়ে আছে। আমাদের বাবা-কাকারা ভিতু স্বভাবের। বাড়িতে গৃহদেবতা থাকলে নাকি কোনও প্রাণীকে হিংসে করতে নেই। আমরা যে দু-একটা কাকের পা, ঠোঁট, চোখ খোঁড়া করে দিয়েছি, বাবা-জ্যাঠারা তা জানে না। জানলে আমাদেরও যে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়া হত না, জোর দিয়ে বলা যায় না।

সে যাই হোক, এখন অবু গেছে কাকের জন্য অন্নব্যঞ্জন আনতে। আমরা মগডালে কাক-পাহারা দিচ্ছি।

এত দেরি কেন! কালু শেখ জলে নেমে স্নান করছে। গণপতি সুরের আসার কথা। বিখ্যাত জাদুকর। সংক্রান্তির দিন সেও ঠাকুরদার আশীর্বাদ নিতে আসে। গণপতি সুর প্রথম খেলাটা মেলায় দেখায়। তারপর সে তার মানুষজন, তাঁবু নিয়ে বের হয়ে পড়ে, কত দূরদেশে, পাহাড়ি জায়গায় যায়—গণপতি সুরের জাদুর খ্যাতি ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। ভারতীয় জাদুকরের নাকি এতই সময়জ্ঞান যে, শো আরম্ভ করতে এক-দু' মিনিট দেরি হয় না। এবার পাঁচ-দশ মিনিট নয়, ত্রিশ মিনিটও নয়, পুরো এক ঘন্টা দেরি। দর্শকরা ক্ষিপ্ত। তিনি মঞ্চে উঠতেই ঢিল পড়তে শুরু করেছে, এটা অবশ্য আমার তিনুকাকার কাছে শোনা। গণপতি সুর বলেছে, আরে, করছেন কি, আমি ঠিক সময়ে এসেছি। রাগ করবেন না। ঘড়ি মিলিয়ে দেখুন।

সবাই তাজ্জব। তাই তো, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় শুরু। হতবাক। এমন খবরে ঘাবড়ে যাবারই কথা, আরও সব গল্প আছে গণপতি সুরের। তিনটি মেয়েকে, দুটো করে দেয়। গলা কেটে দেয়, পেটে তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। তবু মরে না। এত সব জাদুবিদ্যার কথা আমরা শুনেছি। গাঁয়ের মেলায় সে খেলা শুরু করে, তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বর্ষায় ফেরে গয়নার নৌকায়। নদীর জলে টান ধরে গেলেই দেশে ফিরে আসে। আবার

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে সে বড়-বড় শহরে চলে যায়, সেই সব শহর, যেখানে ট্রামগাড়ি পর্যন্ত চলে। যেখানে গণপতি সুরকে সবাই চেনে। তার জাদু দেখার জন্য পুলিশ দিতে হয়। এত সব হয় মানুষটাকে নিয়ে, সেই মানুষ আজ আসবে কাছে। পায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকবে। ঠাকুরদাকে তামাক ভরে খাওয়াবে। গায়ে সাদা সিল্কের চাদর। পরনে গরদের ধুতি। খড়ম পায়ে হেঁটে আসবে সেই দু'ক্রোশ পথ। সঙ্গে লোকজন, ফুল-ফল, এবং ঠাকুরসেবার জন্য চাল-ডাল-আনাজপাতি, সে এক এলাহি ব্যাপার। বাড়িতে যে মোচ্ছব শুরু হয়েছে—গণপতি সুরের পাঠানো চাল-ডালে। লোকজন সকাল থেকেই আসতে শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের একটা মাত্রই দায়, কাকভোজন। কাকের ভোজনপর্ব শেষ হলে উঠোনে সারি-সারি কলাপাতা পড়বে।

কাকটা বসে আছে শিমূল গাছের মগডালে। আমরা এখন কা কা করছি না। দিঘির পাড় ধরে ছুটে গেছে অবু, লাবণ্য, নীহার। তারা বাড়িতে খবর দেবে, পাওয়া গেছে। একটা কাক খুঁজে পাওয়া গেছে। ছিল কয়েতবেল গাছের ডালে, উড়ে গিয়ে বসেছে শিমুলের ডালে। তারপর আবার উড়তে শুরু করলে কোথায় গিয়ে বসবে কেউ বলতে পারে না। কাকেরা খুব ধূর্ত হয়, কাক মানুষকে কম হয়রানি করে না, অথচ এই সংক্রান্তির দিনে কাকভোজনে তুষ্ট করতে হয় কেন জানি না। ইঁদুর, বিড়াল, ময়ূর ওদের ভোজন করালে দেবদেবীরা তুষ্ট হবেন জানি, কিন্তু কাকভোজন করলে কোন দেবী তুষ্ট হন জানি না। ঠাকুরদাকে বললে এক কথা, কাক হল পাখিদের মধ্যে কুৎসিত প্রাণী। তার জন্য মানুষের মায়া-দয়া কম। কেউ কাক পোষে শোনা যায়নি। কিন্তু ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছেন। হেলাফেলা করা ঠিক না। সুন্দরের উপাসন করতে হয়, আবার অসুন্দরেরও উপাসনা করতে হয়। সবই করুণাময়ের ইচ্ছে।

সুতরাং কাকভোজন করানোর অর্থ, প্রকৃতির সবাই মানুষের কোনও-না-কোনও উপকারে লাগে। এ-দিনে কাকভোজন করিয়ে প্রকৃতির নিকৃষ্ট প্রাণীটিকেও সেবা করার অর্থ, কিছুই হেলাফেলার নয়।

এখনও কাকটা বসে আছে। আমি, বড়দা, মেজদি গাছের গোড়ায় বসে আছি। সেজদি বড়দি সোনাদাও গেছে খবর দিতে। আর দেখলাম তখনই তারা আসছে সবাই মিলে। মাথায় সাদা পাথরের রেকাবি। ভাত, ডাল, উচ্চেভাজা, তিতের ডাল, টকের ডাল, চাটনি, পায়েস আর-একটা থালায় দু'জন মানুষের মতো অন্ন।

কে যেন ডাকল, "কী রে, তোরা এখানে!"

দেখি, বেলকুঁড়ি বকুলতলা থেকে উঠে আসছে। গাঁয়ের অনেকেই এসেছে ঘোড়াগুলি দেখতে। মেলায় যাবে, ঘোড়দৌড় হবে। ঠাকুরবাড়ির দিঘির পাড়ে গাছে বাঁধা, কত গাছ, আম-জাম-নরকেল-কয়েতবেল-কাঁঠালি-চাঁপার গাছ। বিশাল হাতিশুঁড়ের গাছ, চন্দন গাছ। রসুন গোটার গাছ—এত গাছ আর তার ছায়া এবং দিঘির কালো জলে শাপলা-শালুক-এত সব আকর্ষণ থাকতে বেলকুঁড়ি বকুলতলা দিয়ে উঠে আসতেই পারে। বেলকুঁড়ি তার বাবাকে এ-সময় ভাত দিতে যায়। মাঠের মাঝখানে, পরিত্যক্ত টিলায় পাতার ঝুপড়ি। বেলকুঁড়ির বাবা সেখানে থাকে। ঘরটার চারপাশে গণ্ডি আঁকা, তার মধ্যে হাঁটাহাঁটি, শোওয়া-বসা। এর বাইরে বের হলেই গাঁয়ের মাতব্বর মানুষেরা হাঁই-হাঁই করে ওঠে।

বেলকুঁড়ি বড় গরিব। তার বাবা গরিব। গাঁয়ের বাঁশবন পার হয়ে গেলে বেলকুঁড়িদের ঘর। ঘরে তার বাবা থাকে না, থাকতে দেওয়া হয় না। মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। বড় ছোঁয়াচে রোগ। রোগটা ধরা পড়তেই ঠাকুরদার কাছে নালিশ। বেলকুঁড়ির বাবার মুদিখানা দোকান। এই যেমন গাঁয়ে থেকে থাকে, রোজ হাঁটবার থাকে না, বাজার বসে না। হাটে যেতে [illegible] এক ক্রোশ হেঁটে গেলে সুলতানসাদির বাজার। গাঁয়ে যে-যার পুকুর থেকে মাছ ধরে— তবু চাল ডাল মসলা পাড়ায় কার কখন কম পড়ে যায়—ছোটো বেলকুঁড়ির বাবার মুদির দোকানে।

অবশ্য এসব আমাদের শোনা কথা। আমরা বড় হয়ে দেখেছি, মাঠের একপাশে দরগা পার হয়ে নির্জন এক টিলায় একটা শ্যাওড়া গাছ। তার নীচে পাতার ছাউনি দেওয়া একজনের মতো থাকার ছোট্ট ঘর। বেলকুঁড়ির বাবা মদন দাস বেঁটে-খাটো মানুষ। নাক বসে গেছে। আঙুলের ডগা ফুলে গেছে, ঘা। হাতে পায়ে ন্যাকড়া বাঁধা। ওপথে কেউ যায় না। যেতে সাহস হয় না। কেমন ভূতের মতো ঘরের ভিতর বসে থাকে। আবার পায়চারি করে। একমাত্র আমি যাই বেলকুঁড়ির সঙ্গে। আমার মা কেন যে এক সাঁঝবেলায় বলেছিল, বেলকুঁড়ির সঙ্গে যা। ভয় পায়। বেলকুঁড়ির মা, ভাত-ডাল-তরকারি গামছায় বেঁধে দেয়। বেঁধে দিলে সে আমাদের পুকুরপাড়ে এসে ডাকে নাম ধরে। আমি দৌড়ে গোপাটে নেমে যাই। বেলকুঁড়ি বাঁশবন পার হয়ে যায়, নলের বাগান পার হয়ে, দরগা বাঁয়ে ফেলে একঘটি জল আর গামছায় বাঁধা মাথায় এনামেলের থালা নিয়ে হাঁটে। ভয়ে আমি কাছে যাই না। কিন্তু বেলকুঁড়ি তার বাবাকে ভয় পায় না। ভয় সাঁঝবেলায় দরগার পথে হেঁটে ফিরে আসা।

ওর বাবা গেলেই কত কথা বলতে চায়। বেলকুঁড়ি তো দেরি করতে পারে না!

"তোর মা এল না!"

"আসবে।"

"কবে আসবে! তোর মা'র শরীর ভাল না!"

বেলকুঁড়ি জানে, তার মায়ের আসা বারণ। কী নিয়ে একবার যে ঝঞ্ঝাট হল, মা দৌড়চ্ছে, বাবা পেছনে দৌড় দিচ্ছে, সেই থেকে গাঁয়ের পাঁচজন বসে ঠিক করেছিল, বউমা, তুমি আর ওর ভাত নিয়ে যাবে না। বেলকুঁড়ি যাবে। বেলকুঁড়ি দু-তিন মাস হল যায়। দুপুরে একা যায়। সাঁঝ লাগার আগে আমি যাই। গরম ভাত না দিলে খায় না। ঠাণ্ডা ভাত হলে, ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পাতার ঘরটার কাছে গেলেই মনে হয়, মদন দাস সেই কখন থেকে মেটে থালা, মেটে গেলাস ধুয়ে বসে আছে, বেলকুঁড়ি কখন আসবে। বেলকুঁড়ি বাপের থালায় আলগা করে ভাত দেয়, তরকারি ঢেলে দেয়। তখন মদন দাস মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। ভাত দ্যাখো না, তরকারি দ্যাখে না, মেয়ের মিষ্টি মুখ দেখে আবার কালতক বেঁচে থাকবে এমন বোধহয় ভাবে। বেলকুঁড়ি ঘটির জল আলগা করে ঢেলে দেয় বাপের ঘটিতে, এতেও শেষ নেই, মহাব্যাধির বীজ কখন কীভাবে লাফায় সে জানবে কী করে, যদি তার হাত-পা পঙ্গু হয়ে যায়— ভয়ে সে দৌড়তে থাকে, আমিও দৌড়ই। বেলকুঁড়ি এসে আমাদের দিঘির জলে স্নান সেরে বাড়ি ফেরে। দু'বেলা সে যায়। দু'বেলা সে ফিরে আসে। দু'বেলা সে দিঘির জলে স্নান করে।

বেলকুঁড়ির ফ্রক ছেঁড়া। গরিব হলে ছেঁড়া ফ্রক পরতে হয়, বেলকুঁড়ি এমনই বলে থাকে। বাবা পঙ্গু হয়ে গেলে সংসারের যে শ্রী থাকে না, বেলকুঁড়িকে দেখে আমরা টের পাই। দিন-দিন কেমন মেয়েটার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। খেতেও পায় না ভাল। সবার বাড়িতে কাকভোজন, কেবল বেলকুঁড়ি ফাঁকা। তার কাজ নেই। বাপের ভাতও দিয়ে আসেনি। আজকাল, সাঁঝবেলায় রোজ যাওয়া হয় না। ভাতে টান পড়েছে। সেই মেয়ে এসে যখন বলল, কী রে তোরা এখানে! বেলকুঁড়ি তো জানে না, আমরা সতর্ক পাহারায় আছি। কাক কোথায় আবার না উড়ে যায়। মেজদি, বড়দি, সোনাদা এসে গাছের গুঁড়ির কাছে থালা সাজিয়ে রাখল।

আর তখনই আমরা একসঙ্গে ডাকছি "কা-কা-কা।"

কা-কা-কা ডেকেই চলেছি। কাকটা নির্বিকার।

বড়দা আর কী করে! পায়েসের থালা হাতে নিয়ে কাকটা দেখতে পায় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, কা-কা-কা। অর্থাৎ, কৃপা করে নেমে এসো। ভোজন করো।

আমরাও বড়দার কাছে গিয়ে ডাকলাম, "কা-কা-কা।"

না, উড়ছে না। বসে আছে।

বেলকুঁড়িকে বললাম, "তুই বাপের কাছে যাসনি?"

বেলকুঁড়ি কিছু বলল না।

এমনই স্বভাব বেলকুঁড়ির। ঘরে কিছুই নেই, থালা বাসন পর্যন্ত সব বন্ধক প্রসন্ন মজুমদারের কাছে, সব নিঃশেষ হবার মুখে। কিন্তু বেলকুঁড়ির কোনও শোক-তাপ নেই। শুধু ওর মুখ দেখলে আমার মা কী করে যে টের পায়, বেলকুঁড়িকে বারান্দায় বসিয়ে খাওয়ায়, একমাত্র মা'ই টের পায় বেলকুঁড়ি না খেয়ে আছে। ওর বাবা খায়নি, মা খায়নি। বাপের জন্য ভাত-ডাল পর্যন্ত দেয়। চাল-ডাল দিয়ে দেয় বেলকুঁড়িকে। বলে, তোর মাকে ফুটিয়ে নিতে বলিস।

সেই বেলকুঁড়ির জন্য আমাদের একটা কষ্ট থাকতেই পারে। তাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না।

বেলকুঁড়ি বলল, "বড়দা, আমার হাতে দে। দেখবি কাকটা নেমে আসবে।"

আমারও মনে হল, বেলকুঁড়িই পারবে। কারণ সে রোজ ভাত দিতে যাবার সময় কাকপক্ষী তাড়া করলে, ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা তার পেছনে উড়ছে, কারণ কাকেরা টের পায় বেলগুঁড়ি যাচ্ছে বাপকে ভাতদিতে। বেলকুঁড়ি ভাবে, এই কাকভোজনে হয়তো একদিন বাবা তার নিরাময় হয়ে উঠবে। আবার দোকানে বসবে। বাবার হাত-পায়ের ঘা সেরে যাবে। কুষ্ঠ রোগ হলে মরে না, সে শুনে আসছে। বড়ই কালব্যাধি। একমাত্র ভগমান পারেন, ভগমানের জীব এই কাকপক্ষী, কাঠবেড়ালি, এদের তো আর মা-বাবা নেই যে দেখবে, খেল কি খেল না। ভগমানই সব ব্যবস্থা করে দেন।

সুতরাং কাকপক্ষীদের সঙ্গে বেলকুঁড়ির পরিচয় আছে। তারা বোধহয় বেলকুঁড়ির ভাষা বোঝে। বেলকুঁড়িও তাদের ভাষা বোঝে!

বেলকুঁড়ি হাতে পায়েসের থালা নিয়ে ডাকল, "কা-কা-কা।"

কাকটা উড়ে এসে কাছে বসলে, বেলকুঁড়ি পায়েসের থালা রেখে সামান্য দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

কাকটা লাফিয়ে পায়েসের থালার কাছে এল, কিন্তু খেল না। উড়াল দিল।

একটাই মাত্র কাক, সেই কাকটা উড়াল দিলে, আমাদের আত্মারাম

খাঁচাছাড়া। বাড়ি থেকে তিনূকাকা দুবার খবর নিয়ে গেছে, কাক অন্নে মুখ দিয়েছে কি না। না দিলে খুবই অশুভ ব্যাপার। আমরা যদি না পারি, বড়রা পারবে কে! বড়দের শেয়ানাপনা ধূর্ত কাক শুধু কেন, নিরীহ কাঠবিড়ালি পর্যন্ত টের পায়। সুতরাং কাকভোজনের দায় আমাদের।

আমরা এখন কাকটার পেছনে ছুটছি। বাঁশবাগানে ঢুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। হা ঈশ্বর কোথায় উড়ে যাচ্ছে। না বেশি দূর না। বাঁশবাগান পার হয়ে বিশাল একটা কেঁউ গাছের মগডালে গিয়ে বসল কাকটা, এবারে কাকটা নিজেই কা-কা করে ডাকতে থাকল। যেন বলল, আছি, আমি আছি।

আমি ভাবলাম, আছ তো, নেমে আসছ না কেন। তুমি খেলে আজ সবার পুণ্য। তোমার এত আহারে অরুচি কেন বুঝি না বাপু। বাড়ি-বাড়ি খেয়ে বেড়িয়েছ বুঝি! সবারটা খাবে, আমাদেরটা খাবে না কেন?

এই এক কাক নিরন্তর যেন উড়ে চলেছে। চরাচরে আর কোনও কাক নেই, ভাবতে বিস্ময়ও ঠেকছে। সে যাই হোক, বেলকুঁড়ি যখন এসে গেছে সে যে-করেই হোক কাকভোজন করাবে। তার উপরে আমাদের আস্থা আছে। ওর জন্য আমি এত করি, আমাদের বাড়ির সবাই এত ভাবে, আর কাকভোজনে তার সাহায্য পাব না আশা করতে পারি না।

সোনাদা বলল, "যাঃ, উড়ে গেল।"

উড়ে গেল কোথায়! বেলকুঁড়ি ছুটছে। আমরা ছুটছি। কেবল ছুটতে পারছে না সেজদি, বড়দি, সোনাদা। তাদের মাথায় সাদা পাথরের রেকাবিতে কাকের ভোজন। সাদা পাথরের গেলাসে জল। ঠাকুর-দেবতার মতো আজ কাকের সেবা লাগে।

চৈত্রমাস শেষ, লাল ফুলে ছেয়ে আছে মাদার গাছ আর শিমুল গছ। যেন এক দাবদাহ। রোদ বড় প্রখর। আমরা ঘেমে গেছি। বেলকুঁড়ি হঠাৎ দূর থেকে আমাদের ইশারায় ডাকল। কাছে গেলে বলল, "খুঁজে পাচ্ছি না।"

"যা! সব গেল!"

কিন্তু বেলকুঁড়ি বলল, "এই জঙ্গলটাতে আছে।"

জায়গাটা দরগার একপাশে। ভেতরে ঢোকা যায় না। পাঁচিল দেওয়া বলে আমরা লাফিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাব, দেখি বেলকুঁড়ি হাতের ইশারায় বারণ করছে। তারপর আমাদের বুঝতে না দিয়েই সে ডাকতে থাকল, "কা-কা-কা।"

সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে শব্দ পেলাম--- কা-কা-কা।

বেলকুঁড়ির ভাষা এত বোঝে! অবাক হয়ে দেখছি। সে ভিতরে চলে গেল পায়েসের থালা নিয়ে, আবার ফিরেও এল। বলল, "উড়ে গেছে।"

"কোথায় ?"

"শ্যাওড়া গাছটায়।"

"তোর বাবার কাছে।"

"তাই তো মনে লয়। চল দেখি।"

সে এবারে আরও দ্রুত ছুটতে থাকলাম।

আর সেই পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে দেখি বদন কাকা বড়-বড় চোখে আমাদের দেখছে। আরও অবাক, শ্যাওড়া গাছে গাঁয়ের যত কাক উড়ে এসে বসেছে। আমাদের যে ত্রাস ছিল, কাক নেই, কাকভোজন হবে না, এখন এত কাক, উড়ছে, নাচছে, কা-কা-কা করছে। বেলকুঁড়ির বাবা কি গণপতি সুরের চেয়েও বড় জাদুকর। ঘরে-ঘরে ভোজ, অন্নপ্রসাদ, কাকভোজন, একমাত্র পরিত্যক্ত একটি পাতার ঘরে একজন উপবাসে আছে, গাঁয়ের কেউ জানে না! বেলকুঁড়ির বাবা কি তুকতাক জানে!

সে যাই হোক, আমরা এবার গাছের নীচে থালা সাজিয়ে দিলাম। বেলকুঁড়ি বলল, "কাছে যাস না।"

মদন দাস বলল, "একেবারে চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয়। সে ঢোক গিলল। কিন্তু সে জানে হাত দিয়ে পারবে না। এমন সাদা পাথরের রেকাবি সে জীবনেও দ্যাখেনি। ছুঁয়ে দিলেই গেল!

বেলকুঁড়ি বলল, "বাবা আজ খায়নি।"

বড়দা তেড়েফুঁড়ে গেল, "তোর বাবা খায়নি বলে সব কাক এনে এখানে জড়ো করবে! গেরস্তের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে কথা।"

মদন দাস মাথা দোলাচ্ছে। আর কেবল বলছে---- চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয়। সংক্রান্তি বলে কথা কর্তাঠাকুরেরা, বিবিধ আয়োজন। পায়েসের থালা ভর্তি। তা দু-তিনজনের আহার। বলে সে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল! অন্ধকার, পাতায় ছাউনি ঘরটায় কেউ থাকে বলে মনেই হল না। দিনদুপুরে এমন ভোজভাজি, আমরা বেলকুঁড়িকে বললাম, "কী রে, কাক এত সাধু হয়। একটা কাকও নেমে আসছে না! কিছু মুখে দিচ্ছে না।"

বেলকুঁড়ি বলল, "বড়দা, তুমি রাগ করবে না, একটা কথা বলি।"

"কী কথা ?"

আমার বাবাকে বলো অন্নগ্রহণ করতে। বাবা খেতে বসলেই সব কাকগুলি নেমে আসবে। বাবার তো আর কেউ নেই। শুধু কাকপক্ষীরা আছে। ওরা তো বোঝে আমার বাবা আর তারা এক কিসিমের প্রাণী।

বড়দা জানে, এই দামি রেকাবি থেকে অন্ন গ্রহণ করলে, বাড়িতে আর

নেওয়া যাবে না। সব ফেলে দিতে হবে। কেমন দোনোমোনো গলায় বলল, ‘তোর বাবার মাটির থালায় ঢেলে দে।”

আমরা কিন্তু তখনও ডেকে চলেছি, “কা-কা-কা।”

কাকস্য পরিবেদনা কাকে বলে জানি ন। একটা কাকও নেমে এল না। এমনকী টুকরে খাবার জন্য নাচানাচি করল ন। বড়দা কী বুঝল কে জানে। বলল, “মদনকাকা, তুমি খাও। তুমি বাইরে এসে বোসো। ঠাণ্ডা জল এনেছি ডাবের।”

কী যেন তৃপ্তির হাসি। ঘর থেকে কুশাসন বের করে বাইরে এসে আসন পিঁড়ি করে বসল। হাতের ত্যানা-কানি খুলে ফেলল। প্রথমে ভাতের রেকাবি থেকে কিছু ভাত নিয়ে ছুঁড়ে দিল চারপাশে। আর সঙ্গে-সঙ্গে কাক নেমে এল। নাচতে থাকল। কা-কা করতে থাকল। ঠুকরে খেল সব। কিছু অবশিষ্ট থাকল না।

মদনকাকা মুখ মুছে বেলকুঁড়িকে বলল, “তুই খেয়েছিস?”

বড়দা বলল, “আমাদের বাড়তে খাবে।”

“ওর মা খেয়েছে?”

আমি বললাম, “তিনিও খাবেন।”

মদন দাস বলল, “সেই। সবাই খাবে, না খেলে চলবে কেন! সংক্রান্তির দিন, বছর শেষ। বারো মাসে তেরো পার্বণ, মানুষের দুঃখ-কষ্টের তবু শেষ নেই। বড় তৃপ্তি পেলাম। সুস্বাদু খাবার কতদিন খাই না। আমি খাই না, বেলকুঁড়ি খায় না, তার মা খায় না।” বলেই ‘ইশ’ করে দিতে কাকগুলি চক্রাকারে সেই পাতার ঘরের চারপাশে উড়তে থাকল।

ভাবলাম, গণপতি সুর তুমি কত বড় মহাজন, ঠাকুরদা আপনি আরও বড়, কালু শেখ ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে মেলায় মেডেল পাবে বলে, কিন্তু যে মানুষটার সঙ্গে কাকপক্ষীর এমন নিবিড় বন্ধুত্ব, তার দাম কে দেয়!



ওপার

বাংলা



ভৌতিক কুয়াশা

আহসানুল হাবীব

অকস্মাৎ একটা সাদা ভালুক দেখে চমকে উঠলো তবারক হুসেন। আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তো ভালুকের গায়ে। একেবারে হাতের গোড়ায়। আট দশ ফুট সামনে। নিজের অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে এল তবারক হুসেন। সাদা ভালুক জীবনে দেখেনি সে। বাংলাদেশের কোথায়ও কোন চিড়িয়াখানাতেও সাদা ভালুক নেই। তবু চিনতে অসুবিধা হল না।

একটি নয়। দুটো সাদা ভালুক। একটি শুয়ে আছে মাটিতে কুকুরের মত

কুণ্ডলী পাকিয়ে। অপরটি দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। জিরাফের মত গলাটি উঁচু করে নাক কুচকিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে। আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে।

টাইম মেসিন ছেড়ে এসেছে তবারক হুসেন ঘন্টাখানেক আগে। এর মধ্যে আড়াই মাইলের বেশী পথ অগ্রসর হতে পারেনি। অন্তত রেডিও মনিটরের নির্দেশক কাঁটা তো তাই বলছে। পাথুরে চড়াই উতরাই এর মাঝে চলার অভ্যাস নেই। প্রথম পাহাড়টি পার হতে কষ্ট হয়নি। শ' দেড়েক ফুটের বেশী উচ্চতা ছিল না পাহাড়টির। ওটা পেরিয়ে পেয়েছিল একটি অসমতল মালভূমি। প্রায় একটি ফুটবল মাঠের সমান। তারপরই চোখে পড়েছিল একটি প্রাকৃতিক গিরিপথ। দু'ধারে পাহাড় আর মধ্যখানে বিশ পঁচিশ ফুট প্রশস্থ একটি পথ। গিরিপথের মুখে অশত্থ গাছের মত বিশাল একটি অচেনা গাছ। গাছের ছায়ায় আট দশজন জওয়ান ইনকা। আগুনের একটি কুণ্ডকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল দলটি। আগুনের ওপর বর্শাবিদ্ধ ছাল চামড়াহীন মুণ্ডুহীন ছাগলের মত আস্ত একটি প্রাণী। ভিকুনা সম্ভবত। দুজন ইনকা আগুনের দুদিকে বসে বর্শাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাঁছাছোলা ভিকুনাটিকে ঝলসিয়ে ঝলসিয়ে রোস্ট বানাচ্ছিল। দুপুরের খাদ্য হবে সম্ভবত।

পাথুরে ঝোপের আড়াল থেকে গোপনে ইনকা দলটির কার্যকলাপ দেখে সাবধানে সরে এসেছিল তবারক হুসেন। ইনকাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়াই উত্তম। গিরিপথটি ব্যবহার করতে পারলে হতো। পাহাড় ডিঙাতে হতো না। পরিশ্রম কম হতো। কিন্তু ইনকা দলটির চোখে ধুলো দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাই ঘুর পথে দ্বিতীয় পাহাড়টি ডিঙিয়ে এদিকটায় আসতে হয়েছে। এদিকটা আবার গাছগাছালিতে ভর্তি। সিনকোনা গাছটিকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছিল তবারক হুসেন। বেশ কয়েকটি সিনকোনা গাছ দাঁড়িয়ে পরপর। সিনকোনার বাকল থেকে তৈরী হয় যমতেতো কুইনিন। অন্য সময় হলে এক খণ্ড বাকল কেটে নেয়া যেত স্যুভেনির হিসেবে। কিন্তু এখন ওসব বাহুল্য সৌখিনতা করার সময় নেই।

সিনকোনার ডালে বাদুড়ের মত ঝুলে আছে দুটো 'শ্লথ'। দু' পায়ে আঁকড়ে ধরে আছে ডালটা। বাকী হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। ছোটখাট একটি ভালুকের বাচ্চার মত দেখতে। শরীরটা লোমশ। হালকা সবুজ লোমে ভর্তি। মুখটা শুয়োরের মত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে 'শ্লথ' দুটি।

'শ্লথ' দেখতে গিয়ে পায়ের দিকে খেয়াল করা হয়নি। লতাপাতায় পা আটকে অকস্মাৎ হুড়মুড় করে পড়ে গেল তবারক হুসেন। আর সমস্ত শরীরে একসাথে কয়েক শ' সূঁচ বিদ্ধ হল যেন! পড়বি তো পড় একেবারে সিরিউস

ক্যাকটাস ঝোপে। আস্ত ফনিমনসার মত। সিরিউস ক্যাকটাসের কাঁটাগুলো সূঁচের মত। খোঁচা খেয়ে নিজের অজান্তেই 'উহ্! কি কাঁটারে।' বলে ফেলেছে তবারক হুসেন।

আর সাথে সাথে পাশের কলাথোপের আড়ালে গা ঢেকে কে যেন পেত্নীর মত নাকি সুরে ভেংচি কাটলো,'উহ্ঁ। কিঁ কাঁটারেঁ।

তবারক হুসেন চমকে তাকালো সেদিকে। কলাগাছগুলো দীর্ঘ দীর্ঘ। কাণ্ডগুলো স্থূল। কলাগুলোও প্রমাণ সাইজের। কাঁদি কাঁদি ঝুলে আছে। পেকেও আছে কয়েকটা। তলায় ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকার। কাউকে দেখা গেল না সেখানে। ভুল শুনেছে নিশ্চয়। এখানে আর খাঁটি বাংলায় রসিকতা করবে কে। একমাত্র রীড ছাড়া। তবারক হুসেন সিরিউসের কাঁটা ছড়াতে ছড়াতে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো, 'কে রে তুই' ?

অমনি সিনকোনার ডাল থেকে পাঁচজনে একত্রে পেত্নীর মত নাকি গলায় ভেংচি দিল, 'কেঁ রেঁ তুঁই ?

কলাথোপের আড়াল থেকেও শোনা গেল, 'কেঁ রেঁ তুঁই ?

সামনে, ডিমের মত পাতা, সবুজ সবুজ ফুলের আভোকাডস গাছ। আভোকাডসের পাতার ঝুপড়ি থেকেও কয়েকজন ঠাট্টা করে বললো, 'কেঁ রেঁ তুঁই ?'

অদূরে পাইন গাছ কয়েকটা। পাইনের সরু সরু পাতার এখানে সেখানে পাকা আপেলের মত ফুটে আছে পাইন ফুল। সেই পাইন পাতার আড়াল থেকেও আরও কয়েকজন বলে উঠলো,'কেঁ রেঁ তুঁই।'

তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান নৈঋত ঊর্ধ অধঃ সব দিক থেকে নাকি সুরে একই কথা 'কেঁ রেঁ তুঁই'। একসঙ্গে যেন শত শত কণ্ঠ প্রশ্ন করতে লাগলো 'কেঁ রেঁ তুঁই।' আকাশে বাতাসে শুধু 'কেঁ রেঁ তুঁই।' 'কেঁ রেঁ তুঁই।' 'কেঁ রেঁ তুঁই।'

বিস্মিত তবারক হুসেন অবাক চোখে এদিকে ওদিকে তাকায়। রূপকথার স্বপনপুরীতে এসে পড়েছে নাকি! ভূতপ্রেতে আদৌ বিশ্বাস নেই তার, অতএব ভৌতিক নয় ব্যাপারটা। তাহলে ? ঠিক সে সময়েই জংলী আনারসের ঝোপ থেকে বিকট গলায় বেড়ালের ডাক দিল কেউ। ডাকটি বেড়ালের মত হলেও আওয়াজের ভল্যুমটি একটু বেশী। ঢাকের মত গুরুগম্ভীর। অমনি কলারথোপ, সিনকোনা, আভোকাডস এবং পাইনের ডালে ডালে ছটফটে হুটোপটির শব্দ। চঞ্চল পাখার ঝাপটাঝাপটি। তারপরই পত পত করে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখী। হেসে ফেললো তবারক হুসেন। মাকাও। তোতাপাখীর জাত ভাই।

রঙিন ডানা দুটো যেন জীবন্ত রংধনু। লাল, নীল, হলুদ, সাদা রংয়ের বাহার তার পালকে পালকে। বন-মোরগের মত দীর্ঘ রঙিন পুচ্ছ। ঠোঁটটি গাঢ় হলুদ। থুতনীটি লাল। ঝুঁটিটিও লাল। অদ্ভুত সুন্দর নকল করতে পারে মানুষের গলা।

ওদিকে আনারসের ডালপালা ভেঙ্গে চুরে দুমড়ে মুচড়ে বেরিয়ে এল একটি প্যানথার। পিঠটি হলুদ। বুক পেট সম্পূর্ণ সাদা। ছোট ছোট কান দুটো কাল। দীর্ঘ লেজটিও কাল। ঢাকার চিড়িয়াখানায় ব্ল্যাক প্যানথার দেখেছিল তবারক হুসেন। এটি তারই সৎ ভাই। বেড়ালের অগ্রজ। এবং রয়েল বেঙ্গলের অনুজ এই প্যানথার। স্থানীয় নাম পুমা। প্যানথারটি তবারক হুসেনকে দেখে গম্ভীর গলায় পুনরায় বেড়ালের ডাক দিল একবার। তারপর এক লাফে অ্যাভোকাডসের ডালে উঠে চকিতে হারিয়ে গেল ডালপালার আড়ালে।

তবারক হুসেন বাঁদরের কিচির মিচির মাকাও পাখির সংগীত শুনতে শুনতে সিনকোনা ও রাবার গাছের ছায়ায় ছায়ায় বনটা পেরিয়ে এধারের শামুকের পিঠের মত দেখতে ধূসর বনের পাহাড়টির ধারে চলে এসেছিল প্রায়। রেডিও মনিটরটি চেক করে রীডের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সে সময়েই একেবারে ভুঁইফুঁড়ে জলজ্যান্ত দুটো সাদা ভালুক।

এখানে সাদা ভালুক থাকার কথা নয়। সাদা ভালুক থাকে উত্তর মেরু অঞ্চলে। কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে। এবং রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে। মেরু অঞ্চলের ভালুক এখানে কি করে এল ? তা ভেবে পেল না তবারক হুসেন। রীড দেখেছিল আফ্রিকার বন্য হাতী। তবারক হুসেন দেখছে মেরু ভালুক। অলৌকিক না ভৌতিক ? গা টা ছমছম করে উঠলো তবারক হুসেনের।

ঘ্রাণ পেয়েই কিনা কে জানে দাঁড়ানো সাদা ভালুকটি ঘুরে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তবারক হুসেনকে দেখলো। দেখে যেন একটু বিস্মিত হয়েছে ভালুকটি। প্রথমে দু'তিন সেকেণ্ড সন্দেহজনক চোখে পিটপিট করে দেখলো। মাথাটি ডানে নাড়িয়ে ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ করলো বার কয়েক। দু'পা ছুটে এলো সামনে। ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ শব্দটা পালটে গেল এবার। রাগে গর-র গর-র করতে লাগলো সাদা ভালুকটি। পালানোর তাগিদ অনুভব করলো তবারক হুসেন। পা'জোড়া চঞ্চল হয়ে উঠলো। পেছনে ফেলে আসা বনটিকেই নিরাপদ মনে হোল, আপাতত। কিন্তু দৌড়াতে গিয়ে দেখলো, পিছনে নেই সবুজ বনটি।

বনের গাছপালা, গাছের শাখা প্রশাখায় বাঁদরের নাচানাচি, মাকাও পাখীর গান কিছুই নেই। বেমালুম গায়েব। উধাও হয়ে গিয়েছে বনটি। শুধু বনই

নয়, ডানেবামের গাছপালা প্রস্তরখণ্ড ঝোপঝাড় সামনের শামুকের মত ধূসর পাহাড়টিও নেই। একেবারে ফাঁকা। শূন্য।কিছুই চোখে পড়ছে না। এটা ছিল, এই নেই। যেন ভোজবাজীর মত উবে গেছে সব। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। যাদুকরের যাদুকাঠির স্পর্শে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে চারপাশের পৃথিবী।

আর সাদা ভালুক ও তাকে ঘিরে কুয়াশার মত এক ধোঁয়ার চাদর। সাদা সাদা পেঁজা তুলার মত ধোঁয়া ধোঁয়া। শরতের মেঘের মত শুভ্র চাপ চাপ ধোঁয়া। ভাসছে। স্থির হয়ে আছে। ধোঁয়ার মাঝে সাদা ভালুক দুটি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। সবকিছু ঢাকা পড়েছে শ্বেতশুভ্র ধোঁয়ার মেঘে। সমস্ত পৃথিবীকে যেন আড়াল করেছে পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার প্রাচীর।

হকচকিয়ে গেল তবারক হুসেন। ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে পড়লো। দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ করে সাদা ভালুক দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে, কিন্তু ঘাবড়ায়নি। কিন্তু এখন নিজের অজান্তেই শরীরের সমস্ত লোমগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে গেল। রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে গেছে। হাত-পাগুলো আতঙ্কে অসার হয়ে আসছে। চারদিকের আকস্মিক এই পরিবর্তন হতবুদ্ধ করে দিয়েছে তাকে। কোথায় পালাবে, কোনদিকে পালাবে, এই ধোঁয়া ও কুয়াশার রাজ্যে কোনদিকটা নিরাপদ হবে, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

সাদা ভালুকটি দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মত দাঁড়াল এবার। উচ্চতায় প্রায় সাত ফুটের মত হবে ভালুকটি। সামনের পা দুটো হাতের মত বুকের দুদিকে প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে ভালুকটি। কুতকুতে চোখে সরাসরি চোখের দিকে তাকাচ্ছে। যেন সম্মোহিত করতে চাইছে চাহনি দিয়ে! নিষ্ঠুর এবং হিংস্র সে চোখের দৃষ্টি। রাগে ফুঁসছে ভালুকটি। গর-র গর-র করছে আর এগুচ্ছে। এগুচ্ছে আর গর-র গর-র করছে।

ভালুকের শরীরের উৎকট দুর্গন্ধ পাচ্ছে তবারক হুসেন। ডান হাতটি বন্ধ। রেডিও মনিটরটি ডানহাতে ধরা। বামহাত দিয়ে রিভলবারটি বের করতে গিয়ে আর এক ঝামেলা। হোলস্টারটি ডান কোমড়ে। বামহাতে রিভলবার বের করা মুশকিল। অগত্যা বেয়নেটটি মুঠো করে ধরলো তবারক হুসেন।

ভালুকটি এগিয়ে আসছে। বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসছে। কোনরূপ বিপদের চিন্তা নেই ভালুকটির মনে। গর-র গর-র করছে আর এগুচ্ছে। সামনের পা দুটো দুদিকে প্রসারিত করলো আরও। জাপটে ধরবে এবার।

ভুরভুর ভুরভুর করে বোঁটকা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ভালুকটির গা থেকে। গন্ধে

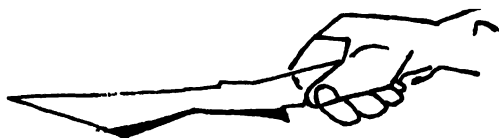
বমি আসে আরকি। নাকমুখ চেপে ডানপাটা একপা সামনে বাড়ালো তবারক হুসেন। ভালুকের হাত দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরার দু'সেকেণ্ড আগে হৃৎপিণ্ড বরাবর তাগ করে আমূল ঢুকিয়ে দিল বেয়নেটটি। বিকট কানফাটা চীৎকার দিল ভালুকটি। চীৎকার দিয়ে একপা পিছিয়ে গেল। পিচকারীর মত ফিনকি দিয়ে এক ঝলক উষ্ণ রক্ত এসে পড়লো তবারক হুসেনের সার্টে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বিতীয়বার বেয়নেট চার্জ করলো সে।

ভালুকটির বিকট চীৎকার এবারে গোঙানীর মত শোনালো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার লোমশ বুক। টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ভালুকটি। সামনের দু'পা ধপাস করে মাটিতে ফেলে কুকুরের মত চারপায়ে দাঁড়ালো। তারপর কেঁউ কেঁউ করে মাতালের মত দুলতে দুলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

না, লুটিয়ে পড়াটা দেখতে পেল না তবারক হুসেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে গেল ভালুকটির শরীর। অস্পষ্ট হয়ে গেল ভালুকটি। তারপর আরও একটু ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। তারপর আবছা আবছা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত মনে হল। তারপর পানির মতই স্বচ্ছ। ধোঁয়াটে ভাবটি কেটে গেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ভালুকদুটি নেই আর ওখানে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ভালুক দুটোর সাথে সাথে হাওয়া হযে গিয়েছে চতুর্দিকের চাপ চাপ তুষার শুভ্র কুয়াশা। ভোজবাজির মতই উধাও হয়ে গেছে পেঁজা তুলোর মত ধোঁয়া। যাদুকরের গোপন পৃথিবী যেন ফিরে পেয়েছে তার পুরোন রূপ। সবুজ বন, গাছের শাখায়, পাখির কিচির মিচির, ঝোপঝাড়, শামুকের পিঠের মত ধূসর পাহাড় সব।

তবারক হুসেন ঘুরে ঘুরে দেখলো। বন, পাহাড়, গাছপালা সবই ঠিক আছে। দেখে নিশ্চিত হল। বেশ স্বস্তি বোধ করলো। পরক্ষণেই আবার দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলো সে। যখন দেখলো, তার খাকী সার্টটির এখানে সেখানে ছোপ ছোপ তাজা রক্ত। আর বেয়নেটটির গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। ভেজা ভেজা আর গরম।





অভীকের অন্তর্ধান

স্বপন কুমার গায়েন

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে দেখি স্বাতী বারান্দায় একটি সোফায় চুপচাপ বসে আছে। রীতিমত অবাক হওয়ার ব্যাপার। দম দেয়া ঘড়ি অসময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিকেল বেলায় স্বাতী ঘরে বসে থাকতে পারে না কিছুতেই। তার তখন কত কাজ! বাগানে ছোটাছুটি করে রঙীন প্রজাপতি. ধরা, চিড়িয়াখানায় 'ডানোর' সাথে দেখা করা, 'মিমিকে' নিয়ে বেড়াতে বেরনো, পার্কে বান্ধবীদের সাথে খেলাধূলা করা আর এমনিধারা কত শত দরকারী কাজে প্রতি বিকেল কাটে তার। আগে থেকে জানা না থাকলে

বিকেলে তাকে খুঁজে বের করাই কঠিন হয়ে পড়ে। আর আজ এমন লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ বসে আছে।

আমি কাছাকাছি যাওয়ার পরেও ও তেমনি বসেই থাকে। কোন কথা বলে না। ভীষণ গম্ভীর মুখ। চোখ দুটো ছল ছল করছে। এমন সব অবস্থায় স্বাতীর মুখ থেকে কথা বের করার উপায় হল হাসির ছড়া কাটা। পুরানো একটা ছড়াই আওড়ালাম।

'কে মেরেছে, কে বকেছে,
কে দিয়েছে গাল।
স্বাতীমণি রাগ করেছে
ফুলিয়েছে গাল।'

তবু স্বাতীর মুখে কোন কথা নেই। কি হল, মামণি? শরীর খারাপ করেনিতো? বলে ওর মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে তাপ পরীক্ষা করে দেখলাম। না ঠিকই আছে। কি হয়েছে, বলতো আমাকে। মা বকেছে?

ঘাড় নাড়ে ও।

তাহলে?

জানো বাবা, অভীক কাকু আমার সাথে আজ কথা বলেনি। দেখাও করেনি।

এবার মনে পড়ে আমার। তাইত, আজ স্বাতী আর ওর সাথীদের নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে পিকনিক করতে যাওয়ার কথা অভীকের। অভীক সৌরজগতের খুবই নামী পদার্থবিজ্ঞানী। ট্রান্সসমাইগ্রেশানের ওপর কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেছে। রেডিওতে যেমন দূরের মানুষের কথা শোনা যায়; টেলিভিশনে যেমন ছবি দেখা, কথা শোনা দুই-ই হয় ওর আবিষ্কারটাও তেমনি। শুধু কথা বা ছবি নয়, যে-কোন পদার্থকে এই পদ্ধতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠান যাবে। রেডিওতে কথা বা গান শোনা যায় কিভাবে? রেডিও সেন্টার থেকে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে কথা বা গানকে এক ধরনের তরঙ্গে পরিণত করা হয়। এই তরঙ্গ দেখা যায় না। তবে এদের একটা নির্দিষ্ট কাঁপুনি বা ফ্রিকোয়েন্সী থাকে। এই অদৃশ্যতরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে শূন্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। রেডিওতে এই তরঙ্গ ধরার ব্যবস্থা আছে। যে কাঁপুনিতে আগে গান বা কথা প্রচার করা হয়েছিল রেডিও সেই কাঁপুনির তরঙ্গ ধরার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়। রেডিও সেই তরঙ্গ ধরে তাকে আবার কথা বা গানে পরিণত করে দেয়। অভীকের যন্ত্রও তেমনি। যে বস্তুকে অন্য জায়গায় পাঠাতে হবে, এই যন্ত্র দিয়ে তাকে এক নির্দিষ্ট কাঁপুনির তরঙ্গে পরিণত করে শূন্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অন্য প্রান্তে, মানে যেখানে বস্তুটি পাঠান হল, সেকানে

রেডিওর মত একটি গ্রাহকযন্ত্র থাকে। গ্রাহকযন্ত্র ঐ তরঙ্গ ধরে আবার তাকে পদার্থে পরিণত করে দেয়। এই তরঙ্গ ছোটে খুব দ্রুত। সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বা উপগ্রহে কোন বস্তু পাঠিয়ে দেয়া যায়। গতবার 'আন্তঃগ্রহ বিজ্ঞান সম্মেলনে' এই আবিষ্কার চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। অভীক এখন এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ, প্রাণী, এমন কি মানুষকেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখছে। সারাদিন এজন্য ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকে ও। তবে পনেরদিনে একদিন ওর স্বাতীর জন্য বরাদ্দ করা। আজ সেই দিন। তাই স্বাতীকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ না তোমাদের পিকনিকে যাওয়ার কথা'?

অভিকাকু তাই বলেছিল। আমরা সবাই রেডী হয়ে বসে আছি। কাকুর আর পাত্তা নাই। ফোন করলাম। বলল, আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। কোথায় কি'? এগারটায় আসার কথা। একটা, দুটো বেজে গেলো তাও এল না। ওরা অনেকক্ষণ দেরি করে চলে গেল। আবার ফোন করলাম। কোন সাড়া নেই। ভাবলাম কোথাও গেছে হয়ত। পরে ল্যাবরেটরি রিসেপশানে ফোন করে জানলাম, না ল্যাবরেটরিতেই আছে। বারবার ফোন করার পরও ফোন ধরেনি।.....

ও, এই ব্যাপার। নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজে আটকে গেছে। নইলে ঠিক আসত।

আসত না, ছাই। ভিডিওফোনে আমার ছবি দেখেনি বুঝি'? বললেই হত আসতে পারছি না। এবার এলে আর আমি কাকুর সাথে কথাই বলব না। আড়ি...আড়ি....আড়ি ...এই তিন আড়ি দিলাম।

সেকি, অপরাধের বিচার না করেই শাস্তি দিলে যে'? ওর কিছু বলার থাকতে পারে। আগে দেখ ও কি বলে।

কি আবার বলবে'? বললে শুনছেই বা কে'? অভিমানে ভারী ওর গলা।

বেশ যা ভাল বোঝ করো। এখন চট করে জামা-কাপড় পরে আস দিকি। চল বেড়িয়ে আসি।

পরেরদিন। দুপুরে অফিসে বসে একটি নু-তাত্ত্বিক অভিযানের রিপোর্ট দেখেছিলাম। ভারতের শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে এক ধরনের নর-বানরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এরা হেলোসিন যুগে বেঁচে ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এরা মানুষের আদি পূর্ব-পুরুষ। গাছের শাখা থেকে নেমে আসার পর মানুষের পূর্ব-পুরুষেরা যেমনটি ছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ

কঙ্কালগুলির গড়নের সাথে তা অনেকটা মিলে যায়। এ ধারণা সত্যি হলে দীর্ঘদিনের একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রিপোর্ট দেখতে দেখতে ভাবছিলাম মানুষ আর তার সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল স্বাতী।

জান বাবা, অভিকাকুকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাল অনেকরাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরি থেকে না বেরনোয় কাকুর সহকারীর সন্দেহ হয়। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। বার বার ডেকে সাড়া না পাওয়ায় দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে সবাই। কিন্তু কাকুকে আর পাওয়া যায়নি। এখন কি হবে, বাবা? বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল।

অভীকের রহস্যজনক অন্তর্ধান তুমুল আলোড়ন তুলল। সবার মুখে মুখে একই প্রসঙ্গ ফিরছে। জলজ্যান্ত একটি মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেল কি করে! হাজার চেষ্টা করেও বিশেষজ্ঞরা কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ এই নিখোঁজ হওয়া নিয়ে মজার মজার গল্প ফেঁদে বসল। কেউ বলল, কোন উন্নত ধরনের অদৃশ্য প্রাণী এসে তাকে অদৃশ্য পদার্থে পরিণত করে নিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। অন্য একদল রটাতে শুরু করল, সে নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেছে.....ইত্যাদি। সংবাদপত্রগুলো কড়া সম্পাদকীয় লিখল অনুসন্ধান বিভাগকে আক্রমণ করে। কেন তারা আজো এই মহান বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করতে পারছে না?...এদিকে স্বাতী ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছে। ভাল করে কারো সাথে কথা বলে না। ডানোর সাথে দেখা করতে যায় না। পোষা প্রাণীগুলোর দিকে খেয়াল নেই কোন। সব সময় টেলিভিশনের সামনে বসে থাকে। যদি হঠাৎ খবর আসে। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, কাকু কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না?

আমি জোরাগলায় বলি, নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু যতদিন যায়, হতাশ হয়ে পড়তে থাকি। স্বাতীও কেমন যেন হয়ে যেতে থাকে দিন দিন।

আরো কয়েকদিন পর। নানা চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত আসছিল। স্বাতীর ডাকে জেগে উঠলাম।

বাবা, কাকুর খবর পেয়েছি।

কখন? কোথায় আছে ও?

আমাকে অতটা উত্তেজিত হতে দেখে খানিকটা চুপসে গেল যেন স্বাতী। বলল, না আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা উঁচু টিলার মত জায়গা। দেবদারু আর ঝাউয়ের ঝাড় সে টিলার গায়ে। বুনো ফুল আর লতাপাতায় ছেয়ে ফেলেছে সারা টিলা। বড় বড় রঙীন সব প্রজাপতি উড়ছে। পাখি ডাকছে।

তার মধ্যে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাকু। খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কেমন আবছা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছিল কাকুকে। আমি ডাকলাম। উত্তরে হাত নেড়ে কি যেন বলল। তার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার।

এবার স্বাতীর জন্যই ভাবনা হল আমার। মেয়েটা পাগল না হয়ে যায়। বললাম ও কিছু না। তুমি এসব নিয়ে খুব ভাবছ কিনা। তাই অমনি স্বপ্ন দেখেছ।

কিন্তু কাকু যে বলত, ছোটদের স্বপ্ন অনেক সময় সত্যি হয়?

অভীক একবার বলেছিল একথা। গাঢ় ঘুমের সময় মানুষের মন সব চিন্তা-ভাবনা মুক্ত থাকে। অনেক দূরে থেকেও তখন নাকি তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ঘুমন্ত মানুষের মনে হবে সে স্বপ্ন দেখছে। যোগাযোগ করার সময় যেসব কথা বলা হবে বা যেসব দৃশ্য ব্যবহার করা হবে ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে সে সবই শুনবে বা দেখবে। শিশুদের মন সরল বলে তাদের সাথে যোগাযোগ করা আরো সোজা। এ ধরনের যোগাযোগ হলে ছোটরা যেসব স্বপ্ন দেখবে তার অনেকটাই হবে সত্যি। এই ছিল অভীকের যুক্তি। আর এ ধরণের যোগাযোগ সহজেই যাতে করা যায়, তেমনি একটি উপায় বের করার চেষ্টা করছে, তাও বলেছিল। স্বাতীর কথা তাই খানিকটা ভাবিয়ে তুলল আমায়। কিন্তু সবকিছুই তখনো অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

পরদিন। ভাল করে ভোর হয়নি তখনো। স্বাতী ঘুম থেকে ডেকে তুলল আমাকে। বাবা, তাড়াতাড়ি চল। কাকুর ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে।

কেন? কি হয়েছে?

যেতে যেতে সব বলব তোমাকে। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হও। তাড়া দিল স্বাতী। ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল ওকে।

পথে নেমে শুধোলাম, এবার বলত কি হয়েছে?

কাল তোমাকে একটা জায়গার কথা বলেছিলাম না? সেখানে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কাকু দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গাছ ছেড়ে তিন হাতের বেশি যাওয়ার সাধ্য নেই তার। ল্যাবরেটরিতে কি একটা ভুলের জন নাকি তার এ দশা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কি করতে হবে, কাকু স্বপ্নে আমাকে বলে দিয়েছে। সেটি ঠিক ঠিক করতে পারলেই নাকি কাকু আবার ফিরে আসবে।

কি করতে হবে ল্যাবরেটরিতে?

উহুঁ, সেটি বলছি না আগেভাগে। স্বাতীর মুখে দুষ্টু হাসি। আবার আগের মেজাজ ফিরে পেয়েছে সে।

ঘণ্টাখানেক পর। ল্যাবরেটরির পরিচালককে সাথে নিয়ে আমরা অভীকের ঘরে ঢুকেছি। পরিচালক প্রথমে এসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করতে চাননি। স্বাতী তখন তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোককে আসতে হয়েছে। সারা ঘর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। মিলিয়ন চ্যানেল কম্পিউটার দুটো দেখলাম বেকার দাঁড়িয়ে আছে। জটিল সব ইলেকট্রনিক সার্কিট অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অভীক নিখোঁজ হওয়ার পর কেউ আর ওদের ব্যবহার করেনি।

ট্রান্সমাইগ্রেশান ট্রান্সমিটার কোনটা'? স্বাতী প্রশ্ন করে পরিচালকের দিকে তাকিয়ে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকান ওর দিকে। তারপর ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা যন্ত্রের দিকে নির্দেশ করেন। একছুটে স্বাতী গিয়ে দাঁড়ায় তার পাশে। আমরাও এগিয়ে যাই।

ম্যাক্রো থাইরোট্রন কোনটি'? আবার প্রশ্ন করে স্বাতী পরিচালককে। দেড় ফুট ব্যাসার্ধের একটি কাঁচের গোলক দেখিয়ে দেন পরিচালক এবার।

দেখুন তো এর কারেন্ট সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা।

উহুঁ ফিউজ পুড়ে গেছে দেখছি, সাপ্লাই লাইন পরীক্ষা করে জবাব দেন পরিচালক।

একটা ফিউজ নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি, নির্দেশ দেয় স্বাতী। পরিচালক ফিউজ নিয়ে আসতেই স্বাতী তা জায়গামত লাগিয়ে দেয়। ম্যক্রো থাইরোট্রনের ভিতর একটা তীব্র নীল আলো দপ করে জ্বলে উঠেই আবার নিভে যায়।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সুখবর পেয়ে যাবেন। বলে বিমূঢ় পরিচালককে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসে স্বাতী।

ঘরে ফিরে দেখি বাইরে নরম মিঠেল রোদে চেয়ার পেতে বসে বেশ আয়েশ করে চা খাচ্ছে অভীক। আমার হতবাক অবস্থা দেখে ওরা দুজন জোরে হেসে ওঠে।

ওরে দুষ্টু তুমি দাদাকে কিছুই বলনি। স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলে অভীক।

কি আমি দুষ্টু'? চোখ পাকায় স্বাতী। গাবগাছে ভূত হয়ে থাকতে আমি না হলে। আর এখন আমাকেই দোষ দেয়া হচ্ছে।

অভীক হেসে কোলে টেনে নেয় ওকে। না, না, তুমি কত লক্ষ্মী মেয়ে।

পরে ভোরের নাস্তা করতে করতে অভীকের মুখে শুনি তার দুর্ভোগের কথা। ট্রান্সমাইগ্রেশান করে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে ঘটনার দু তিন আগে

পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করে ও। আমাদের না জানিয়ে ও এখানেও একটা গ্রাহকযন্ত্র বসিয়েছিল। স্বাতীর ফোন পেয়েই ও নিজেকে ট্রান্সমাইগ্রেট করে। ইচ্ছা ছিল স্বাতী ডায়ালে ফোন নামিয়ে রাখার পর পরই এখানে পৌঁছে ও চমকে দেবে স্বাতীকে। কিন্তু ফিউজের গোলমালে সব ভেস্তে যায়। পুরোপুরি ট্রান্সমাইগ্রেশান সম্ভব হয় না। শরীরের যেটুকু তরঙ্গে পরিণত হয়েছিল সেটুকু এখান থেকে দশ মাইল দূরে ঐ টিলার গায়ে জমাট বাঁধে।

আর তার পরের ঘটনা ত সবই আপনার জানা, বলা শেষ করে অভীক।

স্বাতী এখন বলে,ভালই হয়েছে ঘটনাটা ঘটে। নাহলে পিকনিক করার এমন সুন্দর জায়গার খোঁজ কি সহজে পেতাম '?

ফি-হপ্তায় ওরা ঐ টিলার পাশে চড়ুইভাতি করতে যায়।





তাজীর কলসী

অনামিকা হক লিলি

তাজি নামের কিশোরী মেয়েটি মরুভূমি থেকে কিছুদূরে একটা মালভুমিতে বাস করতো। সেই উঁচু মাল ভূমিটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর তার বাতাস এমন মোলায়েম ছিল যেন পাতলা বরফ। এখান থেকে দূরে পর্বতমালা আর ছোট নীল পাহাড় চূড়োকে বেশ কাছে বলেই মনে হত। তাজী ছিল ভারতের 'পিঁড়বলো'র মেয়ে। তার গায়ের রং ছিল বাদামী, ঠিক রোদে শুকানো বাদামের যেমন রং হয় তেমন। তাজী মালভূমির দিকে তাকিয়ে থেকে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতো।

কিন্তু তাজীর স্বপ্ন দেখার মত অবসর ছিল না। খুব কঠিন কাজ না হলেও, অনেক অনেক কাজ তাকে করতো হতো। একটু সময় পেলেই সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো কি করে কদিন আগের দেখা ধূসর মাটিতে আস্তে আস্তে সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠে বসন্ত আসার সাথে সাথে। তাজী মালভূমির নীচে যেয়ে মায়ের সাথে কাজ করতো।

তাজী দূরে ঝরণা থেকে পানি এনে বড় বড় কলসী ভরে রাখতো। প্রতিদিন সে তার মায়ের সাথে মাঠে গিয়ে বিভিন্ন রঙের শস্য ক্ষেতে কাজ করতো। মায়ের গুছিয়ে রাখা ধানের ঝুড়িও সে বাড়ি বয়ে আনতো।

যখন কেউ থাকতো না বা তাকে কেউ দেখতে পেতোনা সেই সময় সে চুপচুপ করে একটা কাজ করতো। সে কাদামাটি দিয়ে একটা কলসী বানাতো। মধুর মত নরম মাখনের মত মোলায়েম আর ঘন কালো মাটি দিয়ে সে কলসীটা বানালো। তাজীর কলসী বানানোর কথা কেউ জানতো না, এমনকি তার মাও জানতো না।অবশ্য সে কলসীটা একটা বিশেষ কারণে তৈরী করছিল।

তাজীর মা যেভাবে কলসী বানায় সেও ঠিক সেই ভাবেই কলসীটা বানাতো। আর একদিন সে সম্পূর্ণ নিজের হাতে একটা কলসী বানিয়ে ফেললো। যেদিন সত্যি সত্যি শেষ হয়ে গেলো সেদিন সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না, কারণ কলসীটা সত্যই অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল। কলসীটাকে সে যখন সোনালী খয়েরী করে পুড়িয়ে নিল আর কালো রং দিয়ে লাইন টানলো ও নানারং দিয়ে নকশা আঁকলো, তখন সেটা সত্যই অপূর্ব হয় উঠলো। তাজীর মনে হল এমন সুন্দর কলসী সে কোথাও কখনও দেখেনি। সে অত্যন্ত যত্নের সাথে একটুকরো কম্বল দিয়ে কলসীটাকে জড়িয়ে লুকিয়ে রাখলো।

যখন তাজী মাঠে বা অন্য কোথাও কাজ করতো সব সময় তার মন পড়ে থাকতো কলসীটার দিকে। কলসীটার কথা ভাবতে ভাবতে কলসীটা নিয়ে একটা গান রচনা করে ফেললো আর তারই তালে তালে নাচতো সময় পেলেই।

গানটার ভাব ছিল এরকম—

কি সুন্দর কলসী—
আমার মস্ত গোল কলসী—
চাঁদ যেমন গোল আর সুন্দর,
আমার কলসীও যেন চাঁদ,
চাঁদ যেন পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে।
নরম গোল চাঁদ যেমন উজ্জ্বল

আমার কলসীও তেমন চকচকে,
হয়তো চাঁদই এসে ঢুকেছে আমার কলসীতে।

তাজীর কলসী বানানো শেষ হবার কদিন আগেই পিউবলো শহরের গভর্ণর শহরের সকলকে শহরের খোলা মাঠে একদিন একত্রিত হবার কথা জানালেন। আশে পাশের তিনটি শহরের লোক সেখানে জমায়েত হবে, নাচ গান আনন্দ করবে, খাবে খেলবে ও বেড়াবে। আর তার সাথে এও বলেছে যে স্ত্রীলোক, বালকবালিকা প্রত্যেককেই তার নিজের তৈরী একটা করে জিনিস দেখাতে হবে। কোনো এক বিদেশী শ্বেতাঙ্গ জ্ঞানী নাকি বলেছেন, "ভারতীয়রা কোন ভাল জিনিসই নিজেরা তৈরী করতে পারে না আর সেই জন্যই ভারতীয় শিশুদের শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে যেয়ে এ ব্যাপারে শিক্ষাগ্রহণ করা দরকার।"

ভারতীয়রা তাদের ছেলেমেয়েদের দূরে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতে রাজী ছিল না। তারা নিজেরাই সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করে সেই শ্বেতাঙ্গদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল যে ভারতীয়রা কারও চেয়ে কম নয়। বিদেশীদের কথার ভুল ভেঙে দেবার জন্যই গভর্ণর এই আনন্দ মেলার আয়োজনের কথা বলেছেন। যারা যারা সত্যকার ভাল জিনিস দেখাতে পারবে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

গভর্ণরের কথায় শহরের চারিদিকে বেশ সাড়া পড়ে গেল। নানান রকম জল্পনা কল্পনা হতে লাগলো আর প্রস্তুতি নিতে থাকলো সবাই। তাজী প্রথম থেকেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইল, আর প্রতীক্ষা করতে থাকলো কবে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি আসবে।

সুন্দর আনন্দ-মুখর দিন। আকাশে বাতাসে যেন সেই আনন্দের সাড়া লেগেছে। তাজীর এত ভাল লাগছিল যে সে অন্যদিনের মত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে, চলতে, বলতে, এমনকি নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিল না।

শহরের সেই খালি মাঠে আলো জ্বালিয়ে রঙিন কাগজ দিয়ে তোরণ বানিয়ে সাজানো হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন মেলা বসেছে। চারিদিকে মিষ্টি সুগন্ধ বইছিল আর গান বাজনার শব্দ ভেসে যাচ্ছিল বাতাসে। চারিদিকে জিনিস সাজিয়ে সবাই বসে গেছে অন্যদের দেখাবার জন্য। কোথাও মাটির পাত্র, কোথাও রূপার গহনা, হাতের বালা, কানের দুল, মাজার বিছা, কোথাও রঙিন কম্বল, কোথাও চামড়া আর কাঠের জিনিস। একদিকে বড় বড় লাউ, কুমড়ো, সুপুষ্ট ধান-গম-ছোলা, অন্যদিকে বাহারের মনিহারী জিনিসপত্র। এত বড় আর সুন্দর জিনিস তাজী আগে কখনও দেখেনি। সুন্দর সুন্দর চামড়ার জুতো, সেন্ডেল, জালের তৈরী ব্যাগ, স্তূপ করা কত ফলমূল, ফলের ঝাঁকা আর পাইন, বাদাম দিয়ে বানানো কত পিঠা, হাঁড়ি হাড়ি কত খাবার।

তাজী প্রায় সবার শেষে সেই সুন্দর আনন্দের দিনে খোলা মাঠে এলো। সে মায়ের সাথে তাদের বাসার কাজে ব্যস্ত ছিল। বাসাটাকেও তারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে যাতে বাইরের লোক দেখে প্রশংসা করে। কাজ শেষ করে সে কম্বলে জড়ানো কলসীটা নিয়ে দৌড়ে মাঠে আসলো আর শক্ত করে ধরে থাকলো তার কষ্টকরে বানানো জিনিসটা।

বৃদ্ধ গভর্ণর আর দু'জন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকটা জিনিসের কাছে যেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন—বিচার করে পুরস্কার দেবার জন্য। কারণ গভর্ণর আর শ্বেতাঙ্গ দু'জনেই ছিলেন বিচারক।

একটা ছোট্ট ফুটফুটে বিদেশী মেয়েও তাঁদের সাথে আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। মেয়েটি সবকিছুই খুব উৎসুক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মেয়েটির বাবাও খুশী হচ্ছিলেন ভারতীয়দের তৈরী জিনিসপত্র দেখে। মনে মনে তিনি এদের প্রশংসা না করে পারছিলেন না। এদিক ওদিক দেখে তাঁরা এসে পৌঁছালেন তাজীর কাছে। তাজী হাত দিয়ে জড়ানো জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখলো ঠিক আছে কিনা। তাঁদের কাছে আসতে দেখে তাজী কেমন একটু ভয় পেলো। মনে ভাবলো তার জিনিসটা হয়ত তাঁদের পছন্দ হবে না। কেউই জানতো না যে তাজী কিছু দেখাবে। তাই অনেকেই তাজীর কাছে এলো।

তাজী মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলো, 'হয়তো এটা খুব সুন্দর হয়নি আবার হতেও পারে।' ভীত মিনমিনে গলায় তাজী এই কথা বলতে বলতে তার জড়ানো কম্বলটা খুললো। খুলেই তাজী ঘাবড়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলো তার সুন্দর কলসীটা কম্বলের ভিতরে নেই। বরং যেখানে রয়েছে একটা পুরানো খড়ের পুতুল। তাজী জানতোনা যে তাদের ঘরে এটাও কম্বল দিয়ে মা জড়িয়ে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি আসতে আর অস্থিরতায় সে ভুল করে নিজের জড়ানোটা না এনে অন্যটা নিয়ে এসেছে।

পাশের সবাই তাজীর কাছে পুরানো পুতুলটা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি ঠাট্টাতে তাজীর ভুলের কথা কেউ শূনতে পেলোনা। গভীর দুঃখে তাজী এক দৌড়ে মাঠ ছাড়িয়ে বাড়িতে এলো । সে জানতো না যে সেই ছোট্ট মেয়েটিও তার পিছনে পিছনে আসছিল সেই পুরানো পুতুলটা আবার দেখবার জন্য। তাজীর একটু পিছনে পিছনেই মেয়েটি দৌড়িয়ে আসছিল।

মালভূমির উপরে তাজীদের সুন্দর ছোট বাসা। তাজী সোজা দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল আর ছোট মেয়েটি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল তাজীর

জন্য। ছোট মেয়েটি মাথা দেখে একটা বিষাক্ত সাপ দরজার পাশে পাথরের ভিতর থেকে মাথা বের করছে। ভয়ে মেয়েটি চিৎকার দিয়ে উঠলো। তাজী তখন তার কলসীটা কম্বল থেকে খুলে নিয়ে দরজার দিকেই আসছিল। কি করবে তাজী ভেবে পেল না। অথচ সাপটা ক্রমশ মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আর বেশ কাছে চলে এসেছিল সাপটা প্রায় ছোবল তুলল বলে—চিন্তা করার মত কোন সময় ছিল না। কাউকে ডেকে সাহায্য চাওয়ার মত সময়ও ছিল না—ওদিকে ভীত বিবর্ণ মেয়েটাকে দেখে তাজী তার হাতের কলসীটা ছুঁড়ে মারল।

কলসীটা সে একেবারে ঠিক মেরেছিল। সাপটার মাথায় লেগে সাপটা চ্যাপ্টা হয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল—ছোট মেয়েটার চিৎকার তার বাবাও শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

তাজী খুশী হয়ে বলে উঠল, 'যাক সাপটা মরেছে তাহলে।' তারপরই তার প্রিয় কলসীটার কথা মনে হল। ছলছল করে উঠল তার দুই চোখ। মনে মনে বলল, 'কেউ আর এখন তার কলসীটাকে সুন্দর বলবে না।' তাজী একটা ভাঙ্গা টুকরো কুড়িয়ে নিল আপন মনে।

একজন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ তাজীর হাত থেকে ভাঙ্গা টুকরো নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা নিশ্চই খুব সুন্দর একটা মাটির কলসীর টুকরো। তুমি কি এটা বানিয়েছিলে?"

তাজী মাথা নাড়ল।

ছোট মেয়েটার বাবাও প্রথমে তাজীর কলসীর ভাঙ্গা টুকরোটা দেখলেন পরে তাজীকে দেখলেন। তাজীই আজ তার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের গলা ভার হয়ে এলো, তিনি ভাঙা গলায় বললেন, "সত্যিই কলসীটা খুব সুন্দর হয়েছিল।" তাজীর জন্য দুঃখ বেদনায় তার গলা বারে বারে চেপে আসছিল, গলা ঝেড়ে কেশে নিয়ে তিনি বললেন, "কিন্তু ভাঙ্গা কলসীর জন্য এখন কি করে পুরস্কার দিই?"

মেয়েটার বাবা তাজীর হাত চেপে ধরে বললেন, "পুরস্কার না হয় নাই দিতে পারলাম কিন্তু আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি। তুমি যা চাইবে তোমাকে আমি তাই দেব। বল, দয়া করে বল, তুমি কি চাও।"

প্রথমে তাজী কিছুই বলতে পারল না। তারপর ভেবে নিয়ে বলল, "আমার নিজের চাওয়ার কিছু নাই। কিন্তু আমি পিউবলোবাসীদের জন্য কিছু চাই। শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে শিখবার জন্য আমরা দুরে যেতে চাই না। একটা কাজ শিক্ষার স্কুল আমরা এই পিউবলো শহরে চাই।"

শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি হেসে তাজীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে তাই হবে—শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকেরা এখানে একটা স্কুল খুলবেন, আর সেখানে ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গরা এক সাথে কাজ করবে ও শিখবে একে অন্যের কাছ থেকে। কারণ আজ এখানে আমি যা দেখছি তা থেকে বুঝেছি শ্বেতাঙ্গদেরও অনেক শিখবার আছে ভারতীয়দের কাছ থেকে। আর তোমার সুন্দর কলসীটার টুকরোই তার প্রমাণ দেয়।

তাজী এখন ভীষণ খুশী। কলসী ভাঙ্গার জন্য তার মনে আর কোন ক্ষোভ-দুঃখ নেই। সে এখন থেকে অমন একটা নয় আরও অনেক কলসী বানাতে পারবে, এমনকি আরও সুন্দর করে। আর পিউবলোর সবাই আরও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ সুন্দর করে শিখতে ও শেখাতে পারবে।





জীবন্ত রাডার

কামাল আরসালান

—না, -আর পারা গেল না মিনুকে নিয়ে। আজও বারটা বাজতে না বাজতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন কপালে হাত দিয়ে বসে আছে। গত ছ'দিন ধরে প্রতিরাতেই এরকম হচ্ছে।

কয়েকদিন হল দীঘায় এসেছি। দীঘা হল কলকাতা থেকে শ' তিনেক মাইল দূরে সমুদ্রের উপকূলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সঙ্গে ছিল আমার দু'বোন। মিনু ও শানু। মিনু কলেজে পড়ে, শানু ক্লাস সেভেনে। সেখানে একটা দু-কামরাওয়ালা কটেজ ভাড়া করেছিলাম। একটা কামরায় থাকতাম আমি।

পাশেরটা দিয়েছিলাম মিনু ও শানুকে। প্রথম কয়েকদিন খুব আনন্দেই কেটে গেল। তারপর থেকেই আরম্ভ হল এই অনাসৃষ্টির ।

দুদিন আগে রাত প্রায় সাড়ে বারটার সময় শানু এসে আমার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল । সাড়া দিতেই চেঁচিয়ে বলল— ভাইয়া,মিনু আপার ভীষণ মাথা ধরেছে। তুমি তাড়াতাড়ি এস।

—ঠিক আছে,আমি আসছি। তুই ওর কাছে যা। বলে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। খুবই অবাক হয়েছিলাম। সারাদিন যে হেসে খেলে কাটিয়েছে দুপুর রাতে তার নাকি আবার মাথা ধরেছে।

গেলাম তাদের ঘরে। দেখি মিনা তার ডান হাতটা দিয়ে কপালটা টিপে ধরে বিছানায় বসে আছে। কিছুদূরে শানু দাঁড়িয়ে আছে। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার জন্য দুজনেরই চোখগুলো ফোলা ফোলা।

হঠাৎ তোর মাথা ধরল কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম। মিনু বলল—কি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করতেই সেই বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নটা ভেসে উঠল। এরপর যতবার চেষ্টা করেছি ঘুমোতে ততবারই ঐ একই স্বপ্ন দেখছি। বার বার ঘুম ভাঙ্গার জন্যই হয়ত মাথা ধরেছে।

আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। রুদ্ধস্বরে জানতে চাইলাম কি এমন বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখলি যে মাথাই ধরে গেল। মিনু শানুর কাছে এক গ্লাস পানি চাইল। পানিটা খেয়ে বলল—সেটা খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে আমার মনে হল আমি যেন কয়েকটা কার্ড দেখতে পাচ্ছি। কার্ডগুলো অনেকটা তাসের মতোই। তবে তাদের ওপরে যে রকম নক্সা ছিল সেরকম নক্সাওয়ালা তাস আমি কোন দিন দেখেনি। স্বপ্নে প্রথমে দেখলাম একটা ক্রুশ আঁকা কার্ড, তার পরেরটায় বৃত্ত আঁকা। কিছুক্ষণ পরে ওগুলো মিলিয়ে গেল এবং ভেসে উঠল একে একে তিনটা নতুন কার্ড । একটার ওপর একটা তারা আঁকা, অপরটায় চৌকোনা বাক্স এবং সবশেষেরটায় দেখলাম তিনটা ঢেউ খেলানো লাইন।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রত্যেকটা কার্ডকেই বেশ কিছু সময় ধরে দেখছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেল। কার্ডগুলো খুবই দ্রুত বদলে যেতে লাগল। এই দেখছি বৃত্ত, তারপরেই হয়ত ক্রুশ, তারা, চৌকোণা বাক্স.......। কোন কোন সময় একই কার্ডকে পরপর কয়েকবার দেখছিলাম। কার্ডগুলো এত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে লাগল যে এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরই আমার মাথাটা ধরে উঠলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল। এরপর যতবার ঘুমোবার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকবারই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই আবার ঐ কার্ডগুলো দেখতে পাই।

মিনুর কথা শুনে গুম হয়ে থাকলাম। বুঝতে পারলাম মিনু যা বলেছে তা যদি সত্যিই হয় তবে ব্যাপারটা খুবই জটিল। কিন্তু মিথ্যাই বলতে যাবে কেন। তাছাড়া ছেলেমানুষী করার বয়সও তার নয়। কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় সোয়া একটা বেজে গিয়েছে। বললাম —আচ্ছা এবার তোরা শুয়ে পড়। দেখি কি হয়। আর মিনু, তুই ঐ বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা কর। লাইট নিভিয়ে দিয়ে ওদের ঘর ছেড়ে চলে এলাম।

রোববারের যুগান্তরটার একটা গল্প পড়া বাকি ছিল। জেগে থাকার জন্য সেটাই পড়তে নিলাম। কাগজটার আদ্যোপান্ত পড়তে প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। এর মধ্যে কিন্তু ওদেব ঘর থেকে কোন খবর এল না। মিনু যদি ঘুমাতে না পারে তাহলে ত নিশ্চয়ই শানু আমাকে তা জানাতো। সে যখন এল না তখন বুঝতে পারলাম মিনু এবার যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ বেয়াড়া কার্ডগুলো ওকে আর জ্বালাচ্ছেনা। আমিও লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা প্রায় সাতটা। অন্যান্য দিন সাধারণত আমি ছ'টার মধ্যেই উঠে পড়ি। বাইরে এসে দেখলাম ওরা কেউ ওঠেনি। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার জন্য ওদের আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। তাই ওদের ডেকে তুললাম না। একাই বেরিয়ে পড়লাম প্রাতঃভ্রমণে। অন্যদিন এ সময় মিনু ও শানু আমার সঙ্গে থাকতো।

দীঘার সমুদ্রসৈকত খুবই মনোরম। বছর দুয়েক আগে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। কক্সবাজারে সমুদ্রসৈকতও অতুলনীয়। কিন্তু এই দুই সৈকতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। কক্সবাজারের বেলাভূমিতে দাঁড়ালে একদিকে চোখে পড়ে বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। তার উল্টোদিকে রয়েছে সারি সারি অসংখ্য সবুজ টিলা। এর মাঝখানে কিন্তু তেমন একটা গাছ পালা চোখে পড়ে না।

এক্ষেত্রে দীঘার সমুদ্রসৈকত কিন্তু একটা ব্যতিক্রম। এখানে তীর থেকে কিছুদূর গেলেই অসংখ্য গাছপালা চোখে পড়ে। চন্দ্রা, গড়াই, জয়দেবপুর প্রভৃতি পিকনিক গ্রাউন্ডের মতো এখানেও পিকনিক করা চলে। কারণ অসংখ্য গাছপালা থাকায় ছায়ায় ঢাকা স্থানের কোন অভাব নেই।

মিনিট বিশ পঁচিশেক বেড়ানোর পর কটেজে ফিরে এলাম। দেখি ইতিমধ্যেই মিনু ও শানু উঠে পড়েছে। তারা চায়ের টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। মিনুকে বললাম —কিরে রাতে আর কোন বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখিস নি তো।

—না ভাইয়া, কি আশ্চর্য ব্যাপার। এরপরে আর ঘুমের কোন ডিস্টার্ব হয়নি।

যাক্, ভালই হয়েছে। এবার পিকনিকে যাবার যোগাড়যন্ত্র কর।

সারাদিন খুব আনন্দে কেটে গেল। রাতে ঘুমুবার সময় বললাম—দুজনে কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া না বাঁধিয়ে খুশিমনে ঘুমিয়ে পড়। তাহলে আর রাতে বাজে স্বপ্ন দেখবি না।

কিন্তু হায়; আমার উপদেশ কোন কাজে লাগল না। সে রাতেও ঠিক একই সময়ে ঐ ঘটনা ঘটল। পরের রাতেও যখন এর পুনরাবৃত্তি হল তখন বুঝলাম ব্যাপারটা আর হেলা করার মতোন নয়। প্রতি রাতে ঘুম ভাঙ্গার ফলে দুশ্চিন্তায় মিনুর স্বাস্থ্য তো নষ্ট হচ্ছেই, সেই সঙ্গে আমাদেরকেও ভুগতে হচ্ছে।

দীঘায় কটেজ ভাড়া করেছিলাম সাতদিনের জন্য। কিন্তু চতুর্থদিনেই জিনিসপত্র গুছিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। এখানে থাকাকালে মিসেস মজুমদার নামে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি পরামর্শ দিলেন মিনুকে একজন মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে। কলকাতার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডকটর অজয় বসুর ঠিকানাও তাঁর কাছে পেলাম।

কলকাতায় যখন গিয়ে পৌঁছলুম তখন রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। রাতটা একটা হোটেলে কাটিয়ে সকালে ডকটর অজয় বসুর ক্লিনিকে গেলাম। খুব ভোরে যাওয়ায় রোগীর সংখ্যা কমই ছিল। তাই অল্পক্ষণ পরেই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মিনুর দুঃস্বপ্নের কথা তাকে সবিস্তারে জানালাম।

সব শুনে তিনি ঘরের মধ্যে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ মিনুর কাছে যেয়ে বললেন, "আচ্ছা মা, তুমি যে কার্ডগুলোকে দেখেছ সেগুলোর ওপরের নক্শাগুলো কি এঁকে দেখাতে পারবে?

—নিশ্চই পারব, মিনু বলল—গত চার রাতে ক্রমাগত দেখার ফলে ওগুলো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

অজয় বাবু তাঁর প্যাড আর কলমটা মিনুর দিকে দিলেন। মিনু মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তার স্বপ্নে দেখা কার্ডগুলোর নক্সা এঁকে ফেলল। নক্সাগুলোর ওপর একবার চোখ বোলাতেই যেন ডকটর বসুর চোখগুলোতে আশার আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

কিন্তু তিনি পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে আমাকে বললেন —আপনি কাইন্ডলি কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সম্ভবত আজ রাতেও মিনু ঐ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আশা করছি কালকের মধ্যেই মিনুর জন্য কার্যকরী কিছু একটা করতে পারব।

অজয় বাবুর আশ্বাস পেয়ে কিছুটা উৎসাহবোধ করলাম। সেদিনের মত মিনুকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। রাতে আবার মিনু সেই কার্ডের স্বপ্ন দেখল। এবারে প্রায় দুঘন্টা ধরে চলল এই জ্বালাতন। কালও যদি অজয় বাবু এর একটা বিহিত করতে না পারেন তবে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব।

পরদিন সকাল দশটায় ডাক্তারের কাছে যাব বলে তৈরী হচ্ছি। এমন সময় একটা ফোন এল। রিসিভার তুলে "হ্যালো"বলতেই টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে অজয় বাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উনি বললেন —"দেখুন, একটা জরুরী কলে আমাকে এখুনি খড়গপুরে যেতে হচ্ছে। কাল ভোরে ফিরব। তাই আজ আমার পক্ষে আপনার সংগে দেখা করা সম্ভব নয় বলে আমি খুবই দুঃখিত।

তবে আপনাকে একটা সুখবর দিয়ে যাচ্ছি। সেটা হল আজ রাত থেকে আপনার বোন মিনু আর ঐ কার্ডের দুঃস্বপ্ন দেখবে না। আজ রাত থেকে ও আগের মতই শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

—"বলেন কি" আমি চমকে উঠলাম।—কাল রাতেও বরং অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশী ভুগিয়েছে।"

অজয় বাবু উত্তর দিলেন—"তা হতে পারে। কিন্তু আপনি আমার কথার উপর আস্থা রাখুন। দেখবেন আজ রাতে কোন গোলমাল হবে না। আপনি কাল বিকেলের দিকে আমার চেম্বারে আসুন। আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব। আচ্ছা,সি ইউ।"

লাইনটা কেটে গেল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। মিনু ও শানু যখন জানতে চাইল ডাক্তার কি বলেছে তখন তাদের আসল কথাটা না জানিয়ে শুধু বললাম যে একটা জরুরী কলে ডাক্তারবাবু খড়গপুর যাচ্ছেন বলে আজ তাঁর সংগে আমাদের দেখা হবে না। তাই তিনি কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। স্থির করলাম যে ডাক্তারের অনুমানটা সত্যি হয় কিনা তা আগে পরখ করে দেখব। যদি ঠিকই হয় তবে ব্যাপারটা মিনুকে জানাব। মিথ্যা আশায় আমি ওকে ভুলাতে চাই না।

যথারীতি রাত হয়ে এল। প্রত্যেকদিন রাত বারটা থেকে মিনুর দুঃস্বপ্নটা আমাদের ভোগায়। আজ আমি ঠিক করলাম যে বারোটার পর কি হয় তা দেখে তবে শুতে যাব। মিনু ও শানু ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে একটা শারদীয় পত্রিকা নিয়ে বসে পড়লাম। মিনুকে বলে রেখেছি আজ রাতে ও যদি দুঃস্বপ্ন দেখে তবে যেন উঠে এসে আমাকে জানায়।

সময় বয়ে যেতে লাগল। এক সময় বারটাও বাজল। আরও মিনিট পনের

কেটে গেল। কিন্তু কই, মিনুরতো কোন সাড়া নেই। তবে কি ডাক্তারবাবুর অনুমানই সত্য হল। ধীরে ধীবে রাত আরও বেড়ে গেল। গত কয়েকদিন মিনু এ সময়টা বিছানায় অস্থিরভাবে কাটিয়েছে। মিনু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দেখবার জন্য ওদের ঘরে গেলাম। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর অনুমান সার্থক হয়েছে। সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আমার ঘরে ফিরে এসে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে মিনুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। আজ ও আমার আগেই উঠে পড়েছে। মিনুকে এখন খুব খুশি খুশি দেখাচেছ। এতদিনের দুঃস্বপ্নে ও যেন প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই বলল—ভাইয়া, ডাক্তারের কাছে বোধহয় আর যাওয়া লাগবে না। কাল রাতে আমি একবারও ঐসব বাজে স্বপ্ন দেখিনি।

মৃদু হেসে বললাম—এমনটা যে হবে তা কিভাবে যেন জানতে পেরে ডাক্তারবাবু আমাকে আগেই বলেছিলেন। কিন্তু তোদের বলিনি যদি তেমন না হতো। বিকেলে আমি অজয় বাবুর কাছে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোদের গোটা ব্যাপারটা জানাব।

অজয় বাবুর চেম্বারে যখন পৌঁছলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের জন্য তিনি অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সেদিনের অন্য সব পেসেন্টদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিয়েছিলেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন—কি, গতরাতে তো মিনু ঐ বিদঘুটে কার্ডের স্বপ্ন দেখেনি। আশা করি তার ভাল ঘুম হয়েছিল।

উৎফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিলাম।—হ্যাঁ, হয়েছিল। কাল ও আমাদের একটুও জ্বালায়নি। কিন্তু অজয় বাবু, এবার সব খুলে বলুন। আমার আর তর সইছে না। আপনি কি করে জানলেন যে গতরাতে মিনু দুঃস্বপ্ন দেখবে না।

অজয় বাবু বললেন—ব্যস্ত হবেন না। সবই বলব একে একে। তবে মিনুর ব্যাপারটা বুঝবার জন্য আপনাকে আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানান প্রয়োজন। প্যারাসাইকোলজি নামে মনোবিজ্ঞানের একটা শাখা আছে। বিজ্ঞানের এই শাখায় বৈজ্ঞানিকরা মানুষের চিন্তাশক্তির ওপর বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছেন। আমরা যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করি তখন তা শুধু আমাদের ব্রেইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। চিন্তাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যে যত বেশী মনোযোগ দিয়ে কোন বিষয় চিন্তা করবে তার চিন্তাটাও তত বেশী সম্প্রসারিত হবে। ব্যাপারটা ঠিক রাডারের মতোই। রাডার যেমন বিভিন্ন শক্তির বেতার-তরঙ্গ পাঠাতে পারে ব্রেইনও তেমনি আমাদের চিন্তাশক্তি চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। বেতার-গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ বেতার-তরঙ্গকে

ধরতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজনের চিন্তাকে অন্যজন উপলব্ধি করার জ্ঞানটাকে মানুষ এখনও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। প্যারাসাইকোলজিস্টরা তাই এই বিষয়ের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটা মানুষই হল এক একটা জীবন্ত রাডার।

একটা ব্যাপার অনেকদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা শুধু চিন্তার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আলাপ চালাতে পারে। অর্থাৎ তাদের একজন কিছু চিন্তা করলে অন্যজন তা উপলব্ধি করতে পারে। এই বিশেষ পদ্ধতিটাকে বলা হয় টেলিপ্যাথি।

আমি আগেই একবার বলেছি যে প্যারাসাইকোলজিস্টরা মানুষের চিন্তাশক্তির কর্মক্ষমতা, ব্যাপকতা প্রভৃতির ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মিনু তাদের একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

বলেন কি, কি অদ্ভুত ব্যাপার। আমি বলে উঠলাম। সত্যিই অজয় বাবু আমাকে একেবারে চমকিয়ে দিয়েছিলেন।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। এমনকি যেসব প্যারাসাইকোলজিস্টরা এই পরীক্ষাটা চালাচ্ছিলেন তাঁরাও এমন কিছু একটা ঘটবে তা ধারণাও করতে পারেননি। তবে মিনুর ব্যাপারটায় আসার আগে আমি আপনাকে প্যারাসাইকোলজিস্টরা আজ অবধি যেসব চমকপ্রদ পরীক্ষা চালিয়েছেন তার কয়েকটা উল্লেখ করছি।

১৯৫৯ সালে দু'জন ফরাসী সাংবাদিক জানালেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ নটিলাসকে এ ধরনের একটা পরীক্ষাকার্যে ব্যবহার করছেন। রিপোর্টে তাঁরা আরো উল্লেখ করেছিলেন যে ঐ দেশের প্যারাসাইকোলজিস্টদের প্রধান কেন্দ্র ডিউবা ইউনিভার্সিটি থেকে গভীর সমুদ্রে ভাসমান নটিলাসে চিন্তার মাধ্যমে সংকেত পাঠানো হচ্ছিল।

বলা বাহুল্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করেন। এ ধরনের গবেষণা যে রাশিয়াতেও চলছে তারও খবর আসছে। দুই বৃহৎ শক্তিই এর বিরাট ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। কারণ চিন্তার মাধ্যমে সংকেত পাঠালে তা শত্রুপক্ষের কোন রাডার যন্ত্রে ধরা পড়বে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর পরীক্ষা চালিয়েছে এ্যাপোলো-১৪ চন্দ্র অভিযানে। এই অভিযান চলাকালে মহাশূন্যচারী মিচেল চিন্তার মাধ্যমে সংকেত পাঠিয়েছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একজন ড্রাফট-ইঞ্জিনীয়ার ওলফ জনসন তা সংগ্রহ করেছিলেন।

এসব কাজে সাইকোলজিস্টরা জেনার কার্ড নামে তাসের মত এক ধরনের

কার্ড ব্যবহার করেন। কার্ডগুলোর নকশা পাঁচ রকমের হয়ে থাকে। নক্সাগুলো হল বৃত্ত, ঢেউ খেলানো, লাইন তারা, চৌকোণা বাক্স ও ক্রশ চিহ্ন। এক সেট জেনার কার্ডে পঁচিশটা কার্ড থাকে। প্রত্যেক নক্সার পাঁচটা করে।

অজয় বাবু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু মিনু তো এ ধরনের নক্সাওয়ালা কার্ডই স্বপ্নে দেখেছে। এটা কি করে সম্ভব হল।

সে প্রসঙ্গে আসছি। আপনি আরও একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। কিছুটা গম্ভীর শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। চিন্তার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সাধারণত দু'জন লোককে ব্যবহার করা হয়। একজন এক সেট জেনার কার্ড নিয়ে বসে প্রত্যেকটা কার্ডকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। সে সময়ে সে আর দ্বিতীয় কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারবে না। শুধু একের পর এক জেনার কার্ডগুলো লক্ষ্য করে যেতে থাকবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সব রকম চিন্তা ছেড়ে গভীর ধ্যানে বসবে। তার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। সে একটা কাগজের মধ্যে লিখে যেতে থাকবে প্রথম ব্যক্তি কখন কোন্ নক্সার কার্ড দেখছে।

চন্দ্র অভিযানকালে মহাশূন্যচারী মিচেল পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়ার সময় তিনবার এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় তিনবার জেনার কার্ডগুলো নিয়ে বসেছিলেন। কোন্ সময় মিচেল কার্ডগুলোর ওপর মনোনিবেশ করবেন ওলফের তা আগেই জানা ছিল। তিনি নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই ধ্যানে বসতেন।

ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক হয়েছিল। দেখা গেল সুদূর মহাশূন্য থেকে মিচেল কখন কোন্ কার্ডের কথা চিন্তা করছিলেন পৃথিবীতে বসে ওলফ তা প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পেরেছেন। এই ঘটনার পর ওলফ খুবই পরিচিত হয়ে ওঠেন। যথারীতি নাসা এ ব্যাপারটাকে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য ওলফ অবশ্যই নাসাকেই দায়ী করেছেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক রিপোর্টার ওলফ জনসনকে পরখ করে দেখলেন। তিনি কতকগুলো জেনার কার্ড নিয়ে সেগুলোকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে ওলফ জানালো সে প্রস্তুত। তখন রিপোর্টার এক এক করে কার্ডগুলো পাল্টাতে লাগলেন। ওলফ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলতে থাকল কার্ডগুলোর নক্সা। ক্রস, ঢেউ, বাক্স-----এভাবে।

রিপোর্টার এক সময় খুবই দ্রুতগতিতে কার্ডগুলোকে পাল্টাচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওলফ সমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে যাচ্ছিল ঢেউ, বাক্স, ক্রুশ-----প্রভৃতি এবং প্রায় নির্ভুলভাবে। তবে মাঝে মাঝে সে থেমে পড়ত এবং বিরক্তির সুরে রিপোর্টারকে বলত যে সে পরিষ্কারভাবে কার্ডের নক্সা বুঝতে পারছে না। তার কারণ নাকি রিপোর্টার কার্ডের উপর যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না। তাই শক্তিশালী চিন্তাশক্তির অভাবে সে মাঝে মাঝে কার্ডগুলোকে চিনতে পারছিল না।

বেয়ারা চা নিয়ে এল। অজয় বাবু আমার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে আরেকটা কাপ নিলেন। চায়ে দুটো চুমুক দিয়ে তিনি বললেন—মিচেল ও ওলফের এই পরীক্ষা থেকে বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারলেন যে বহু দূর থেকেও মানুষের পক্ষে চিন্তার মাধ্যমে যোগাযোগ সম্ভব।

তবুও ব্যাপারটাকে আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একটা দূর পাল্লার পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, দিল্লী, ব্যাংকক, সিডনী প্রভৃতি শহরে অবস্থান করছিলেন। দিল্লীতে ছিলেন মিঃ কনরাড রিচার্ডসন। তিনি জেনার কার্ডের রিডিং পাঠাচ্ছিলেন তাঁর সিডনীর সহকর্মীকে। গত সপ্তাহে প্রতি রাতে বারটা থেকে একটা পর্যন্ত তাঁদের গবেষণা চালিয়েছেন। মিষ্টার কনরাডের পাঠানো চিন্তা-সংকেতগুলোই মিনুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল।

—সেটা কি করে সম্ভব হল। আমি প্রশ্ন করলাম। অজয় বাবু বললেন—আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জীবন্ত রাডার। রেডিও ওয়েভগুলোর যেমন বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি থাকে আমাদের চিন্তাগুলোও তেমনি অভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির হয়ে থাকে। এক-একজন মানুষ এক-এক ফ্রিকোয়েন্সিতে চিন্তা করে। খুব সম্ভব মিঃ কনরাড যখন গভীর ধ্যানের মাধ্যমে শক্তিশালী চিন্তা-সংকেত সিডনীর উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে মিনুর ব্রেইন ঠিক রাডারের মতই ওগুলো ধরে ফেলে।

ঘুমিয়ে থাকলে ব্রেইনের কাজ অনেক কমে যায় বলে মাথাটা পরিষ্কার থাকায় ঘুমিয়ে থাকার সময় মিনু জেনার কার্ডগুলো স্পষ্ট দেখেছিল। যখন মিঃ কনরাড খুব দ্রুতগতিতে কার্ডগুলো পাল্টাচ্ছিলেন তখনই তার মাথা ঘুরতে থাকত। জেগে বসে থাকলে বা কথাবার্তা বললে অন্য চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে। তাই মিঃ কনরাডের পাঠানো চিন্তা-সংকেত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় এবং তার ইন্টেনসিটি কমে যায়। ফলে তখন সে আর কার্ডগুলোকে

দেখতে পায়নি। আমি এবার আর জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি কি করে জানলেন যে গত রাতে মিনু আর ঐ দুঃস্বপ্ন দেখবে না।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে অজয় বাবু বললেন———মিনু যখন কার্ডগুলো আমাকে এঁকে দেখায় তখনই আমি ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। বিকেলের দিকে আমি লণ্ডনের একজন সাইকোলজিস্টের কাছে ট্রাংকল করি। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে মিঃ কনরাড দিল্লীতে অবস্থান করে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরদিন সকাল সাতটায় মিঃ কনরাডের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলাম। মিনুর ব্যাপারটা শুনে তো তিনি অবাক। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন যে মিনুকে আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। পরপর আর কয়েক রাত সংকেত পাঠাবার পর তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কয়েক দিন বিশ্রাম নেবেন। তাই আমি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলাম যে গত রাতে মিনুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না।

এতক্ষণ সোফায় বসে থেকে পায়ে ঝিম ধরে গিয়েছিল। তাই উঠে একটু পায়চারি দিতে লাগলাম। গোটা ব্যাপারটাকেই কেমন অদ্ভুত রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছিল। মিঃ কনরাড, একজন ইউরোপীয়ান, দিল্লীতে ছিলেন। অথচ তাঁর চিন্তা কিনা দীঘায় বাঙালী মেয়ে মিনুকে ব্যতি-ব্যস্ত করে তুলেছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম———মিঃ কনরাড ও মিনুর মধ্যে চিন্তাব মাধ্যমে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, এই ব্যাপারটাকে কি আরও সহজতর করা যায় না? যেন একজন মানুষ ইচ্ছে হলেই আরেকজনের সঙ্গে এই পদ্ধতিতে যোগাযোগ করতে পারে। অজয় বাবু বললেন———প্যারাসাইকোলজিস্টরা এ কাজটা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ভবিষ্যতে হয়ত টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এসবের ব্যবহার অনেক কমে যাবে। বিদেশে থাকার সময় কোন লোক হয়ত চিন্তার মাধ্যমে প্রতি দিন স্বদেশের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আপনি বলেছিলেন গতকালের আগের রাতে মিনু দু'ঘন্টা ধরে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। সে রাতটা ছিল মিঃ কনরাডের গবেষণার শেষ রাত। তাই তিনি এবং তাঁর সিডনীর সহকর্মী দু' ঘন্টা তাঁদের কাজ চালিয়েছিলেন। সে জন্যেই মিনুকে দু'ঘন্টা ধরে ভুগতে হয়েছিল।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। অজয় বাবুকে ফিসটা

দিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছিলাম।——একটু দাঁড়ান, মিনুর টেলিগ্রামটা নিয়ে যান।

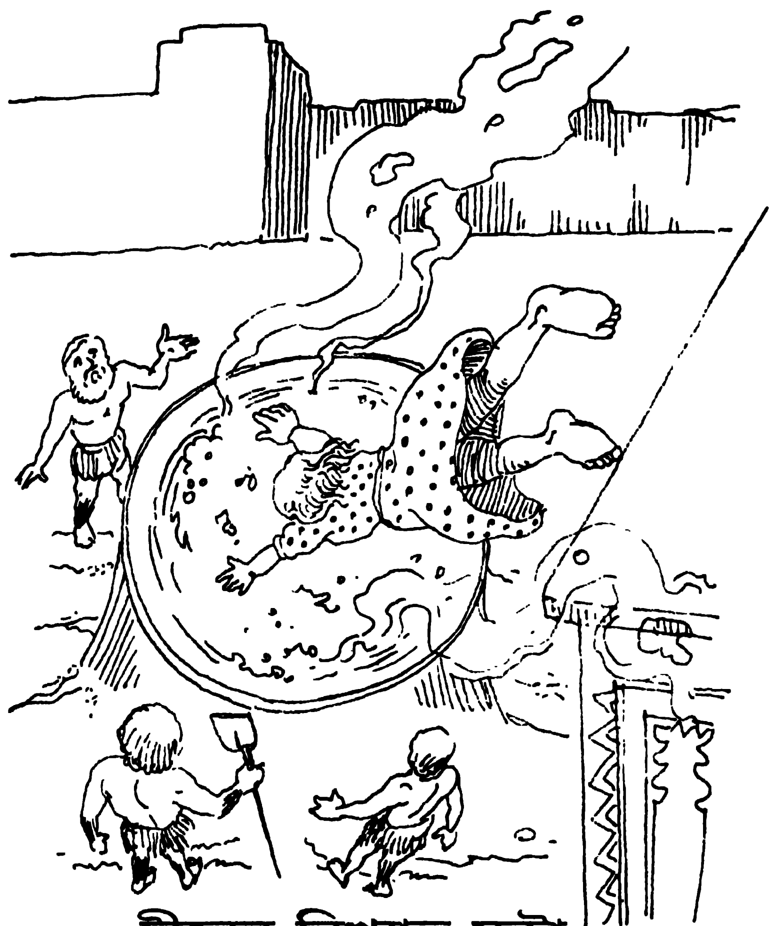
মিনুর টেলিগ্রাম, অজয় বাবুর কথায় আমি চমকে উঠলাম।

কে পাঠালো ?—

আজ দুপুরের দিকে টেলিগ্রামটা পেয়েছি। মিঃ কনরাড পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর গবেষণার জন্য মিনুকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে বলে তিনি খুবই দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

—উঃ, বাঁচালেন, আমি বললাম——এতক্ষণ যা বললেন তা মিনু ও শানুকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যেত না। কিন্তু এই টেলিগ্রামটা দেখালেই ওদের তর্ক করা বন্ধ হয়ে যাবে।





চীনের বিখ্যাত ঘন্টা

নাজমা তাপসীন

ওই শোন—! তুমি শুনছ কী! ওই যে ঢং—ঢং—ঢং—বেজে চলেছে চীনদেশের বিখ্যাত বৃহৎ ঘন্টা। সারাটা পিকিং শহর জুড়ে অমন আকুল মধুর ঝংকারে আর কোন ঘন্টাই বাজে না।

এই ঘন্টার সুরেলা তরঙ্গ যার কানেই ঢোকে সেই এর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়।

বাতাসে কান পাতো—শুনতে পাবে ঘন্টা বাজছে 'কো-নিগাই! কো-নিগাই!'

যখনই ওই ঘন্টা বেজে ওঠে প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ নিনাদে তখনই শহরের সব পুরনো মন্দিরে রাখা যতো সবুজ ও সোনালী ড্রাগনের মূর্তি আছে, তারা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই গম্ভীর অথচ আশ্চর্য মধুর সুরে।

শহরের যেখানে যতো মন্দিরের ঘন্টা আছে সব উন্মুখ হয়ে ওঠে—অধীর আগ্রহে যোগ দিতে চায় সেই সুরতরঙ্গে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। অমন প্রচণ্ড সুন্দরের সাথে তাল মেলাতে ভয় হয়। যদি সুর কেটে যায়।

'কো-নিগাই! কো-নিগাই!' শহর জুড়ে একা একাই বেজে চলে বৃহৎ বিখ্যাত ঘন্টা।

ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খেলা থেমে যায়। শিশুরা কান্না ভুলে যায়। কান পেতে শোনে তারা। ফসল ক্ষেতে চাষ দিতে যেয়ে দাঁড়িয়ে শোনে চাষী ভাই। শোনে পিকিং শহরের যেখানে যে আছে।

প্রথমে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাতাস ঠেলে উছলে পড়ে জোয়ারের মতো ঘন্টাধ্বনি। 'কো-নিগাই! কো-নিগাই!'

ক্রমান্বয়ে মধুর থেকে মধুরতর হয় ধ্বনি। আর তারপর.....। তারপরই ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য প্রতিধ্বনি।

বাতাসের পরতে পরতে মিশে যায়। মনের গভীরে আলোড়ন তোলে সেই শব্দ। যেন স্বর্গ থেকে ভেসে আসা কোন অলৌকিক সুর। স্বপ্নের নদীর মতো তার ধারা বয়ে চলে শহরময়। আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সুরের চন্দ্রাতপ।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে সেই ঝংকার। মিহিন মেয়েলী কণ্ঠে কে যেন ফিশ্ ফিশ্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হী-আই! হী-আই!

পাখির শীষের মতো কোমল সেই ধ্বনি এলোমেলো এলিয়ে পড়ে বাতাসে।

বৃহৎ ঘন্টাটি যতক্ষণ বাজে ততক্ষণ যেন এক যাদুর সম্মোহনী চাদর বিছিয়ে থাকে শহর জুড়ে।

সারা দেশবাসী জানে বৃহৎ ঘন্টার মহত্ত্বের সেই অতি পুরাতন অথচ চির নতুন কাহিনীটি।

ঘরে ঘরে মায়েরা তাদের শিশুদের বলে, কেন ঘন্টায় ধ্বনিত হয় একটি ছোট্ট মিষ্টি মেয়ের নাম, 'কো-নিগাই!' কেন করুণ দীর্ঘশ্বাসে ধ্বনিত হয়, 'হী-আই!'

শোন তবে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা বন্ধুরা!—আমি নাজমা তাশমীন আজ তোমাদের সেই পুরনো চীনা লোককথাটি শোনাই।

সম্রাটের আদেশ

পাঁচশত বছর আগের কথা। চীন দেশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা তখন ইয়ং-লো। তাঁর ভয়ে সদা কম্পমান যত প্রজাকুল। তাঁকে অমান্য করে এমন সাহস রাজ্যের কারো নেই।

হঠাৎ একদিন সম্রাটের মাথায় এক খেয়াল চাপলো। তক্ষুণি ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী,'কুয়ান-উ'কে।

কুয়ান-উ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই রাজা আদেশ করলেন, 'শোন মন্ত্রী। আমি চাই আমার রাজ্যে এমন একটি ঘন্টা থাকবে যা হবে জগতের সবচেয়ে বড় ঘন্টা।'

'এর মেঘের মতো জোরালো আওয়াজ শোনা যাবে বহু দূর দূরান্ত থেকে। এটি এমন এক বিশেষ উপায়ে তৈরী হবে যাতে তা চিরকাল পৃথিবীতে অদ্বিতীয় থেকে যায়। কেউ যেন কোথাও কোনদিন আর এমন ঘন্টা তৈরী করতে না পারে।

'এটি প্রস্তুতের সময় লোহা ও ব্রোঞ্জকে একসাথে মেশাতে হবে যাতে ঘন্টার শব্দ খুব জোরালো হয়। শব্দে অতলস্পর্শী গভীরতা আনার জন্য তার সাথে দিতে হবে স্বর্ণ। এবং সবশেষে লৌহ, ব্রোঞ্জ ও স্বর্ণের সাথে মিশেল দিতে হবে ঝকঝকে চাঁদের আলোর মতো রৌপ্য—যাতে মধুরতম ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

'ঘন্টাটি হবে আশ্চর্য রকম সুন্দর ও আকর্ষণীয়। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘন্টা হবে এটি।'

'আমার ঘন্টার প্রশংসায় মুখর হবে দেশবাসী। মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে এর নাম, পাহাড়———সাগর———বন-বনান্তর পেরিয়ে কতো দেশে বিদেশে।'

'সবাই বলাবলি করবে সম্রাট ইয়ং লোর আশ্চর্য ঘন্টার কথা। দেখতে আসবে পিকিং-এর জগদ্বিখ্যাত ঘন্টা। চীন সম্রাটের মহিমা কীর্তনে হবে পঞ্চমুখ।'

'ঘন্টাটি তৈরী হলেই তা ঝুলিয়ে দেয়া হবে শহরের সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচীন মন্দিরটির উঁচু চূড়োয়।

'আজ সূর্যাস্তের আগেই কাজ শুরু হওয়া চাই। নইলে, শোন হে মন্ত্রী! তোমার গর্দান যাবে।'

সম্রাটের নির্দেশ শেষ হতেই কুয়ান-উ আবারও নত হয়ে কুর্নিশ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন রাজ-দরবার থেকে।

এক্ষুণি খবর দিতে হবে শহরের যত নামী দামী কারিগরদের। অল্প সময়ের মাঝেই সব কারিগরদের একত্রে জড় করলেন কুয়ান-উ। তারপর তাদের জানালেন সম্রাটের ইচ্ছের কথা। বললেন, 'শোন হে কারিগর! রাজার আদেশ! এমন একটি ঘন্টা তৈরী করতে হবে যার সুনাম দেশে-বিদেশে লোকের মুখে মুখে ফিরবে। এটি তৈরীর সময় সম্রাটের ইচ্ছে, ব্রোঞ্জের সাথে লৌহের মিশেল দিতে হবে যাতে খুউব জোরালো শব্দ বাজে। গভীরতার জন্য খাঁটি সোনা আর মধুরতার জন্যে নিরেট রৌপ্য।

'যথাসাধ্য দ্রুত এর কাজ শেষ করতে হবে এবং পৃথিবীর সর্বকালের—সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘন্টা হবে এটি।'

সব কারিগরেরাই জানতো সম্রাটের আদেশের অর্থ ও গুরুত্ব। তক্ষুণি তড়িঘড়ি কাজ শুরু হয়ে গেল।

একটুখানি বিশ্রাম ও খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া দিনরাতের বাকী সবটুকু সময়ই কারিগরেরা বিপুল উদ্যোগে খেটেই চললো। ঘন্টাটি একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। কোন খুঁত থাকা চলবে না তাতে।

কারিগরদের উপর মন্ত্রী কুয়ান-উর সদাজাগ্রত চোখ। ভীষণ দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে সম্রাটের ইচ্ছে অনুযায়ী।

সারাদেশ খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে ভালো ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনা ও রূপা সংগ্রহ করা হলো।

দক্ষ কারিগরেরা প্রয়োজনমত সব উপাদান সংগ্রহ করে এক সাথে জড় করলো।

এবার জ্বালিয়ে দিলো আগুন। আগুনের উপর বসানো হয়েছে বিশাল এক তামার পাত্র। পাত্রের চর্তুদিক ঘিরে লকলকে লাল আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ জ্বলে উঠলো। যেন শত শত রক্তলাল ড্রাগন ফুঁসে উঠছে বাতাসে।

টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ তেজী ঘোড়ার মতো ফুটছে চারটি ধাতুর মিশ্রণ।

ধাতুগুলো সবে গলে প্রস্তুত হলো বিশেষ মিশ্রণটি। এবার খুব যতনে হলো ছাঁচে।

তারপর ধাতুর মিশ্রণ ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে এলে কারিগরেরা খুউব সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে ছাঁচটা উঠিয়ে নিলো।

কিন্তু একি! সবার চোখ ভয়ে বিস্ময়ে ছানাবড়া। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না তারা।

একসাথে সবগুলো ধাতু মিশে আশ্চর্য ঘন্টাটি তৈরী হওয়াতো দূরের কথা,

ধাতুগুলো একটির সাথে অপরটি মেশেই নি। ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা, লোহা সব আলাদা আলাদাভাবে টুকরো টুকরো হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

এতদিনের এতো কষ্ট, এতো সাধনা সবই বিফলে গেল। নিরাশায় ভরে গেল সবার মন।

মন্ত্রী কুয়ান-উ ভয়ে আর ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে আদেশ দিলেন কারিগরদের প্রতি, 'অকর্মণ্য কারিগরের দল! দেখ! কী ভীষণ সর্বনাশ তোমরা করেছো! আমার জীবন এখন বিপন্ন তোমাদের এই ব্যর্থতায়। যেমন করেই হোক সম্রাটের ঘন্টা তোমাদের গড়তেই হবে।'

নতুন করে আবার সব ধাতু নেওয়া হলো। দ্বিতীয়বারের মতো তৈরী হবে ঘন্টা।

এবারে মন্ত্রীর নির্দেশ জারী হলো। কাজ শেষ করার আগে কেউ এতটুকু বিশ্রাম নিতে পারবে না।

কুয়ান-উ সদা ভয়ে ত্রস্ত। তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন আবারও কারিগরেরা ব্যর্থ হয়েছে। আর সম্রাটের সে কী ভয়ঙ্কর মূর্তি।-------জল্লাদের তলোয়ার ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে।------না আর ভাবতে পারেন না তিনি। মাথা ঘুরে ওঠে ভয়ে। সব শুকিয়ে আসে।

এবার কারিগরেরা দ্বিগুণ যত্নের সাথে বহু আশায় বুক বেঁধে ছাঁচে ঢাললো ধাতুর মিশ্রণ। কোথাও কোন ভুল নেই তাদের। এবারে নিশ্চয়ই তৈরী হবে আশ্চর্য ঘন্টা।

কিন্তু হায়! আবারো সেই একই অবস্থা। চারটি ধাতু চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোথায় ঘন্টা —কোথায় কী!

উত্তেজনায় রাগে দুঃখে নিজের চুল নিজেরই ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে কুয়ান-উর।

এমনটি কেন ঘটছে। চেষ্টার তো কোন ত্রুটি রাখেনি কারিগরেরা। আন্তরিকতার তো কোন অভাব ছিলো না কারো।

শুধু কুয়ান-উ নয়। এবারে কারিগরেরাও দারুণ ঘাবড়ে গেল। সম্রাট যদি রেগে যান তবে শুধু কুয়ান-উ নয় তাদের সবার জীবনই বিপন্ন হয়ে উঠবে।

ভগ্নকণ্ঠে আবার নির্দেশ দেন কুয়ান-উ, নতুন করে ধাতু ঢেলে তৃতীয় বারের মতো ঘন্টা তৈরী শুরু করার জন্য।

ক্লান্ত অবসন্নের মতো বাড়ী ফিরে যান কুয়ান-উ। বলে যান, আবার আসবেন যেদিন ঘন্টার ছাঁচে ঢালা হবে ধাতুর মিশ্রণ।

কুয়ান-উ ফিরলেন আপন প্রাসাদে।

বাড়ী পৌঁছতেই সম্রাটের একজন বিশেষ দূত এলো। হাতে তার একটুকরো হলুদ-সিল্কের কাপড়ের উপর লেখা রাজার চিঠি।

কুয়ান-উর বুক ধুক্ ধুক্ করতে লাগলো। তিনি পড়তে লাগলেন——

'কুয়ান-উর প্রতি মহামান্য চীন সম্রাটের নির্দেশনামা।

'সম্রাটের ধৈর্য শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।'

মহামান্য সম্রাট আপনাকে, পিকিং-এর আশ্চর্য ঘন্টা তৈরীর' কাজ তদারকের ভার দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে আপনি পর পর দুইবার এই কাজে ব্যর্থ হইয়াছেন।

'এইবার সম্রাটের শেষ আদেশ শুনুন। তৃতীয়বার যেন এই কাজ ব্যর্থ না হয়। কারণ ব্যর্থ হইলে আপনার জীবন দিয়া তাহার মূল্য দিতে হইবে। স্মরণ রাখিবেন! হয় সম্রাটের ঘন্টা না হয় আপনার শির!'

ভয়ঙ্কর রাজলিপিটি পড়ে ভয়ে মূর্ছা গেলেন কুয়ান-উ।

ফুলবাগানে সখীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো কুয়ান-উর একমাত্র কন্যা সুন্দরী কো-নিগাই।

কো-নিগাই ছিলো চীনদেশের সেরা সুন্দরী। নিশীথ রাত্রির মতো ঘনকালো রেশমী চুল তার। ত্বক যেন পাহাড়ী ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ পেলব। চাঁদের আলোয় গড়া শরীর। শিশিরের মতো স্নিগ্ধ মায়াময় অন্তর।

কো-নিগাই ছুটে এলো বাবার কাছে। পড়লো সম্রাটের চিঠি। ভয়ে শিউরে উঠলো কো-নিগাই। পিতাকে সে খুবই ভালোবাসে।

এখন উপায়! ভাবতে থাকে কো-নিগাই। কেমন করে বাঁচানো যায় বৃদ্ধ পিতাকে।

হঠাৎ তার মাথায় খেলে যায় এক বুদ্ধি। সাথে সাথে একজন দাসীকে ডেকে নিজের অঙ্গের সমস্ত রত্নখচিত জড়োয়া অলঙ্কার খুলে তুলে দিলো তার হাতে। অনুরোধ করলো ওগুলো বদল করে শুধু সোনা এনে দিতে স্বর্ণকারের কাছ থেকে।

দাসীটি তাই করলো। দামী মণি-মুক্তা-হীরে-জহরতের অলঙ্কার বদলে নিয়ে এলো তাল তাল সোনা।

কো-নিগাই কালো পোশাক পরলো। ঘোমটা টেনে দিলো মুখের উপর। কেউ যেন দেখতে না পায়। কেউ যেন জানতে না পারে সে কোথায় চলেছে।

সরু গলিপথ ধরে রওয়ানা দিলো শহরের বিখ্যাত যাদুকরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ভদ্রলোক খুব জ্ঞানী ও গুণী। অনেক কিছুই জানেন তিনি।

যাদুকরের ঘরে পৌঁছেই অস্থির ভাবে কো-নিগাই জানতে চাইলো এমন কোন উপায়, যাতে এবার সবদিক রক্ষা হয়। প্রাণে বাঁচতে পারেন তার প্রিয় পিতা।

আরো জানালো সম্রাটের আদেশ ও পরপর দুবার তার পিতার নিযুক্ত কারিগরদের ব্যর্থতার কথা। সবশেষে রাজার প্রেরিত সেই চিঠির কথাও বললো।

যাদুকর কো-নিগাইর হাতে ধরা সোনার থলেটি সযত্নে সিন্দুকে তুলে রেখে এসে একটি খোলা জানালার পাশে বসলেন।

দূর আকাশে তখন মিটিমিটি জ্বলছে তারার সোনালী প্রদীপ। সেদিক পানে চেয়ে মনে মনে কী যেন অঙ্ক কষলেন। তারপর চোখ রাখলেন একটি ভারী পুরনো বইয়ের পাতায়।

প্রথমে যাদুকরকে একটু যেন চিন্তিত মনে হলো। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে কো-নিগাইর দিকে ফিরলেন।

মৃদু গভীর কণ্ঠে বললেন, 'ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনা ও রূপা কোনদিনেই একসাথে মিশবে না যদি না তার সাথে যুক্ত হয় মানুষের ভালোবাসা। আর ধাতুর সাথে ভালোবাসার মিশ্রণেই তৈরী হতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত সুন্দর ও মনোরম ঘন্টাটি।'

—'কিন্তু ধাতুর সাথে আবার মানুষের ভালোবাসা কেমন করে মিশানো যায়?' অবাক কণ্ঠে শুধায় কো-নিগাই।

—হ্যাঁ, যায়। ভালোবাসা মেশানো যায়। আর তা দিতে পারে এমন একজন মানুষ যে কুয়ান-উ-কে সত্যি সত্যি খুউব ভালোবাসে আর তার জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজনে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে।'

অবাক হয়ে আবারও প্রশ্ন করে কো-নিগাই,-'কিন্তু-কেমন করে তা সম্ভব?'

যাদুকরের ভরাট কণ্ঠ গম্ গম্ শব্দ তোলে প্রায় অন্ধকার ঘরে, 'গলিত ধাতুর ফুটন্ত পাত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে ধাতুর মিশ্রণের সাথে।'

দূর পর্বত চূড়ার জমাট শাদা বরফের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় কো-নিগাইর মুখ। —'এ কি ভয়ঙ্কর কথা।'

ত্রস্ত হরিণীর মতো ছট্‌ফটে অস্থিরতায় বাড়ী ফিরে এলো কো-নিগাই।

প্রাসাদে ফিরে কাউকে জানালো না যাদুকরের কথা। একা একাই সিদ্ধান্ত নিলো সে।

বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করার এই-ই একমাত্র পথ। কাজেই মনে মনে তৈরী হলো কো-নিগাই।

নির্দিষ্ট দিনটি সামনে এলো। এবার শেষবারের মতো ছাঁচে ঢালা হবে সব মিশ্রণ। এবারের ব্যর্থতার একটিমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

বৃদ্ধ কুয়ান-উ যথাসময়ে রওয়ানা দিলেন। এবারে তাঁর সঙ্গ নিলো তাঁর প্রিয় কন্যা কো-নিগাই ও তাঁর দাসী।

কুয়ান-উর মাথায় অবিরত চরকির মত ঘুরপাক খাচ্ছে সম্রাটের কথা,—'মনে রেখ! হয় আমার ঘন্টা নয়তো তোমার শির।---- ঘন্টা নয়তো তোমার শির। ------ঘন্টা অথবা শির।'

এবার শির দিতেই হবে। আর রক্ষা নেই।

যেখানে ধাতুর মিশ্রণ বিশাল চুল্লীতে জ্বাল হচ্ছে তার উপরে তৈরী করা হয়েছে উঁচু প্ল্যাটফরম। সেখানে যেয়ে দাঁড়ালেন কুয়ান-উ, কো-নিগাই ও আরো অনেকে।

আগুনের লেলিহান শিখায় ছেয়ে গেছে চতুর্দিক। ফোঁস-ফোঁস —দারুণ রোষে যেন হাজারটা অজগরের মতো ফুঁসছে, আগুনের টক্‌টকে শিখা। আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। আগুনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। সম্রাটের ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এতোগুলো মানুষ।

কারিগরেরা তাকিয়ে আছে কুয়ান-উর মুখপানে। তাঁর নির্দেশ পেলেই ছাঁচে ঢালা হবে ধাতুর মিশ্রণ।

ভয়ে ভাবনায় কাতর কুয়ান-উ চোখ তুলে তাকালেন একমাত্র মেয়ের দিকে।

কো-নিগাইকে আজ যেন সবদিনের চেয়ে বেশী সুন্দর লাগছে। পবিত্র মনে হচ্ছে।

পরণে তার লিলিফুলের মতো শুভ্র পোশাক। কালো চুল মুখের চারপাশে এসে পড়েছে অলস ভঙ্গিতে। চুলের আড়ালে চাঁদের মতো ঝলমল করছে মুখখানি।

কুয়ান-উ মনে মনে নিশ্চিত যে, আজও ব্যর্থ হবে তাদের চেষ্টা। আর তারপর মৃত্যুই অবধারিত। মনে মনে বিদায় নিলেন মেয়ের কাছ থেকে—সবার কাছ থেকে। ভাবলেন, তিনি তার ওই কিশোরী কন্যাটির আজকের এই

পবিত্র নিষ্পাপ মুখখানি অন্তরে গেঁথে নিয়ে চলে যাবেন মৃত্যুর ওপারে।

কো-নিগাই বাবার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো। ফুলের মতো নির্মল সে হাসি।

মন্ত্রী কারিগরদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন ঢালাই শুরু করার।

কারিগরেরা আগুনের তাপে ফুটন্ত ধাতুর মিশ্রণের পাত্রের দিকে চোখ রাখলো আর তখনই আগুনের গপ্ গপ্ শব্দ ছাপিয়ে ভেসে উঠলো কো-নিগাই এর মধুর কণ্ঠ।

—'প্রিয় পিতা। রাজার ঘন্টার জন্য এবং তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমি সানন্দে আমার জীবন দিলাম। বিদায় পিতা! বিদায় জন্মভূমি!'

কথা শেষ করে নিমেষের মাঝে কো-নিগাই ঝাঁপ দিলো উঁচু প্লাটফরম থেকে একেবারে নীচে সেই ফুটন্ত শাদা ধাতুর পাত্রে।

সাথে সাথে ঝলকে উঠলো আগুনের শিখা প্রায় আকাশ সমান উঁচু হয়ে। ধাতুর মিশ্রণ টগ্‌বগ্ শতগুণ জোরালো শব্দে উছলে উঠলো—উথলে পড়লো শত তরঙ্গে। যেন তারা সবাই প্রবল আনন্দে দু'বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানালো কো-নিগাইকে।

ঝাঁপ দেয়ার সময় কো-নিগাইর পায়ের ছোট্ট একপাটি হাতীর দাঁতের তৈরী জুতো খুলে পড়ে রইলো প্লাটফরমের উপর।

কুয়ান-উ পাগলের মতো ছুটে গেলেন ফুটন্ত শাদা ধাতুর পাত্রের দিকে।

চারপাশ থেকে লোকেরা এসে জাপটে ধরে আটকালো শোকাভিভূত পিতাকে।

কো-নিগাইর দাসী আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। বুক ফেটে জল এলো সবার চোখেই।

কিন্তু কাজ বন্ধ করারতো উপায় নেই। কারিগরেরা চোখের জল মুছে যন্ত্রের মতো ধাতুর মিশ্রণ ছাঁচে ঢাললো।

মিশ্রণটি এবারে যেন সববারের চাইতে অনেক বেশী শাদা মনে হচ্ছে। ধবধব্ করছে দুধের মতো।

ধাতুগুলো এক সময় ছাঁচের ভেতর জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে উঠলো।

কারিগরেরা ভয়ে ভয়ে সরালো ছাঁচ।

সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলো ঘন্টার দিকে।

ধাতুগুলো চমৎকারভাবে জোড়া লেগে তৈরী হয়েছে এবারে একটি আশ্চর্য মনোহর ঘন্টা।

এমন সুন্দর একটি ঘন্টা কেউ কখনো কোথাও দেখেনি। একেবারে নিখুঁত গড়ন। গোধূলি বেলার সূর্যাস্তের চাইতেও চমৎকার সোনার বরণ।

মন্দিরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ঘন্টাটি। বেজে উঠলো ঘন্টা। ঢং—ঢং—ঢং—।

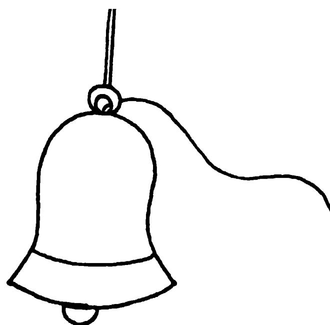
কান পেতে সারা শহরবাসী শুনলো সেই স্বর্গীয় সুরলহরী। সারা চীনদেশের কেউ কোনদিন অমন জোরালো অথচ মধুর ঘন্টাধ্বনি শোনেনি। ঘন্টার শব্দ ছড়িয়ে গেল শহরে—বন্দরে—গ্রামে। দিগন্ত থেকে দিগন্তে—।

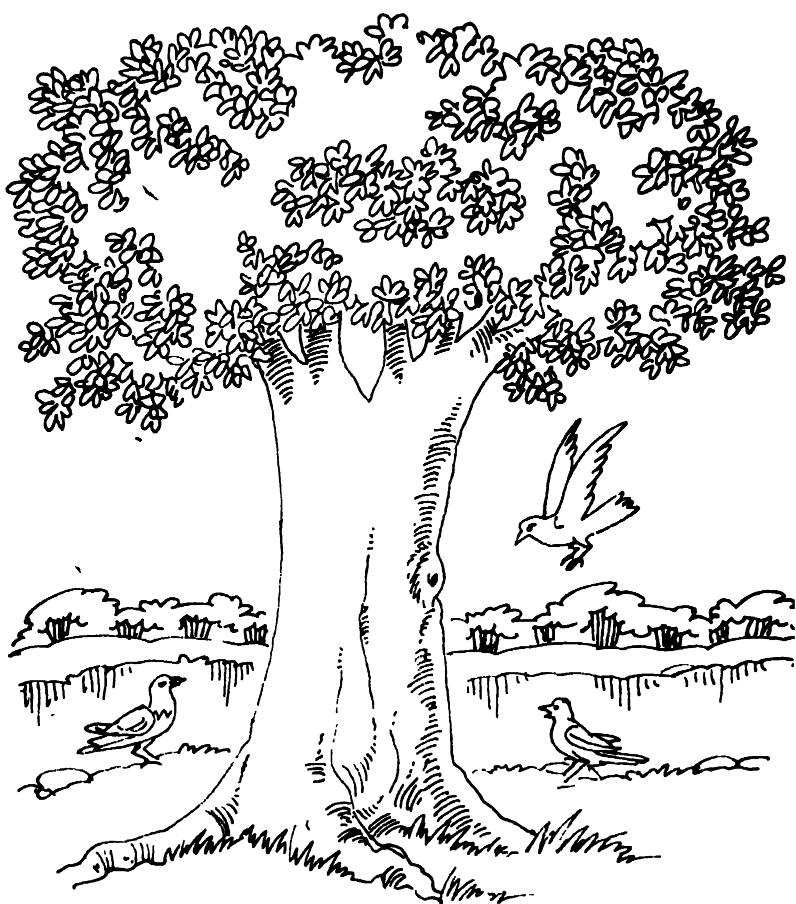
চমৎকৃত হলো দেশবাসী। অবাক হয়ে শুনলো ঘন্টাধ্বনির মাঝে ঝংকৃত হচ্ছে কুয়ান-উর সুন্দরী কন্যা কো-নিগাই-এর নাম।

আর প্রতিটি ঘন্টাধ্বনির মাঝখানে শোনা যায় ক্ষীণ কণ্ঠের প্রাণ আকুল করা এক হাহাকার ধ্বনি। 'হী-আই!'

সবাই বলে কিশোরী কো-নিগাই তার ফেলে যাওয়া একপাটি জুতোর জন্যে দুঃখ করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে 'হী-আই!'

আজো যখন পিকিং শহরের মাঝখানে অবস্থিত সেই প্রাচীন মন্দিরটির বহু উঁচু চূড়োয় বাঁধা সোনালী ঘন্টাটি বেজে ওঠে ঢং———ঢং———ঢং—সবাই তখন কান পেতে শোনে আর বলে ওই শোন———কো-নিগাই। কো-নিগাই!





গল্পের একদিন

মমতাজ লতিফ

মাঠের শেষপ্রান্তে একটু বুড়ো বট। ছোট, বড় অগুনতি ডালপালা, রাশি রাশি ঘনসবুজ পাতা, পাখির বাসা, পাখিদের ঝাঁক, ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল, পোকা মাকড় আর লম্বা লম্বা দাড়ির মত ঝুড়ি নিয়ে যেন সে মস্ত সংসার পেতেছে। ও'র নীচেই যে জমিটুকু—তাতে রয়েছে বকুল, তিনটে বনফুলের ঝাড়, কিছু কাঁটা ঝোপ আর সবুজ কচি দূর্বা ঘাসের দল। বনফুলের ঝাড়ে থাকে তিন: প্রজাপতি বোন। বকুলগাছে কুচকুচে কালো একজোড়া ভোমরা

বর-বউ। দূর্বা ঘাসের নীচে গুঁড়ো গুঁড়ো হীরাকুচি বালুর কণা দিয়ে তৈরি চক্ মিলানো বিরাট প্রাসাদে থাকে ক্ষুদে পিঁপড়ের এক বিশাল দল।

এদের ওই একচিল্‌তে জায়গার ওপর অনেক উঁচু আকাশে রোজ সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। রোজ রাতের আকাশ ভরে ওঠে তারারা, আর তাদের মাঝখানে ফুটফুটে রূপসী চাঁদ। আর আসে, যায় বাতাস—কখনো মায়ের হাতের মতো আদর ছড়িয়ে, কখনো লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে, হাঁক-ডাকে, সিটিতে দশদিকে ভয় জাগিয়ে, কখনো বুড়ো বটের চোখে ঘুমের সুড়সুড়ি দিয়ে, হেলঞ্চ আর বনফুলকে দোল দিয়ে, তিন প্রজাপতি বোনকে হাওয়ায় ভাসিয়ে, ভোমরা বর-বউয়ের মুখে গান ফুটিয়ে—রাত দিন বাতাস আসে আর যায়। কোনদিন দুষ্টু ছেলের পালের মত বটের ডালে ঘুমিয়ে থাকা পাখির ছানাদের ভয় দেখাতে আসে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে যায় ওদের কোনদিন, কখনো শান্ত খুকিটির মতো চুপটি করে সে কোকিল্ পাখির গান শোনে।

আসে রোদ—নরম, সোনালী, কখনো ঝকঝকে রূপালী। কখনো আরাম আর সুখ আর ঠোঁট ভরা চুমু নিয়ে। কখনো বা ভুরু কোঁচকানো রাগ আর কড়া বকুনি নিয়ে। যেদিন রাগ—সেদিন সবার মুখ চুন, মাথা নীচু ক'রে চোখ নামিয়ে ব'সে থাকে সব—বট, বকুল, বনফুল, পাখি, ভোমরা, প্রজাপতি—সব। পিঁপড়েরা মাটির নীচ থেকে আর ওঠেই না। যেদিনটা ভালো—নরম, আর মিষ্টি, সেদিন সবাই মাথা দুলিয়ে, হেসে হেসে ফিস ফিস করে কথা বলে, উনিও উত্তর দ্যান, ভালো মন্দ সবার খোঁজ খবর করেন—সবশেষে সবাই একটা ক'রে চুমু উপহার পায়। বট বুড়ো পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে আসে জল। সরু সরু সাদা জলের তীর, কখনো বড় বড় ফোঁটায় ফোঁটায়। ঘাস থেকে গাছ—ছেলে বুড়ো সব মাতামাতি শুরু ক'রে দ্যায়। ভিজে ভিজে ধুয়ে ধুয়ে সবার গা ফর্সা আর ঝলমলে। খুলে যায় রূপের বাহার, মনও সতেজ, সজীব। তবে পাখি, প্রজাপতি ভোমরা আর পিঁপড়ের হয় কষ্ট—বাসা আর শরীর ভিজে চুপসে যায়, তাতে ওদের যেমন রূপ যায় নষ্ট হয়ে, তেমনি তানারা প'ড়ে অসুখে, ভোগে সর্দি-জ্বরে।

এমনিই চল্‌ছিল ঐ একচিলতে জায়গার জীবনটা। তারপর নামল সেই গল্প-জমানো দিনটা।

তখনো আলো আর আঁধারে মেশামেশি। এমনি সময় এরি, দুরি, টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জাদের ধাক্কাধাক্কি আর কান্নাকাটিতে পিঁপড়েদের ক্ষুদে ছানা অরু ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসে। প্রথম, ছোপ্ ছোপ্ কালি ঝুলি ভুসি মাখা হুতোমমুখী অন্ধকার ছাড়া ও আর কিছুই দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে সেই

কালিঝুলিগুলো এরি দুরিদের মুখ, গা, হাত-পা হ'য়ে যেতে দেখে ও খুব মজা পেল। কিন্তু নতুন কাণ্ড কী হ'ল? ওরা হাত পা ছুঁড়ে অমন ক'রে কাঁদছেই বা কেন। ওদিক থেকে উম্‌নি, ঝুম্‌নি, রুম্‌নি, ছুঁচোমুখী, উঁচকপালী, মধুমুখী সবাই আর ওদের মায়েরা ধ'রে আনছে তার মা'কে—মা'র শরীর পড়েছে এলিয়ে, বোঁজা চোখের ভিতর থেকে বেরোচ্ছে জলের ধারা। কী হল?

কেউ কিছু না বলে মা'কে বিছানায় শুইয়ে দিলে। অরু উঠে পড়ল, এরির কানে কানে জিজ্ঞেস করল,—"এরিরে, কি হয়েছে, বলতো?" এরি, এদিক ওদিক দেখে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল—"জানিস না হাঁদা, তোর বাবা মরেছে আজ।"

—"তাই বুঝি। চল্ বাইরে যাই।"

বাইরে এসে অরু দ্যাখে—বড় পিঁপড়া-পিঁপড়ীরা সব সেজেগুজে বসেছে—লাল, কালো পোশাকে। সর্দার, সর্দারনী বসেছে মাটির উঁচু বেদীতে। তাঁদের সামনে রাখা অরু'র বাবার ওল্টানো দেহ। বাবার গলায় দোলানো হয়েছে ঘাসফুলের ক্ষুদে মালা, ঠোঁটের ওপর রাখা হয়েছে চিনির একটা কণা, কপালে জবাফুলের রসের টিপ, হাতে পায়ে ফুলের কেশরের বালা আর মল। মাথার কাছে ইরু সবুজ ঘাসের টুকরো দুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে।

এমনি সময় কে ঘণ্টা ফুল বাজিয়ে দিল—টুং-টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল, মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাজতেই লাগল। বাজনা থাম্‌তে না থাম্‌তেই, রাজা আর রাণী এল, আর তাদের সঙ্গে পাইক, পেয়াদা, সর্দার, সর্দারনী প্রহরী, খানসামা, লোক লস্কর, ফুল-পাতা, বাটি, প্লেট, জল-সরবত, মিষ্টি, সুগন্ধী—সব কিছু এ'সে পৌঁছাল। এরি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—'নে বসে পড়, বসে পড়।' নিজেও সাত তাড়া-তাড়ি পাতা টেনে ব'সে প'ড়ে। অরু স'রে পড়ল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে খাওয়া দাওয়ায়। অরুর মনটা খারাপ হ'য়ে গ্যাছে। সে পা টিপে টিপে বাবার বেদীর পাশে দাঁড়ায় এসে।

বাবার করুণ মুখ, বন্ধ চোখ দেখে অরুর এই প্রথম চোখ ফেটে জল বেরোতে থাকে। বাবার নিথর মুখ-হাত পায়ে হাত বুলোয় ও। কী একা বাবা। এখন বাবার সঙ্গী কেউ না—মা না, অরু না, ইরু না, এরি দুরি'র বাবারা না—কেউ না। কেউ না। আহ্---আজ---এক্ষুনি বাবা চ'লে যাবে-----মাটির ভিতরে---নেমে যাবে পাতালে---কোনদিন বাবাকে কেউ দেখতে পাবে না আর।

খাওয়ার পাট চুকে গাছে—সবাই সার বেঁধে দাঁড়াতে লাগল—প্রথমে

রাজা রানী তারপর পাইক—পেয়াদা, সেপাই, সান্ত্রী সর্দার—সর্দারনী, তারপর বাবার দল, তারপর মায়ের দল। তারপর ছেলে মেয়েরদল—শুরু হ'য়ে গেল শোভাযাত্রা—সমস্ত শোভাযাত্রার সাপের মত লম্বা শরীরের মাথায় রাজার সামনে সামনে চলল অরুর বাবার দেহ—ফুলে ফুলে ছাওয়া শরীর নিয়ে আট জনের মাথায় চ'ড়ে চলেছেন তিনি।

ভিড়ের মাঝে অরুকে আলাদা ক'রে কেউ চিন্‌তে পারে না। সবাই হুড়োহুড়ি ক'রে এগোচ্ছে। শোভা-যাত্রা শেষ পর্যন্ত এসে প'ড়ে বুড়ো বটের গুঁড়ির কাছে—ওখানে আছে ছোট্ট এক ফোকর—তার ভেতর দিয়ে অন্ধকার, গম্ভীর মুখো সুড়ঙ্গটা—পাতালপুরীতে নামার পথ। গুঁড়ির কাছটায় এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল—বুড়ো বট মাথা নুইয়ে দেখলেন, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে আফসোস করলেন। বনফুলের ঝাড় থেকে উড়ে এল তিন বোন—রাঙাবালা, ফুলবালা, নীলাবালা। মাথা দুলিয়ে এদিক ওদিক উড়ে উড় অরুর বাবার কপালে সুন্দর ডানা ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বিদায় জানাল। কাঁটা ঝোপ থেকে উড়ে আসল ভোমরা বর-বউ। ইনিয়ে বিনিয়ে গুণ গুণ ক'রে তারা গাইল বিদায়ের গান; এসে দাঁড়াল রূপসী হলুদ রোদ, তার হাত ধরাধরি ক'রে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল, বাতাস—রিনি ঠিনি, রিনি ঠিনি---কোথায় কোন্ দূরে বেজে উঠ্‌ল ঘণ্টা---তখুনি নিঃশব্দে পাতালপুরীর রূপোর জোড়া প্রহরী পিতলের কারু কাজ করা চোখঝলসানো ঝক্‌মকে দরজাটা দিল খুলে—সার সার নীল বাতি জ্বলা নীল অন্ধকারে বাবাকে নামিয়ে দিল বাতাস। মুহূর্তে, নিঃশব্দে দরজা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। ফিরে চল্‌ল শোভাযাত্রা।

বুড়ো বট ফিস্ ফিস্ ক'রে অরুকে কাছে ডেকে নিলেন। অরু গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল—মিছিল চলে যাচ্ছে, কেউ ওকে ডাক্‌ল না। অরু একা একা উঠ্‌তে লাগ্‌ল গুঁড়ি বেয়ে, ডাল বেয়ে পাতা বেয়ে, বটবুড়োর দাড়ি বেয়ে,—বেশ খানিকটা উঠে অরুর চোখে পড়ল, এই বড় এক পাখির বাসা—তাতে বাচ্চা পাখিরা ঘুমিয়ে কাদা। আর এক ডাল ওপরে উঠে দ্যাখে—রাতের মত মিশমিশে কালো এক পাখি মিষ্টি গান ধরেছে। সে গানের দোলায অরুর ছোট্ট বুকটা দুলে ওঠে। অরুকে দেখে ছুটে এল তিন প্রজাপতি বোন রাঙাবালা, ফুলবালা, নীলাবালা। হাত ধরাধরি ক'রে, কখনো সুঁড়ে সুঁড় ঠেকিয়ে, ফুলতোলা তিনজোড়া রঙিন পাখা নাড়িয়ে গা ঝাঁকিয়ে চোখ কাঁপিয়ে নাচল তারা অরুকে ঘিরে ঘিরে, ঘুরে ঘুরে;—অরুর চোখের সামনে যেন আলো জ্বলছে, আলো নিভ্‌ছে, নানা রঙের আলো, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা। নাচ থামলে—তিন বোন ও'র পাশে ব'সে হাঁপাতে থাকে,

থির থির ক'রে কাঁপে ওদের সুন্দর শরীর। দেখে অরুর চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনি সময় উড়ে আসে ভোমরা বর-বউ—ফুলের পাঁপড়ির ঠোঙায় হরেক রঙের ফুলের মধু দিয়ে তৈরি মিষ্টির টুকরো—খাবার দেখে অরু বুঝতে পারে ও'র ক্ষিদে পেয়েছে বেশ। মিষ্টি ক'টা চুষে চুষে আরাম ক'রে খেল ও। ওর একরত্তি পেটও ভ'রে গেল। ও'কে খাইয়ে ফিরে গেল ভোমরারা। প্রজাপতি বোনেরাও হাসিমুখে বিদায় নেয়। সারা দিনের হট্টগোল, হৈ-চৈ শেষ। এবার অন্ধকার নামছে। ঘুমের ঢুলুনি ধরেছে সবাইকে।

বট বুড়ো ডাক দিল,—'এদিকে উঠে আয়, অরু।' অরু আরও খানিকটা উঠল,—এখানে গর্তে গর্তে পোকা মাকড়ের বাসা, এখন দুয়ার দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে। অরু আরও ওপরে উঠ্‌তে থাকে—এক দম ওপরে। এখানটায় ডাল কম। বাতাস ফুর ফুর ক'রে এদিক থেকে ওদিকে ছুটছে, অন্ধকারে সন্ধ্যার সূর্যের শেষ লাল ছোপ লুটিয়ে আছে পাতাদের মাথায় মাথায়। অরু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে প'ড়ে সবুজ পাতার দোলনায়। এম্‌নি সময় বুড়ো বট ডাক দিলেন, "অরু, ঘুমোবি তো? ঘুমো এখন। প'রে গল্প শোনাবো তোকে।"

ঘুমের ঢুলুনী এসেছে অরুর চোখে আর কিছু কথা না বলে ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসী পান মুখে দিয়ে, পানের বাটাটি হাতে ধরে ও'র চোখ জুড়ে এসে বসল। মাসী বললে, বুড়োবাবা, অরু আজ কিনা বড্ড কাহিল, এট্টু তাড়াতাড়িই ঘুমোবে আজ,—কাল তোমার গল্পের ঝোলা খুলো—আজ এট্টু ঘুমোক ছেলেটা।' মাসী-পিসীর সূক্ষ্ম কারু কাজ করা নীল ডানা, নীল মাটির পুতুল পুতুল মুখ, কপালের খয়েরের টীপ দেখতে দেখতে অরু ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল—পাখিদের গানে। এ্যাতো অন্ধকারে অরু আর কোনদিন ওঠেনি—গতকাল ছাড়া। চোখ মেলে কালো ভুসো মুখো বট বুড়োর বিরাট ডাল-পাতাগুলো দেখে ও আঁতকে উঠলো—কিন্তু আবার চার পাশেই এ্যাতো মধুর গান। কান যে জুড়িয়ে যায়। ওপরে, গাছেরও ওপরে খুদে খুদে জ্বলজ্বলে আলো, কারা সাজিয়েছে এমন উৎসবের সাজ। বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে নাম না জানা কত ফুলের গন্ধ। ধীরে ধীরে ওপরের আলোর ঝাড় নিভ্‌তে থাকে, পাখিদের গান থেমে আসে—হলুদ রঙের শাড়ী পরে রোদ এক লাফে এসে অরুর চোখ টিঁপে ধরে একমুহূর্তে। তারপরই ও'র চোখ খুলে দিয়ে খিল খিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। গাছে, গাছে, পাতায় পাতায়, ডালে ডালে মাখামাখি হ'য়ে যায় হলুদ রঙ্‌। বুড়ো বট ঝলমল করতে থাকে খুশিতে আর গর্বে। হাসতে থাকে মাথা দুলিয়ে মিটি মিটি। দাড়ি দুলিয়ে বলেন,—'অরু, ঐ পাখির বাসাগুলোতে সুন্দর সুন্দর পাখিগুলোকে দেখেছিস্‌? আরে, ওরাই

তো ওদের বেগুনি নীল, সাদা সাদা, লাল, হলুদ, সবুজ আর খয়েরী কালো পাখা ভাসিয়ে উড়ে যায় আকাশের শেষ প্রান্তে, পাহাড়ের দেশে, বরফ রাজার প্রাসাদে, ফুলপরীর রাজকন্যার পুরীতে—আর পাখায় ক'রে নিয়ে আসে অফুরান অপূর্ব, অদ্ভুত সুন্দর সব গল্প। যেসব গল্প বয়ে বয়ে জমা করতে নিয়ে যায় পোকা আর মাকড়দের দল। এই উঁচু চাঁই, গল্পের পাহাড় জমা হয়েছে ঐ সুড়ঙের ভিতর। সে সব গল্পের দেশ পেরিয়ে পেরিয়ে তবে যেতে হয় পাতালপুরীতে—যেখানে সবাই রাত ভর, দিনভর স্বপ্ন দ্যাখে। শুধু স্বপ্ন। মিষ্টি মধুর তার স্বাদ। চাঁপা ফুলের মত তার ঘ্রাণ, বাজনার মত তার মিহি শব্দ। সে সব স্বপ্ন আবার বোনে ঐ তিন প্রজাপতি বোন—রাঙাবালা, ফুলবালা, নীলাবালা। ফুলের কেশর, গন্ধ আর রঙ, গাছের পাতার শব্দ, নদীর জলের কুলকুল গান, রোদের নরম সোনালী চুল নিয়ে তাতে বাতাসের গা জুড়ানো, ঢেউ খেলানো মিহি সুতো মিশিয়ে বুনতে হয়, মনে মনে ভাবতে হয় সুন্দরী রাজকুমারীর মুখ—তবেই তৈরি হয় এসব স্বপ্ন। ওরা বুনে এনে রেখে যায় আমার সবুজ পাতায় পাতায় আর ভোর ভোর পোকা মাকড়দের কাজ হয় শুরু। স্বপ্নগুলোকে আলতোভাবে ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে যায় তারা ভেঙ্গে চুরে নষ্ট না হয় কোনটা ! নিয়ে গিয়ে জমা করে পাতালপুরীতে—একা একা যাদের পাতালপুরীতে থাকতে হয়,. তাদের জন্যে জমা হয় এই সব।

ওদিকে কাঁটাঝোপে যারা থাকে—ভোমরা বর-বউ সারা দিন ভর ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে রকম রকম মধু আনে খুঁজে—বিকেল থেকে তৈরি হয় নানান মিষ্টি মিষ্টি খাবার, পিঠা আর কেক। দু'জনায় মিলে সেসব খাবার এনে রেখে যায় আমার ডালে ডালে—সন্ধ্যার আগেই পোকা-মাকড়দের ছেলেপুলেরা একটুও মুখে না দিয়ে সে সব বয়ে নিয়ে যায় পাতালপুরীর সিংহ দরজায়। তিনটে টোকা দিলে ভেতর থেকে পাতালপুরীর খুদে মাটির পরীরা এসে নিয়ে যায় সেসব খাবার—সেসব খাবারের সুগন্ধে ওদের চোখ মুখে ঠোঁট ওঠে হেসে। যারা নীচে পাতালপুরীতে একা একা থাকতে যায়, তাদের জন্যেই থাকে ঐসব খাবার। বুঝতে পেরেছো এতোক্ষণে ? আর দুঃখ নেই। বাবা আমাদের ভালো জায়গায় ভালোভাবেই আছেন। এইতো হাসি ফুটেছে দেখছি। তোমাকে হাসতে দেখে পাখিরা খুশিতে শীস দিচ্ছে, বাতাস সুড়সুড়ি দিচ্ছে, লাফাচ্ছে আর রোদ কেমন নাচ্ছে ঐ দ্যাখো।"

তারপর বুড়ো বট মাথা নেড়ে, ভুরু তুলে বলল, "আজকে কিন্তু তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে গ্যাছে, ঐ দূর্বা দাদা-দিদির দল। ওখানে ওদের সাথে খাবে, বেড়াবে, দেখবে, গল্প শুন্‌বে—তারপর বেলাবেলি ফিরে এসে ঘুম দেবে কেমন ?"

অরুর মুখে কোন কথা নেই। ও চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ওপরের নীল-সবুজের মেশামেশি, সোনালী রোদের লম্বা চুল, পাখির ছানাদের কিচিমিচি, পোকা-মাকঁড়দের ধীর, শান্ত চলা-ফেরা, ভেবে চিন্তে কাজ করা খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া—এইসব দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেল। বুড়ো বটেরও ঝিমানী এসেছে। হঠাৎ অরু শুনতে পেল—কারা যেন একসাথে, একতালে, একসুরে ও'কে ডাক দিচ্ছে, ডাক্‌ছে গান গেয়ে,—

অরু-উ-উ, অরু-উ-উ-,
এসো এসো আমাদের বাড়ি
এসো সাত তাড়াতাড়ি;
রয়েছে সবুজ দেশ,
লাগবে ভালোই বেশ।
শুন্‌বে সবুজ গান,
জুড়াবে তোমার প্রাণ;
সবুজ হাওয়ায় চ'ড়ে—
দুঃখ যাবে দূরে।
তখন নামবে ঘুম,
না-ম-বে ঘু-ম।
অরু-উ, অরু-উ-উ---

অরু লাফিয়ে উঠ্‌ল। এমন গান শুনে আস্তে হাঁটা যায় না যে! এমন গান শুনে চোখকে বন্ধ রাখা যায় না যে। এমন গান শুনলে মনটা যে কেমন কেমন করতে থাকে।

অরু টগ্‌বগাতে টগ্‌বাতে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামতে লাগল—। এক জায়গায় দেখলে, মাকড়সা বুড়ি সুতো রোদে দিয়েছে, তারই একটা টানা, ঝলমলে সুতো ধরে ঝুলে পড়ল অরু—এক্কেবারে একটানে নেমে পড়ল, দূর্বাঘাসেদের মধ্যে। সাথে সাথে চারদিক থেকে হা-হা, হিহি, হো হো শব্দে ছোট ছোট হাসির মিহি ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক শব্দের ঢেউ শেষ হ'তে আরেক শব্দের ঢেউ---অনেকটা যেন বাজনার সুর, ধাপে ধাপে উঠছে, নামছে— মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসের শরীরের ভিতর।

সাতটা দূর্বাঘাসের বাচ্চা এসে অরুর হাত ধরল, কচি সবুজ মুখে টানা দু'টো চোখ তাদের পাতলা ঠোঁটে সবুজ শান্ত হাসি। অরুকে নিয়ে গেল ওরা বড় দূর্বাঘাসেদের কাছে। তখন বড়দের সভা বসেছে। মা-বাবা একেকজন উঠে দাঁড়িয়ে নানান সুবিধা অসুবিধার কথা বলছিল—কোথায় সবসময়

গাছেদের ছায়া পড়ছে, তাতে ক'রে সর্দি-জ্বর ছড়িয়ে পড়ছে ঘাসেদের মধ্যে; কোথায় পাথরের চাঁই রাখা হয়েছে—তার তলায় প'ড়ে বাতাস আলোর অভাবে মরতে বসেছে একদল দূর্বাঘাস; কোথায় কখন কোন্ চারপেয়ে দু-শিংওলা দৈত্য এসে মুড়িয়ে খেয়ে গ্যাছে কাদের আত্মীয়দের, কোথায় দু'পেয়েরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারছে তাদের, এইসব বড় বড় বিপদের আলোচনা চলল ঝড়ের মত ঝগড়া, হাতাহাতির সাথে সাথে। এইসব কাণ্ড শেষ হ'লে একটা বাচ্চা উঠে দাঁড়াল দূর্বা-সর্দারের কাঁধে—দু'হাত দুলিয়ে সবাইকে চুপ করালেন দূর্বা-সর্দার। সব চুপ করলে বাচ্চাটা বলে উঠল—"আমাদের মহামান্য অতিথি, অরু, এসে গ্যাছেন। তিনি এখন আমাদের মধ্যেই আছেন, তাঁর জন্য যা যা করবার আপনারা ঠিক করুন আর আমাদের বলুন।"

আবার চারদিক থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে, গা হেলিয়ে হাত দুলিয়ে দূর্বাঘাসেদের বাবা মায়েরা ভীষণ শোরগোল তুললো—সে শোরগোলের শব্দ কানে বাজল যেন সেতার, পিয়ানো, একতারা, বাঁশি আর তব্‌লার মেশানো সুর। সবাই এগিয়ে এসে, ঝুঁকে ঝুঁকে অরুকে দেখল, ও'র বাবার জন্যে চুক্‌চুক্ ক'রে আফসোস করল, ও'র মায়ের খবর নিল, তারপর সাতজন সাতজন ক'রে দল বেঁধে ফিরে গেল যে যার বাড়ি।

দূর্বাসর্দার সাত বাচ্চাকে কি যেন বুঝিয়ে দিলে—অরুকে হাত ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল সাত বাচ্চা—যেখানে বটের গুঁড়ি আছে, ছায়া আছে, এক চিল্‌তে বৃষ্টির পানিতে গড়া ঝিল আছে—তার কাছটিতে। বটের পাতায় তৈরি ময়ূরপঙ্খী নৌকো রয়েছে সাতটা—সাত দূর্বা মাঝি দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে। ময়ূরপঙ্খী সাজানো হয়েছে ঘাস ফুলের মালায়, প্রজাপতির ঝরা রঙিন পাখনায় তৈরি হয়েছে সুন্দর সাজসজ্জা, ভোমরার ঝরা পাখনায় তৈরি হয়েছে দরজা জানালার শার্সি। শুকনো বকুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছে সুন্দর মিহি বিছানা; সার সার জোনাকি বসে আছে রাতের আলোক সজ্জার আয়োজন নিয়ে। ময়ূরপঙ্খীর মাঝি ওদের আটজনকে উঠিয়ে নিল হাসিমুখে—বেয়ে চলল ময়ূরপঙ্খী,—বটের গুঁড়ি ছাড়িয়ে কাদামাটির দেশ পেরিয়ে, ঘোলাজল পার হ'য়ে নীল জলে সাদা ফেনা মালা তুলে ওরা চলতে লাগল। থামল একেবারে যখন জলের রঙ লাল হ'ল,—। অরু দেখল লাল জলে ফুটে আছে টুক টুকে লাল শাপলা আর পদ্ম। বড় মাঝি মাথা দুলিয়ে বলল—'এখানেই নামতে হ'বে। ঐ বড় লাল পদ্মের ডাঁটার সুড়ঙ্গ দিয়ে নামবে, নামলেই আমাদের ক্ষুদে স্বর্গ পারিজাত। ওখানে যা আছে—তা গেলেই দেখতে পাবে, রাতের আঁধার ছাড়া আবার এসব কিছুই চোখে দেখা যায় না—এতো মিহি আলো

দিয়ে তৈরি যে দিনের আলোতে সব মিশে থাকে মিলে থাকে আলোর গায়ে গা মিলিয়ে। সেজন্যেই আবীরের রঙে দিনের আলো রেঙে উঠতে উঠ্‌তে এসে পড়লাম—এখানে বিদায় নিতে হ'বে আমাদের—আমরা অপেক্ষায় থাকব, তোমরা ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে এসে উঠ্‌বে ঐ পদ্মের বুকে—কেমন ? এবার এসো।'

তড়াক ক'রে অরু লাফিয়ে পড়ল, লাল পদ্মটির বুকে, ও'র সাথে সাথে ঘাসশিশুরা খলখলিয়ে হেসে নেমে পড়ল। মুহূর্তে সুরুৎ করে আটজনই সেঁধিয়ে গেল এবং সরু অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চোখের পলকে নেমে পড়ল পাতালপুরীর— চোখের সামনে ভেসে উঠল— বিশাল এক সিংহ দুয়ার; ছোট ছোট মাটির প্রদীপের আলো দিয়ে গড়া দুয়ারের নক্সাগুলো মুহূর্তে যাচ্ছে বদলে— কখনো বা মনে হ'চ্ছে নীল জলে অসংখ্য রঙের বড়, ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে মহাফুর্তিতে, একটু পরই সবুজ আলোছায়া ভরা জল— জলে জলে শাপলা, শালুক আর পদ্মের মেলা উড়ছে রঙিন বড় বড় ফুলতোলা ডানা নিয়ে প্রজাপতির ঝাঁক, গুণ গুণ গান গেয়ে কাজল কালো ভোমরার দল— আবার একটু পরই— আলোয় আলোয়, রঙিন মেঘে ভরা আকাশে আকাশে যত রাজ্যের রঙ বেরঙের গায়ক পাখির ঝাঁক— তাদের সুমিষ্ট গানে দশদিক উঠেছে ভ'রে। অরু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ও'কে দেখে সাত বাচ্চা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল-- 'এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত দেখবে কখন ? সামনে চ'লে এসো।'

দুয়ার পেরোতে— সবুজ ঠান্ডা আলো দিয়ে গড়া এক বিশাল প্রাসাদ। কাছে গিয়ে দেখল, ফুলের মধু জমিয়ে জমিয়ে গড়া খুদে খুদে অসংখ্য ছেলে আর মেয়ে পরীর দল— নাচে-গানে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে দশদিক, পলকেই আবার নানা ছাঁদের নানান রঙের মিষ্টি। যেমন তেমন মিষ্টি নয়— হাওয়ায় শূন্যের ওপর ভেসে ভেসে মিষ্টিগুলো ঠিক ঠিক সবার মুখে ঢুকে পড়ছে— মধুর রসে সবার মুখ হ'ল ভরপুর।

অরুকে নিয়ে ঘাসশিশুর দল ঢুকল পরের দুয়ারে— এখানে বিশাল গোলাপী আলোয় ভরা ঘরে কাজ করছে পাতালবিজ্ঞানীরা সব— মগ্ন হ'য়ে তৈরি করছেন স্বপ্ন— সুন্দর, মধুর, খুশির আর স্বর্গের সব স্বপ্ন। রাশ রাশ, হাজারো স্বপ্ন বানিয়ে বানিয়ে লম্বা বড় বড় সব ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখছেন— যারা পাতালপুরীতে নেমে গ্যাছে, মাটির তলায় যারা এখন থেকে ঘুমোবে, উঠবে না, জাগবে না কোনদিন আর—তাদের জন্যে গড়া হচ্ছে এইসব স্বপ্ন। এমনি কিছু স্বপ্ন অরুকে দেখাতে চাইলে ঘাসশিশুরা—বিজ্ঞানীরা তাদের

পাঠিয়ে দিল লম্বা ঘরটির শেষ প্রান্তে যে টলটলে নীল জলের দীঘি রয়েছে, তার পাড়ে—এ জলের ভিতর স্বপ্নের ছায়া ফেলে চলে তাঁদের পরীক্ষা, খুঁত বের করেন, আবার ভুল শোধরান, এমনি ক'রে তৈরি হয় নিখুঁত সব স্বপ্ন। এখানেই অরু আর ঘাসশিশুদের স্বপ্নের ছায়া দেখানোর বন্দোবস্ত করলেন বিজ্ঞানীরা।

অরু আর ঘাসশিশুরা বসে পড়ল হাত, পা ছড়িয়ে। নীলজলে বাতাসের নাচে উঠল ঢেউ, জেগে উঠল যেন জলশিশুর দল— সুগন্ধি বাতাস ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—জলের নীল রঙ ভেদ করে ফুটে উঠতে লাগল কোন প্রভাতের এক লাল সূর্য;—সে সূর্যের সাতরঙা আলো সাত ঘোড়ায় চড়ে সাত নাম না জানা দেশের দিকে রওনা হ'ল; বেগুনী ঘোড়া, নীল ঘোড়া, আকাশী ঘোড়া, সবুজ ঘোড়া, হলুদ ঘোড়া, কমলা ঘোড়া, লাল ঘোড়া। সাত আলো তো নয়, সাত টুকটুকে পরী, তাদের মুখের গড়ন, ঠোঁটের গড়ন, ঠোঁটের হাসি, চুলের রাশি, চোখের খুশিতে রূপ যেন উপছে পড়ছে, সাত আকাশ সে রূপে ভরে তুলে তারা এসে পৌঁছল, সাত রাজার পান্নাসবুজ সাত দেশে। একদেশে মানুষেরা উঠল হেসে, পদ্মকলি চোখ মেলে বিছানায় উঠে বসল মানুষ রাজার কন্যা, নিঃশ্বাসে তার সুগন্ধ বাতাস বয়, ঠোঁটে তার ভোরের হাসি, চোখ তার নীলাকাশ, দু'হাতে দুলছে তার বনফুলের মোটা মালা, গলায় শাপলা আর পদ্মের মালা, মাথায় সাতরঙা পাথরের ঝলমলে মুকুট, পায়ে নূপুরের মধুর তান, পায়ের পাতায় আলতার কারুকাজ, কপালে চন্দনের ফোঁটা। সূর্যের আলোককে অভিবাদন করতে রাজকুমার উঠল নেচে—সে নাচে আনন্দ আর খুশি হীরার কুচির মতো ঠিকরে পড়ল, শুক্তির ভিতর জমা হল মুক্তো, ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্ধকারে ঢাকা কুয়াশা মোড়া সবুজ এক বন, পাখিদের গলায় ফুটল গান, বাতাস আর রোদ বিনিসুতোর মালা হ'য়ে দুলে উঠল সে কন্যার চারপাশ ঘিরে, আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠল সে নাচের তালে তালে—ধীরে ধীরে কন্যার পিছু পিছু এসে জড়ো হল যত ছেলে-মেয়ের দল—কারো হাতে ঝাঁকায় ভরা বীজ, কারো হাতে লাঙ্গল, কারো হাতে কাস্তে, কারো বা হাতে চরকা, কারো হাতে জাল, কুমারের চাক, বৈঠা, হাতুড়ি, বাটালী, নানান জিনিস—তাল পড়তে লাগল—বৈঠা থেকে ছপ ছপ, লাঙ্গল থেকে খর্ খর্, কাস্তে থেকে খ্যাস্ খ্যাস্, চরকা থেকে ঘুর ঘুর, জাল থেকে ঝপ্ ঝপ্, কুড়াল থেকে ঠক্ ঠক্, কোদাল থেকে খপ্ খপ্, মেয়েদের কোমরের কলসী থেকে ছলাৎ ছল, ছন্দময় তাল উঠতে লাগল, পড়তে লাগল—হাজারো কাজের হাজারো তাল। ছেলে মেয়ের দল

ধীরে ধীরে সরে যায়—রাজকন্যা গান ধরে সুরেলা কণ্ঠে—

তোমার ছোঁয়ায় জাগে জল,
জাগে ফুল, জাগে ফল,
জাগে পাখি নির্ভার,
জাগে প্রাণ দূর্বার,
তোমার ছোঁয়ায় জাগে মন,
জাগে এক অমূল্য রতন ;....

সুর মিশে যায় হাওয়ার গায়ে গায়ে-----ধীরে ধীরে মুছে যায় ছবি, হারিয়ে যায় শব্দ, আবার জেগে ওঠে নীল জল।

মুগ্ধ চোখে অরু তাকিয়ে থাকে নীল জলের দিকে, সুখে ওর চোখ বুজে আসে, ওদিকে ফুটে উঠতে লাগল আরেক স্বপ্ন। —নীল জলে আবারো লাগল দোলা, কেঁপে উঠল জলের নরম শরীর। ভেসে আসতে লাগল মৃদু মধুর রিনি ঝিনি শব্দ ; নীলজলকে তোলপাড় করে জলকে নানা রঙে, রূপে ভেঙ্গে ভেসে উঠ্‌ল মাছ্‌রাজের ছবি। ঝলমলে আঁশে ভরা দেহে আলো পড়তে, তা থেকে ছ'টা বেরোল নানান রঙের ; ভোরের আলোকে অভিবাদন করতে শুরু হ্‌ল মাছ্‌রাজের ঘূর্ণী নৃত্য—জল পাক খেয়ে মালার মতন হ্‌ল, সাপের মতন ফুঁসে উঠল, ঝড়ের মতন শক্তিমান হ্‌য়ে উঠল, রাজকন্যাদের চুলের মতন দীর্ঘ হ্‌ল,—ঘুরতে শুরু করল কার পিছু পিছু, ঝিনুক, শামুক লালমাছ, ছোট, মাঝারী, বড় যত মাছ, সোনালী সাদা, কালো সব মাছ, সাদা গোল গোল মুক্তোর মত বুদ্বুদে ভরে গ্যাছে চারদিক, শুরু হ্‌ল ডুব সাঁতার আর মাথা তুলে এক লাফে সূর্যের আলোকে ছোঁয়ার খেলা, সোনালী আলোয় ঝলমলে সোনার টুকরোর মতো মাছেরা উঠ্‌তে লাগল, পড়তে লাগল নীল সোনালী জলে। ততক্ষণে সূর্যের খুশি জলে একাকার হ'য়ে উঠেছে, চক্‌ চক্‌ করছে ক্ষুদে ক্ষুদে সরু সরু যত জলের স্রোত, ঢেউয়ের যত মাথা। এরপর শুরু হ'ল শিকার নৃত্য—জল লণ্ড-ভণ্ড হ্‌ল, গুলিয়ে মিলিয়ে গেল এক হ'য়ে মাছেদের নিপুণ শরীরের গতি, নড়াচড়া লাফ-ঝাঁপ ধীরে ধীরে মিশে গেল জলের রঙে, জলতরঙ্গের মৃদু রিনি-ঝিনি ধ্বনি গেল মিলিয়ে—মাছ্‌ রাজের নির্দেশে সবাই গতি কমিয়ে দ্যায়—ধীরে ধীরে ছবি যায় মুছে।

এই ফাঁকে অরু আর ঘাস শিশুরা ফুলের মধু আর শিশির খেল পেট পুরে।

এদিকে আবারও জলে উঠল কাঁপন, জলের নীল ঢেউ হ'ল সবুজ—বাতাসের সুরেলা গলায় যেন গান উঠল বেজে ; অনেক দূরে যেন

কাদের পায়ে নূপুর বাঁধা সারা হ্ল—কোথায়ও তবলায় বোল উঠ্‌ল মধুর, গম্ভীর ; কোথায় কাদের হাতের কাজ এইমাত্র হ্ল সাঙ্গ, ভেসে উঠ্‌ল জলের বুকে—বটবুড়োর ছবি, সেই বট রাজার বিশাল, বিপুল শরীর—গাছের ডালে ডালে বসেছে রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক যেন রঙিন আলোর মালা, এসে পড়ল হাত ধরাধরি করে সার বেঁধে— গোলাপ, পদ্ম, হাস্নাহেনা, বকুল, বেলী, জুঁই, টগর, মালতি, নাগকেশর, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, চাঁপা, মাধবীলতা, রজনীগন্ধা--আরও আরও যত ফুলের গাছেরা --বটবুড়োকে ঘিরে হাত-ধরাধরি ক'রে নাচতে লাগল তারা আলোকে অভিবাদন জানাতে। বটবুড়ো মাথা নামিয়ে তালে তালে আলোকে অভিবাদন জানাতে লাগল ; ফুলের তীব্র মিলিত সুগন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে। আলোপরী এসে পৌঁছুতে, পরম সুখে দুলে উঠ্‌ল ফুল আর গাছেদের শরীর, ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ল তাদের নানান রঙের রূপ, সমস্ত জল রঙে রঙে নেয়ে উঠ্‌ল, আলোয় আলোয় ভ'রে গেল। নাচের তালে তালে ফুলের সুগন্ধ উঠতে লাগল উঁচু থেকে উঁচুতে--আলোকপরীর মুখ-চোখ ভরিয়ে অভিবাদন হ'য়ে আকাশে পড়ল ছড়িয়ে ; বাতাস আর রোদ হেসে উঠল আকাশে ভরিয়ে—তখন বটের সোনালী পাতা ঝুরঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ল সবুজ ঘাসদের ওপরে-- বটবুড়ো নাচ থামাতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর চোখ বুঁজে উদার, ভরাট, গম্ভীর গলায় গান ধরলেন --সে গানের সুরে বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, রোদের চোখে জল জমা হ'ল, আকাশের মন কেমন করতে লাগল, ফুলেরা পাপড়ি গুটিয়ে নিল, পাতারা মাথা নামিয়ে ফেলল-- প্রজাপতি ডানা নামাল,-- বটবুড়ো বিদায় জানাচ্ছেন সোনালী পাতাদের চিরদিনের জন্যে—

মাটির তলায় মাটির ঘরে,
স্বপ্নেরা সব সারি ধ'রে ধ'রে,
ডাকে আমাদের—আয়, আয়রে।
মাটির অতলে আঁধার ঘরে—
ভালোবাসা, সে যে সবার ওপরে,
ডাকে আমাদের—আয়, আয়রে।
শুরুতে আলোর পুরী,
শেষেতে পাতাল পুরী,
ডাকে আমাদের—আয়, আয়রে।

গানের সুর মিলিয়ে যেতে— নিথর নীল জল জেগে ওঠে, মুছে গ্যাছে পুরো জীবন্ত স্বপ্নের ঘোর।

আবার, নীল জলে নতুন আলোর ছটা এসে পড়ল, নতুন ঘোড়ায় চ'ড়ে নতুন আলোপরী এসে পৌঁছল নতুন দেশে—চোখ মেলে উঠে বসে পশুরাজ। তাঁর ঘাড়ের দীর্ঘ কেশরে এসে পড়েছে রাঙা আলো তাঁর কন্যা, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী চিত্রাকুমারী আজ মালা দেবে বীর সেনাপতি অজয়কুমারকে। তারই আয়োজনে আজ সেজেছে বন, গুহা, পাহাড়—হাজার রঙের হাজারো ফুলে গা মাথা সেজে দাঁড়িয়ে আছে হাসিভরা গাছের দল। মনোহর ফুল ফুটিয়েছে তারা রাত ভর, সুন্দরী প্রজাপতি আর ভোমরারা তাতে ঢেলেছে মধু, বাতাস ভরেছে মধুর সুগন্ধ ভোর অবধি—সে ফুলে মালা গেঁথেছে রোদের সোনালী চুল দিয়ে রাজকুমারীর সাত সখী। ফুলের রূপের ছ'টায় তাদের রূপ গ্যাছে খুলে, চোখে লেগেছে ফুলের শিশিরের শীতল ছোঁয়া, গালে আর ঠোঁটে লেগেছে রক্তপদ্মের লালিমা, দেহে লেগেছে সোনার রঙ। কন্যার মালা পরা সাঙ্গ হল আর আকাশ জুড়ে নামল পূর্ণিমার রাত। আকাশে হাজার তারার কারুকাজ করা নীল চাঁদোয়া ঝুলল। চাঁদ তার সবচাইতে সুন্দর মুখটি নিয়ে আকাশে উঠল—চাঁদের আলোয় চারধার রূপালী হয়ে উঠল। দলে দলে এসে আসন নিতে লাগল যত রাজ্যের লাল, সাদা, খয়েরী, কালো, হলুদ, সবুজ, ডোরাকাটা, চাকাচাকা--নানান রকমের বড় ছোট পশু আর পাখির দল। কেউ এলো লাফ মেরে, কেউ বা হেলে দুলে, কেউ বা শুঁড় তুলে, কেউ তীরের বেগে বাতাসে ঝড় তুলে, কেউ বা কাজলকালো চোখ আর লতাপাতার মত শিং নেড়ে। পাখিরা আকাশ ছেয়ে বাতাসে ভর করে নেমে এল। সাথে সাথে গাছেরা সবুজ পাতা নাড়িয়ে, ডাল দুলিয়ে ধরল ঐকতান। রাজকন্যার সাত সখী ওড়না উড়িয়ে নাচল উৎসবের নাচ—সে নাচ দেখে পূর্ণিমা চাঁদের মুখ হ'ল আরো সুন্দর, আরো উজ্জ্বল, আরো হাসি ঢল ঢল। নাচ থামলে অজয়কুমার গম্ভীর ভরাট কণ্ঠে গান ধরলেন—

দক্ষিণে সাগরের নীলজল,
উত্তরে উন্নত পর্বত,
পূর্বে উজ্জ্বল সূর্য,
পশ্চিমে অরণ্য নিবিড়
অভিবাদন লও হে তোমরা,
সামনে চলি—আমরা ॥

অজয়কুমার এগিয়ে এসে চিত্রাকুমারীর হাত ধ'রে,—দু'জনে এক সাথে গান ধরে—

হাতে হাত ধরি,

আমরা এ জীবন গড়ি,
ভালোবাসা জমা করি,
আমাদের বুক ভার
হাতে হাত ধ'রি।

ধীরে ধীরে কন্যা এগিয়ে এসেছে—দুঃখ আর সুখের আবেশে তাকে আজ দেখাচ্ছে দেবীর মতন। আজ তার সবচাইতে বেশী ক'রে মনে পড়ছে তার মাকে—যে মা হারিয়ে গ্যাছে একদিন শেষ বিকেলে। যখন বনের সমস্ত সবুজ গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, পাতায় পাতায় বনে বনে আলোর আলপনা যখন যাচ্ছে মিলিয়ে, গা জুড়োনো শান্ত ভেজা বাতাস যখন গাছের পাতার ফাঁক গ'লে ঘরে এসেছে—পাখিরা মাথার ওপর শান্ত ডানা নেড়ে এসে বস্ছে, সবুজ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ছোট্ট ঘরে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমের আয়োজন চলছে—এম্নি সময়ে মা ফিরছিলেন ঘরে—ঐ ছোট্ট সবুজ নদীটা পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে তীরে উঠ্ছেন আর তখুনি হঠাৎ যেন আকাশ ফুড়ে আগুন বের হল। মা'র কপাল ফেটে লাল রক্তের নদী বইতে লাগল। মা শান্ত গভীর চোখে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প'ড়ে গেলেন—চিত্রকুমারী পুরো কাণ্ডটা দেখে গুহার ভিতর ভ'য়ে কাঁপতে থাকে। তারপর সব লোক লস্কর এসে পড়লে—মিছিল ক'রে সবাই মা'কে পাতালপুরীর দুয়ার দিয়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। পাতাল রাজার রূপোর সান্ত্রীরা মাথা নত করে নামিয়ে নিয়ে গ্যাছে মা'কে।

সেই মায়ে কথা ভাবতে ভাবতে রাজকুমারীর চোখে জমল শিশিরের মত জল। জলভরা চোখ তুলে সে দৃষ্টি রাখল অজয়কুমারের চোখে, ধীরে ধীরে ঠোঁটে ফুটল তাদের লাল সূর্যের হাসি। গলার মালা খুলে পরিয়ে দিল কন্যা কুমারের বীরকণ্ঠে। অম্নি গায়কপাখির দল গান ধরল, গাছেরা মাথা নেড়ে নেড়ে তাল ঠুকতে লাগল, আর পশুরা নাচ শুরু করল। সে নাচে আস্তে আস্তে সবুজ আলো উঠ্ল জ্বলে, যেন গভীর অরণ্য—পাখপাখালি, পোকা-মাকড়, জীবজন্তুর আবাস। ধীরে ধীরে সবুজ আলো ভেদ ক'রে বনদেবীর অনিন্দ সুন্দর সবুজ মুখ স্পষ্ট হল—চোখ যেন বনের সরোবরে ফোটা দুই নীলপদ্ম, ঠোঁট যেন রক্ত কমলের পাপড়ি, ভুরু নয় যেন পাখির দু'টি উড়ন্ত ডানা। দেবী হাত তুললেন। সবুজ ঘন অন্ধকার ভেদ ক'রে গোলাপী কমলের মত হাত। সবাই মাথা নত করলো। দেবীর আশীবাদ ঝ'রে পড়ল নরম, ঠাণ্ডা সুগন্ধ বাতাসের মত। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দেবীর ফোটা ফুলের মত মুখ। রাজকুমারীর হাত ধ'রে অজয়কুমার চলতে শুরু

করল—পিছনে সার বেঁধে শোভা যাত্রায় চলতে শুরু করল সব জন্তু জানোয়ারের আর পাখির দল। সমস্বরে গান ধরে সবাই—

ঐ যায় রে কারা,
বিদায় নেয় যে তারা,
ওরা যায় রাজারপুরী,
ওরা যায় স্বপ্নপুরী,
ওরা যায় পাতাল পুরী॥

সমস্ত ছবি ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে। সব রঙ গেল মিশে। টলটলে জল রইল শুধু ভেসে।

অরু আর ঘাসশিশুরা চোখ কচ্‌লে, মধুর তৈরি মিষ্টি খেয়ে ন'ড়ে চ'ড়ে বসল। আবার জলে জেগেছে কাঁপন। আরেক আলো পরী আস্‌ছে নেমে আরেক ফুলের দেশে—রাশ রাশ ফুল চোখ মেলেছে, হরেক রকমের নানান বরণের ফুল। হাসি ঢল্ ঢল্ ফুলকন্যারা খুশিতে উঠেছে রেঙে। আলোপরী সবার ঠোঁটে চুমু খায়, সবাই দুলে ওঠে আনন্দে—ছুটে আসে রাশ রাশ প্রজাপতি—ফুলতোলা, রঙ-বেরঙের রেশমী ডানা ঠেকিয়ে একে আদর করে, ও'কে আদর করে। অনেক দূরে দেখা যায় একটা ছোট্ট কালো প্রজাপতি ব'সে আছে ছোট্ট বনফুলের ওপর। আলোপরী ছুটে গেল তার কাছে, দু'হাতে তাকে তুলে নিলেন বুকে, আদরে আদরে ভরিয়ে দিলেন ছোট্ট প্রজাপতি ছানাকে। অরু দেখল, আলোপরীর একহাতে রয়েছে একটা চোখ বোঁজা বড় খয়েরী ডানার প্রজাপতি। প্রজাপতিটা ম'রে গ্যাছে—কিন্তু তার রূপ এতটুকুও কমেনি,—ভেল-ভেটের মতন পাখনা দু'টো ঝিকমিক করছে। আলোপরী এক চোখে ইশারা করলেন—ছুটে আসল দলে দলে গোলাপ, টগর, চাঁপা, গন্ধরাজ, বেলী চামেলী জবার দল—আলোপরী আবার অন্য চোখে ঈশারা করতে নেমে এল আকাশ ছাপিয়ে যত রাজ্যের রং-বেরঙের সুন্দর সব পাখির ঝাঁক। ঠোঁটে কারো রং-বেরঙের গল্প ভরা চিঠি, কারো বা সুমিষ্ট নাম না জানা পাকা ফল, কারো বা রঙ-মশাল, ফুলঝুরি। দেখতে না দেখতে রঙ-মশাল আর ফুলঝুরিরা তাদের আলোকনৃত্য শুরু করল—নানা আলোর ফুল, চাঁদ-তারা ফুটতে লাগ্‌ল নীল আকাশে সাথে পাখিদের গান আর ফুলেদের নাচ।

তারপর রং বেরঙের চিঠি থেকে গল্প প'ড়ে শোনাতে লাগল আলোপরী—কোথায় কোন নীল পাহাড়ের কাছে পাখিদের দেশে নীলকণ্ঠ রাজা হয়েছে। তিন্ দিন তিন রাত ধ'রে চলছে তারই উৎসব—ঢাক, ঢোল, বাজনা, বাদ্যি।

কোথায় কোন্ ধবলগিরির দেশে রাজকুমারীর ষোল বছরের জন্মদিন চলছে—তুষারের মত রঙ কন্যার রক্ত জবার মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানা, যে ঠোঁটে হাসির মালা তাতে রাজপুরী উজালা, নীল চোখে আলোর ঝর্ণা—তাকে ঘিরে চলছে বাজনা, বাদ্যি নাচ, গান। নানান দেশের রাজকুমার, রাজকুমারীরা নানান রঙের ফুলের মালা উপহার পাঠিয়েছে রাজকুমারীকে, ফুলের মালার পাহাড় জমে উঠেছে—তাতে খেলছে যত রঙিন প্রজাপতি আর ভোমরার দল।

কোথায়—রাজারকুমার পণ ধ'রে ঘুমন্ত রাজকুমারীর দেশে গিয়ে মায়া দানোদের মেরে রাজকুমারীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেতারের তার বেজে উঠতেই—রাজকুমারী পদ্মকলির মত চোখ মেলল সাথে সাথে মলয় বাতাস বইতে শুরু করল, গা ঝাড়া দিল সব সেপাই সান্ত্রী, রাজা-রাণী লোক-লস্কর—ঠোঁট ভ'রে উপছে পড়ল রাজকুমারীর মুক্তো ঝরা হাসি। কুমারের হাতে হাত রাখল কুমারী আর জল, স্থল, শূন্যে—আনন্দ পড়ল ছড়িয়ে।

কোথায়—পাথরের রাজকুমারের চোখে জমেছে শিশিরের জল। কোন্ অচিন পাখি নরম পালকে তা মুছে দ্যায় আর দূরে শিরিষ গাছে ব'সে শোনায় মধুর গান, দুঃখ ভোলার গান—

একদিন চোখে খেলতো সবুজ ছায়া,
একদিন ফুট্‌ত ঠোঁটে হাসির মায়া,
একদিন হাতে তোমার বাজতো বাঁশি,
একদিন পায়ে বন্দী ছিল সে নৃত্যরাশি।।
সবকিছু দান করেছো তাদের,—
ভালোবেসেছো পৃথিবীতে যাদের।।
জমে আছে সব মণিতে, মাণিক্যে
জমে আছে সব সূর্যের সপ্তরঙে
জমে আছে আমাদের নীল বুকে।।

হাসি ফুটল পাথর-রাজপুত্রের ঠোঁটে। তার মূর্তিকে জড়িয়ে যত লতা বেয়ে উঠেছিল, সবগুলো ভরে গেল ফুলে ফুলে, অচিন-পাখি রাজপুত্রকে ভালোবেসে বাসা বাঁধল সে গাছের ডালে।

কোথায়—কোন্ রাজার বাগান শুকিয়ে যায় কোন্ ডাইনীর আগুনে নিঃশ্বাসে, সবুজ পাতা যায় কুঁকড়িয়ে, শুকিয়ে, লাল, হলুদ, কমলা বেগুনী—রঙ বেরঙের ফুল মাথা নামিয়ে, চোখ বুঁজে যায় ঝরে, রাজকুমারী

ভোরে সাজি হাতে এসে কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়। একরাতে জ্যোৎস্না ফুটেছে নীল, ঘন নীল আকাশে তারা ফুটেছে অগুন্তিত রাজকন্যা জানালার রূপোর শিক্ ধ'রে বাইরে চেয়ে—এমন সময় কন্যা দেখে, নীল আকাশ ছাপিয়ে লাল, নীল, হলুদ, সোনালী কমলা রঙের পরীর ঝাঁক নেমে আসছে—পরীরা সব বাগানে হাওয়া দিচ্ছে, জল ঢালছে, গাছেদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গাছের গা-মাথা ঝাঁকিয়ে নড়ে চড়ে উঠ্‌ল—ডালে ডালে নতুন কুঁড়ি হল, কুঁড়ি থেকে ফুলেরা সব পাপড়ি মেলতে লাগল। তারপর হাসি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পরীরা উড়িয়ে দিল ডাইনীর নিঃশ্বাসের বিষ—সে হাসির সৌরভে ডাইনী পালাল দেশ ছেড়ে। তারপর জানালার কাছে এসে রাজকন্যার মুখে চুমু খেয়ে পরীরা উড়ে গেল আবার নীল আকাশে, নানান রঙের পাখনা ছড়িয়ে। ভোর ভোর রাজকন্যা ছুটেছে সাজি হাতে বাগানে—ফুলের গাঢ় সুগন্ধে রাজা, রানী সবাই ছুটে এসেছেন—এসেছে যত রাজ্যের প্রজাপতি, ভোমরা আর পাখি। উৎসব শুরু হ'ল রাজ্যের ঘরে ঘরে, রাজার পুরীতে।

কোথায়—দুঃখী মা মরা সুন্দরী মেয়েটি সৎমা ও সৎবোনদের অত্যাচারে মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন কী হল—পরীমা নেমে এলেন যাদুদণ্ড নিয়ে অন্ধকার ঘরে—মুহূর্তে দুঃখী মেয়ে হ'ল অপরূপ রাজকুমারী। রাজসভায় সে নাচতে গেলে রাজপুত্র পাগল হয় তার রূপ দেখে, নাচ দেখে। রাজপুত্রের সাথে তারই বিয়ের উৎসব চলছে, মহাসমারোহে সাত দিন ধ'রে।

কোথায় পাতালপুরীতে মণির অজগর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে মণিমালাকে—। সেই অজগরকে মেরে সাপের বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিঃসাড় মণিমালাকে বাঁচিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে এক রাজপুত্র। আজ সেই দিন—মণিমালা অবাক চোখে দেখছে পৃথিবীর ফুল, লতা-পাতা ঘাস, গাছ, পাখি, প্রজাপতি, আকাশ, মানুষ,—সবকিছুকে। কী অপূর্ব সব আর কী সুন্দর—ওদিকে এদিকেই বিয়ে হচ্ছে মণিমালার সাথে রাজকুমারের।

কোথায়—বুদ্ধ-ভুতুম, দুখিনী ছোটরানীর দুই সন্তান জিতে আনল লীলাবতী রাজকুমারীকে; তাদের বুদ্ধিতে পরাজিত হল হিংসুটে বড়রানীরা ও তাদের কুমারেরা। বুদ্ধু ভুতুম-দুই রাজপুত্র বসল রাজসভায়—সভায় আনন্দের বন্যা বইছে।

কোথায়- রানীর দুইবোনের ষড়যন্ত্রে রানীর দুই কুমার অরুণ বরুণ আর এক কন্যা কিরণমালা বড় হ'তে থাকে এক ব্রাহ্মণের কুটিরে। মায়া পাহাড়ে গিয়ে দু'ভাই পাথর হয়ে গেলো; কিরণমালা রাজপুত্র সেজে মায়ার জাল ছিঁড়ে সব রাজপুত্রদের জীবন ফিরিয়ে দ্যায়। নিয়ে আসে সাত রাজার ধন মাণিক।

রাজাকে নিমন্ত্রণ করলে শুক-সারী দেয় তাদের আসল পরিচয়—রাজা বুকে তুলে নেন দুই দেবকুমার আর এক দেবকুমারীকে। তারই উৎসব আজ আকাশ, বাতাস ছাপিয়ে। মেঘে মেঘে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় ভাসছে সে খুশি।

রাঙা চিঠির মজার গল্প, আর খবর শেষ হ'তে আলোপরী ছোট্ট কালো প্রজাপতিটাকে বসিয়ে দিলেন প্রজাপতির ঝাঁকের ভিতরে। খুশী হ'য়ে সে ছানা উড়তে লাগল ফুরফুর করে। বসতে লাগল এ ফুলে, ও ফুলে।

আলোপরী সবাইকে আদর দিলেন, সবার আদর নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে হাততালি দিলেন,—সব দৃশ্য মুছে গেল পলকে। অরুর হাত ধরে টেনে ওঠাল ঘাস-শিশুরা। অরু দেখল প্রায় রাত ভোর ভোর। এখনি সেই রাঙা জলে পদ্মডাঁটা দিয়ে গিয়ে উঠতে হবে। সেই যেখানে অপেক্ষায় আছে সাত দাঁড়ি, মাঝি আর ময়ূরপঙ্ক্ষী। অরু ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে ঘাস শিশুদের সাথে সাথে চলতে লাগল। অবাক করা স্বর্গ 'পারিজাতের মধুর মতো মিষ্টি সব সপ্ন দেখে মুগ্ধ অরুর মনের সব দুঃখ কোথায় যে উবে গ্যাছে, তা সে জানতেও পারল না। বাবা এতোক্ষণে সেই স্বপ্নগুলো দেখছে, হয়তো মিটি মিটি হাসি ফুটেছে ঠোঁটে—মা'কে ফিরে গিয়ে বলতে হ'বে সব। অরু ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। দূর্বাশিশুদের হাত ধরে নেচে নেচে চলল ও। পথে পথে জোনাকীরা আলোর প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়ে। সে আলো পড়েছে লাল ফুলে, নীল ফুলে, বেগুনী কমলা, হলুদ ফুলে আর সবুজ পাতায় সবুজ ঘাসেদের গায়ে। অনেক ওপরে সূর্যের আলো ফুটি ফুটি করছে, তাতেই পাতালের নীচেও আলোয় আলোয় উঠছে ভরে। অরুরা দেখল জোনাকী দিদিরা আলো নেভাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে আলোর সিংহদুয়ার।

আলো দিয়ে গড়া ঘাসেদের স্বর্গ—পারিজাতের সব ছবি যাচ্ছে মুছে সব স্বপ্ন যাচ্ছে আবছা হ'য়ে। ঐ দেখা যাচ্ছে রাঙা নদীর জল, কাদা ভরা তল—পাশেই বড় পদ্মের সেই ডাঁটা। ডাঁটার বন্ধ দুয়ার খুলে ঢুকে পড়ল সাতঘাস-শিশু-হাত লাগিয়ে ওরা টেনে ভেতরে ঢোকাল অরুকে তারপর অন্ধকার শুঁড়িপথে সবাই ওপরে উঠতে লাগল। অরু এ কাজে অভ্যস্ত—ও চট্‌পট্‌ উঠতে লাগল ঘাসশিশুদের আগে আগে। একটু পরেই অরু বেরিয়ে এল পদ্মের চাকার ওপর, পিছন পিছন সাত ঘাস শিশু। দুর্বামাঝিরা হেঁইয়ো ক'রে বৈঠায় দিল টান, সর সর করে ভোরের বাতাসে ময়ূরপক্ষী পদ্মের কাছে এসে ভিড়ল, ওরা লাফিয়ে উঠে পড়লে মাঝিরা পাল তুলে দিল। সাতরঙা পালের বাহার আরও খুলে গেল যখন ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত ধরাধরি ক'রে লাল সূর্যের রাঙা আলো এসে পড়ল সবকিছুর ওপর। রাঙা নদীর জল ডগমগ

করতে করতে ময়ূরপঙ্ক্ষীর সাথে সাথে চলতে লাগল। কখনো বা দুষ্টুমী ক'রে নেচে নেচে, কখনো অরুদের চোখে মুখে জল ছিঁটিয়ে, কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর জল চলতে থাকে। মাঝে মাঝে প্রজাপতি এসে বসে শুকনো খড়ের মাস্তলে, তাদের সুন্দর ডানা ছড়িয়ে একটুক্ষণ বসে—আবার উড়ে যায় ফুরফুরে বাতাসে ডানা মেলে। কখন বা নিয়ে আসে মধু, অরু আর ঘাস-শিশুদের ভাগ দেয় হাসি মুখে। উড়ে আসে সবুজ ঘাসফড়িঙের ছেলে মেয়েরা—এখানে দাঁড়ায় ওখানে দাঁড়ায় —তারপর নিঃশব্দে উড়ে চলে যায় কোথায়। জলে মাঝে মাঝে বুড়বুড়ি তুলছে কুচো মাছের দল। অরুর বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে , যদি প'ড়ে যায় জলে।

বোঁ বোঁ করে উড়ে আসে ভোমরাদের দু'বাচ্চা—গুণ গুণ গান গাইতে গাইতে এখানে ঠোকর খায়, ওখানে ঠোকর খায়—তারপর ধাঁ করে বেড়িয়ে চলে যায় দূরে, বনের ভিতর। বনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় ছায়া আর আলোর লুকোচুরি খেলা চলছে। মাঝে মাঝে সবুজ থেকে বেরিয়ে এসেছে লাল টুকটুকে ফুলের মুখ, হলুদ টুসটুসে ফল। মুখ বের করেছে বেগুনী লতাফুল, লাল করমচা। এই সব দেখতে দেখতে অরুর গলা থেকে কখন গান বেরিয়ে আসে, সাথে সাথে সাত-ঘাসশিশুও কণ্ঠ মেলায়। তালে আর সুরে চারদিক ভ'রে উঠতে বাতাস আর রোদও এসে যোগ দেয়। অরুর চোখে মুখে আদর ভরে দেয় দুজনে। আস্তে আস্তে জলের রঙ চক্চকে সোনালী হয়ে উঠতে উঠতে ওরা পৌঁছে গেল ঘাটে। পাল নামিয়ে ফেল্লে মাঝিরা—ময়ূরপঙ্ক্ষী ঘাস বাবা-মাদের কোল ঘেঁষে ভিড়ল।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে নামল অরু আর সাতঘাসশিশু। ঘাস বাবা-মা'য়েরা ঝুঁকে দেখল—ছেলেপুলেরা ঠিকমতোই ফিরেছে। অরু ওদের হাতে হাত রেখে গাইতে গাইতে ফিরল ঘাস-রাজ্যে। তারপর বিদায়ের পালা। শিশিরের এক একটা ফোঁটার টিপ পরিয়ে দিল এ ও'র কপালে , অরুর হাতে দিল সাতটি ঘাস ফুলের তোড়া। সব শেষ হলে অরু উজ্জ্বল সোনালী রোদের হাত ধরে বটবুড়োর কাছে ফিরে যেতে লাগল। সোনালী রোদ ফিসফিস ক'র জিজ্ঞেস করল, 'কেমন কেটেছে রাত?' উঃ আমি যদি তোমার সাথে যেতে পারতাম তবে কী মজাই না হ'ত, ওসব স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার সোনালী চুল আরও সুন্দর আরও লম্বা আরও ঢেউ খেলানো হ'য়ে উঠত, তাই না?' অরু ঘাড় নেড়ে লাজুক মুখে চলতে লাগল। গাছ তলার কাছ পর্যন্ত রোদ ও'কে এগিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল,—অরু সেই পাতাল পুরীর বন্ধ কপাটে ঘা দিল আস্তে। 'পেতলের ফুল লতাপাতা আঁকা ঝকমকে দুয়ার খুলে গেল

ধীরে, —রূপোর দুই দুয়ারী ঝকমকে হাসি হেসে অরুর হাত থেকে ফুলের তোড়া নিলে। তাদের চোখ বলল—'ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।' তাদের ঠোঁটের হাসি বলল, 'তোমার ভালোবাসা ঠিক জনকে জানিয়ে দেব।' অরু দেখল, আস্তে কপাট বন্ধ হয়ে গেল। অরু ফিরল এবার। মনে হ'চ্ছে এবার ঘুম নামবে—মাসী-পিসির পুতুল পুতুল চেহারা ভেসে উঠেছে। সামনেই চোখে পড়ল, সেই মাকড়সা বুড়ি রোদে ঝলমলে রেশমী জাল শুকোতে দিয়েছে—অরু জাল বেয়ে তরতর করে উঠে গেল বুড়ো বটের উঁচু ডালে। বুড়োবট মাথা নুইয়ে দেখলেন, এক গাল হেসে বললেন, "এসে গেছিস তবে? খুব ভালো, খুব ভালো। এবারে তবে মার কাছে ফিরবি, তাই না? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরবে।'

এমনি সময়ে তিন প্রজাপতি বোন—রাঙাবালা, নীলাবালা, ফুলবালা উড়ে এল পাখায় রঙ-রেরঙের ঢেউ তুলে, বলল, 'অরু, এসো তোমাকে নিয়ে বিদায় নাচ নাচি।' তারপর, অরুর হাত ধরে লাফিয়ে উঠ্‌ল, বেজে উঠ্‌ল শুকনো পাতার নূপুর, রোদের সোনালী দেহ চক্‌ মক্‌ ক'রে উঠ্‌ল, বাতাসে লাগল কাঁপন—ডানা মেলে রঙের ফুলঝুরি ছড়িয়ে, কখনো দু'ডানা একসাথে জুড়ে নিয়ে, কখনো এ ডাল থেকে ও ডালে, কখনো বা এ ফুল থেকে ও ফুলে নাচতে লাগল ওরা। ওদের সাথে হাত ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে অরুর মনে হ'ল আবার বুঝি আরেক নতুন পারিজাত-এ এসে পড়েছে ও'—যেখানে সব কিছু ভালো সুন্দর আর অসম্ভব মায়ায় ভরা। যেখানে রোদ কুচি কুচি সোনা ছড়াচ্ছে চারপাশ ঘিরে, যেখানে গাছেরা সাদা জ্যোৎস্নার মত ফুল ফোটাচ্ছে অবিরাম, বাতাস আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছে চারধার, পাতারা উল্টে পাল্টে নেচে নেচে তাল দিচ্ছে—অরুর মনটা ভরে যায়। অবশেষে তিন বোন প্রজাপতি নাচ থামিয়ে বটের ডালে এক গুচ্ছ কালো ফুলের মতন ঠাণ্ডা আঁধার ছায়ায় জিরোবার জন্যে বসল। ওদের সুন্দর ফুটফুটে শরীর থির থির ক'রে কাঁপতে লাগল। হাসি মুখে তিন বোন অরুকে নিয়ে ডালে ব'সে দোল খায়। এমনি সময় উড়ে আসে ভোমরা বর বউ। অরুকে অম্‌নি অম্‌নি খালি হাতে কি বিদায় দেওয়া যায়? হাতে তাদের তাই বটপাতায় মোড়া ফুলের মধুর তৈরী কেক্‌ আর পিঠে। অরুর হাতে মোড়কটা তুলে দিয়ে ও'র বুকে মুখে আদর ছোঁয়া দিয়ে বিদায় নেয় ওরা।

বটবুড়ো ঝুঁকে পেড়ে বললেন,—বুঝলি অরু, এসবের টানে আবার দু'দিন না যেতেই তুই এসে পড়বি। নিশ্চয় আবার আমাদের দেখা হ'বে। পাতালপুরীতে নামার আগে নিশ্চয় আরেকবার দেখা হ'বে। এই ব'লে বটবুড়ো গাঢ় নীল

আকাশের দিকে মুখ তুলে হা হা ক'রে হেসে উঠল---পাখিরা চমকে ফুড়ুৎ ক'রে সব ডানা মেলে ছড়িয়ে পড়ল, চারদিকে, পোকা মাকড়েরা তাড়াহুড়া করে যার যার গর্তে ঢুকে পড়ল, এক রাশ হলুদ পাতা ঝ'রে পড়ল নীচেয়।

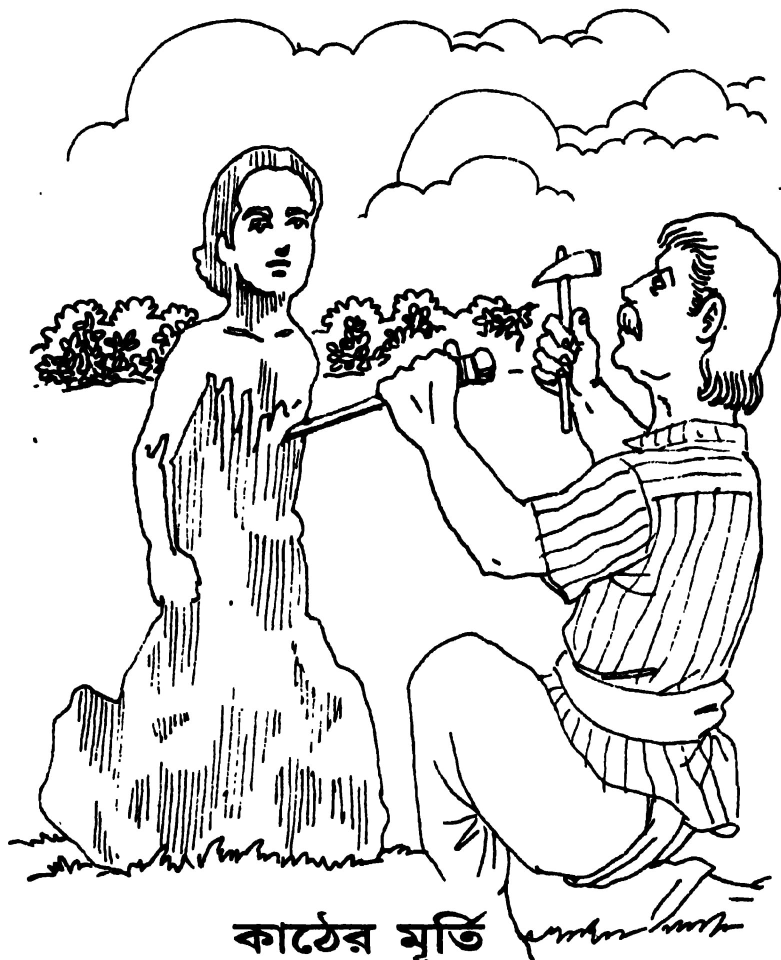
আকাশের নীলের দিকে চোখ রেখে বলল,—'আচ্ছা, বিদায়।'

বাতাস অরুকে কোলে তুলে নিয়ে এক লাফে নেমে এল মাটিতে, ঘাসেদের সবুজ দেহের ওপর। ঘুমন্ত ঘাসেরা কিছুই টের পেল না। একটু পর লাল রোদ এসে হাত ধরল অরুর। ডগমগ ক'রে উঠল অরুর সারা শরীর, গাছ, ফুল লতাপাতা ঘাস সবকিছু। অরু চলতে লাগল বাড়ির দিকে—সেই প্রাসাদ, সেই ছোট ছোট খুপরী ঘরগুলো, তাতে সাজানো আছে আরাম ভরা ছোট ছোট বিছানা। আবার ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসি দেখা দিলেন অরুর চোখের সামনে। তাদের লাল টুকটুকে ঠোঁটের দিকে দেখতে দেখতে অরুর মনে পড়ে গেল—এরি, দুরি, তেরি, উমনি, ঝুমনি, উচকপালী, মধুমুখী—আর মা, ওর মায়ের মুখ।

অরু তাড়াতাড়ি বলল, 'বিদায় , বিদায়, আবার দেখা হবে।' তার পর এক ফোঁটা এক গর্তে নেমে পড়ল---যেখান দিয়ে একটু পথ হেঁটে গেলে পড়বে সেই বিশাল প্রাসাদ, কুঠরীতে কুঠরীতে যার রয়েছে রাজা, রানী, মন্ত্রী, সর্দার পাইক পেয়াদা, বাবারা মায়েরা আর কত বাচ্চারা।

অরুকে দেখতেই এরি দুরি, তেরির দল ছুটে এল, কে যেন বাজিয়ে দিলে ঘণ্টা ফুল—সবাই বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রায় যোগ দিল। অরুকে সামনে নিয়ে সারা প্রাঙ্গণ ঘোরা সারা হ'লে অরু মা'র হাত ধরে ঘরে ঢুকল। আর সবাই যে যার বাসায় ফিরল। গল্পটিও ফুরোল।





কাঠের মূর্তি

চৌধুরী ওসমান

কোন এক শহরে বাস করতো চার বন্ধু। এক জন মিস্ত্রী, একজন স্বর্ণকার, তৃতীয় জন দর্জি আর চতুর্থ জন ফকির। সবাই ভাল লোক। প্রতি বছরে কোন-না-কোন জায়গায় তীর্থ ভ্রমণে বের হতো তারা।

একদিন ফকির তার তিন বন্ধুকে দাওয়াত করলো। খাওয়া-দাওয়ার পর বললো : আমাদের তীর্থ ভ্রমণের এই উপযুক্ত সময়। এবার কোথায় যাওয়া যায় বলো। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটলো। প্রত্যেকেই অন্যে বলবে মনে করে বসে রইলো।

অবশেষে ফকির বললো: শহরের দক্ষিণে একটা গভীর বন আছে। একদিনের রাস্তা। সেই বনের অপর পারে আছে একটি শহর। সেখানে আমার ওস্তাদের কবর আছে। তিনি একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। চল, এবছর আমরা তাঁর কবর জিয়ারত করে আসি। এতে আমাদের সওয়াব মিলবে প্রচুর। একথায় সকলেই রাজি হলো।

একদিন সুপ্রভাতে তারা চারজন যাত্রা শুরু করলো। সূর্যাস্ত নাগাদ তারা বনের প্রান্তসীমায় উপনীত হলো। এখানেই তারা রাত্রিবাসের আয়োজন করতে লাগলো। একজন আগুনের সন্ধানে বেরুলো। অন্যজন শুকনো খড়কুটো জড়ো করলো। তৃতীয় জন জায়গা পরিষ্কার করতে লাগলো। আর চতুর্থ জন শুরু করলো রান্না।

খেয়ে দেয়ে আগুনের চার ধারে বসে তারা আলাপ করছিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। বন্য জন্তুর গর্জন ও চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো তাদের কানে।

মিস্ত্রী বললো: আজ আর ঘুমানো হবে না। কখন বা বাঘ এসে পড়ে।

ফকির বললো: সকলের জেগে জেগে পাহারা দেবার দরকার কি? পালা করে জাগলেই চলবে। আমরা তো চারজন। রাত্রির প্রথম ভাগ মিস্ত্রী পাহারা দিক। তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জাগক দর্জি। রাত্রির দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম অংশ পাহারা দেবে স্বর্ণকার আর আমি দেব সূর্যোদয় পর্যন্ত।

এই প্রস্তাব সবার কাছেই বেশ ভাল মনে হলো। মিস্ত্রীই প্রথম পাহারায় রইলো। আগুনের ধারে বসে বসে তার বাড়ীর কথা, ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়লো। আগুনের তাপে বেশ আরাম লাগছিল। মাঝে মাঝে হাই উঠছিল, মাথা ঢলে পড়ছিল এবং ঘুমে দু'চোখ মুদে আসছিল তার।

এমন সময় একটি বাঘ শিকার না পেয়ে হতাশায় গর্জন করে উঠলো। আর মিস্ত্রী তন্দ্রা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখ রগড়াতে লাগলো সে। সে ভাবলো কোন কাজে ব্যস্ত না থাকলে ঘুম পাবেই, ঘুম এলে হয়তো বাঘ এসে তাদের একজনকে ধরে নিয়ে যাবে।

অতএব সে তার কুঠার তুলে নিল এবং এক খন্ড কাঠ নিয়ে কোপাতে লাগলো। কাঠ কোপাচ্ছিল আর চিন্তা করছিলো তার ছোট ছেলের কথা। চিন্তা করতে করতে তার নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটি সুন্দর বালকের ছাঁচ তৈরি করলো। সে একজন ওস্তাদ কারিগর। এই রূপে পাহারা শেষ হওয়ার আগেই একটা বালকের মনোহর মূর্তি গড়ে উঠলো।

সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দর্জিকে জাগিয়ে দিল সে। এখন দর্জির পালা।

মিস্ত্রী ঘুমোতে গেল। দর্জির ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম তাড়ানোর জন্যে সে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারী করলো, এমন সময় কাঠের মূর্তিটি তার নজরে পড়লো। কি সুন্দর বালক মূর্তি! হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো খানিক। তারপর মনে মনে বললোঃ যদি একে পোশাক পরানো যায় তবে আরও সুন্দর দেখাবে। তার ঝুলিতে ভেলভেট ও মসলিনের টুকরো ছিলো। তাই দিয়ে সে পোশাক তৈরির কাজে লেগে গেল। মূর্তি ও কাপড়ের একটা মাপ নিল সে। তার কাজে সে এতো ডুবে গেল যে সময় কখন চলে গেছে টেরই পায়নি। মাঝ রাতে মূর্তির পোশাক পরানো সম্পূর্ণ হলো।

তারপর স্বর্ণকারকে জাগিয়ে তুলে সে বললোঃ ওঠ, ওঠ, এখন দুপুর রাত। এবার তোমার জাগবার পালা। আমি ঘুমুবো।

স্বর্ণকার আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো এবং হাই তুলতে লাগলো।

: নিশ্চয়ই এখন দুপুর রাত নয়—সে বললো। কিন্তু যখন সে আকাশের তারার দিকে তাকালো তখন আর বুঝতে বাকী রইলো না এখন তারই পালা।

দর্জি শীগ্গীরই ঘুমিয়ে পড়লো আর স্বর্ণকার আগুনের ধারে গিয়ে বসলো। পোশাক সজ্জিত মূর্তিটি মাটির উপর পড়ে ছিল। স্বর্ণকারের নজর পড়লো তার ওপর। হাতে নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো মূর্তিটার পানে। সে ভাবলো এ আমার বন্ধু মিস্ত্রী ও দর্জির কাজ। কিন্তু একে আমি আরও সুন্দর ও মনোহর করে তুলতে পারি। আমার থলিতে কিছু সোনা ও পাথর আছে। তাই দিয়ে অলংকার তৈরি ক'রে পরালে একে রাজপুত্রের মত দেখাবে।

পালা শেষ হওয়ার মধ্যেই স্বর্ণকারের অলংকার তৈরি শেষ হলো এবং সে কাঠের পুতুলকে গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিল। তারপর সে ফকিরকে ডাক দিয়ে ঘুমোতে গেল।

যখন ফকির ফজরের নামাজ পড়ছিল তখন সুন্দর পুতুলটির দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। মূর্তিটি কুড়িয়ে নিল সে। সে বুঝলো, তার বন্ধুরা এমনি করে সময় কাটিয়েছে। মিস্ত্রী তৈরি করেছে মূর্তি, দর্জি পরিয়েছে এর পোশাক আর স্বর্ণকার মূল্যবান অলংকারে একে সাজিয়েছে। এখন যদি এর জীবন দেওয়া যায় তাহলে এই বালকই হবে দুনিয়ার মধ্যে সৌন্দর্যে অনুপম। ইস্মে আজম দোয়া পড়ে ফকির তার বন্ধুদের কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যত হলো।

মাটির উপর সে একটি বৃত্ত টানলো। বৃত্তের মাঝখানে আঁকলো একটি নক্ষত্র। আর সেই নক্ষত্রের মাঝখানে প্রাণহীন মূর্তিটি স্থাপন করলো সে। এবার বৃত্তের চারিদিকে সাত পাক ঘুরলো এবং প্রত্যেক বার কি যেন উচ্চারণ করলো মনে মনে। সপ্তম পাকের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের মূর্তি নড়ে উঠলো। একটু একটু করে চোখ খুললো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

সেই মুহূর্তে অন্য তিন বন্ধু জেগে উঠলো। যখন দেখলো কাঠের মূর্তি জীবিত হয়ে উঠছে তখন তাকে প্রত্যেকেই দাবি করলো।

মিস্ত্রী বললোঃ যেহেতু এক টুকরো কাঠ থেকে আমি একে তৈরি করেছি, সুতরাং এ ছেলে আমার।

:না, না—দর্জি বললো—তা ঠিক নয়। ওকে কি আমিই বহুমূল্য পোশাকে সাজাইনি? যেমন পিতা পুত্রকে পোশাক পরায় সেই হিসেবে আমিই ওর দাবিদার। এই বলে সে বালকটি নিয়ে যেতে অগ্রসর হলো।

:দাঁড়াও—স্বর্ণকার চিৎকার করে উঠলো—আমার জিনিসটার ওপর তোমাদের কিসের দাবি? কাপড় দেওয়া এমন কোন বড় কাজ নয়। ভিখিরিকেও লোকে কাপড় দেয়। তাই বলে তার ছেলে হয়ে যায় না। আমি এই ছেলেকে অলংকার দিয়েছি। অপরিচিত লোককে কি কেউ কোন দিন ধন-সম্পত্তি দেয়? আমার দাবি তোমার চেয়ে জোরালো। এই বলে ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখল সে।

: থাম—ফকির বললো—একমাত্র আমিই এর দাবি করতে পারি। মন্ত্রবলে আমি তার জীবন দিয়েছি এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

কিন্তু কেউই একথা মেনে নিল না। প্রত্যেকেই যথাশক্তি উচ্চ কণ্ঠে নিজ নিজ দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হলো এবং বালককে নিযে যেতে চেষ্টা করলো।

সেই মূহূর্তে একজন ধনী কৃষক ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো সেখানে। সে বললোঃ কেন ঝগড়া করছে তোমরা?

তখন ফকির সমস্ত ঘটনা খুলে বললো।

যখন ফকির গল্প বলছিল তখন কৃষক বারবার ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছিল। সে ছিল নিঃসন্তান। সর্বদা পুত্রের অভাব অনুভব করতো। বালককে দেখে এবং এই কৌতুহলোদ্দীপক গল্প শুনে সে ছেলেটিকে পুত্র বলে দাবি করতে বদ্ধপরিকর হলো।

গল্প শেষ হতেই কৃষক ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে এবং দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে দু'বাহু দিয়ে বেষ্টন করে ধরলোঃ তোমরা চোর! এ আমার হারানো ছেলে। ক'মাস আগে সে অপহৃত হয়েছে। তোমরা ডাকু। এ ছেলে আমার।

কথা শুনে চার বন্ধু অত্যন্ত রেগে গেল। তারা কৃষককে ধরতে গেল। কিন্তু কৃষক অতি দ্রুত ছেলেটিকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। ঘোড়ায় চাবুক কষতেই শহরের কোতোয়াল এসে উপস্থিত হলো ঘোড়া ছুটিয়ে।

চার বন্ধু কোতোয়ালের কাছে দৌড়ে গেল। তারা সমস্বরে বললোঃ ইনসাফ চাই, ইনসাফ। এই লোকটা জোর করে আমাদের ছেলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে থামান।

কৃষক ঘোড়া অগ্রসর করে বললোঃ এ ছেলে আমার এ চারটি লোক বদমায়েশ।

: দাঁড়াও—কোতোয়াল বললো—এ ছেলে তোমাদের পাঁচ জনের হতে পারে না। এ আমার ভাইপো। বহুদিন আগে একে ছেলেধরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে এসো কাজীই এর ফয়সালা করবেন। তোমরা সবাই বদমায়েশ।

কোতোয়াল ও তাঁর লোকেরা পাঁচ জনকে ঘিরে দাঁড়াল এবং কাজীর কাছে নিয়ে গেল।

কোতোয়াল কাজীকে বললঃ এই পাঁচটা লোক চোর এবং বদমায়েশ। এই ছেলেটি অমার ভাইপো। ওকে এরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।

: না, না—সকলেই এক সঙ্গে বলে উঠলো—ও আমার ছেলে। এবং সকলেই তাদের গল্প বলতে লাগলো।

কাজী বললোঃ চুপ কর। যদি সকলেই এক সঙ্গে কথা বল, তাহলে আমি কেমন করে শুনবো। তিনি তাদের পর পর কাহিনী বলতে আদেশ দিলেন। গল্প বলা শেষ হলে বালককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেনঃ তুমি কার ছেলে?

বালক বললোঃ আমি জানিনে।

: তুমি কোথায় থাক?

বালক পুনরায় জবাব দিলঃ আমি জানিনে। আমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। আজ সকালে দেখলাম আমি আগুনের ধারে বসে আছি (মিস্ত্রী, দর্জি, স্বর্ণকার ও ফকিরকে দেখিয়ে) এই চারটি লোক আমাকে নিয়ে ঝগড়া করছে। তারপর এলো এই কৃষক। এসে বললো, আমি তার ছেলে। তারপর সেখানে এলো কোতোয়াল। সে দাবি করলো যে আমি তার ভাইপো। এটুকুই আমি জানি।

কাজী দাড়িতে হাত বুলালেন কিছুক্ষণ। ভাবতে ভাবতে মাথা চুলকাতে লাগলেন। তার পর আইনের বই-পুস্তক তলব করলেন। কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারলেন না। অবশেষে বললেনঃ এ অত্যন্ত জটিল বিষয় দেখছি। চল, আমরা আজব গাছের কাছে যাই। সম্ভবত তার কাছ থেকেই আমরা আসল সত্য জানতে পারবো।

আজব গাছ একটি অদ্ভুত পিপুল কাছ। গাছটি শহরের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে

আছে মাথা উঁচু করে। কোন জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে সে সঠিক উত্তর দেয়।

কাজেই কাজী, কোতোয়াল, কৃষক ও চার বন্ধু গাছের কাছে গেলেন। এক বিরাট জনতা চললো তাদের পিছনে। কারণ এই অদ্ভুত ঘটনার খবর সকলেরই কানে পৌঁছেছে।

কাজী আজব গাছের কাছে এসে তিন বার মাথা নোয়ালেন। সেই সময় গাছের শাখাপ্রশাখা আন্দোলিত হলো এবং পাতার মর্মরধ্বনি শোনা গেল। মনে হলো গাছও যেন কাজীকে মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

:শোনো আজব গাছ! একটি গল্প বলছি, শোনো। এই বলে কাজী সমস্ত গল্পটি বর্ণনা করে বললেনঃ তাহলে বল ছেলেটি কার?

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। আজব গাছের দুটি শাখা নুয়ে পড়লো। মা যেমন ছেলেকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে তেমনি তারা যেন বালকটিকে আকর্ষণ করলো। আস্তে আস্তে ছেলেটি গুঁড়ির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর গাছ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলোঃ ছেলেটি কাঠের, আমিও কাঠের। বালকের মধ্যেও আছে জীবন, আমার মধ্যেও আছে জীবন। বালক ফিরে এসেছে আমার কাছে। সমস্ত জিনিস যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাবে। এখন সবাই চলে যাও।

সকলেই ধীরে ধীরে চলে গেল। কাজী কোতোয়াল ও কৃষককে গ্রেফতার করে বললেনঃ তোমরাই হচ্ছ সবচেয়ে বড় বদমায়েশ। তারপর তিনি চার বন্ধুকে তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে গালি দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

লজ্জিত হয়ে চার বন্ধু আবার গন্তব্য পথে চলতে শুরু করলো।





পরিবর্তন

[illegible]

রফিক, শফিক, জেবা, শেবা, মা ও বাবা—এই নিয়ে তাদের সংসার। রফিক ও শফিক—দু'ভাই এবং জেবা ও শেবা—দু'বোন। রফিক বড়। শফিক ছোট। শফিকের পর জেবা, তারপর শেবা।

শফিক ছোট। রফিকের চাইতে এক বছরের ছোট। শফিক ছোট হলে হবে কি, দুষ্টুমিতে তার জুড়ি নেই। দুষ্টুমিতে সকলের উর্ধ্বে—সকলের সেরা। এই তল্লাটে তার মত অত দুষ্টু ছেলে আরেকটা মেলা ভার।

শফিককে নিয়ে মায়ের যত চিন্তা। শফিকের কাছে কোন ভেদাভেদ নেই।

রফিককে সে শান্তিতে থাকতে দেয় না। এটা-ওটা ছুতো-নাতা কোন কিছু নিয়ে রফিকের সাথে সে ঝগড়া করবেই করবে। ঝগড়া থেকে মারামারি—একেবারে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়।

রফিক শান্ত ছেলে। সে এগুলো সহ্য করতে না পেরে বলেঃ শফিক, তুই এ রকম করলে কিন্তু আর তোর সাথে কথা বলবো না, খেলবোও না।

:তুমি আমার সাথে কথা না বললে, না খেললে আমার বয়েই গেল।—সদম্ভে মুখ ভেংচে কথা কয়টা বলে শফিক অন্যত্র চলে যায়।

জেবা ও শেবা হয়ত বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। সেখানে গিয়ে সে জেবার মাথায় টোকা মারে বা গাল ধরে টানে আর নয়ত পুতুল নিয়ে পালিয়ে যায়। আর ব্যস, অমনি দু'বোন মিলে কান্না জুড়ে দেয়। এভাবে ঘরে সবাইকে সে বিরক্ত করে—সবাইকে অস্থির করে তোলে।

ঘরেই সে কেবল মারামারি বা ঝগড়া-ঝাঁটি করে না বা ছোট ছোট বোনদের অস্থির করে তোলে না, বাইরেও শফিক দুষ্টুমিতে কম যায় না। সে বাইরেও এ-ওর সাথে মারামারি ঝগড়া-ঝাঁটি হর-হামেশাই করছে। এজন্যে তার মা-বাপকে অন্যান্য ছেলেমেয়ের মা-বাবার বা অভিভাবকদের কত কথাই না শুনতে হচ্ছে হর-হামেশাই।

মা শফিকের এই দুষ্টুমিতে একেবারে অতিষ্ঠ। তাই শফিককে নিয়ে মায়ের চিন্তার অন্ত নেই। মা তাকে ডেকে বলেঃ বাবা, মারামারি, ঝগড়া-ঝাঁটি করতে নেই। তুমি যে এ রকম করো, মানুষে বলবে কি!

:কই মা, আমি তো ঝগড়া-ঝাঁটি করিনে। ওরা আমাকে মারে তাই মারি। আমি তো আর অমনি কারো সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করিনে, মা।—শফিকের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

মা শান্তভাবে বলেঃ না বাবা, কারো সাথে মারামারি বা ঝগড়া-ঝাঁটি করো না। কেউ যদি তোমার সাথে ঝগড়া বা মারামারি করে, তা'হলে আমাকে বলো। আমি তার বাবা-মাকে বলে দেব। আর কেউ তোমার সাথে মারামারি বা ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না। কেমন, কথাগুলো মনে থাকবে তো?

:জি, হ্যাঁ! মনে থাকবে!—শফিকের কণ্ঠে নম্রতা ঝরে পড়ে।

এরপর শফিকের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। সে আর এখন কারের সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করে না। সে পরিবর্তিত হলেও ইদানিং তার মধ্যে অন্য একটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মা রফিক ও শফিককে রোজ বিকেলে পরিষ্কার ভাল ভাল জামা-কাপড়

পরিয়ে দিয়ে বলেঃ যাও বাবা, একটু বেড়িয়ে এসো। দেখো, কারোর সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করো না কিন্তু।

রফিক ও শফিক দু'জনেই একসঙ্গে বলেঃ না মা, আমরা কারো সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করবো না।—এই বলে দু'ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পেছন থেকে মা ডেকে বলেঃ সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসো। দেরী করো না কিন্তু।

রফিক ও শফিকের কানে মায়ের এ কথাগুলো যাক বা না যাক, রফিক ঠিকভাবেই ঘরে ফেরে। সে কারোর সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করে না। তার জামা-কাপড়ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকে।

আর শফিক। শফিকও ঘরে ফেরে যখন সন্ধ্যে হয় তখন। তবে তার জামা-কাপড় আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না। দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। ধুলো-বালিতে ভর্তি হয়ে থাকে। মাথার ক্যাপটাও ময়লা হয়ে যায়। এই ক্যাপটা তার বাবা কিনে দিয়েছিল। নেভিদের ক্যাপের মত চোখের ওপর শেড দেওয়া সাদা টুপি। ও বাড়ীর রহমানের মাথায় এরকম একটা ক্যাপ দেখতে পেয়ে বাপের কাছে আবদার করেছিল। আবদার নয়, দস্তুরমত জেদ ধরেছিল, যেভাবে হোক, এরকম একটা ক্যাপ তাকে কিনে দিতেই হবে। উপায়ান্তর না পেয়ে তার বাবা তাকে এই ক্যাপটা কিনে দিয়েছিল। সেই ক্যাপটাও ময়লা হয়ে যায়।

মা শফিকের কাপড়-চোপড় ও টুপিতে ময়লা দেখে মনে মনে ভাবে, সে নিশ্চয়ই কারো সাথে মারামারি করেছে। নইলে জামা-কাপড় ও টুপি নোংরা হয় কখনো!

মা শফিককে ম্লান মুখে শুধোয়ঃ কি বাবা, কার সাথে মারামারি করেছ?

: না মা, আমি কারো সাথে মারামারি করিনি।

:তোমার জামা-কাপড় ও টুপি তাহলে এত ময়লা হলো কিভাবে? আর দুমড়ে-মুচড়েই-বা দিল কে এগুলো?

: কেউ কিছু করেনি, মা। খেলতে গিয়ে এমনটি হয়েছে।—স্মিতমুখে বলে শফিক। মা রাগতস্বরে বলেঃ কাল থেকে আর কাপড়-চোপড় ময়লা করো না।

:তাই হবে। আর ময়লা করবো না।

ব্যাস, ওই পর্যন্তই! কার কথা কে শোনে। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজই এমনটি হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় ধুলো-বালিতে

ময়লা তো রোজ হয়ই, তার ওপর জামা-কাপড় ও টুপি দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়।

একদিন দেখে যে, টুপির শেডটির সেলাই খুলে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। মা জিজ্ঞেস করেঃ বাবা শফিক, এটা কিভাবে হলো ?

:কি জানি মা, আমি তো এর কিছুই জানিনে।

মা আর শফিককে কিছু বলে না। টুপিটা আবার সেলাই করে দেয়। ভেতরে ভেতরে খুব রাগ করে। মনে মনে বলে, ছেলেটা আমাকে জ্বালিয়ে মারলো। তার মত এমন আর কেউ জ্বালাতন করে না। সে যে কি করে, এর রহস্য উদঘাটন করতেই হবে।

একদিন শফিক যখন খেলতে গেল, তখন রফিককে, ডেকে বলেঃ বাবা, খোঁজ করে দেখ তো শফিক কোথায় যায় রোজ রোজ।

রফিক মায়ের কথামত শফিক কোথায় যায় আর কার কার সাথে খেলা করে, তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে রহমান ও উজ্জ্বলের কাছে গেল। সে তাদের কাছে জানতে পারল যে, কৃষি খামারের মধ্যে ঝিলের পাশে যে প্রকান্ড মাঠটা আছে, শফিক সেখানেই কয়েকটা ছেলের সাথে খেলা করে।

রফিক তাদের কথামত সেদিকে গেল। মাঠটার কাছাকাছি যখন গেল, তখন সে দেখতে পেল যে, কয়েকটা ছেলে কাঁধে বাঁশের লাঠি নিয়ে মাঠের এদিক থেকে ওদিক টহল দিচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের গলায় রুমালের মত বাঁধা তাদের শার্টগুলো। আরেকটি ছেলে দু'হাতে দুটি কাপড় নিয়ে ঝিলের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে হাত দুটো এদিক-ওদিক নাড়ছে। আবার কখনো মাথার টুপিটা নিয়ে ইশারা দিচ্ছে। তারা নৌসেনা নৌসেনা খেলছে।

রফিক তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

: এই, কি দেখছো ?

রফিকের তন্ময়তা ভাঙলো। তারা যে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টেরই পায়নি। সে ফিরে তাকিয়ে দেখে যে, দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশের লাঠি। কৃত্রিম নেভির সাজে সজ্জিত।

: এই, কি দেখছো, বল না!—আবার ছেলে দুটো জিজ্ঞেস করলো।

: না, কিছুই না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।—রফিক নম্রভাবে বলে।

: তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

: না, আমি যাব না।

: তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সাথে।—এই বলে ছেলে দুটো রফিকের হাত ধরে টানতে শুরু করে দিয়েছে।

: আমাকে ছেড়ে দাও বলছি।—এই বলে রফিক হাত ছাড়াবার জন্যে তাদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল।

ছেলে দুটোও কিছুতেই ছাড়লো না। টানতে টানতে মাঠের মধ্যিখানে নিয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় একজন এসে কানে কানে বললোঃ এই ভাইয়া, ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না। আমরা এমনি মিছেমিছি খেলা করছি।

কে কার কথা শোনে। রফিক তবুও হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো।

তারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে টেনে নিয়ে গেল ইট দিয়ে বানানো উঁচু আসনে বসা টুপি মাথায় একটি ছেলের কাছে। বললোঃ এই যে সর্দার, একে ধরে আনলাম।

:এ কে ?

: এ আমাদের শত্রু। এ আমাদের গোপন ঘাঁটি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। তার গতিবিধি সন্দেহজনক। তাই তাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

: বেশ করেছো। ভাল করেছো।—এই বলে সর্দার ছেলেটি রফিকের দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমরা আমাদের এই মাটি—এই দেশকে আমরা ভালবাসি। এটাই আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। আমরা আমাদের প্রাণ দিয়ে একে রক্ষা করবো। আমরা আমাদের এই জন্মভূমি—আমাদের এদেশকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছি। আমরা সবাই সৈনিক। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে আমরা সবাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। তাই তুমি আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারনি। তুমি ধরা পড়েছো। তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না। তোমাকে শাস্তি দেবো।

: আমি তোমাদের শত্রু নেই। আমি এমনি এখানে এসেছি। —ভয় সচকিত কণ্ঠে বলে রফিক।

: সত্যি, যদি তুমি এমনি এসে থাকো, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো। আর কখখনো তুমি এখানে এসো না।

: বেশ, আসবো না।

: মনে থাকে যেন। আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দাও। —সর্দার রফিককে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

রফিক ছাড়া পেয়ে বলেঃ দাঁড়া, শফিক, তোকে মজা দেখাচ্ছি। মাকে গিয়ে সব বলবো। —এই বলে দে দৌড়।

রফিক হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো।

মা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ কি বাবা, কি হয়েছে ? শফিক কোথায় যায়, কি করে কার সাথে খেলা করে, খোঁজ পেয়েছো তার কিছু ?

: হ্যাঁ মা, পেয়েছি। —এই বলে রফিক আদ্যোপান্ত সব কিছু বললো। তারপর বললোঃ শফিক বলে কি জান, আমরা আমাদের প্রাণ দিয়ে এ দেশকে রক্ষা করবো, শত্রুকে আমরা কঠোর হাতে দমন করবো—এসব আরো কত কিছু।

মা যত শোনে, গর্বে তার বুকটা তত ফুলে ওঠে। মনে মনে বলেঃ দুষ্টু, শফিক, বড় হয়ে সে দেশ ও জাতির সেবা করবে। —মার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তারপর আবার মনে মনে বলেঃ হে আল্লাহ, তাকে তুমি খাঁটি দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোল।

এরপর মা রফিকের কাছে এগিয়ে এসে বলে : বাবা, তুমিও কাল থেকে তাদের সাথে খেলতে যেও, কেমন!

রফিক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।





রাতের অতিথি

কাজী আবুল হোসেন

আঁধারমানিকের খাঁ সাহেবদের একটা বহুদিনের পুরানো বাগানবাড়ী ছিল। আজ সেই খাঁ গোষ্ঠীর কেউ আর দুনিয়ায় নেই। কিন্তু নাম তাদের আছে লোকের মুখে মুখে। এই ধুয়ে-মুছে-যাওয়া বংশের নানারকম আজগুবী সংবাদ যেমন প্রাচীনরাও বিস্তর জানতো, তেমনি ছেলে-ছোকরার দলও জানতো। অবশ্য এই দুপক্ষেরই কথাগুলো কানে শোনা। খাঁদের সেই শান- শওকাৎ দেখবার মত নসিব তাদের কারোই হয়নি।

এখন যে বাগানবাড়ীটার কথা বল্‌তে যাচ্ছি—সেই বাগানবাড়ীকে কেন্দ্র

করেই নানারকম সব আজগুবি কথা লোকের মুখে-মুখ ফিরতো। কেউ বলতো—ওখানে দিনের বেলায় কোহ্‌কাফ্ পাহাড় থেকে পরীর দল আসে, তারা নাচ গাওনা করে —বাড়ীর সামনের প্রকান্ড দীঘির পানিতে সাঁতার কাটে।'

আবার কেউ-বা বলে—না, ও সব ভুতুরে কান্ড-কারখানা । অমাবস্যার রাত্রে ঐ চারমহলা বাড়ীর ওপরতলার খিড়ড়ি খুলে যায়। সেখানে দপ্ দপ্ করে আলো জ্বলে আর নেভে।

বুড়োরা আর ছেলে ছোকরার দল এ-কথা সহজেই বিশ্বাস করতো। বিশ্বাস করতো না শুধু যুবকরা। যারা আজকাল লেখাপড়া শিখ্‌ছে, মনে যাদের জ্ঞান -বিজ্ঞানের আলো। এদের দলের পান্ডা ছিল আমজাদ হোসেন। সে বলতো—ওসব বুড়োদের আজগুবী খোশ্-খেয়াল। আজকাল কি আর সেদিন আছে যে, মানুষ কথায় কথায় ভূত বিশ্বাস করতে যাবে? ভূত আবার কি, একটা কাঁচকলা!—-

বুড়োরা আমজাদ হোসেনের এই কথা শুনে চোখ রাঙাতো। মনে মনে বল্‌তো —গায়ে তাজা রক্ত আছে বলে ছোড়াটা যেন আসমান দিয়ে উড়তে চায়।

ছেলে ছোকরার দল অবাক হতো। তারা আমজাদের দলের কাছে এগিয়ে এসে মনে মনে সাহসী হওয়ার আনন্দ পেতো।

যা হোক,হঠাৎ একদিন ঐ বাড়ীটাতে এসে জুটলো একজন নূতন লোক। নবীনগর জমিদার-সেরেস্তার ম্যানেজার সাহেব। সম্প্রতি জমিদার আবদুল মালিক চৌধুরি খাঁ সাহেবদের এষ্টেটটা নীলামে চড়িয়ে খুব কম দামে কিনে ফেলেছেন। এ তল্লাটের হাল-বকেয়া খাজনা ও নুতন প্রজাবিলির ভার দিয়ে তিনি ম্যানেজার সাহেবকে পাঠালেন আর্ধারমানিক গ্রামে।

ম্যানেজার লতাফৎ হোসেন সাহেব ছিলেন আধুনিক শিক্ষিত যুবক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাস করে সবে বেরিয়েছেন। মনে যেমন বল দেহেও তেমনি শক্তি। গ্রামে ঢুকে তিনি টকাটক্ ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা উঠলেন গিয়ে খাঁ সাহেবদের সেই ভূতুড়ে বাগানবাড়ীটায়। জমিদার সাহেব অবশ্য আসবার সময় তাকে বলে দিয়েছিলেন.., গ্রামে গিয়ে কোন বর্ধিষ্ণু মাতব্বরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করতে। কিন্তু প্রবীণ জমিদারের এই অহেতুক সদুপদেশ তরুণ ম্যানেজারের কানেও আজগুবী খোশ খেয়ালের মতই মনে হলো। এমন সুন্দর বাড়ী, বাড়ীর সমানে প্রকান্ড দীঘি। সাদা পাথরের সিঁড়িগুলো ওপর থেকে সোজা পানির নীচে নেমে গেছে। কী চমৎকার

আবহাওয়া। গাঁয়ের কোন মাতব্বরের বাড়ীতে রাত্রিবাস করলে কি আর এতো আনান্দ পাওয়া যেত? না তৃপ্তিই সে পেতো মনে?

চৈত্রের অপরাহ্ন।

সূর্যের আলো ঝিকমিক করে নারকেল পাতার উপরে যেন গড়িয়ে পড়ছে। ম্যানেজার লতাফৎ হোসেন চারতলার ঝুলানো বারান্দায় ইজি চেয়ারে টেনে নিয়ে বসে আছেন। কেমন করে ঐ রহস্যময় আকাশের এক প্রান্তে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তাই তিনি বেশ মনোযোগের সাথে দেখছিলেন। হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়লো। সিঁড়িতে কতকগুলি পায়ের শব্দ হলো। ম্যানেজার সাহেব একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে উপরে উঠে এলো। তার ভিতর বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বললো: "আব্বা আপনাকে দাওৎ করেছেন, আজ রাতে আপনি আমাদের ওখানে খাবেন।"

ম্যানেজার সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। তিনি এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন: কেন তোমাদের ওখানে খাব কেন? আমি চাকরি করি জমিদারের। তার জমিদারিতে এসে তারই এক প্রজার ঘাড়ে চাপবো এ কোন দিশী কথা?

মেয়েটি আবার বললো: শুধু খাওয়া বলে তো নয়,—-আজ রাতে আমাদের দহালজে ঘুমোবেন আপনি!

ম্যানেজার সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন: যাও যাও কি যে বলছো তোমরা, ওর মাথামুন্ডু কিছুই তো বুঝিনে আমি। এখানে এতো জায়গা খালি পরে আছে তা ছেড়ে এখন ঘুমুবার জন্য আমাকে তোমাদের বাড়ীতে ছুটতে হবে নাকি?

দলের ভিতর থেকে এবার একটি ছেলে কিছু সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললো: এটা যে ভূতের বাড়ী। এখানে আপনি ঘুমোবেন কি করে?

ম্যানেজার সাহেব পুনরায় প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন: তোমরা কেউ ভূত দেখেছো কোনদিন?

ছেলেরা বললো: না, শুনেছি।

ম্যানেজার সাহেব এবার গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন: —তবে বাড়ী ফিরে যাও। আমার খাবার জিনিস সঙ্গেই আছে। আর এখানে একা থাকতেও আমার অসুবিধে হবে না।

মেয়েটির দিকে ফিরে তিনি পুনরায় বললেন: তোমার আব্বাকে আমার মুবারকবাদ জানিয়ো।

ছেলেরা আবার দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। তরল আঁধারের সঙ্গে চৈতী হাওয়ার আমেজ এসে ম্যানেজার লতাফৎ হোসেনের দেহ-মনকে স্নিগ্ধ করে তুলেছিলো। এই বিরাট বাগানবাড়ীর কোন সীমানায় যেন কি একটা অজানা ফুল ফুটেছিল। হাওয়ার বুকে তারই মদু গন্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এক এক করে আসমানের বুকে ফুটে উঠলো অসংখ্য তারা। জরীর ফুলের মত, হীরের টুকরোর মত, ঝক্‌ঝকে —ঝলমলে । এমন শান্ত সন্ধ্যার এই নির্জন প্রশান্তি —এ যে কত বড় দুর্লভ, লতাফৎ হোসেন তা জানেন। তাই তিনি এই মাত্র গ্রামের কোন আগ্রহশীল প্রজার দাওৎ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যতই আঁধার বাড়ছে,—তারাগুলি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সামনের দীঘিটার বুকে পড়েছে সেগুলির আলোক প্রতিবিম্ব। মরি, মরি কি চমৎকার আবহাওয়া। লতাফৎ হোসেন সাহেবের মনে হলো এখনি তিনি মন খুলে, গলা ছেড়ে দিয়ে বেশ সুন্দর একখানি আধুনিক গান কায়দা করে বাগিয়ে ধরে ফেলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাকে আপাতত দমন করতে হলো। কারণ, আশে পাশে শিক্ষিত, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত প্রজার দল রয়েছে, তারা যদি আবার এ সব শুনে ফেলে, তবে জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তার যে গাম্ভীর্যটুকু আছে, সেটুকু বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে যে।—

একটা হ্যারিকেন তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আঁধার গাঢ় হতেই তিনি সেটা জ্বালিয়ে ফেললেন। সঙ্গে একটি টিফিনক্যারিয়ারের ভিতর ছিল মুরগীর গোশ্‌ত আর কয়েকটা পারোটা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে—ফ্লাস্ক খুলে ঢক্ ঢক্ করে বেশ খানিকটা পানি খেয়ে নিলেন। ব্যস্ এবার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত!—

দীঘির পাড়ে ঘোড়াটাও বেশ মনের সাধে চরে বেড়াচ্ছিল। বহুদিনের অযত্ন-বর্ধিত তৃণের বনে সে আজ নবাগত। এই প্রাচীর-ঘেরা জগতে এতোদিন কোন চতুষ্পদ বা দ্বিপদের আগমন হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাই প্রচুর মোলায়েম, মনোরম ঘাস পেয়ে নবীনগর জমিদার সেরেস্তার এই রোগা ঘোড়াটিও স্বর্গ সুখ অনুভব করছিল। তারও মনে হচ্ছিল সম্ভব হলে মানুষের মতই সে গলা ছেড়ে দিয়ে খুব খানিকটা তাইরে নাইরে করে রাগিণী ঝাড়তো। লতাফৎ হোসেন সাহেব আঁধারের জন্য ঘোড়াটাকে ঠিকমত ঠাহর করতে না পারলেও অনুভব করছিলেন। ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে ঘাস ছোঁড়ার আওয়াজ হচ্ছিলো আর তারই তালে তালে শক্ত পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছিলো।—

খানা পিনার পর স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের তাগিদ এলো।

একটু হালকা ভাবে, নরম শয্যার উপর গা এলিয়ে দিয়ে নানারকম কল্পনার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া।....

লতাফৎ হোসেন এবার প্রকান্ড হল-কামরাটায় ঢুকে পড়লেন। খাঁ বংশের সুপ্রাচীন মর্যাদা নিয়ে তখনও একটা বৃহদাকারের খাট ঘরের মেঝেয় বিছানো ছিল। ধুলা-বালি আর মাকড়সার কল্যাণে খাটখানির কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না। সুতরাং ম্যানেজার লতাফৎ হোসেন মেঝের খানিকটা জায়গা ঝাড়ামোছা করে নিয়ে নিজের গদী বালিশ খাটিয়ে নিলেন। তারপর হ্যারিকেনটা শিয়বের দিকের উঁচু কুলুঙ্গীতে রেখে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু তার শোওয়া হলনা।.....

হঠাৎ সিঁড়িতে অনেকগুলি ভারী পায়ের শব্দ উঠলো। দুমদাম্ দুমদাম্ করতে করতে কারা যেন উপরতলার দিকে ছুটে আসছে। লতাফৎ হোসেন ত্রস্তে শয্যার উপর উঠে বসলেন। এত রাত্রে কারা আবার জ্বালাতন করতে এল। সিঁড়িতে একই ভাবের শব্দ হয়ে চলেছে। তার ওপর আবার একটা করুণ তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ যেন সারা বাড়ীটাকে বিদীর্ণ করে ফেলছে। একি ব্যাপার ?.....

ম্যানেজার সাহেব এবার আর নিরস্ত থাকতে পারলেন না। তিনি তার চা ব্যাটারীর টর্চটা হাতে করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কৈ কিছুই তো না।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আবার তিনি ভালো করে শব্দটি শুনতে লাগলেন। এবার তাঁর মনে হল আওয়াজটা যেন ছাদের উপর থেকে আসছে। তিনি আবার টর্চ হাতে করে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ছাদে। বিরাট ছাদ। দিগন্তব্যাপী যেন তার সীমা। কিন্তু একদম ফাঁকা। ...আশ্চর্য বটে। তবে এ আওয়াজ আসছে কোত্থেকে ? উদ্বেগে এবং ছুটাছুটিতে লতাফৎ হোসেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। .....তিনি ছাদের আলিসার উপর কনুই ঠেকিয়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ভূত না দেখলেও, এ যে একটা অদ্ভুত কিছু এ-কথা তিনি মনে মনে স্বীকার না করে পারলেন না। কিন্তু কিসের এই শব্দ ? এ তো তার অন্ধকার মনের সংস্কার নয় ? বাস্তব উপলব্ধির ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে এই আওয়াজ। একই ভাবে একই ছন্দে হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি। ....মনে হচ্ছে বাড়ীটার প্রত্যেকখানি ইট, কাঠ যেন আজ এক সঙ্গে চীৎকার করছে, —আর্তনাদ করছে।

এমন সময় দীঘির পাড় থেকে ভেসে এল আর একটা তীব্র চীৎকার। ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়াটা বিকট আর্তনাদ করে যেন কোন্ দিকে ছুটে

পালাচ্ছে। টর্চের আলোয় দেখা গেল,—দীঘির পানি ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছে। ....অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে এবার তিনি পুনরায় সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নাম্‌তে লাগলেন।

এতক্ষণের এই অহেতুক দাপাদাপিতে ম্যানেজার সাহেবের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিলো। তিনি নিজেকে অনেকখানি অবসন্ন মনে করছিলেন। কিন্তু এই আশ্চর্য ভৌতিক ঘটনার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তিও পাচ্ছিলেন না।

সিঁড়ি বেয়ে বরাবর তিনি এবার নীচে নেমে গেলেন। ঘোড়াটা কোনদিকে ছুটে পালাল, সেও তাঁর জন্য এক দুশ্চিন্তার কথা। সবার নীচের তলাকার সিং-দরজার পাশে থামের আড়ালে দাড়িয়ে তিনি সবদিকে একবার ভালভাবে দেখে নিলেন। কৈ কোথাও তো কিছু দেখা যায় না। ...এমন কি, কিছুক্ষণ আগে দীঘির পানিতে যে একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, সেটাও এখন নীরব হয়ে গেছে। কিন্তু উপরের তলাকার সেই বিকট আওয়াজ এখনও সমান তালেই চলেছে।

ম্যানেজার সাহেব এবার ঘোড়ার সন্ধানে দীঘির দিকে এগিয়ে চললেন। কতকগুলি বড় বড় কলমের আমগাছ ও লিচুগাছ,—তার তলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা পথের রেখা দীঘির দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঝে কাটা, গুল্ম ও ছোট-খাটো ঝোপ ঝাড় গজিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ....

বহু চেষ্টার পর তিনি দীঘির পাড়ে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু ঘোড়াটাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। পুকুরের সান-বাধানো ঘাটে দাড়িয়ে তিনি টর্চ জ্বেলে চারদিকে আলো ফেলতে লাগলেন।

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন —দীঘির অপর পাড়ে লম্বা দুটো তালগাছের নীচের বিরাট ছায়ামূর্তি! যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। টর্চের আলো পড়তেই সেই মূর্তি একটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। যেন সমস্ত দীঘি, তার পার্শ্ববর্তী গাছপালাগুলো সে হাসির ধমকে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়তে চাইলো। হাসিটার যেন কেমন একটা বিস্তার আছে।

একটা হি-হি-হি-হি-হি-হি....শব্দ বায়ু তরঙ্গে ভেসে দিক্‌ হতে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। সেই হাসির পর স্তব্ধতাটা যেন আরও ভয়াবহ মনে হ'লো। ম্যানেজার লতাফৎ হোসেন সাহেব সাহসী হতে পারেন,—কিন্তু সে সাহসেরও একটা সীমা আছে। এই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণের পর থেকে যে সব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে,—তাতে তিনি আগে থেকেই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।—এবার তিনি তাই আর নিজেকে সংবরণ করতে

পারছিলেন না। রাত্রি নিশীথে সেই নির্জন পুকুরঘাটে অভিভূতের মতই তিনি টর্চ হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন।....মুখ দিয়ে কোন কথাও বেরিয়ে আসছে না। সমস্ত দেহের রক্ত, শিরা-উপশিরার নালা দিয়ে দাপাদাপি করে মস্তিষ্কে এসে আছড়ে পড়ছে।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, শিথিল-স্নায়ু ম্যানেজার সাহেব এবার লক্ষ্যহীনভাবে দীঘির পাড় হতে ছুটে বেরিয়ে চললেন। যেন এক অস্পষ্ট ভয়ের ছায়া পিছন থেকে তাকে ক্রমাগত অনুসরণ করে চললো। তারপর তিনি কোথায় গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন,—সেইটুকুও তাঁর খেয়াল নেই।

পরদিন বেলা আটটায় যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন দেখতে পেলেন, গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু মাতব্বরের দহলিজে তিনি শুয়ে আছেন। চারদিকে তাঁর অনেক লোকের ভিড়।

যখন তিনি গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দাওৎ অস্বীকার করেছিলেন, ঠিক তখন থেকেই গ্রামের লোক একটা বিপদের আশঙ্কা করে তাকে পাহারা দিচ্ছিলো . ঘটনাক্রমে ঐ সময় ম্যানেজার সাহেব দীঘির পাড় হতে জ্ঞানশূন্যভাবে ছুটতে ছুটতে খাঁ সাহেবের বাগানবাড়ীর বাইরের রাস্তায় এসে পড়েছিলেন। সেখান থেকেই গ্রামের লোক তাকে ধরাধরি করে মাতব্বর সাহেবের দহলিজে এনে শুইয়ে দেয়।—

এর দুএকদিন পর ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়াটাকেও পাওয়া গেল,—তবে জীবিত নয়, মৃত অবস্থায়। গ্রামের কতকগুলি উৎসাহী লোক যখন দিনের আলোয় ঘোড়াটাকে খাঁ বাড়ীর পুকুর থেকে টেনে তুললো, —তখন দেখা গেল, ঘোড়াটার পায়ে রশি জড়িয়ে পড়াতেই সে পানিতে পড়ে আর উঠতে পারেনি।

সেদিন রাত্রি বেলাকার দীঘির পানিতে আলোড়নের কথাটা মনে করে—ম্যানেজার সাহেব এবার নিজের মনেই একবার হেসে নিলেন।





যেমন বুড়ো তেমন বুড়ি

সানাউল হক

গাঁয়ের ফাঁকা মাঠের ওপর একটি কুঁড়েঘর। খড়ের চাল, নড়বড়ে খুটি। উঠোন ভর্তি আগাছা। নাদুস নাদুস গাছগাছড়ার বাড়ীটা পাহাড়া দিচ্ছে সাড়ী গোপালের মতো। চড়ুই পাখিরা বাসা বেঁধেছে চালে। কাঠ বেড়ালিররা আস্তানা ফেলেছে গাছে। ঘরের ভেতরটা এক ধারে ধসে গেছে। কাত হয়ে আছে বেড়া। জানালাগুলোর গলায় পড়েছে ফাঁস। একটি কেবল মুখের হা মেলে শ্বাস টানতে পারে। ঝাকড়া পাতার ইয়া বড় গাছটা আঙিনায় এলিয়ে আছে যেখানে, সেখানে জমেছে পানি। দোর গোড়ায় বসে লেজ চুলকাচ্ছে ছাল

ওঠে যাওয়া সেই কুকুরটি যেটি পাত্রমিত্র সবাইকে দেখামাত্র একবার ভ্যাংচিয়ে ওঠে।

বাড়িতে বাস করে তারা দুজন বুড়ো চাষী আর তার বৌ। ধন দৌলত তো দূরে, তাদের না ছিলো কোন আসবাবপত্র. না অন্য কিছু সামগ্রী। হ্যাঁ, থাকবার মধ্যে ছিল একটি ঘোড়া। এই চারপেয়ে জীবটি ছিল তাদের অগতির গতি। মাঠের ঘাসপাতা খেয়েই ও বাঁচতো। নিজেই বেরিয়ে যেতো আবার খেয়েদেয়ে ঘরে ফিরতো।

বুড়ো এই ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে যেতো, পাড়ায় ঘুরতো। পড়শীরাও যখন তখন ওটা চেয়ে নিত। ঘোড়ার বদলে তারা বুড়ো বুড়ির ফাই ফরমাস খেটে দিত।

ঘোড়াটাকে হাতছাড়া করার জন্য বুড়ো বুড়ির হঠাৎ খেয়াল চাপল। ওরা ভাবলো ওটাকে বেচে দিয়ে বা বদল করে তারা আরো দরকারী কিছু পাবে। কথা হচ্ছে, সে দরকারী জিনিসটা কি?

তুমিই তা বুঝবে ভালো, বুড়োকে উৎসাহ দিয়ে বলে বুড়ি, আজ চৈতপরবের মেলা। ঘোড়াকে নিয়ে চলে যাও সেখানে। শহরের মেলায় ওটাকে হয় বেচে ফেলো, নয় বদলিয়ে নিও।

এই বলে বুড়ি নিজ হাতে বুড়োর মাথায় গোল টুপিটা চাপিয়ে দিলো। শেষে দুহাতে বুড়োর দুগালে নাড়া দিয়ে বললো, এবার চলো দিকিন।

আর কথা কি? ঘোড়া সওয়ার বুড়ো একগাদা ধুলো ছড়িয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

ঘোরার লাগাম খিঁচে ধরে সোজা হয়ে বসতে চাইলো বুড়ো, ঘোড়াটা যা ছোটা ছুটছে। কিছুক্ষণেই রোদ উঠলো তেতে। ঘামে ভিজে সে একাকার।

আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। রাস্তায় সে কি ধুলো। হিমসিম খেয়ে বুড়ো তবু এগিয়ে চললো।

এক রাজ্যের লোক চলেছে মেলায়। কেউ গাড়ি হাঁকিয়ে, কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পায় হেঁটে।

ভিড়ের ভেতর গরু নিয়ে যাচ্ছিলো একটি লোক। আর যে কোনো গরুর মতো সুন্দর তার গাইটি।

গরুটি নিশ্চয়ই প্রচুর দুধ দেয়, হাতের লাগামটি শিথিল করে দিয়ে ভাবলো বুড়ো, ঘোড়ার বদলে যদি এই গরুটি পাওয়া যায় ভারী চমৎকার হয় নাকি?

যেমন ভাবা তেমন কাজ। বুড়ো পেছন থেকে হেঁকে ওঠে, ও ভাই গরুআলা শুনছো? গরুঅলা ফিরে চাইতেই সে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বল

দিকিন, গরুর চেয়ে ঘোড়া দামী নয় কি? জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই আবার বলে, কিন্তু তাতে কি, যদি চাও এখখুনি আমার ঘোড়াটি নিতে পারো তোমার গরুর বদলে। রাজি?

সত্যি? গরুঅলার যেন বিশ্বাস হয় না। বুড়ো এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে বলে, হ্যাঁ ভাই সত্যি?

অদল বদলের পালা চটপট চুকে যায়।

গরুঅলা ঘোড়ায় চড়ে শিশ্ দিতে দিতে বাড়ীর ফিরতি পথ ধরলো। বুড়ো মেলা না দেখে ফিরবে কেন, গরুর দড়িটা হাতের মুঠোয় চেপে সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো হাঁপাতে হাঁপাতে।

সামনে চলছিল একজন ভেড়া চালক। বুড়ো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাকে ধরে ফেললো।

মোটা সোটা, গোলগাল দিব্যি ভেড়াটি।

গায়ে তার কি চমৎকার লোম। বুড়ো ভাবলো, হ্যাঁ ও ব্যাটাকে আমি চাই-ই। আমাদের বাড়ির আশেপাশে প্রচুর ঘাস, পেট ভরে ও খেতে পারবে। গরুর চেয়ে ভেড়া অনেক লাভের হবে নিশ্চয়ই।

কথাটা ভেড়াঅলার কাছে বলতে সে ইতস্তত করলো না। ভেড়াঅলাও সাদাসিধে মানুষ। কথা না বাড়িয়ে সে তখুনি রাজি হয়ে গেল।

বুড়ো খুশি মনে ভেড়া নিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো।

কিছু দূর এগোতেই একটি লোক কোণাকোণি মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে আসলো। তার বগলের নিচে একটি রাজহাঁস। পেছন থেকে হাঁসের গলাটি দেখে বুড়ো ঠিক চিনতে পারলো। ভেড়াটিকে তাড়া দিয়ে দ্রুত পায় সে সামনে এগিয়ে আসলো।

বেশ পুরুষ্ট হাঁসটি নিয়ে চলছো হে বাপু। দেখে শুনে মনে হচ্ছে অগুন্তি পাখার নীচে প্রচুর গোস্ত আছে। বুড়ের মুখে হাঁসের তারিফ

শেষে নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে সে, পায় দড়ি বেঁধে ওটাকে ছেড়ে দিলে আমাদের উঠোনের পানিটুকুতে বেশ খেলতে পারবে। বুড়ির খুব কাজে আসবে এটা। নাঃ এ সুযোগ ছাড়া যায় না। বুড়ির জন্যে এটাকে নিতেই হয়।

তুমি কি বলো হে, আমার ভেড়ার বদলে তোমার হাঁসটি দেবে কি? বুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে।

আলবৎ, হাঁসটি বগল থেকে বার করে বুড়োর হাতে তুলে দিয়ে লোকটি ভেড়াটি নিয়ে সরে পড়ে।

বুকের ওপর রাজহাঁসটিকে পাজা কোলে নিয়ে বুড়ো এগোতে থাকে।

টলতে টলতে মেলার কাছাকাছি এসে সে একটু দাঁড়ায়। বড় রাস্তার ওপর মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়। গরু, ভেড়া, ছাগল, হাস, মুর্গি, এমনি আরো কত কি। রাস্তার পাশের একটি মুর্গি কেমন পা তুলে নাচছে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় কি পালিয়ে যায় ভয়ে, একটি পা তার সুতলি দিয়ে বাঁধা। এক পা তুলে সে ভারী চটুল ভংগিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেজের লোম খাট করে ছাটা। চোখ দুটি গর্তে।

এক পা'র ওপর কোমরটি ভর দিয়ে দুষ্টুমি ভরা দুচোখ তুলো সে যখন কঁক কঁক করে উঠলো, বুড়ো তখুনি দেখে ফেললো।

আর যায় কোথা।

আহা, চমৎকার মুর্গি আর হয় না, বুড়ো মনে মনে বললো, আমাদের কাজি সাহেবের ফুটফুটে মুর্গিটিও এর কাছে লাগে না ; এ মুর্গিটিকে আমার চাই। আর মুর্গি পোষায় খরচই বা কি। রাস্তার পাশে এটা ওটা ঠোকরিয়েও নিজেই ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। হাঁসটার বদলে যদি ওটাকে পাওয়া তো আমার পোয়াবারো। আমতা আমতা করে কথাটি সে মুর্গিঅলার কাছে বলে।

বদল করতে চাও, বেশতো। মুর্গিঅলা রাজি হয়ে যায়।

মুর্গিটি নিয়ে বুড়ো ভিড়ে মিলিয়ে যায়। কপালটা তার ভালো। ব্যবসাটা জমেছে খাসা।

শেষে গরমে ঘামে ক্লান্ত হয়ে সামনেব সরবতের দোকানটিতে বসে একটু জিরিয়ে নিতে চাইলো।

দোকান ঘরের সিঁড়ির গোড়ায় দেখা বস্তা কাঁধে একটি লোকের সঙ্গে।

কি আছে তোমার বস্তায়, বুড়ো জানতে চায়। পচা আলু ক্ষেতের সার। লোকটি ছোট করে জবাব দেয়।

কেন মিছি মিছি নষ্ট করতে যাবে এ চমৎকার জিনিসগুলো। তার চেয়ে আমাকে দিয়ে দাও বুড়ি ভারী খুশি হবে। গেলবার আমাদের ক্ষেতে পাঁচ সের আলু হয়েছিল । সেগুলো আমরা ঘরের মেঝে ছড়িয়ে রেখেছিলাম। শেষে বর্ষার দিনে পচে নষ্ট হয়ে গেলো। আমার স্ত্রী আলু খু-উ-ব ভালোবাসে। এই পুরো বস্তাটি পেলে তার খুশি আর ধরবে না।

পুরো বস্তাটির জন্যে আমায় কি দেবে ভায়া, বস্তা কাঁধে লোকটা শুধোয়। কি আর দেবো। বুড়ো অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হাঁ ভালো কথা, আমার এ মুর্গিটি আছে, যদি নিতে চাও, নাও। লেনদেন শেষ করে বুড়ো আলুর বস্তাশুদ্ধ

দোকানে গিয়ে ঢোকে। দোকান ঘরে তিল ধারনের জায়গা নেই। এক রাজ্যের মানুষ। ব্যবসায়ী ফিরিঅলা , কাবুলি মাড়োয়ারী হিন্দু মুসলমান।

ঘরের গরমে বস্তার আলুগুলো হয়তো সেদ্ধ হচ্ছিলো।

কি আছে এর ভেতরে '? বস্তাটিকে লাঠি দিয়ে গুঁতো মেরে একজন প্রশ্ন করলো।

তাও জানোনা বুঝি, চোখ দুটাকে গোল গোল করে বুড়ো জবাব দেয়। শেষে নামতার ছড়ার মতো আউরিয়ে যায় ঘোড়া থেকে গরু এবং সেই থেকে ধাপে ধাপে মুর্গির বদলে পচা আলুর বস্তা পাওয়াব কাহিনী।

বাড়ি গেলে বুড়ি তোমাকে আচ্ছা সাজা দেবে বলে বাখছি। গোঁফে চাড়া দিয়ে টিটকিরি দেয় একজন মাড়োয়ারি বাবু।

কি বললে তুমি, সাজা, সাধে কি বলে মেড়ো বুদ্ধি। বুড়ো পাল্টা জবাব দেয়। দুধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রসিকতা করে বলে, বুড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগালে হাত বুলোতে বুলোতে বলবে, আমার বুড়োর খাসা আক্কেল, ও যা করে সব ভালো, বড় ভালো।

মাড়োয়ারি বাবু, বুড়োকে কাবু করার জন্যে রুখে দাঁড়ালো, বাজি রাখবে, বাজি '? দশহাজার টাকা, যদি চাও দশ হাজার সোনার মোহর বাজি '?

অত টাকায় কাজ নেই ভায়া, পাঁচশ টাকা —ব্যস্। আর এ শোধ দিতেই বাড়ি বস্তাশুদ্ধ আলু আর আমরা বুড়ো বুড়ি কাবার হয়ে যাব। বুড়ো কায়দা করে বলে।

বেশ তাই হোক। মাড়োয়ারি ও তার সংগী এক সাথে উঠে দাঁড়ায়।

দোকানের সামনের রাস্তায় ছিলো একটি ঘোড়ার গাড়ি। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে বুড়ো গাড়িতে চড়ে গাট হয়ে বসলো।

বুড়োর উঠোনের পাশে এসে গাড়ি থামলো। ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নামতেই বুড়ি এগিয়ে এলো।

ঘোড়াটিকে আমি বদল করে এনেছি। বুড়োই প্রথম শুরু করে।

ইস্ সত্যি, তুমি ভুলে যাওনি লক্ষ্মীটি। বুড়ি অতি খুশিতে বুড়োকে জড়িয়ে ধরে।

ঘোড়ার বদলে আমি একটি গরু নিয়েছি, বুড়ো বললো।

গরু, দুধের গাই, কী মজা। এখন তাহলে আরামে দুধের মাখনটা খাওয়া যাবে। বুড়ির চোখ খুশিতে চকচক করে ওঠে।

তা ঠিকই, বুড়ো বলে, তবে গরুটা বদলিয়ে আমি একটা ভেড়া নিয়েছি।

আরো চমৎকার, বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠে। তোমার দেখছি সব

মনে থাকে। ভেড়ার দুধ আর লোম। গরু থেকে এতোসব মিলতো কই।

কিন্তু ভেড়াটিকে যে একটি রাজহাঁসের সংগে বিনিময় করে ফেলেছি। বুড়ো স্বরটা নামিয়ে নিয়ে বলে।

ভালোই হলো, বুড়ি বিনা দ্বিধায় সমর্থন করে, এবার শীতে হাঁসের রোষ্ট খাওয়া যাবে। তুমি বড্ড আদুরে বুড়ো, আমাকে খুশি করার জন্যে তোমার কতো ভাবনা। হাঁ ভালো কথা পায় দড়ি বেধেঁ হাঁসটাকে আমরা উঠোনে ছেড়ে দেবো। বেশা ঘোরাঘোরি করতে পেরে আরো চেকনাইদার হবে। তারপর একদিন রোষ্ট খাওয়ার পর্ব। কী স্বাদটাই না পাওয়া যাবে'?

হাঁসটিকে যে আমি একটি মুর্গির বদলে হাত ছাড়া করেছি। আমতা আমতা করে বুড়ো বললো।

মুর্গি'? তোফা বিনিময়, বুড়ি উৎসাহে চিৎকার করে ওঠে। মুর্গি আন্ডা দেবে, বাচ্চা ওঠাবে। মুর্গির বাচ্চায় ভরবে ঘর। অনেকদিন ধরেই আমি এই আশা করে আসছি।

কিস্তু মুর্গিটিকেও আমি এক বস্তা পচা আলুর সংগে বদল করে ফেলেছি। একটু কেশে নিয়ে বললো বুড়ো।

কী বললে, আলু'? এসো তোমাকে একটু বুকে জড়াই, বুড়ির খুশি আর ধরে না। এবার তোমাকে আমার মনের কথাটা বলছি শোনো। সকালে যেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলে, রাতের খাবারের কথা ভাবছিলাম। কি খেতে দেয়া যায় তোমাকে। ভাবলাম আন্ডা আলুর ঝোল বেশ তোফা হবে। ঘরে আন্ডা ছিলো, কিন্তু আলু কোথায় পাই। পন্ডিতের ঘরে আলু আছে জানতাম। সেখানে গিয়ে পন্ডিতের স্ত্রীর কাছে কয়টি আলু ধার চাইলাম। পন্ডিতের স্ত্রী সুন্দর হাসতে পারে, কিন্তু বড্ড কনজুস। হেসেই জবাব দিলো, আলু কোথায় পাবো গো, এবার ক্ষেতের একটি আলুও ঘরে ওঠেনি।

কথটা শেষ করে বুড়ি একটু দম নিয়ে বললো, এখন আমিই পন্ডিতের স্ত্রীকে যত ইচ্ছে আলু ধার দিতে পারবো। আহা, এক বস্তা আলু ভাবতেই মনটা জুড়িয়ে যায়। বুড়ি অতি আদরে স্বামীর দুগাল ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

আমাদের বাজি রাখা সার্থক হয়েছে, এক সাথে বলে উঠলো মাড়োয়ারী দুজন। পয়সা খরচ করে দেখবার মতো ব্যাপার বলেই একজন পাঁচটি একশত টাকার নোট বার করে বুড়োর হাতে তুলে দিলো।



ময়নামতী

জসীমউদ্দীন

রাজার ছেলে মোহনলাল স্বপন দেখে ঘুম থেকে উঠেচে, কৃষ্ণপুর রাজ্যের রাজকন্যা ময়নামতী যেন তাকে বিয়ে করেছে। কৃষ্ণপুর রাজ্যে যে কোথায় তা-ই তো সে জানে না, তায় আবার সেই দেশের রাজকুমারী ময়নামতী—যার রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না—তাকে সে দেখবে কি করে! ভাবলে, তাকে যখন সে স্বপ্নে দেখেছে আর তার সাথে তার বিয়েও হয়েছে, কাজে কাজেই তাকে যে করেই হোক খোঁজখবর করে বের করা চাই-ই,— আর তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে জীবনে বিয়েই করবে না।

হরিণ শিকারের নাম করে একদিন রাজা আর রাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে একটা বনের মধ্যে এসে ঘোড়াটা ছেড়ে দিলে। দিয়ে, রাজপোষাক খুলে একটা পোট্‌লা বেঁধে নিয়ে সাধুর বেশ পরে পথ চলতে লাগলে।

দুপুরের রোদ মাথার ওপরে ঝাঁ ঝাঁ করছে, কাক পক্ষীর রা নেই। যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্য। বনের মধ্যে মস্ত একটা বটগাছ, —সেই গাছের ছায়ায় মোহনলাল ক্ষিদের তেষ্টায় কাতর হয়ে শুয়ে পড়লো। পড়তেই অঘোরে ঘুম।

যখন প্রায় বেলা ডোবে ডোবে, এম্‌নি সময়ে তার ঘুম ভাঙ্‌লে। ঘুম ভাঙতেই সে শুনতে পেলো, গাছের ওপরে এক শুক পাখী শারীকে বল্‌চে, "আজ এই রাজপুত্রের নিশ্চয় মরণ হবে।"

শারী জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

সে বললে, "এক্ষুণি একটা বাঘ আস্‌বে, এসেই রাজপুত্রকে খেয়ে ফেল্‌বে।"

"আহা, তবে তো খুব দুঃখের কথা! তা এঁকে কোন রকমে বাঁচানো যায় না?"

"নাঃ, তা কি করে হবে; তবে একটা উপায় হতে পারে। বাঘটা আসতেই যদি রাজপুত্র তাকে 'মামা' বলে ডেকে কাছে যায় তা' হলে সে আর কিছু বলবে না।"

দুই

নীচে থেকে রাজপুত্র সব শুনতে পেয়ে আগে থেকেই তৈরি হয়ে রইলো। এদিকে খানিক পরে বন-বাদাড় কাঁপিয়ে হালুম হালুম করে একটা বাঘ ঝোপের মধ্যে আসতেই রাজপুত্র উঠে তাকে একটা প্রণাম করলো। বললে, "কি মামা কেমন আছো?"

বাঘ তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এ বলে কি! মানুষ আবার তার বোনপো হবে কি করে! বেচারী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমতা আমতা করে বললে, "তা ভাগ্নে কেমন আছো? আমাদের বাড়ী চলো।"

বাঘ তাকে সাথে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বাঘের ছেলেপুলেরা একজন মানুষ ভাই পেয়ে তার গা চেটে আনন্দ জানাতে লাগলে। বাঘিনী তাকে আদর করে মরা গরুর একটা ঠ্যাং তাকে খেতে দিলে।

রাজপুত্র দু'একদিন তাদের কাছে থেকে, বাঘ, বাঘিনী আর তার ছেলেপুলেদের কাছে বিদায় নিতে গেল।

তারা বল্লে, "যদি কোনো বিপদ আপদ হয়— 'মামা' 'মামা' বলে ডেকো— তাহ'লেই আমরা গিয়ে হাজির হবো।"

রাজপুত্র স্বীকার ক'রে তাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আবার পথ চলতে সুরু করলে। দিনের পর রাত আসে—রাতের পর দিন ; এমনি ক'রে কত মাস যে যায় তার ঠিক নেই। অবশেষে একদিন সে কৃষ্ণপুর রাজ্যে এসে হাজির হলো।

তিন

রাজার বাড়ীতে সেদিন খুব ধুমধাম— লোকজনের হৈ চৈ বাদ্যিভাণ্ডে রাজ্যিটা সরগরম। এক গয়লানী দুধের ভাঁড় মাথায় করে সেইপথে যায়। রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞেস করে খোঁজ পেলে যে, সেই দেশের রাজকন্যা ময়নামতীর সেইদিন রাত্রিকালে দক্ষিণ দেশের রাজপুত্রের সাথে বিয়ে হবে। শুনে তার মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু সে ভাবটা গয়লানীকে সে জানতে দিলে না। হেসে বললে, "তাই নাকি, তা বেশ, বেশ, আমরা গরীব লোক, দু'দিন খেয়ে বাঁচবো।" তারপর গয়লানীর কাছে থেকে দুধসুদ্ধ ভাঁড়টা কিনে নিয়ে একটা ঝোঁপের মধ্যে গিয়ে কাপড় চোপড় বদলিয়ে নিজে গয়লানী সেজে দুধের ভাঁড় মাথায় ক'রে রাজার বাড়ীতে দুধ বিক্রী করতে গেল। মহলে ঢুকে ভাঁড়টা একদিকে নামিয়ে রেখে সে দাসীর কাছে খবর নিয়ে যে ঘরে রাজকন্যা ছিলো— তাড়াতাড়ি সেই ঘরে এসে হাজির হ'লো। রাজকন্যাকে দেখবামাত্রই সে চিনতে পারলে, ঠিক একেই তো সে স্বপনে দেখেছিল।

রাজকন্যাকে এককোণে ডেকে নিয়ে সে নিজের পরিচয় দিলে—আরও কত সব কথা বললে। রাজকন্যাও যেন নিজের প্রাণের কথা এতদিন পরে তার কাছে বলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

তারপর তাকে বিদায় দেবার সময় সে বললে, "একপ্রহর রাতে তুমি নদীর ঘাটে কাঙালী জেলের রূপোর নৌকা আর সোনার বৈঠা নিয়ে বসে থেকো ; আমি তোমার কাছে যেমন ক'রে হোক যাবো— তারপর দু'জনে এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবো।"

রূপোর নৌকো আর সোনার বৈঠার এমন গুণ যে, যে দেশে যে মানুষ যেতে চায়, সে দেশের কথা মনে করলে আর বৈঠা বাইতে হয় না। নৌকো সেখানে আপনা আপনি যায়। রাজপুত্র মোহনলাল রাজার বাড়ী থেকে বাইরে এসে গয়লানীর পোষাক ছেড়ে নিজের পোষাক পরলে। তারপর তার ভাবনা হলো, সে কাঙালী জেলের রূপোর নৌকো আর সোনার বৈঠা কি ক'রে

পাবে। হঠাৎ তার মনে হলো যে বাঘমামা তো তাকে বলেছিলো, বিপদে আপদে তাকে ডাকতে। কথাটা যেই মনে পড়া, অমনি সে হাঁটু পেতে বসে চোখ বুজে এক মনে 'বাঘমামা' 'বাঘমামা' বলে ডাকতে লাগলো। আর দেখতে না দেখতে বন-বাদাড় ভেঙে হালুম হালুম করতে করতে বাঘমামা তো তার ছেলেপুলে সব নিয়ে এসে হাজির। বললে, "ভাগ্নে, ব্যাপার কি? কি বিপদ তোমার?"

রাজপুত্র বললে, "মামা, রূপোর নৌকা আর সোনার বৈঠা কাঙালী জেলের ঘরে আছে—সেটা আমার দরকার।"

আর যায় কোথা, —হালুম হালুম করতে করতে বাঘ তো সদলবলে গিয়ে পড়লো জেলের বাড়ী। আচমকা এমন বিপদ দেখে তারা ভয়ে তড়াসে কেঁপেই অস্থির। বাঘ বললে, "তোমার রূপোর নৌকা আর সোনার বৈঠা শীগ্‌গির বের করে দাও, নইলে সবাইকে আমরা খেয়ে ফেলবো।"

তারা আর কি করে, জিনিষের চেয়ে প্রাণের মায়াই ঢের বেশি। ভয়ে ভয়ে রূপোর নৌকা আর সোণার বৈঠাটা তারা বের করে দিলে।

বাঘ সেটা নিয়ে রাজপুত্রকে দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল।

চার

নিঝুম রাত। জ্যোৎস্নায় যেন যুঁইফুল ঝরচে। নদীর ডাক তার সাথে মিশে চারদিক মাতিয়ে তুলেচে। নৌকার ওপরে বসে রাজপুত্রের আর সময় কাটতে চায় না। এক প্রহর গেল, দুই প্রহর যায় যায়— তবু রাজকুমারী এলো না দেখে তারটা মনটা যেন কেমন কেমন করতে লাগলো। ভাবলে, কি বা বিপদ হয়েচে। নৌকাটা বেশ করে বেঁধে রেখে ময়নামতীর খোঁজ নিতে সে রাজবাড়ীতে চলে গেল।

এদিকে সেই কাঙালী জেলের মনে সুখ নেই। তার অত সাধের অমন রূপোর নৌকাখানা আর সোনার বৈঠাটা হাতছাড়া হয়েচে, সে কি আর স্থির থাকতে পারে! যে ঘাটে ঐ নৌকাটা বাঁধা ছিলো— সে তারই কিছু দূরে ঝোপের মধ্যে ঢুকে মনে মনে ফন্দি আঁটতে বসেছিলো। রাজপুত্রকে নৌকো থেকে নেমে যেতে দেখে সে ভাবলে,— এইতো সুযোগ। সে দুই লাফে এসে নৌকোয় উঠে বসে তার বাঁধন যেই খুলে দিতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে রাজকুমারী ময়নামতী এসে তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে বসলে। এদিকে নৌকো স্রোতের মুখে আলগা পেয়ে তর্‌তর্-ক'রে ছুটে যেতে লাগলো।

ময়নামতী কাঙালী জেলেকে তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করেনি! তারপর ধীরেসুস্থে তার কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলো। বললো, "তুমি কে?"

কাঙালী বললে, আমার নাম কাঙালী— তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

অন্য সময় হলে রাজকুমারী তার এই বেয়াদপীর জন্যে তার মুখে হয়তো জুতো মারতো, —কিন্তু অকূল দরিয়ায় চারদিকে চেয়ে তার সে সাহস হলো না। মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে বললে, বেশ, এ আর হবে না কেন! তবে দেখ, ছ'মাস আমার একটা ব্রত আছে। এই সময়টা তোমার সাথে আমার বাপ আর মেয়ের সম্বন্ধ। ছমাস পরে যদি বিয়ে করতে চাও—আমি রাজি আছি।

কাঙালী বেচারী আর কি করে, ভাবলে, রাজকুমারীকে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে শেষে হিতে বিপরীত হতে পারে; সে অগত্যা তাতেই স্বীকৃত হয়ে নিজের বাড়ীতে এনে তাকে লুকিয়ে রাখলে।

পাঁচ

ওদিকে রাজপুত্র রাজবাড়ীতে গিয়ে শুনতে পেলে রাজকুমারী ময়নামতীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মনটা খুসিতে ভরে উঠলে, সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ নৌকাতে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করচে। সে তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে এসে হাজির। কিন্তু তার নৌকোই বা কোথায়, আর ময়নামতীই বা কোথায়!

রাজপুত্র পাগলের মতন হয়ে নদীর কূলে কূলে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াতে লাগল— ততক্ষণ হয় তো স্রোতের টানে ময়নামতী আর জেলেকে নিয়ে রূপোর নৌকো এক রাজার দেশ ছেড়ে আর এক রাজার দেশে হাজির হয়েছে। চারদিকে খুঁজে খুঁজে যখন কিছুতেই ময়নামতীকে পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হয়ে নদীর কিনারে বসে মাথায় হাত দিয়ে হায় হায় করতে লাগলে।

সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে যে দৈত্যপুরী আছে—সেই দেশের রাজার মৃত্যু হয়েচে। রাজ্যে হাহাকার, দোকান পাঠ বন্ধ, পথে লোক চলে না, কাক চিলে রা করে না। রাজার শোকে সবাই পাগল। রাজার ছেলে সন্তান নেই সেইজন্যে সিংহাসন খালি— বিচার বন্ধ। দৈত্যপুরী থেকে সিপাই শান্ত্রী ছেড়ে দেওয়া হয়েচে সুলক্ষণযুক্ত কোন ছেলে পাওয়া গেলেই তাকে ধরে নিয়ে এসে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হবে। দেশের সিপাই, শান্ত্রী, পাইক বরকন্দাজেরা একেবারে হয়রাণ হয়ে উঠেচে। তেমন রাজপুত্র আর

খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরক্ত হয়ে একদম তারা আশাই ছেড়ে দিলে। অবশেষে সেই নদীর ধারে এসে রাজকুমারকে দেখেই তাদের আর আনন্দ ধরে না। যেমনটি তারা খুঁজছিলো ঠিক তেমনটিই মিলে গিয়েচে। তারা সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে নিজেদের রাজ্যে এনে তাকে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করলে।

রাজপুত্র মোহনলাল দৈত্যদের দেশের রাজা হয়েও মনে সুখ পেলে না। সব সময়েই তার শুধু ময়নামতীর চিন্তা। ময়নামতীর অভাবে তার কাছে পৃথিবীই যে মিথ্যা। নিজের মনের দুঃখ মনে চেপে তার দিন কাটে।

দৈত্যদের দেশে হাজার রকমের আমোদ আহ্লাদ, হরেক রকমের আজব তামাসা। সেই দেশের মন্ত্রী, পাত্র, মিত্রেরা গোপনে লক্ষ্য করলেন যে, এসবে কিছুতেই রাজার মন নেই— এখানে এসে পর্যন্ত তিনি একদিনও হাসে নি। এর কারণ কি! কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারলে না। একদিন তারা পরস্পর একসঙ্গে রাজার কাছে এসে প্রণাম জানিয়ে, তাঁর মনের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে। রাজপুত্র তখন নিজের মনের সব কথা তাদের কাছে খুলে বল্‌লে। আরো বল্‌লে যে, সেই রাজকুমারী ময়নামতীকে কে যে নিয়ে গেছে—তার কিছুই সে জানে না। কিন্তু তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তার মনে আর শান্তি নেই।

সব শুনে উজির নাজিরেরা তক্ষুণি আর একটা উপায় করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। সিপাই বরকন্দাজ ছুটলো। খোঁজ— খোঁজ— রাজ্যিময় একটা সোরগোল পড়ে গেল। কোথায় বা সে ময়নামতী— কোথায় বা সে রূপোর নৌকো আর সোণার বৈঠা। দিনের মধ্যে রাজকুমারীকে খুঁজে না পাওয়া গেলে তাদের সবার ছেলেপুলে শুদ্ধ গর্দ্দান যাবে— কোটালের হুকুম।

এদিকে ছ'মাস পূর্ণ হতে আর মাত্তর একটা দিন বাকি। কাঙালী ভাবছে আর একটা দিন পরেই রাজকুমারীর সাথে তার বিয়ে হবে। মন তার আনন্দে ভরে উঠেচে সত্যি সত্যি।

ময়নামতীর মনেত, দিনরাত চিতার আগুন। বেচারী চান করে না— খায় না— রাজপুত্র ভাবনায় শুকিয়ে আধমরা হয়েচে। আর তো একদিন মাত্র— তারপর এ মুর্খ জেলে তাকে বিয়ে করবে। হায়রে কপাল!

কিন্তু তা হবে না—

ভাবলে, আজ রাত ভোর হলেই সে বিষ খেয়ে নিজের প্রাণ নিজে দেবে, তবু একজন জেলের ঘরের বউ হতে সে কিছুতেই পারবে না।

ঠিক এমনি সময়ে দৈত্যদেশের সিপাই শান্ত্রীরা ময়নামতীকে খুঁজতে

খুঁজতে জেলের ঘরে এসে হাজির। তারা অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলো যে এইখানেই ময়নামতীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

তারা দরজায় গিয়ে হাঁক দিলে, "হেঁইও জেলে— কৃষ্ণপুরের রাজকন্যা তোমার ঘরে আছে?"

জেলে রেগে খুন। চটেমটে বাইরে এসে তাদের সবাইকে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে। আর যায় কোথা! সিপাইশান্ত্রীরা তার লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে আচ্ছা ঘা কতক দিয়ে দিলে। তারা তারপর রাজকন্যা, রূপোর নৌকো, সোনার বৈঠা আর কাঙালী জেলেকে নিয়ে দৈত্যপুরীতে ফিরে এল। ময়নামতীকে ফিরে পেয়ে রাজপুত্র মোহনলাল আনন্দে প্রায় বেঁহুস হয়ে পড়লো। রাজকুমারীর অবস্থাও অনেকটা সেই রকম।

কাঙালী জেলেকে তার বেয়াদপী আর অপরাধের জন্যে চিরজীবন কারাগারে আটক রাখা হলো।

কিছুদিন যায়।

তারপর একদিন দৈত্যপুরীর সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকুমার আর রাজকুমারী রূপোর নৌকোয় উঠে নিজের দেশে ফিরে চললো।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ রূপোর নৌকো সাত সমুদ্র আর তেরো নদীর পথে ছুটে চলেছে রাজপুত্র মোহনলাল আর রাজকন্যা ময়নামতীকে নিয়ে।

মাত্র আধেক পথ গিয়েচে কি যায় নি— এমন সময় আওয়াজ উঠলো— রূপোর নৌকো আর সোনার বৈঠা নিয়ে কে পালায়— নৌকো বাঁধো— থামাও নৌকা— নইলে...

নইলে কি— কি কথা তার শেষ হতে পেলো না।

এদিকে ব্যাপার হয়েচে কি— কাঙালী জেলেকে দৈত্য রাজার লোকেরা ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই তার লোকজনেরা তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্য। কারণ কাঙালী ছিল জেলেদের দলের সর্দ্দার। কিন্তু খোঁজ পায়নি। এবার নদীতে রূপোর নৌকো দেখে তারা ভাবলে— বোধহয় দৈত্য রাজার লোকেরা এই নৌকোতেই কাঙালী জেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! তাই হাঁক দিলে নৌকো থামাবার জন্যে।

হাঁক শুনে রাজপুত্র ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দেখেন নদীর পারে বহু লোকের জনতা। এর মধ্যে কয়েকজন একটা নৌকোতে উঠতে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য তারা নৌকোতে করে এসে তাদের নৌকোকে আটকাবে।

রাজপুত্র দেখলে বিপদ— সে তখনই স্মরণ করলে— বাঘ মামাকে।

আর যায় কোথা! অমনি বাঘমামা সদলবলে এসে নদীর পারে হাজির!

বাঘের দল দেখে সবাই ছুটোছুটি করে পালাতে লাগলো আর যারা নৌকোতে উঠতে যাচ্ছিল তারা ভয়ে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ডুবে গেলো।

এদিকে রাজপুত্র সেই রাজ্য ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যে চলে এসেচে। এখন বেশ শান্তিতে তারা পথ চলতে চলতে দেশে এসে পৌঁছলেন।

রাজপুত্র মোহনলালকে হারিয়ে বুড়ো রাজা আর রাণী মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। এতদিন পরে তাকে ফিরে পেয়ে তাঁদের আর খুসি ধরে না। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে আর ময়নামতীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর— রাজপুত্রের সাথে ময়নামতীর বিয়ে। সাতদিন সাতরাত্তির আমোদ আহ্লাদ, মিঠাইমণ্ডার ছড়াছড়ি— লুচির পাহাড়— ক্ষীরের দীঘি — দধির পুকুর— নাচ-গানের বাদ্যিভাণ্ডে তুফান।

বাঘমামা আর বাঘমামী, আর তাদের ছেলেপুলেরা এসে তাজা ছাগল ভেড়া খেয়ে ভাগ্নে আর ভাগ্নেবউকে আশীর্ব্বাদ করে বনে ফিরে গেলো।

রাজপুত্র মোহনলাল তখন রাজা হয়ে ময়নামতীকে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।





শিউলি পরীর দেশে

আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন

হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে, শিউলি ফুলের গাছটা, গলিটার মোড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। খাঁ খাঁ দুপুরে পালতোলা দমকা হাওয়া শরীরে আমেজ আনে, আনে একটা ঘুম ঘুম ভাব। দু-চোখ তন্দ্রা ছড়ায়, কিন্তু ঘুম হয় না। মাঝে মাঝেই চোখে মেলে চায়। একটু পরেই গলির মুখে দেখা যাবে সেই ছোট্ট শরীরটাকে, প্রাণচঞ্চল ঢেউয়ের মতো নাচতে নাচতে স্কুল থেকে ফিরছে। গেটের সামনে এসেই আগে হাতে দুটো ফুল নেবে, দোল খাবে একবার ডাল ধরে, তারপরই মিষ্টি গলায় ডাক ছাড়বে— মা এসে— এ গেছি-ই

তাই সারাটা দুপুর গাছটার কেটে যায় ঐ দিকে চেয়ে। কি বাঁধনেই না বেঁধেছে মেয়েটা ওকে, সারাটা দিনে একবার অন্তত ওকে না দেখলে স্বস্তি পায় না গাছটা। সেবার যখন মেয়েটার খুব জ্বর হয়েছিল অধিকাংশ সময়ে বিছানাতেই পড়ে থাকত, সবাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। শিউলি গাছটার চোখে ছিল না ঘুম। মাটির সাথে আটকে থাকা শরীরটাকে যতটা সম্ভব ঝুঁকিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করত মেয়েটাকে। অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়ে প্রার্থনা করত ভগবানের কাছে, মেয়েটি যেন সেরে ওঠে, এই কটা দিন প্রচণ্ড ক্লান্তিতে, দুর্ভাবনায় সে একটি ফুলও ফোটায়নি, যারা রোজ সকালে ফুল তুলতে আসত তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে, এত সুন্দর তাজা ফুল গাছটা বুঝি বোধহয় মরেই গেল, কিন্তু সেদিন যখন একটু সুস্থ হয়ে মেয়েটি এগিয়ে এল গাছটার কাছে, আহত অভিমানী স্বরে বলে উঠল দেখেছো মা! গাছটা একটা ফুলও আমার জন্য রাখেনি, গাছের ভাষা অন্য কেউ বুঝতে পারে না তাই। না হলে দেখত যে, শিউলিগাছটা সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, সমস্ত ডালপালা পরমস্নেহে বুলিয়ে দিয়েছিল তার গায়ে।

যখন প্রচন্ড গরমে সমস্ত সবুজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, গাছে ফোটেনা ফুল, তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর যখন মরুভূমি হয়ে যায় তখন এই মেয়েটি বুঝতে পারে তার কষ্ট, জল ঢালে তার গোড়ায়। লোকে বলে 'ফুলের মতো সুন্দর।' গাছটা ভাবে এটুকু বললে কম বলা হয়। মেয়েটির সৌন্দর্য্য ফুলের চেয়েও গভীর। আকাশের চেয়েও বিস্তৃত, পাপড়ির চেয়েও নরম। তাই পরদিন সকালে মেয়েটি যখন ফুল তুলতে এসেছিল গাছটি ওর জন্য ফুটিয়ে রেখেছিল নিজের সেরা সবটুকু। ঝর ঝর করে ঝরিয়ে দিয়েছিল ওর সারা গায়ে, মাথায়। ভরিয়ে দিয়েছিল শুভ্র ফুলের চুম্বনে।

স্কুল থেকে ফিরে বিকেল বেলায়, সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলে মেয়েটি। গাছটি দেখে, ওকে ঘিরে বাচ্চাগুলোর চোর চোর খেলা, হুটোপাটি, হইচই, দেখে আর দেখে, এত দেখেও মন আর ভরে না তার। ধীরে ধীরে নববধূর ঘোমটার মতো সন্ধ্যা নামে। মাঝে মাঝে জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের কণা এসে পড়ে মেয়েটির ঘুমন্ত মুখে। জ্যোৎস্নার টুকরোটাকে গাছটার হিংসে হয়। এইভাবে এক সুরেলা তন্দ্রায়, আবেশে, রাত কেটে যায়। ঊষার প্রত্যাশায়, ফুলের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছটি। মেয়েটি আসে, ফুল তোলে, গাছটার প্রাণ মন ভরে দিয়ে যায়।

এইভাবেই দিন কাটছিল বেশ, কিন্তু নীল আকাশেও দাগ কাটে কালো মেঘের ময়লা। একদিন এক সাধু আসে ওদের বাড়িতে। মেয়েটি বাইরে

আসে ভিক্ষা দিতে। মেয়েটিকে দেখে সাধুটার চোখ চকচক করে ওঠে। ভিক্ষে নিয়েই সে চলে যায় না, সিঁড়িতে বসে জল চায়। সাধুর চকচকে চোখ দুটো দেখেই কেমন যেন লেগেছিল গাছটার। ওঁকে বসতে দেখে সন্দেহটা বাড়ে। ব্যগ্র হয়ে কান পেতে থাকে। মেয়েটি জল নিয়ে এলে সাধুটি বলে 'মামনি, তোমার তারাদের দেশে যেতে ইচ্ছে করে না?' মেয়েটি বলে 'হ্যাঁ! খুব করে। কেন তুমি সেখানে গেছ?' সাধুটি বলে 'হ্যাঁ, আমি তো সেখানেই থাকি।'

—সেখানে কি আছে?

—'কি নেই? তুমি যা চাও সব আছে। হীরে, মণি-মাণিক্য, সুন্দর সুন্দর খাবার, গয়না, পোশাক ওখানে কখনো অন্ধকার হয় না। সবসময় আলোয় ভরে থাকে। গরমও নেই, ঠান্ডাও নেই, দুঃখও নেই, কষ্টও নেই। সে এক ভারি সুন্দর জায়গা। একবার গেলে আর আসতে ইচ্ছা করে না। তুমি যাবে সেখানে আমার সাথে?' মেয়েটির চোখদুটো আনন্দে ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, কিন্তু মা তো আমায় যেতে দেবে না। আর তাছাড়া আমি কি করেই বা যাব?' সাধুটি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে 'তোমার মাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ওখান থেকে ঘুরে এসে সবাইকে চমকে দেবে। কেমন?' হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, সেই সেখানে ফুল আছে?'

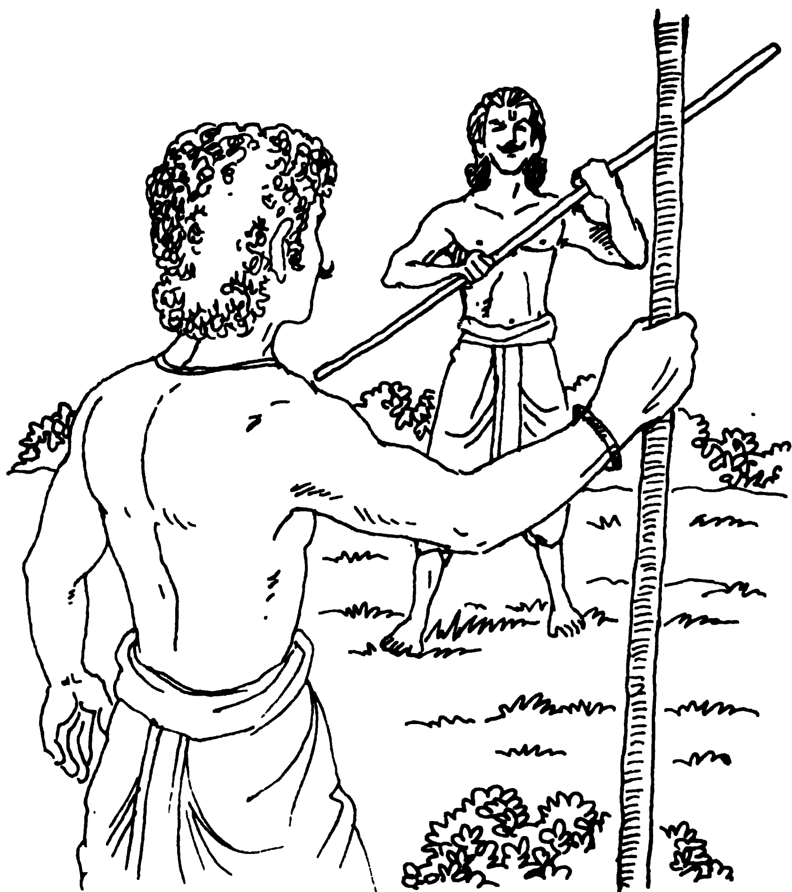
—'হ্যাঁ, ক—তো ফুল। তুমি ফুল বুঝি খুব ভালবাস?'

—'খুব। আমাদের এই গাছটায় না ভারি সুন্দর শিউলি ফুল ফোটে'। সাধুটি গাছটির দিকে একবার অবজ্ঞাভরে তাকায়, তারপর বলে 'এ আর এমন কি! আমাদের ওখানে এমন সব ফুল আছে যা তুমি চোখে কখোনো দেখনি। তবে শুনে রাখো কিভাবে সেখানে যেতে হয়। পূর্ণিমার রাতে আমি তোমাদের ছাদে একটা জ্যোৎস্নার সিঁড়ি নামিয়ে দেব, তুমি ওই সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে চলে যাবে। চাঁদের দেশ পার হলেই আমি তোমাকে নিয়ে নেব। তাহলে আজ চলি, কেমন? কাউকে কিন্তু কিছু বলো না। মনে রেখ, পূর্ণিমার রাতে?' সাধুটি হন হন করে হারিয়ে যায়। যেহেতু শিউলি গাছটির অন্তর্দৃষ্টি মানুষের মতো লোভ লালসার ক্লেদে চাপা পড়েনি সেহেতু সে অচিরেই বুঝতে পারে সে সাধুটি ছদ্মবেশী। আসলে সে এই পৃথিবীর মানুষ নয়। মেয়েটিকে খুব পছন্দ হওয়ায় তাকে তারার দেশে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার তালে আছে। উত্তেজনায় গাছটির শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। থর থর করে কাঁপতে থাকে। সমস্ত রাত কাটে বিনিদ্র। কিছুতেই ভেবে পায়না কি সে করতে পারে। শুধুমাত্র

তার মনের একান্ত অমূল্য রতনটি চলে যাবে এই ভেবেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা ব্যথায় অবশ হয়ে যেতে থাকে। একের পর এক দিন কেটে যায়। পূর্ণিমা যত কাছে আসে গাছটিও তত শীর্ণ হতে থাকে, ফোটে না কোন ফুল। মেয়েটিও আজকাল আর তার কাছে আসে না। সে তার নতুন দেশের স্বপ্নেই মশগুল।

অবশেষে পূর্ণিমা আসে। মেয়েটি ভোরবেলা থেকেই প্রবল উত্তেজনায় আবেগে ছটফট করতে থাকে। অন্যদিকে সূর্য যতই পশ্চিমদিকে এগোয় গাছটির সব পাতা একে একে ঝড়ে যায়। অবশেষে সে এক প্রাণহীন কঙ্কালের মতো একলা দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়। মেয়েটি চুপিসাড়ে বিছানা ছাড়ে। ছাদে যায়। আকাশ থেকে নেমে আসে এক অলৌকিক সিঁড়ি। চাঁদের আলোয় গড়া। মেয়েটি পা রাখে সিঁড়িতে, ক্রমশ উপরে উঠে যেতে থাকে। স্নিগ্ধ আলোয় শিশিরের মতো ঝলমল করে তার শরীর। সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী গাছটি আর পারে না। তার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন টান মেরে উপড়ে ফেলতে চায়। সমস্ত হৃদয় এক শব্দহীন আর্তনাদে হাহাকার করে ওঠে। প্রচন্ড যন্ত্রণার কম্পনে তার শরীর ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় অণুতে পরমাণুতে। নিজের অদম্য ভালোবাসা আর ইচ্ছার জোরে সে হয়ে যায় মেঘ; উড়ে যায় মেয়েটির ফেলে যাওয়া পথ ধরে, দাঁড়ায় গিয়ে মেয়েটির সামনে। হঠাৎ মেঘটিকে দেখে মেয়েটি অবাক হয় বলে একটু সরো। আমাকে তারাদের দেশে যেতে হবে।' মেঘ সরে না। মেয়েটি আবার বলে—'দয়া করে একটু সরো। আমাকে মায়াবি আলোর দেশে যেতে দাও।' মেঘ কোন উত্তর করে না। কেবল তার শরীর থেকে নিঃসৃত হয় এক পরিচিত তীব্র সুবাস শিউলি ফুলের। সেই গন্ধে শরীর মন মাতোয়ারা হয়ে যায় মেয়েটির, কেটে যায় সব সম্মোহন। জেগে ওঠে নিজের একা আপন বাড়ি, বাবা-মা, সঙ্গীসাথী এমন কি সেই শিউলি গাছের স্মৃতিও। আকুল আবেগে সে জড়িয়ে ধরে মেঘরূপী শিউলি গাছটাকে। তার শরীরের তার ভালবাসার উষ্ণতায়, প্রচন্ড তৃপ্তিতে শিউলি মেঘ গলে যায়, টুপটাপ ঝরে পড়ে।

পরদিন সকালে, সকলে ফুল তুলতে এসে অবাক হয়ে দেখে, শিউলি-গাছটা আর নেই-। তার জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র শ্বেতশুভ্র শিউলি ফুল, তাদের গায়ে অশ্রুজলের মতো বড় বড় শিশিরের ফোঁটা।



রূপনগরে আলোর খেলা

আসরফ সিদ্দিকী

রাজসভায় বসেছিলেন রূপনগরের রাজা। দূর থেকে দেখতে পেলেন সামনের রাজউদ্যানে দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছে পূর্বদিকে। ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষ সমুখে। পশ্চিমে শিবের মন্দির যার পাশে ব্রহ্ম দৈত্য বাস করতেন। যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী চাকরাণীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেত। ধোঁয়ার মতো যাঁর ধড় আর কুয়াশায় মতো যাঁর জটা। আর দক্ষিণে প্রজার আঙিনা যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে একটি কবন্ধ জন্মেছিলেন। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

এ সব কথা ভাবছিলেন রূপনগরের রাজা।

এমন সময় মহামন্ত্রী বললেন, মহারাজ আজ মহাশক্তি পরীক্ষার দিন। আপনি চলুন রাজ উদ্যানে।

মহামন্ত্রীর অনুরোধে রাজা চলে এলেন রাজ উদ্যানে।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জমেছিল কম নয়!

বীরকুমার তার সৈন্যসামন্ত কোথায় দাঁড়াবে তারই ব্যবস্থা করছিল। কী চেহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ'ফুটের উপর লম্বা, গালে পাকা দাড়ি, গোঁফ ছাঁটা। সে ছিল ও দিনের সব সেরা লড়কিওয়ালা...।

এমন সময় মহামন্ত্রী রাজাকে কানে কানে বললেন, 'রাজমশাই শক্তিধরকে একবার সেনা দেখাতে হুকুম করুন না—শক্তিধর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি কি লাঠি, কি লড়কি, কি সড়কি...ও হাতে নিলে কোন লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে ও 'না' বলতে পারবে না। কারণ ও আপনার অনুগত প্রজা!'

এরপর মহামন্ত্রী শক্তিধরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। এর শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাংস, চর্বি একবিন্দুও নেই। রং কালো অথচ দেখতে সুপুরুষ।

রাজামশাই বললেন, 'আজ তোমাকে এক হাত খেলা দেখাতে হবে।' শক্তিধর অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, রাজামশাই, লেঠালি আমার জাত ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মতো আমিও খেয়ার নৌকা পারাপার করেই দু-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা...। তাই বলছি এ আদেশ আপনি করবেন না।

রাজামশাই প্রসন্ন হেসে বললেন, 'তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না।'

সে উত্তর করলে, —'জানতুম ছোকরা বয়সে। তারপর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি, তাছাড়া আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? আপনার হুকুম বলে আমি না বলতে পারিনে, তবে আপনি যদি আমার কথাটি শোনেন তবে জানি আপনি আর আমাকে আদেশ করবেন না।

রাজা জিগ্গেস করলেন, "কেন এরকম দিব্যি করেছিলে?"

শক্তিধর বললে, 'ছেলেবেলায় এরা সব খেলা দেখাত, আমিও খেলার লোভে এদের দলে ছুটে গিয়েছিলাম। আমার বয়স যখন বছর কুড়িক—তখন কি লাঠি, কি সড়কি, কি লড়কিতে আমি হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা

ভাবলে যে আমি কোনো তন্তর মন্তর শিখেছি—তার গুণে আমি সকলকেই হটিয়ে দিই, বিশ্বাস করুন—আমি তন্তর মন্তর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে হাতের লাঠি সড়কির মার আসবে কোন দিক থেকে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না। আর শুধু মার খেত। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়িকাঠে বলি দেবে। তারপর এক রাত দুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে আমাকে বিছানা থেকে তুলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়িকাঠে দেবার উদ্‌যোগ করলো। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর রঘু সর্দারের কাছে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের সমুখে দিব্যি করো যে আর তুমি কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব।' আমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি, আর তারপর থেকে একদিনও লাঠি সড়কি ছুঁইনি। কথা সত্যি কি মিথ্যে ওই রঘু সর্দারকে জিগ্‌গেস করুন!

রাজা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন। তারপর তিনি বুঝলেন শক্তিধর সত্যি কথাই বলেছে। যে প্রতিজ্ঞা সে করেছে তার সে প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন থাক।

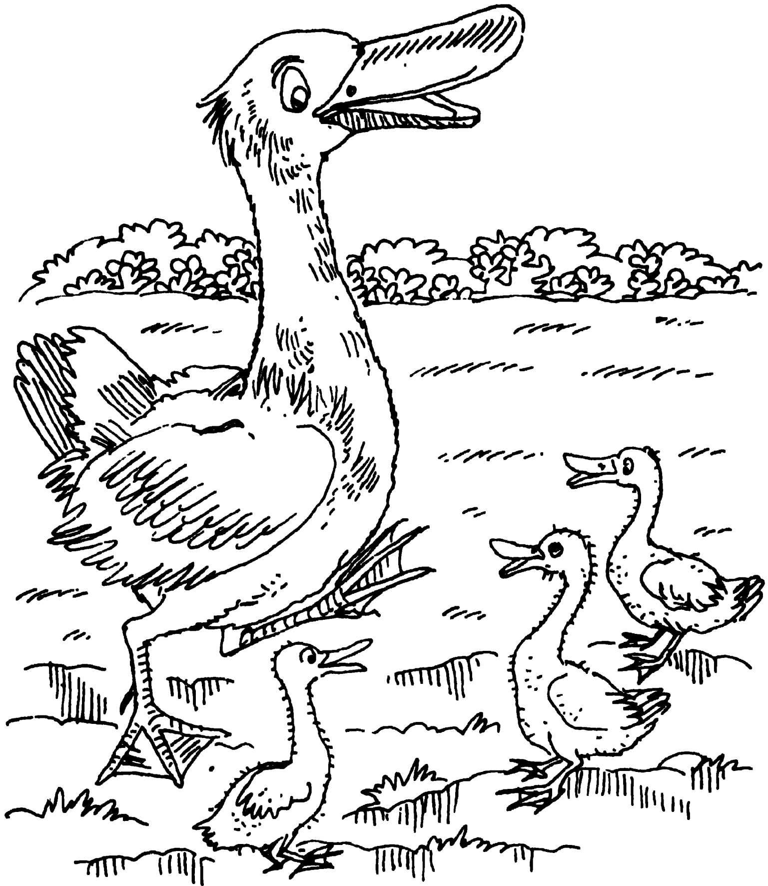
তারপর শুরু হল লাঠি খেলা। শক্তিধর নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

রাজউদ্যানে বসে শুধু রাজা একটা কথাই ভাবছিলেন, শক্তিধরের কথা ঠিক!

শক্তিধরের গায়ে যিনি ভর করেন, তারই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা।

রূপনগরে আজ আলোর মেলা...তিনি শক্তিধরের কাছ থেকেই সে আলো পেলেন।





বাংলা দেশের রূপকথা

মিজানুর রহমান

বাংলা দেশের রূপকথা শুনবে তোমরা ? এসো আজ তোমাদের রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাই।

ছিল সুন্দর সুন্দর বাচ্চা বাচ্চা ডিম। তারা একদিন ফুটে উঠল, তারা বললে, কি সুন্দর এ দেশ!

আর বাচ্চাগুলো যেমন তেমন করে উঠে পড়ে.....সবুজ পাতার নীচে...উঁকি মেরে দেখতে...

একটা বাচ্চা বলল, "আরি বাপ! পৃথিবী কী বড়ো।" মা-হাঁস বলল,

"এইটুকু দেখেই পৃথিবী ভাবলি নাকি? আরে, এ বাগানের ওধারের সীমানার ওপারে অনেক দূর পর্যন্ত, একেবারে পাদ্রীর মাঠ অবধি পৃথিবীটা ছড়িয়ে আছে! অবিশ্যি আমি নিজে অদ্দুর যাই নি। ওরে, তোরা সবাই আছিস্ তো?

বলেই হাঁস উঠে পড়ল। কই, না তো, সবাই তো হেথা নেই। সবার বড়ো ডিমটাই যে বাসায় রইল! কি জ্বালা? এ আর কত দিন চলবে, বাপু। আমি তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠলাম। এই বলে মা-হাঁস আবার গিয়ে বাসায় উঠল। বুড়ি-হাঁস দেখা করতে এসে বলল, কিগো, চলছে কেমন? মা-হাঁস বলল, এই একটা ডিমের জন্যেই যা দেরি হচ্ছে; এ যে আর ফোটেই না! কিন্তু অন্য বাচ্চাগুলোকে যদি একবার দেখতে! জন্মে কখনো আমি এমন সুন্দর হাঁসেব ছানা দেখি নি!

বুড়ি-হাঁস বলল, ওটা নির্ঘাৎ পেরুর ডিম। আমি নিজে একবার ঐরকম ঠকেছিলাম; তারপর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সে যে কি ঝামেলা; জলে যেতে ভয় পেত! হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই জলের ধার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম না। কত ডাকাডাকি বকাবকি করতাম, কোনো ফল হত না। দেখি তো একবার ডিমটাকে! হুঁ, যা বলেছি! ও পেরুর ডিম না হয়ে যায় না! ওটা থাক্ গে, তুমি বরং অন্যগুলোকে সাঁতার শেখাও।

মা-হাঁস বলল, আরেকটু বসেই দেখি-না, এমনিতেই এত দিন ঠায় বসে আছি, ফসল-কাটার শেষপর্যন্তই না হয় এখানে কাটালাম!

যা ইচ্ছা কর! তাতে আর আমার কি! এই বলে বুড়ি-হাঁস হেলেদুলে চলে গেল।

শেষপর্যন্ত বড়ো ডিমটা ফুটল। বাচ্চাটা চিক্, চিক্ শব্দ করে খোলার ভিতর থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু মাগো! কি মস্ত আর কি কদাকার দেখতে! মা-হাঁস তার দিকে তাকিয়ে রইল।শেষটা বলল, এটা কি ষণ্ডা-গুণ্ডারে বাবা! অন্যগুলোর একটাও তো একটুও এমন ধারা নয়। তবে কি এটা একটা পেরুর পুরুষ-বাচ্চা নাকি? বেশ, একটু বাদেই দেখা যাবে। তবে জলে ওকে নামাতেই হবে; নিজের হাতে ঠেলেঠুলে নামাতে হয় তো তাই সই।"

পরদিনটা ছিল চমৎকার; সমস্ত সবুজ পাতার উপর নরম গরম রোদ। এমন সময় মা-হাঁস সব কটা ছানাপোনা নিয়ে খালের দিকে চলল। সেখানে পৌঁছেই টুপ করে মা জলে নামল। তার পর প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাক দিতেই, বাচ্চাগুলোও একটার পর একটা জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমে মাথাগুলো জলের

নীচে তলিয়ে গেল, তার পরেই আবার ভেসে উঠল, সবাই দিব্যি সহজে সাঁতার দিতে লাগল। সব কটা বাচ্চাই, কদাকার ছাই রঙেরটাও। মা-হাঁস বলল, মোটেই পেরু; আহা! একবার খালি তাকিয়ে দেখতে হয় বাছার কি চমৎকার ঠ্যাং নাড়ার ঢঙ, কেমন সোজা হয়ে ভাসা! এটা আমার নিজের ছানা, ভালো করে নজর দিলে বোঝা যায় যে দেখতেও খাসা! প্যাঁক-প্যাঁক! আয় আমার সঙ্গে, তোদের দুনিয়া দেখাই চল। কিন্তু কাছে কাছে থাকিস বাছারা, নয়তো কে কোথায় মাড়িয়ে দেবে; তাছাড়া বেড়াল সম্বন্ধে সাবধান!”

যে উঠোনে পাতি-হাঁসরা থাকত, ওরা সেখানে গিয়ে পৌঁছল।গিয়ে দেখে কি-না একটা বান-মাছের কাঁটা নিয়ে দুই পরিবারে ঝগড়া বেধেছে। সেটাকে শেষে বেড়ালে নিল।

মা-হাঁস নিজেও মাছ-পোড়া ভালোবাসত, ঠোঁট মুছে সে বলল, দেখলি তো বাছারা, এই হল দুনিয়ার দস্তুর। এখন পা চালা দিকি, ঐ যে হোথা বুড়ি-হাঁস, ওকে নমো করিস। এখানে যত পাখি দেখছিস ও-ই হল সবার সেরা, হিস্পানী বংশ ওদের, তাইতে অমন হোমরা-চোমরা চেহারা, অমন আদবকায়দা। ওর ঠ্যাঙে কেমন লাল ন্যাকড়া বাঁধা দেখেছিস? সবাস বলে ঐটে নাকি ভারি সুন্দর, ওর চাইতে বড়ো সম্মান হাঁস জগতে আর হয় না।

উঠোনের অন্য হাঁসরা ওদের দিকে চেয়ে থেকে, জোরে জোরে বলাবলি করতে লাগল, ঐ দেখ, আরেক গুষ্টি এলেন! যেন এখানে এমনিতেই যথেষ্ট লোক নেই! আরে ছি! ছি! ঐটা কি কদাকার গো! ওটাকে থাকতে দেব না! যেই না বলা, অমনি একটা হাঁস সেই বাচ্চাটার দিকে তেড়ে গিয়ে, দিল তার গলায় এক কামড়। মা-হাঁস বলল, ওকে কিছু বল না, ও কারো কোনো ক্ষতি করবে না।

তা হতে পারে, কিন্তু ব্যাটা বেজায় বড়ো আর দেখতে কি অদ্ভুত! ঠ্যাঙে লাল ন্যাকড়া বাঁধা বুড়ি-হাঁস বলল, ঐটে বাদে মা-লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো দেখতে, ঐটে তেমন সুবিধার হয় নি। ওটাকে আরেকবার ডিম থেকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে বেশ হত।

মা-হাঁস বলল, দেখতে সুন্দর নয় সে কথা ঠিক, কিন্তু বড়ো লক্ষ্মী ছেলে, অন্যগুলোর মতোই সাঁতার কাটতে পারে, বরং ওদের চেয়েও ভালো কাটে! মনে হয় সময়কালে ও-ও অন্যদের মতোই হয়ে উঠবে, তখন হয়তো আরো ছোটো দেখাবে।” এই বলে মা বাচ্চাটার গলা চুলকিয়ে দিল, সারা গায়ে ঠোঁট বুলিয়ে দিল। তারপর আবার বলল, তা ছাড়া ও হল পুরুষ-বাচ্চা,

আমার বিশ্বাস ওর গায়ে খুব জোর হবে, কাজেই গায়ের জোরেই দিব্যি চালিয়ে নেবে!

বুড়ি-হাঁস বলল, বাঃ, অন্যগুলি তো ভারি সুন্দর। এসো, এখানে গুছিয়ে বস আর মাছের মুড়োটুড়ো পেলে, আমাকে দিতে পার।

কাজেকাজেই ওরা বেশ গুছিয়ে বসল।

কিন্তু ঐ বেচারা সবার শেষে ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছিল আর দেখতে বেজায় কদাকার ছিল, তাকে সমস্ত হাঁস মুরগিরা কামড়িয়ে, ঠুকরিয়ে জ্বালিয়ে খেত। এদিকে পেরুদের দলের পাণ্ডা, জন্মেই ছিল ঘোড়সওয়ারদের মতো পায়ের গোড়ালিতে কাঁটা পরে, সে তো পাল-তোলা জাহাজের মতো ফুলে ফেঁপে, রাগে মুখ লাল করে, বাচ্চাটার দিকে গটমট করে এগিয়ে এল। সে বেচারা কি যে করবে ভেবেই পেল না; তার চেহারাটা এত বিশ্রী বলে সে এমনিতেই বেজায় অপ্রস্তুত!

এইভাবে তো প্রথম দিনটি কাটল, তারপর থেকে দিনে দিনে অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। ভাইবোনেরাও ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত, খালি খালি বলত, ওরে বিটকেল! তোকে বেড়ালে নেয় না কেন! মা পর্যন্ত বলল, বাছা, তুই যদি দূরে কোথাও চলে যেতিস তবেই যেন ভালো হত!

হাঁসরা ওকে কামড়াত, মুরগিরা ঠোকরাত, যে মেয়েটা ওদের খাবার দিত সে ওকে লাথি মারত। বেচারা ছুটে বেড়ার ঝোপে গিয়ে ঢুকল; সেখানকার ছোটো পাখিরা ওকে দেখেই ভয়ে আধমরা! হাঁসের ছানা ভাবল, এর কারণ আমি বড়ো বিশ্রী দেখতে! এই মনে করে সে ছুটছে তো ছুটছে। শেষটা একটা মস্ত জলা জায়গাতে এসে পৌঁছল। সেখানে কতগুলো বুনো হাঁস থাকত। সেইখানেই সে সারারাত পড়ে রইল, শরীরে কি যে ক্লান্তি, কোথাও এতটুকু আরাম নেই। সকালে বুনো হাঁসরা উঠে পড়েই তাদের নতুন সঙ্গীটিকে দেখতে পেল। তারা জানতে চাইল, বলি তুমি কে? হাঁসছানা ওদের সঙ্গে যতটা পারে ভদ্রভাবেই কথা বলল।

ওরা বলল, তুমি সত্যিই বড় কদাকার হে, অবিশ্যি তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না, যদি-না আমাদের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে চাও।

হাঁস বেচারা বিয়ে-থার কথা কখনো ভাবেও নি। তার একমাত্র ইচ্ছা ঐখানে নল-খাগড়ার মধ্যে পড়ে থাকবে আর বিলের জলে খাবে। তাই সে পড়ে রইল পুরো দুটি দিন। তৃতীয় দিন দুটি ছাই রঙের বুনো হাঁস এসে উপস্থিত। তারা খুব বেশি দিন ডিম ফুটে বেরোয় নি, কাজেই বড়ো বেয়াদব।

তারা বলল, ওরে ব্যাটা শোন্ তোর চেহারাটা এমনি হতকুচ্ছিৎ যে তোকে

আমাদের বড়ো পছন্দ! আসবি নাকি আমাদের সঙ্গে'? কাছেই আরেকটা বিল আছে, সেখানে কয়েকটা লক্ষ্মী মিষ্টি বুনো হাঁস থাকে। সেখানে যত হাঁস হিশ্ শ্ হিশ্শ্ করে ডাক ছাড়ে, তাঁদের সকলের মধ্যে ওদের চেয়ে সুন্দর আরেকটি বার কর দিকিনি! এবার তোর কপাল খুলে যাবে রে, ব্যাটা, তা কুচ্ছিৎ হোস্, আর যাই হোস্!

ঠিক সেই সময় দুম করে একটা বন্দুকের শব্দ হল আর দুটো হাঁসই মরে পা ছড়িয়ে নল-খাগড়ার বনের মধ্যে পড়ল। দুম করে আবার বন্দুকের শব্দ হল, এক ঝাঁক বুনো হাঁস অমনি জল ছেড়ে উঠে পড়ল। তার পরেই আবার বন্দুকের আওয়াজ।

সেদিন শিকারীদের মস্ত দল বেরিয়েছিল। চারধারে এখানে ওখানে শিকারীরা লুকিয়ে বসেছিল; কেউ কেউ আবার গাছেও চড়েছিল। গাছগুলোর ডালপালা লম্বা হয়ে বিলের জলের উপরে ঝুলছিল। এক পাল কুকুর কাদার মধ্যে নেমে, চারদিকে নল-খাগড়ার বন ভেঙে, নুইয়ে, জল ছিটিয়ে, পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হাঁসের ছানা বেচারি তো ভয়েই আধমরা! ডানার তলায় মুণ্ডু লুকোবে ভেবে যেই না মাথা ঘুরিয়েছে, অমনি একটা হিংস্র চেহারার কুকুর তার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল! কুকুরটার এতখানি জিব বেরিয়ে আছে, দু চোখ যেন আগুনের ভাঁটা! হাঁসের ছানাকে দেখেই সে তো প্রকাণ্ড বড়ো এক হাঁ করল, দুই পাটি এই ধারাল সাদা দাঁত দেখা গেল আর তারপরেই জল ছপ্ ছপ্ করতে করতে কুকরটা চ'লে গেল! হাঁসের বাচ্চাকে কিচ্ছু বলল না।

ফোস করে নিশ্বাস ছেড়ে হাঁসের ছানা বলল, বাবা! ভাগ্যিস আমি এমনি কদাকার যে কুকুরেও আমাকে খায় না! নল-খাগড়ার বনে বন্দুক ছোঁড়া চলতে লাগল, বাচ্চা হাঁস চুপ করে শুয়েই রইল। বেলা পড়ে যাবার আগে গুলির শব্দ থামল না; থামলে পরও বেচারা নড়বার-চড়বার সাহস পেল না। কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করবার পর সে চার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই, জলা জায়গাটা ছেড়ে প্রাণপণে ছুট লাগাল। সেকি দৌড়, খেতের উপর দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে, যদিও এমনি জোড়ে বাতাস বইছিল যে তার মুখে দৌড়নোই এক ব্যাপার!

বিকেলের দিকে হাঁসের ছানা ভাঙাচোরা ছোট্টো একটা কুঁড়েঘরের সামনে পৌঁছল, সেটার বড়োই দুরবস্থা; যেন কোন দিকে হেলে পড়বে ভেবে না পেয়ে, কোনোমতে খাড়া হয়ে আছে। হাঁস দেখল দরজার একটা কব্জা কোথায় উড়ে গেছে আর পাল্লাটা এমনি ট্যারা হয়ে ঝুলে আছে যে, দরজার আর দেয়ালের মাঝখানে একটু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে একটা

বাচ্চা হাঁস বেশ গলে যেতে পারে। এদিকে বাইরে ঝড়ের ঘনঘটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে, সে গুড়িশুঁড়ি মেরে ঘরের ভিতর সেঁদিয়ে গেল।

ঐ ঘরে তার হুলো-বেড়াল আর মুরগি নিয়ে এক বুড়ি থাকত। বেড়ালটাকে বুড়ি বলত তার ছেলে; সে পিঠ ফুলো করে গলার মধ্যে গরর্‌-গরর্‌ শব্দ করতে পারত। মুরগিটার ঠ্যাংগুলো বেজায় বেঁটে, তাই বুড়ি তার নাম দিয়েছিল ঠ্যাং-নাটা খুকু। মুরগি খুব ভালো ডিম দিত আর বুড়িও তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসত।

ঘরে নতুন অতিথি দেখে পরদিন সকালে বেড়াল ম্যাও ম্যাও ডাক ছাড়ল আর মুরগিও কঁকর-কঁক করতে লাগল। চার দিক তাকিয়ে, বুড়ি বলল, আবার কি হলো? বুড়ি চোখে ভালো দেখত না, বাচ্চা-হাঁসকে দেখে মনে করল বুঝি মস্ত মোটা হাঁস, পথ হারিয়ে চলে এসেছে। তাই বুড়ি বল, বাঃ, বেড়ে দাঁও মারা গেল! ওটা যদি ছেলে হাঁস না হয় তো দিব্যি হাঁসের ডিম খাওয়া যাবে! দেখাই যাক না। কাজেই তিন সপ্তাহ ধরে হাঁসকে পরখ করা হল, কিন্তু ডিম টিম্ দেখা গেল না।

এখন হয়েছে কি, ঐ বেড়ালটাই ছিল ও-বাড়ির কর্তা আর মুরগি ছিল গিন্নি। কিছু বলতে হলে তারা সর্বদাই বলত, আমরা আর পৃথিবীটা হেনা-তেনা, কারণ তাদের ধারণ ছিল যে তারা নিজেরা শুধু অর্ধেক পৃথিবী তাই নয়, ওদের অর্ধেকটাই বেশি ভালো! বাচ্চা হাঁস ভাবত এ বিষয়ে কারো কারো অন্য মতও থাকতে পারে, কিন্তু মুরগি সে কথা মানবে কেন?

মুরগি জিজ্ঞাসা করল, এই ডিম পাড়তে পারিস? না। তা হলে মুখে কুলুপ দে!

বেড়াল বলল, পিঠ কুলো করতে পারিস? গরর্‌ গর্‌ শব্দ করতে পারিস? না। বেশ তা হলে গুরুজনরা যখন কিছু বলেন, তখন মতামতের কথা তুলবি নে!

কাজেই হাঁসের ছানা আর কি করে, রেগেমেগে এক কোণে একলা বসে রইল। সে যাই হোক, হঠাৎ তার খোলা হাওয়া আর ঝকঝকে রোদের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়তেই আবার জলে সাঁতরে বেড়াবার জন্য এমনি প্রবল ইচ্ছা হল যে, কথাটা মুরগিকে না বলে পারল না।

মুরগি বলল, তো হয়েছেটা কি? কাজকর্ম নেই কি-না, তাই যত সব বাজে খেয়াল পুষছিস। হয় ডিম পাড়, নয় তো গরর্‌ গরর্‌ শব্দ কর্‌, তাহলেই ও সব ভুলে যাবি।

বাচ্চা-হাঁস বলল, কিন্তু সাঁতার কাটতে কি ভালোই যে লাগে! জলের

তলায় ডুব দিলে, মাথার ওপর যখন দু পাশের জল আবার একসঙ্গে মিলে যায়, তখন কি ভালোই না লাগে। মুরগি বলল, বলিহারি তোর ভালোলাগার ছিরি! আমার মতে তুই একটা পাগল! আমার কথা নাহয় বাদ দিলি, বেড়ালকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ-না, ওর মতো বুদ্ধিমান জানোয়ার তো কোথাও দেখিনি, ওকেই জিজ্ঞেস কর সাঁতার কাটতে, কি জলের তলায় ডুব দিতে ওর ভালো লাগে কিনা। নাহয় গিন্নিমাকেই শুধোস, তাঁর চেয়ে তো কারো বেশি বুদ্ধি নেই। তুই কি সত্যি ভাবিস যে সাঁতার কাটলে; কিম্বা মাথার ওপর দুপাশের জল একসঙ্গে মিললে, খুব মজা লাগবে'?

বাচ্চা-হাঁস বলল, তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পার নি।

কি বললি'? না, তা বুঝব কেন! তবে কি তুই-ভাবিস যে বেড়ালের চেয়ে, কিম্বা গিন্নিমার চেয়ে— আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—তোর বেশি বুদ্ধি'? ও-সব কথাকে মনেও স্থান দিস না বাছা, বরং যে দয়া পাচ্ছিস, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাক। একটা গরম ঘরে জায়গা পাসনি আর এমন সব লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাচ্ছিস না, যাদের কাছ থেকে কিছু শেখা যায়'? কিন্তু তুই অমনি আহাম্মুক যে তোর সঙ্গে মেশাই দায়! বিশ্বাস কর, তোর ভালো মনে করেই বলছি। অপ্রিয় সত্য বলি বটে, কিন্তু তাই দিয়েই তো প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়। এবার আয় দিকিনি, একবার একটু কষ্ট করে হয় গরর্ গরর্ শব্দ করতে, নয়তো ডিম পাড়তে শেখ।

হাঁসের ছানা বলল, ভাবছি আবার দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়ি। মুরগি বলল, তাই যা-না।

কাজেই বাচ্চা-হাঁস বেরিয়ে পড়ল। কখনো সে জলের উপরে সাঁতার কাটত, কখনো জলের নীচে ডুব দিত, কিন্তু বেচারা এমনি কদাকার দেখতে যে, সব জন্তু জানোয়ার ওর পাশ কাটিয়ে চলে যেত। এমনি করে হেমন্তকাল এল, গাছের পাতা হলদে হল, পাটকিলে হল, তারপর হাওয়ায় উড়ে গেল, বাতাস তাদের নাচিয়ে ফিরতে লাগল। হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা হল; মেঘগুলো শিলের আর বরফের বোঝায় ভারি হয়ে উঠল; ঝোপের উপর দাঁড়কাক বসে হেঁড়ে গলায় ডাকতে লাগল। বাচ্চা হাঁস বেচারির কোথাও একটু আরাম পাবার জো রইল না।

একদিন সন্ধেবেলায়, ঠিক সূর্য ডোবার সময়, ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে এক ঝাঁক-বড়ো বড়ো পাখি আকাশে উড়ল। হাঁসের ছানা এমন সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখেনি। পাখিগুলোর পাখনা ছিল ধবধবে সাদা, লম্বা পাতলা গলা। ওরা হল রাজহাঁস। অদ্ভুত একটা ডাক ছেড়ে, দীর্ঘ সুন্দর ডানা মেলে,

এদিকের ঠাণ্ডা জায়গা ছেড়ে, ওরা সমুদ্রের ওপারের গরম দেশে উড়ে চলে গেল। কত উঁচু দিয়ে গেল ওরা, কী বিষম উঁচু দিয়ে। বিশ্রী দেখতে বাচ্চা-হাঁসটার মনের ভাবও কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল। গম-পেষার কলের চাকার মতো, জলের উপর পাক খেয়ে সে কেবল ঘুরতে লাগল আর গলা লম্বা করে, তারা যেদিকে গেছে সেদিকে দেখতে লাগল আর তার গলার ভিতর থেকে, এমনি জোরে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল যে তাই শুনে নিজেরই ভয় ধরে গেল! আহা, ওরা সব পাখির সেরা পাখি, ওদের কথা হাঁসের ছানা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কী সুখী ওরা! বাচ্চা-হাঁস ওদের নামও জানত না, কোথায় ওরা যাচ্ছে তাও জানত না। তবু তাদের এমন ভালো লাগল, যেমন আর কখনো কাউকে লাগেনি। একটুও হিংসা হল না; অমন রূপ যে তার নিজের কখনো হতে পারে, এ কথা সে ধারণাও করতে পারত না। উঠোনের সেই হাঁসেরা যদি তাকে থাকতে দিত, তা হলে সে খুশি হয়ে সেখানেই থেকে যেত।

তারপর শীত এল, সে যে কি ঠাণ্ডা! বাচ্চা-হাঁসকে কেবল চরকি দিয়ে সাঁতরে বেড়াতে হত, যাতে তার চারিদিকে জল না জমে যায়। তবু রোজ রাতে দেখত বরফের মাঝখানে খোলা জলের জায়গাটুকু ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে। প্রাণপণে তাকে ঠ্যাং ছুঁড়তে হল, নইলে ওর চারপাশের সব জলটাই জমে বরফ হয়ে যাবে। শেষটা একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে, শীতে জমে আড়ষ্ট হয়ে, বরফের উপর বেচারা শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে ঐ পথ দিয়ে যাবার সময়, একজন চাষী ওকে ওভাবে দেখতে পেয়ে, নিজের পায়ের কাঠের জুতো দিয়ে বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো করে, হাঁসের ছানাকে তুলে ঘরে নিয়ে এসে, তার বৌয়ের কাছে দিল।

দেখতে দেখতে বাচ্চা-হাঁস সুস্থ হয়ে উঠল। চাষীর ছেলে-মেয়েরা তো ওর সঙ্গে খেলা করার ভারি ইচ্ছা; কিন্তু হাঁস ভাবল ওরা বুঝি ওকে জ্বালাতন করতে এসেছে তাই ভয়ের চোটে এক লাফে সে দুধের বালতির মধ্যে গিয়ে পড়ল। সব দুধ পড়ে গিয়ে ঘর ভেসে গেল। চাষীর বৌ চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে উঠল। হাঁস তখন সেখান থেকে ধড়ফড় করে মাখনের গামলায় ঢুকল, তারপর সেখান থেকে উঠে ময়দার পিঁপেতে পড়েই, আবার বেরিয়ে এল।

তখন বৌ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তাকে চিমটের বাড়ি মারার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলেমেয়েও রেষারেষি করে হাঁস ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের সে কী হাসি আর চেঁচামেচি! ভাগ্যিস দরজাটা খোলা ছিল, ছুটে বেরিয়ে এসে

হাঁস ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে নতুন পড়া নরম বরফের উপর যেন স্বপ্নের ঘোরে শুয়ে পড়ল।

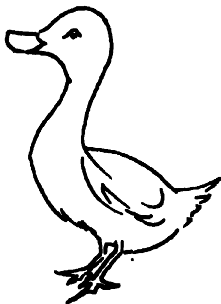
ঐ শীতকালে হাঁসের ছানাকে যে কত অসুবিধা কত কষ্ট সইতে হয়েছিল, সে কথা বলতে গেলে বড়োই দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। শেষে একদিন সে একটা বিলের ধারে নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে শুয়ে ছিল। এমন সময় টের পেল আবার রোদে গরমের আমেজ লেগেছে, লার্ক পাখিরা গান গাইছে, সুন্দরী বসন্তকাল আবার ফিরে এসেছে। তখন বাচ্চাহাঁস আবার ডানা ঝাপটাতে লাগল। আগের চাইতে এখন ডানায় কতো বেশি জোর হয়েছে; সেই ডানায় ভর করে হাঁস তাড়াতাড়ি সাঁতরিয়ে চলল আর কিছু টের পাবার আগেই দেখল যে একটা মস্ত বাগানের ধারে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আপেল গাছ ফুলে ভরে আছে, লতাগাছ খালের জলের উপর দীর্ঘ সবুজ ডালপালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, চারদিক তার ফুলের সুগন্ধে ম-ম করছে। সেখানকার সব কিছু সুন্দর, বসন্তকালের নতুন প্রাণে কেমন ভরপুর।

কুঞ্জের মধ্যে থেকে তিনটি সুন্দর সাদা রাজহাঁস বেরিয়ে এল। কি সগর্বে তারা পাখনার বাহার দেখাতে লাগল আর আলতোভাবে জলের উপর সাঁতরে বেড়াতে লাগল। হাঁসের বাচ্চা সেই অপরূপ প্রাণীদের চিনতে পারল, অদ্ভুত একটা কি দুঃখে তার মন ভরে উঠল।

সে বলল,"রাজার মতো পাখি, ওদের কাছে উড়ে যাব নাকি! আমার মতো একটা কদাকার পাখি ওদের কাছে গেলে আমাকে মেরে ফেলবে।

তার চেয়ে পালিয়ে যাই কোথাও।

এই বলে পাখিটা উড়ে গেল.....।





ওটেন সাহেবের বাংলো

শওকত ওসমান

ওটেন সাহেব সার্ভেয়ার। জমি -জায়গা মাপাই তাঁর কাজ। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে নূতন এসেছেন।সকাল সকাল আমিন আর জরীপ করবার মাল-মশলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন দুপুরে।

জোষ্ঠি মাস। ভয়ানক গরম। সকালে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ সারতে পারলেই ভাল। তাই যে বাবুর্চি থাকত, সাহেব তাকে খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে বলতেন।

মি: ওটেনের বাবুর্চি বদলী হোত প্রায় সপ্তাহে তিন বার। রান্না একটু অপছন্দ হলে আর কী, চাকরির দফা-রফা।

সাহেবের ক্যাম্প পাতা মাঠের মাঝখানে। কতকগুলো অশ্বত্থ বটে বহুদিন এখানে জটল্লা পাকিয়ে আছে, প্রায় ছ-কাঠা জায়গা জুড়ে। একটু দূরে শ্মশান। চোতবোশেখে মড়া পোড়াতে গিয়ে রোদ সহ্য করতে না পারলে অনেকে এখানে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে গাছের ছায়া, রোদ সেঁধোয় না। সাহেব পছন্দ করে এখানে আস্তানা পেতেছিলেন। রাত্রে গরমের দিনে ভারি আরাম তাঁবুর বাইরে এসে ইজি-চেয়ার পেতে হাওয়া খাওয়া।

ফাঁকা মাঠের পর মাঠ। কত দূর থেকে না বাতাস ভেসে আসে। বোশেখ মাসে ফসল নেই কোথাও। চারদিক খা খা করছে। বাতাসকে বাধা দেবার মতো এক খণ্ড সবুজ ঘাসও নেই মাথা তুলে। সাদা মাটি দাঁত বের করে ভূতের মত হাসে।

ওটেন সাহেবের বাবুর্চি গণি প্রথম দিন এসে মহা বিপদে পড়েছিল।

সেদিন মি: ওটেনের খাটুনি হয়েছিল বেশী, অনেক রাত্রে ঘুমোতে গেলেন। সকাল হওয়া মাত্র গণি সাহেবের তাঁবুর ভেতর ঢুকে ডাক দিল "ওঠেন সাহেব।" সাহেবের ঘুম ভাঙল, তখন-ও ঘোর-কাটেনি একদম। আরো খানিক শুয়ে থাকার ইচ্ছা ছিল তাঁর।

গণি আবার "ওঠেন" সাহেব বলা-মাত্র, সাহেব উঠে বসলেন। এক মিনিটে চোখ মুখ লাল হয়ে গেল মিস্টার ওটেনের।

কিয়া- সাহেব কা নাম পাকড়্‌তা! (কি সাহেবের নাম ধরছ তার সামনে) মি: ওটেন রেগে চিৎকার করে উঠলেন।

কোন বেয়াদবী করিনি ত হুজুর, গণি ভয়ে জড়সড় হয়ে বললে।

—বেয়াদবী নেহি? সাহেব কা নাম পাকড়া তোম্।

—না হুজুর, আমি বললুম, সাহব ওঠেন ঘুম থেকে।

—ফিন ওটেন, (আবার ওটেন নাম তোমার মুখে) সাহেবের মুখ থেকে যেন গোলা-বারুদ ছড়িয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি মি: ওটেন খাট থেকে নেমে এসে গণির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "ডর নেহি তোমরা, সাহেব কা নাম পাকড়া?"

গণি ভয়ে একদম জড়সড় । দু-হাত জোড় করে বললে, "আপকা নাম নেহি পাকড়া হুজুর, ওঠেন মানে-"

—ফিন মেরা সামনে বেয়াদবী!

গণি কী করে সাহেবকে বোঝায় ঠিক করতে পারছিল না। চোখে তার

জল এসে পড়েছে। কাঁদো-কাঁদো মুখ, আহা বেচারা! সাহেব এদিকে মার-মুখো।

শেষে গণি সম্মুখে বসে পড়ে 'ওঠেন' বলে আবার উঠে দাঁড়াল। এমনি ওঠ্-বস্ আরম্ভ করল। রীতিমত বৈঠকী কসরত। গণি বসে আর বলে"ওঠেন", আবার উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু হয়েছে। গাল দুটো ভেসে যাচ্ছে। সাহেব খাপ্পা হয়েছিল, শেষে সে-ও বিপদে পড়ল। ভাবল, হোলো কী লোকটার? মাথা খারাপ নাকি?

গণি'ওঠেন বলে, উঠে দাঁড়ানো মাত্র সাহেব তাকে ধরে থামালেন। কিয়া হুয়া তোমরা?

গণি থামতে চায় না। বৈঠকী ব্যায়াম আরো বেড়ে নাক-মুখ দিয়ে জল ঝরছে তার। তার মুখে শুধু এ এক কথা"ওঠেন, ওঠেন, ওঠেন"-আর ওঠ-বস্।

"আমি বেয়াদবী করিনি হুজুর। ওঠেন মানে?" বলে, গণি উঠে দাঁড়ায়।

"আপনি যে সকালে ঘুম ভাঙাতে বলেছিলেন।"

আগে গণির চোখ দিয়ে শুধু পানি ঝরছিল, এবার গা দিয়েও পানি ঝরতে লাগল। ঘামের জোয়ার এসেছে।

—কিয়া হুয়া বোলো?

—হুজুর, বেয়াদবী করিনি।

বলার সাথে সাথে আবার কসরত চল্‌ল।

এমন সময় সাহেবের একজন বন্ধু, মি: টমাস, এসে হাজির হল। টমাস দিশী সাহেব, বাংলা ভালো জানে। তাঁবুর ভেতর এই কাণ্ড দেখে ওটেনকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কী?

গণির কসরৎ আরো বেড়ে গেল।

মি: ওটেন তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে।

টমাস হেসে উঠল। পরে ওটেন সাহেবকে বললে "ওঠেন৷ mean rise up(অর্থাৎ ওঠেন মনে উঠে পড়ুন)।"

ওটেন সাহেব এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এই থামো, হাম সম্‌ঝা। (আমি বুঝেছি)।

গণি তবে থামে।

—তোমরা বেয়াদবী নেহি। হামরা হুয়া।

গণি চোখের জল মুছে তাঁবুর বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ে। বারেক টমাস সাহেব এসেছিল। বাবা, এমন ফাঁদে মানুষ পড়ে।

সকালে সাহেব বেরিয়ে গেলেন, দুপুর বেলা এসে গণিকে ডেকে বললেন, "এই বাবুর্চি, টেবিল লাগাও।" আবার জিজ্ঞেস করেন, "খানা রেডি?"

—হাঁ হুজুর।

সাহেব বললেন, যাও জলদী করো।

মিঃ ওটেন শোয়ার তাঁবুর পাশে একটা ছোট তাঁবু পেতেছিলেন। সেখানে খাওয়ার মত আসবাবপত্র, টেবিল ও অন্যান্য জিনিস।

শোয়ার ঘরে আপিসের কাগজ-পত্র, একটা খাট, বিছানা ইত্যাদি আর বন্দুক।

গণি তাড়াতাড়ি সেই ছোট তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। গিয়ে টেবিলটা আচ্ছা করে পরীক্ষা করলে। একটা পায়া ভাঙা। তারা বদলে একটা বাঁশ ঠেস দিয়ে রাখা। ভাঙা পায়াটা মেঝের এক পাশে পড়ে রয়েছে। একটু কাঠ জুড়ে দিলেই হবে। গণি ভেবে হয়রান, সে ত এ-সব কাজ জানে না। কিন্তু করা চাই-ই। সাহেবকে খুশী করতে হবে। রাজার জাত, কপাল ফিরতে কতক্ষণ!

গণি পাশের তাঁবু থেকে আমীনদের হাতুড়ি বাটালি এনে কাজ শুরু করে দিলে। দুপুর বেলা সেই তাঁবুর ঘিঞ্জি জায়গায় কী গরম। জানালা নেই। ওখানে তা কেউ শোয় না, তা রাখবার প্রয়োজনও নেই। গণি তবু বাইরে এলো না। টেবিলটার ভাঙা পায়া লাগাতে হবে। সাহেব বলেছে, জলদী চাই।

দু' ঘণ্টা চলে গেল। ওটেন সাহেবের খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তিনি ডাক দিলেন, "গণি"।

গণি শুনতে পেয়ে জবাব দিলে, "হুজুর, টেবিল লাগাতা হ্যায়।"

"জলদী," ব'লে সাহেব চুপ করলেন।

মিনিট পনের পর মিঃ ওটেন আবার প্রায় চিৎকার দিয়ে ডাকলেন, "গণি"।

"হুজুর, টেবিল লাগাতা হ্যায়," পাশের তাঁবু থেকে গণি জবাব দিলে।

ওটেন সাহেব রেগে পাশের তাঁবুর ভেতর গিয়ে দেখলেন, গণি কাঠের উপর বাটালি চালাচ্ছে।

সাহেবকে দেখে বাবুর্চি থতমত খেয়ে গেল।

সে মনিবের দিকে চেয়ে বললে, "আর দেরী নেই হুজুর, লাগাতা হ্যায়।"

—এই, তোমকো কিয়া লাগানে বোলা?

মিঃ ওটেন হিন্দীতে বুঝিয়ে দিলেন: টেবিল-লাগানো অর্থ খাবার সরঞ্জাম করা। গণির জ্ঞান এতক্ষণে ফিরে এলো। টেবিল লাগানো অর্থ ভাত-খাওয়া—তা সে কী জানে?

সাহেব নিজে টেবিলের ভাঙা পায়ে বাঁশ দিয়ে ঠেস দিয়ে দিলেন।

খুব ক্ষিধে লেগেছে তাঁর।

ঘাম মুছে গণি সাহেবের খাবার যোগাড় আরম্ভ করলে।

এই প্রথম দিনের দুর্ঘটনার পর গণির চাকরি বহাল হয়ে গেল। তাকে সাহেবের খুব ভাল লেগেছে।

মি: ওটেন মন্তব্য করেছিলেন, "এত সরল লোক পৃথিবীতে আছে!"

গণির সৌভাগ্য বটে!

গণিকে আর ঠকতে হয়নি।

আসলে গণি চালাক লোক। শুধু নতুন জায়গা আর বিলিতি ফাঁপরে পড়ে পয়লা দিনটা কী নাজেহাল না হোলো সে।

আর গোলমাল নেই। গণির রান্না ভালো। সাহস আছে। রাত্রে সাহেব বেড়াতে যান, গণি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। শ্মশানের কাছে এসে গণির গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে। সাহেবের ভয়ে কিছু বলে না। আর গা ছম্‌ছম্‌-ভয় না পেলেও অনেক সময় হয়। ও আর এমন কী দোষ?

সার্ভে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই অঞ্চলে মাত্র আর দুটো মাঠ বাকী—তিনদিন লাগবে। সাহেব ক্যাম্প তুলতে হুকুম দেন আর কী।

ইতিমধ্যে ওটেন এক কাণ্ড করে বসলেন।

সাহেব একটু খেয়ালী লোক। সংসারে কেউ নেই। যেখানে যান সেখানেই অনেকের মমতায় জড়িয়ে পড়েন।

এখানে এসে এই তাঁবুর আস্তানাটা তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। শুধু ওটেন সাহেব কেন- অনেকেই এ-জায়গা পছন্দ করবে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এমন ছায়াবিথী সহজে মেলে না। জায়গাটা গাঁয়ের জমিদারদের। সাহেব তাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন। মি: ওটেন বছরে কখন কোথায় থাকেন তার ঠাঁই-ঠিকানা নেই। এমন বদ্‌-খেয়ালে পয়সা উজোড় করবার কি দরকার ছিল। বাবুরা দুটি হাজার টাকায় শান্ত হয়েছেন। সামনে বিঘে দশেক মাঠ আর এই ছায়াবিথীটুকুর দাম।

ক্যাম্পে ফিরে এসে গণিকে ডেকে ওটেন বললেন, "গণি, এ জায়গা আমার, আমি কিনেছি।"

"খামাখা কিনলেন, স্যার।"

"কিয়া বোলতা হ্যায়?-খাম্‌খা নেহি।"

সাহেবের চোখেমুখে হাসি। বাংলো তৈরীর ইচ্ছায় জায়গাটা কেনা, তা গোপন করলেন না।

গণি বললে, "কত দামে কিনলেন হুজুর?"

সাহেব হাতের পাঁচটা আঙুলের ভেতর তিনটে মুড়ে বাকী দুটো উঁচিয়ে জবাব দিলেন, "দো হাজার।"

গণির চোখ আর একটু হলে মাথায় উঠে যেত, এমন ভাবে "এ্যা" বলে সে সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল।

"ড্যাম চিপ-ড্যাম চিপ-ড্যাম চিপ।—বলে, ওটেন সাহেব সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে দেশালয়ে ঠুকতে লাগলেন।

ড্যাম চিপ—ড্যাম চিপ—ড্যাম চিপ। সাহেব যেন মদ খেয়ে চিৎকার করছেন। সওদা করে এমন জিতেছে যে ঐ দুটো শব্দ দিয়ে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চায় তিনি কত আনন্দিত!

ক্যাম্পে সিগারেট ফুঁকে পায়চারী করতে করতে ওটেন বললেন, "এখানে বাংলো আর ফার্ম অর্থাৎ শাক-সব্জির বাগান করার শখই তার বেশী।"

গণির বিশ্বাস হয়নি তখনও। বললে, "আপনি হুজুর গাঁয়ে থাকবেন, তা কী হয়।"

"হ্যাঁ, গাঁয়ে থাকব।" ওটেন সাহেব আধা-হিন্দী আধা-বাংলায় বোঝালেন।

ক্যাম্পের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে আবার তিনি বললেন, "হ্যাঁ, গাঁয়ে থাকব।

এখন যুদ্ধ বেধেছে জান ত? কখন শহর ছাড়বার হুকুম হয়, তার কি ঠিক আছে? তখন এই মাঠে ত থাকতে হবে, আকাশের তলায় ক্যাম্প পেতে। তার চেয়ে আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত।"

অকাট্য যুক্তি। গণি মাথা দুলিয়ে সায় দিলে, "ঠিক বলেছেন, হুজুর। কিন্তু একটা কথা বলব, স্যার?"

— What বোলো।

—এমন শ্মশানের জায়গায় ভূত-প্রেত-

ওটেন সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। "ড্যাম ইয়োর ভূত-প্রেত" বলে সাহেব হাসির মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলেন। "আমি ওসব মানিনে।"

গণি আরো কত কী বলে গেল সেদিন রাত্রে। সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন, "ওসব কিছু নয়। ড্যাম ইয়োর ভূত-প্রেত।"

"মাফ করবেন, হুজুর। আমার ভয়-ডর নেই। তবে আমি ওদিকে বিশ্বাস করি। না হলে এমন হয় কেন?"

"আচ্ছা ঠিকসে খানা পাকাও।" সাহেব তারপর তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন।

মেঘ না চাইতে জল।

সাহেবের ভাগ্য ভালো।

একটা পোড়ো দেউড়ির ইঁট পাওয়া গেল খুব সস্তায়। গাঁয়ের মাঝখানে

অনেক বছর থেকে জমিদার রুদ্রনারায়ণ সিংহের দেউড়ী পড়ে আছে। কেউ বাস করে না। কেন? সে অনেক ইতিহাস। বাড়ীর মালিকরা কেউ বেঁচে নেই। একটা চাকর মালিকানা পেয়েছে। সে সহজেই ইট বিক্রি করতে রাজী হলো। ডুবো কড়ির মুষ্টি-লাভ। এ ঘরে ত কেউ বাস করবে না। ইট বেচে যা পাওয়া যায়। ইট নয় শুধু, কড়ি বরগা সুদ্ধ সে বেচে দিলে একদম মাটির দরে।

দিন সাত পরে বাংলো তৈরীর জন্য মিস্ত্রী মজুর এসে হাজির হলো।

সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সাহেব ফিরলেন না। আমিনদের শহরে পাঠিয়ে দিলেন।

"বাংলো তৈরী করেন ক্ষতি নেই কিন্তু ঐ বাড়ীর কড়ি বরগা আপনি নিতে পারবেন না।" গণি সেই সময় বলেছিল।

—কেন?

গণি জবাব দিলে, "কেন? আপনি গাঁয়ের সব লোককে জিজ্ঞেস করেন, ওই বাড়ীর জিনিস নিয়ে কেউ সুখী হয় নি। যারা নেয় তাদের কেউ না কেউ মরে। বেয়াদবী মাফ করেন হুজুর। কত খুন হয়েছে ঐ বাড়ীতে তার ঠিক নেই।"

—খুন-।

—হ্যাঁ হুজুর।

—তা ঐ সব জিনিসের সঙ্গে কী?

গণি বললে, "আপনি বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ঐ বাড়ীর ঝরা পাতাও কেউ ছোঁয় না।"

"কালা আদমী। হাঁটো।" ওটেন হেসে জবাব দিলেন।

বাবুর্চি নিরুপায় হোয়ে ফিরে গেল।

এক মাসের ভেতর বাংলো তৈরীর আর কিছু বাকী রইল না।

অন্য একদিন সাহেব সেই পোড়ো দেউড়ির একটা পালং কিনে আনলেন।

গণির কিছু বলতে সাহস হল না আজ। যদি সাহেব রেগে যান।

সাহেব পরদিন শহরে ফিরে গেলেন। বর্ষা নেমেছে, গাঁয়ে থাকা আর পোষায় না।

আপাততঃ বাংলোয় চাবি দেওয়া রইল।

অনেক দূর হতে দেখা যায় ওটেন সাহেবের বাংলো। মাঠের মাঝখানে যেন একটা পায়রা বসে আছে।

আবার শীত পড়তেই ওটেন বাংলোয় ফিরে এলেন। সমস্ত শীত তিনি

এখানে কাটাবেন।

বাংলোর ঘরগুলো বেশ ভালো। চমৎকার আলো-বাতাস খেলে।

এই নির্জন মাঠের মাঝখানে সাহেবের সাথী গণি আর তার ফুপোতো-ভাই রশীদ।

রশীদের চেহারা ভালো। মোটাসোটা। দেখলে ছাতুখোর দারোয়ান মনে হবে। সাহেব তাই তাকে রেখেছেন। বিপদে আপদে এমন লোকের দরকার আছে বৈকি!

রাঁধা-বাড়ার কাজ গণির। রশীদের কাজ নেই বললেই হয়। তবে সে সাহেবের হুকুমের উপর হাজির থাকে। সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে শিকারে যায়।

মিস্টার ওটেনের শাক-সব্জির বাগানে খুব ঝোঁক। মজুর দিয়ে প্রায় ছ'কাটা জায়গা মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। এই শীতের সময় পুঁই-বেগুন ইত্যাদি ফলবে ভালো।

বাগানের ছোটখাটো কাজে সাহেব নিজেই লেগে থাকেন।

অলস অবসর-ভরা দিন। মাঝে মাঝে সাহেব শিকারে বেরোন। তাও দৈবাৎ। বেশীর ভাগ সময় তাঁর কাটে সস্তা গল্প পড়ে, বাগান তদারক করে।

এমনিভাবে সেই শীত কেটে গেলো। আরো তিন তিনটি শীত তারপর।

এই চৈত্রে আকাশে মোটে মেঘ দেখা গেল না। এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। চাষীরা হাহাকার করতে লাগল। সমস্ত ফসল শুকিয়ে গেল। দেশে অজন্মা।

গণি ও রশীদের সংসারে টানাটানি এমনভাবে কখনো দেখা দেয়নি। এক বেলা এক সন্ধ্যে খেয়ে তার ছোট ভায়েদের দিন কেটেছে। জাম-জায়গা নেই, যে বন্ধক রেখে চড়া দামের ধান-চাল কিনবে। মেহনতের উপর সব। জিনিসের দাম বেশী। কোথা থেকে কী জুটোবে?

কোন রকমে সেই ক'মাস কাটল।

শীত পড়তে আবার ওটেন গাঁয়ে ফিরে এলেন। সাহেবের কাছে গণি রশীদের অনেক ধার। এই অজন্মার দিনে সাহেব ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। কিন্তু এত ধার তারা নিয়েছে যে, পাঁচ-সাত বছরে চাকরি করে শোধ দেওয়া সম্ভব নয়। গণি আবার শুধু নিজের জন্য ঋণ করে না, অন্যান্য চাষীদেরও সে টাকা দিয়েছে।

ওটেনের দিনগুলো ভালই কাটছিল।

কিন্তু দিন কয়েক থেকে নতুন জুলুম তাকে সহ্য করতে হচ্ছে।

গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে গণি ও রশীদ চিৎকার করে ওঠে। কাঁচা ঘুম

ভাঙায় বিরক্ত হলেও সাহেবকে টর্চ আর পিস্তল নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে হয়। জিজ্ঞাসাবাদে বিরক্ত হন আরো বেশী।

তারা দু'জনেই বলে, "হুজুর, একটা কালো ছায়া ঘোড়ায় চড়ে এই পথ দিয়ে যায়—আমরা দেখেছি। মাঝে মাঝে সে ঐখানে ঘোড়া রেখে আমাদের কামরায় ঢুকে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।"

সাহেব বিশ্বাস করেন না। ভীরু কাপুরুষ বলে গালিগালাজ দেন।

আগে দু-একদিন ছাড়া ঐ ব্যাপার ঘটত।এখন রাত্রে একবার কেন, মাঝে মাঝে দু-বারও অগ্নি হতে দেখা যায়।

বারে বারে সাহেবের ঘুম ভাঙে।

ভয়ে গণি-রশীদ আর অন্ধকারে ঘুমোয় না।

যথারীতি একদিন তারা চীৎকার করে উঠেছে। সাহেব বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে সাড়া দিলেন না। পরে যখন চিৎকার ক্রমশ বাড়তে লাগল, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না- তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ আর পিস্তল হাতে তাদের দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"কে-কোথা কী হয়েছে?

ওটেন সাহেব এখন ভালো বাংলা বলেন।

"ঐ শুনুন হুজুর, ঘোড় দৌড়ের টক্ টক্ টক্ শব্দ।"

"গণি, কোন্ দিকে ঘোড়াটা ছুটে গেল?"

"ঐ দিকে" গণি আঙুল বাড়িয়ে দেখালে।

"আচ্ছা চলো, দেখি জিনিসটা কী?"

" তা পারব না হুজুর। ওদের সাথে বেয়াদবী। ওরা হাওয়া বাতাসে মিশে থাকে।"

"চুপ কর। চল্ আমার সাথে।"

সাহেবের মেজাজ একদম আগুন।

গণি-রশীদ মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, "হুজুর হাওয়া বাতাসের সাথে আড়ি করব?"

—ফের কথা। ফিন বাত্।"

গণি-রশীদ আর কথা বলতে সাহস করল না। সাহেবের পিছু-পিছু চলতে লাগল।

"আওয়াজটা কোন্ দিক থেকে আসছে? ওটেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

-হুজুর পূব দিক থেকে।

ওটেন সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। কান পেতে শুনে মন্তব্য করলেন। "পশ্চিম দিক থেকে। ঐ শোনো।"

রশীদ আপত্তি জানিয়ে বললে," পূর্ব দিক থেকে।"

সাহেব কারো কথা না শুনে পশ্চিম দিকে পথ ধরলেন।

টক্ টক্ টক্।

শব্দের সোজাসুজি ধীরে পা ফেলে সাবধানে ওটেন এগোতে লাগলেন। পাড়াগাঁর সড়ক নয়। ভিটের আঁস্তাকুড়, ছোট খাট বন-বাদাড় তাকে ভাঙতে হোলো। নিশুত রাত। একটা পাখিও জেগে নেই। শুধু সেই শব্দ: টক্ টক্ টক্।

আওয়াজটা যত কাছে মনে হয়, রশীদ-গণি তত ভয় পায়। সাহেবকে বলে,"কাজ নেই, ফিরে যাই চলুন।"

এই জায়গায় তিন চারটে পুরানো ঝাকড়া বটগাছ ডালপালা মেলে জায়গাটাকে অন্ধকার করে তুলেছে। মাঝ দিয়ে দুটো খেজুর গাছ, টর্চের আলোয় সাহেব দেখলেন। আওয়াজটা তারই ভেতর থেকে আসছে।

গণি রশীদ সাহেবের সামনে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

"হুজুর, দেখে কাজ নেই। ভূত-প্রেতের সাথে আড়ি করে ক'দ্দিন বাঁচব ?"

সাহেবের ধমকে তারা চুপ করে যায়।

ওটেন চারদিকে টর্চ মেরে বটগাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলেন।

আওয়াজ আসছে, কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ে না।

ঘোড়াটা কী গাছে উঠল ? সাহেব মনে মনে ভাবেন।

হঠাৎ টর্চের মুখে দেখা গেল, একটা মানুষ খেজুর গাছের কাছাকাছি মোটা বট-ডালের উপর দাঁড়িয়ে।

মানুষ কি না সাহেবের সন্দেহ হোলো। তাই গণিকে ডেকে বললেন,"দেখো গণি, গাছের উপর একটা লোক মনে হচ্ছে।"

গণি বিশ্বাস করল না। তবু টর্চের আলোয় সে দেখতে লাগল। কৈ সে ত কিছু দেখতে পায় নি। সাহেবকে বললে, "হুজুর আমার চোখে কিছু ঠেকে না।"

রশীদ এগিয়ে এলো।

তারও মুখে ঐ কথা। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে,"কৈ হুজুর ? ওরা যে হাওয়া বাতাসে মিলিয়ে যায় !"

টক্ টক্ শব্দটা আর নেই।

সাহেব বললেন, "ওটা নিশ্চয় মানুষ।"

গণি ও রশীদের উল্টো মত।

সাহেব ভয়ানক রেগেছিলেন, বললেন, "আমি তবে গুলি ছুঁড়ি।" তারপর এক হাঁক।

—এই—কে আছিস গাছের উপরে?

আর গুলি ছুঁড়তে হল না।

উপর থেকে জবাব এলো, "কে গুলি ছুঁড়বে হে। গাছের উপর লোক দেখতে পাওনা?"

সাহেব রেগে বললেন, "নেমে আয়। কী কচ্ছিস ওখানে?"

—আমি খেজুর গাছে রস নিতে এসেছি।

—নেমে আয়, তারপর অন্য কথা।

লোকটা গাছ থেকে নেমে এলো। হাতে তার একটী কলসী ও কাটারী।

—এই ব্যাটা, এত রাত্রে গাছে উঠেছিস কেন?

লোকটা এই গাঁয়েরই। তার নাম শেখ। গণি তাকে চেনে, বললে, শেখ, এত রাত্রে গাছে উঠেছিস, ভয় নেই?"

শেখ সাহেবকে দেখে একদম জড়সড় হয়ে বললে, " গরীব মানুষ, হুজুর। গাছের রস চুরি হয়ে যায় বলে একটু রাতারাতি এসেছিলুম। রাত ঠাহর করতে পারিনি। একটা কাঠ্-ঠোক্‌রা পাখী ঐ দিকে বাসা করছে। আপনাদের গোলমালে তার ঠক্‌ঠকানি এই মাত্র থামল। আপনাদের কথা শুনে চুপ করে মজা দেখছিলুম।"

সাহেব ম্লান হাসি হাসলেন। পরক্ষণে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, " এই গণি, শোন। ভূত না হাতি। ব্যাটারা ভয়ে তিন চার হপ্তা ঘুমোতে দেয় নি।"

সেদিন যখন তারা বাংলোয় ফিরল তখন রাত শেষ হোয়ে গেছে।

বাংলোতে আর গোলমাল নেই।

তবে ওটা ভুতুড়ে-বাড়ী বলে, গাঁয়ে বদনাম রটেছে।

ওটেন সাহেবের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। রাত্রি আটটা না বাজতে বাজতেই ঘুমোতে গেলেন। বেশীক্ষণ সাহেব ঘুমোননি, হঠাৎ একটা কাতরানি শব্দ তিনি শুনতে পেলেন, "উঃ আর পারিনে- ইটে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে আসছে।"

কে এত রাত্রে এমন করে কাত্‌রায়?

খুব বেশী দূর থেকে ও শব্দ আসছে না।

তবে ব্যাপার কী?

শরীর খারাপ। ভাবতে-ভাবতে তবু মিঃ ওটেন বিছানায় উঠে বসলেন।

"উঃ, আর পারিনে, আমাকে বাঁচাও।" খুব চাপা গলার শব্দ। আওয়াজটা যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

ওটেন সাহেব দেওয়ালের কাছে গেলেন। কান পেতে শুনলেন, সত্যি দেওয়াল চিরে যেন শব্দ আসছে।

কোন লোক কী অমন করে অন্যদিকের দেওয়াল থেকে কাতরাচ্ছে?

সাহেব টর্চ জ্বেলে তাড়াতাড়ি তখনই বাইরে গেলেন।

কেউ কোথাও নেই। বাংলোর এই দিকটা একদম ফাঁকা। শুধু একটা ছোট শিউলী গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উঃ- আর পারি নে-। আবার সেই কাতরানির শব্দ।

বাইরের দেওয়ালে ওটেন কান পাতলেন। মনে হল তাঁর ঘরের ভেতর থেকে শব্দ বেরুচ্ছে—উঃ আর পারি নে— মা—মা।

সাহেব তখনই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কৈ—কেউ ত ঘরে নেই।

ওটেন বাইরে যান আবার ঘরে আসেন। এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটল। মাঝে মাঝে সেই কাতরানি শব্দ। ঘুম আসতে চায় না।

গণি আর রশীদকে সে রাত্রে তিনি তুললেন না, পাছে এ-সবে তাদের ভয় বাড়ে। একে যা ভীতু ওরা।

পরদিন সকালে ওটেন রাত্রের ঘটনা গণিকে বললেন।

গণি আঁৎকে উঠল। "হুজুর, গরীবের ছেলে আর বোধ হয় বাঁচব না। আবার ভুত-পেরেত আমাদের পিছু নিয়েছে।"

সাহেব ভয় না পেলেও মনে তাঁর খট্‌কা লেগেছিল। এমন জ্যান্ত-জ্যান্ত ঘটনাকে ত মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

তবু গণিকে ভরসা দিয়ে বললেন," আরে ও-সব বাজে কথা। হয়ত আমার শোনাই ভুল হয়েছে।"

রশীদের মতো সাহসী লোকও শুনে ভয় পেলে।

পরদিন রাত্রে আবার সেই কাতরানি শব্দ।

গনি আর রশিদের কথা তার মনে পড়ল। ওরা হাওয়া বাতাসে মিশে থাকে। সত্যিই কী ভূত বলে কিছু আছে?

সাহেবের ভয় হয় বৈ কি।

তৃতীয় দিন রাত্রে সাহেবের বেশ ভয় লাগল। তবে মনের জোর তার খুব। সহজে দম্‌বার পাত্র তিনি নন।

মিঃ ওটেন গণি আর রশীদকে চিৎকার করে ডাকলেন।

গণি জবাব দিলে,"আসছি, হুজুর।"

একটা লণ্ঠন হাতে পাঁচ মিনিটে সে সাহেবের ঘরে এলো।

—কী হুজুর?

—এ শোন্।

তারা দুজনে কান খাড়া করলে। দেওয়ালের ভেতর থেকে যেন চাপা গলার কাতরানি শোনা যায়।

গণি ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সাহেব তাকে ধমক দিয়ে পরে বললেন, এই—রশিদ কোথা?

—হুজুর, সে গায়ে গেছে, কাল সকালেই আসবে।তার মার অসুখ।

—তোমার যদি ভয় হয় আমার ঘরে শোও।

ওটেনের হুকুম।

আসলে সাহেবের ভয় লেগেছিল। একা শুতে তারও ভয়। তবে গণির কাছে তিনি ব্যাহাদুরী নিলেন—কোন কিছুতেই তার ভয় হয় না।

পরদিন গাঁয়েরই একজন লোকের কথায় ঘটনাটা জল হোয়ে গেল।

লোকটার নাম শুকুর কামার। লোকে বলে লোহা পিটে সে মানুষ করতে পারে। এমন পাকা হাত।

মাঝে মাঝে সে বাংলোয় আসে। গণির গাঁয়ের লোক। আর সাহেব দেখার শখও তার আছে।

সাহেবকে শুকুর নিজে বললে,"হুজুর, আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি। যে বাড়ীর ইট কিনেছিলেন সেই বাড়িতে এক ঘটনা ঘটেছিল।"

কি ব্যাপার? ওটেন জিজ্ঞেস করলেন।

তবে শুনুন, "ঐ বাড়ীর সেজ জামাই খুব বড়লোকের ছেলে ছিল। পরে তার বাবা নানা দোষে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। বনিয়াদি ঘর। তাই দেখে গরীব হলেও এই গাঁয়ের জমিদার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সেখানে। এক বছর পরে কী এক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শ্বশুর-জামাইয়ে ঝগড়া হয়ে গেল। জমিদার রুদ্র নারায়ন সিং—যার প্রতাপে থরোথরো সবাই কাঁপতো, সে কী কারো তোয়াক্কা রাখে। জামাই ত তুচ্ছ। ষড়যন্ত্র ঠিক হোয়ে গেল। রাত্রে তাকে খুন করতেই হবে। ঢালী সড়কীওয়ালার অভাব নেই। জমিদারের হুকুম। জমিদারের মেয়েটি সব জানতে পারলে। স্বামীকে বাঁচানো চাই-ই। কিন্তু বাঁচাতে পারলে না। খিড়কীর পথে পালাবার সময় তারা দুজনেই ধরা পড়ে গেল। রাত্রে কতো রাজমিস্ত্রী এলো। শ্বশুরের সম্মুখে জামাইয়ের জীবন্ত

শরীরের উপর গাঁথা হল গম্বুজের ভিত। অনেকে শুনেছে আজো সেই জামাই অমনি করে কাতরে বেড়ায়। অমন মরণ কোন দুষমনেরও না হয়।

শুকুরের কাহিনী অদ্ভুত। সাহেব চুপ করে শুনলেন মাত্র, কিছু বললেন না।

এমন হওয়া স্বাভাবিক। সাহেবের মনে এ কথা জাগলেও তার সন্দেহ ঘুচল না।

পরদিন রাত্রে কাতরানির শব্দ শোনা মাত্র তিনি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে উঠে পড়লেন। আজ ভাল ভাবেই সাহেব ব্যাপারটা এস্পার -ওসপার করে ছাড়বেন।

ওটেন সাহেব বাইরে এসে দেখলেন, একটা লোক কাৎরাতে কাৎরাতে বাংলোর সীমানা ছেড়ে গাঁয়ের বন বাদাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

ওটেনের সাহস হোলো।এই গোলক ধাঁধাঁ তাকে ভেদ করতেই হবে। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে।

ভয় কি ? গুলি ভরা পিস্তল হাতে। কে কী করতে পারে তাঁর ? সাহেব তাড়াতাড়ি বাংলো ছেড়ে সেই মুর্তির পিছু নিলেন। টর্চের আলো ফেললেন। বেশ দেখা গেল—সমস্ত গা-মাথা কাপড়ে ঢাকা একটা লম্বা মানুষের মূর্তি এগিয়ে চলেছে, আর "উঃ পারিনি" বলে কাৎরাচ্ছে।

ওটেন পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। বেশ জোরে হাঁটছেন তিনি তবুও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। ভারী লম্বা লম্বা পা ফেলছে সেই সাদা মূর্তিটা।

মিনিট কুড়ি চলার পর তারা যে জায়গায় এসে পৌঁছল, সেখানে অন্ধকার ঘন, এত জোছনা রাতেও আলো ভালো করে খেলছে না। দুদিকে মোটা তেঁতুল গাছের সারি, তার পাশে পাশে ছোট ছোট ডোবা। অনেক দূর প্রায় এক শ' গজ এমনি পথ চলেছে। গাছের ফাঁক নেই কোথাও।

ওটেন খুব জোরে হাঁটছিলেন। তিনি প্রায় মূর্তিটার কাছাকাছি এসে পড়েছেন। আর হাত কুড়ি বাকী।

হঠাৎ তাঁর টর্চ নিভে গেল। সাহেব ভয় পাওয়ার বান্দা নয়। নিভলই বা আলো। পূর্ণিমা চাঁদের আলোয় জায়গাটা খুব অস্পষ্ট হোলেও আশ পাশের লোকজন দেখা যায়। পিস্তল হাতে আছে—ভয় বা কিসের ? নতুন ব্যাটারী ভরা আলোটা হঠাৎ কেন নিভল—সেইটুকু যা সাহেবের মনে খটকা । তা ছাড়া মনে তাঁর অন্য কিছুর খটকা নেই।

ওটেন পিস্তল উঁচু করে সাদা মূর্তিটার পেছনে চলতে লাগলেন। বেশ জোরে তিনি হাঁটছেন, মূর্তিটার গতি এখন কিছুটা ঢিলে।

আর মাত্র পাঁচ হাত বাকী তাদের ব্যবধান। এমন সময় ছায়ামূর্তিটা ঘুরে পড়ল এবং গোঁ-গঁ-গঁ শব্দ করে তার লম্বা হাত বাড়াতে লাগল। বেশ লম্বা হাত। সাধারণ মানুষের চার গুণ হবে।

ওটেন হটবার পাত্র নন।

কিন্তু মূর্তিটার কী উদ্দেশ্য কে জানে। সাহেবের গলার সোজাসুজি হাত বাড়াতে লাগল।

ওটেনের ভয় হয়। যে অন্ধকার, হয়ত এটা প্রেত। শেষে কী প্রাণ যাবে! সাহেব পিছু হটতে লাগলেন।

ছায়া মূর্তির মুখ তার দিকে। হাত তার বেড়েই চলেছে।

হটতে হট্‌তে সাহেব হঠাৎ গাছের পিছু-ধাক্কা খেয়ে পড়েন আর কী। আর তিনি পেছুতে পারেন না। পেছনে মোটা তেঁতুল গাছ। সেই গাছটায় ঠেস দিয়ে তিনি তাঁর শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবেন কী আর—সেই মূর্তিটার হাত তাঁর গলা থেকে মাত্র আর তিন হাত বাকী।

সাহেব পিস্তলের ঘোড়া টিপলেন। কোন আওয়াজই হল না। আবার টিপ্‌বার পূর্বেই সেই ছায়া-হাত দুটো ওটেনের গলা শক্ত করে কষে ধরল। আর নড়বার শক্তিও তাঁর নেই। দম তাঁর বন্ধ হোয়ে আসছে।

আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—ওটেন সাহেব চিৎকার করতে করতে সেইখানে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে সাহেবের হুঁশ হোল।

মিঃ ওটেন পাশের একটি ছোট খাদে পড়ে আছেন। সমস্ত গায়ে তার কাদা। প্যান্ট-কোট ভিজে গেছে। পৌষের হিমে জমে যাওয়ার উপক্রম। পাশে পড়ে ছিল তাঁর রিভলবার।

সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

পিস্তলটা নাড়াচাড়া করে ঘোড়া-টিপা মাত্র শব্দ হল, দুড়ুম দুড়ুম।

টর্চ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পিস্তল পকেটে, কাদামাখা টলতে টলতে সাহেব বাংলোয় ফিরে এলেন।

তখনো গণি-রশিদ ঘুম থেকে ওঠেনি।

সাহেব তাড়াতাড়ি কাদামাখা প্যান্ট আর কোট সুটকেশে পুরে রাখলেন। কেউ না দেখে ফেলে।

বেলা আটটায় সাহেবের ঘুম ভাঙল। গণি ঘরে ঢোকা মাত্র ওটেন বললেন, “গণি আজ রান্না থাক্। আমি এখনই শহরে যাব।”

—কেন হুজুর?

—এখানে আমার শরীর ভাল থাকছে না।

ইস্টিশান মাইল খানেক দূরে। গণি ও রশিদ মিঃ ওটেনকে গাড়িতে তুলে দিতে গেল।

—পথে রেজেস্টারী আপিস পড়ে। তার সামনে এসে সাহেব বললেন, "এখানে কাজ আছে।"

—কী কাজ স্যার? গণি জিজ্ঞাসা করলে।

ওটেন সাহেব বললেন, "গণি——রশীদ—তোমরা শোন। তোমাদের আমি খুব স্নেহ করতুম। তবে এ গাঁয়ে আর আসব না। আমার বাংলো আর জমিগুলো তোমাদের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে যাবো। কিন্তু একটি কথা, এ বাংলোয় তোমরা কখনো কেউ রাত্রে শুয়ো না। খবরদার। ভারী কষ্ট পাবে।"

রশীদ ও গণি কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে, "হুজুর, সব ছাড়তে পারি, আপনাকে ছাড়তে পারি নে।"

মিঃ ওটেন অতি কষ্টে তাদের থামালেন।

এক ঘন্টার ভেতর দলিল লেখাপড়া ইত্যাদি হোয়ে গেল।

ওটেন সাহেব চলন্ত গাড়ির জানালা থেকে শেষবারের মতো গাঁয়ের মুখ একবার দেখে নিলেন।

গভীর রাত্রি।

ওটেন সাহেবের বাংলো থম্‌থম্‌ করছে। অন্ধকার। ঘন কুয়াশা চারদিকে। হঠাৎ তার মাঝ থেকে বিকট হাসির রব শোনা গেল। হি-হি-হি-হু-হু-হে-হে-হে।

কিন্তু সত্যি কী ভুতের হাসি?

কেউ যদি সেই নিশুভ রাতে বাংলোর সীমানায় ধীরে ধীরে ওটেনের কামরার শার্সি তুলে দেখত, তার চোখে পড়ত; ডিপো জ্বলছে কামরায়। আর একটা খেজুর রসের কলসী ঘিরে চারজন জীবন্ত লোক বসে আছে। সবাই রস খেতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ঐ বিকট হাসি। হি-হি-হি-হু-হু-হো-হে-হে।

চারজনই আমাদের চেনা লোক।

পয়লা নম্বর—শুকুর কামার।

দুনম্বর—শেখ।

তিন নম্বর—গণি।

চার নম্বর—রশীদ।

ক্বী রস খাওয়ার ধুম সকলের।

গণি এক ঢোক রস গিলে হাতের গেলাসটা শেখকে দিতে দিতে তবে পিঠ থাপড়ে বললে, "কী বাবা কাঠ্-ঠোকরা পাখি, ভাল আছো—?"

শেখ। (গলাটা যথাসম্ভব সরু করে) হ্যাঁ ভাল আছি। চ্যা-চ্যাঁ-চ্যা। আর একটু পাখির ডাক ডাকি মনের সুখে। আহ্।

শুকুর হেসে উঠল।

রশীদকে সে বললে, তুমি ত বাবা একদম জমিদারের জামাই।

গণিও হাসে। বলে, "শুকুর বাবা আমাদের খাসা মাম্‌দো ভূত।"

হি-হি-হি-হু-হু-হু-হি-হো-হো।

—এই শুকুর কামার যে সে নয়। দেখলে, কেমন নকল পিস্তল গড়েছিলুম। ব্যাটা যখন অজ্ঞান হেয়ে গেলো তখন সেই জায়গায় ভালো পিস্তল রেখে নকলটাকে একদম জলে ফেলে দিয়েছি।

শুকুর ঢোক গিলে আবার, বললে, "আমার কিন্তু একটা ভয় হোয়েছিল—যদি ভুল করে তোমরা আসল পিস্তল সরিয়ে না রাখো, আমার দফা কুপোকাৎ হবে। কিন্তু গণি বাবাজি পাকা লোক।"

গণি জোরে হেসে উঠল। শুধু তাই?

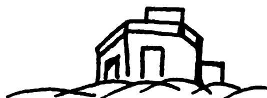
—টর্চ ভাল থাকলে তুমি সাহেবের কাছে এগোতে পারতে, কামারের পুত্র? শুকুরের মুখের দিকে চেয়ে গণি বললে, "আমি পুরাতন ব্যাটারী ভরে রেখেছিলাম, যেন বাতিটা বেশীক্ষণ না জ্বলে।"

তিনটি হাতের থাপড়ানি এক সঙ্গে গণির পিঠের উপর গিয়ে পড়ল।

বাহ্ ভাই, বাহ্ ভাই!

তখনই সকলে গণিকে কাঁধে তুলে ধেই ধেই নাচতে লাগল আর সঙ্গে হৈ হৈ গান—

হৈ হো হৈ হো
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া
ওটেন সাহেব ভাগ গিয়া
বাংলো হামারা হো গিয়া
হৈ হৈ হৈ হো
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!





হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি

হাসান আজিজুল হক

তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমদের গাঁয়ে দু'জন ডাক্তার ছিলেন। একজন হোমিওপ্যাথ আর একজন এ্যালোপাথ। গাঁয়ের লোক ঠিক ঠিক বলতে পারতোনা —একজনকে বলতো হেমাপ্যাথি আর একজনকে বলতো এ্যালাপ্যাথি। দু'জনের চিকিৎসার ধরন ছিল বাঁধা। ওষুধ দিতেন একরকম।

হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তারের কাছে গেলেই একটুখানি সাদা ময়দার মতো গুঁড়োতে দু'তিন ফোটা স্পিরিট টপ টপ করে ফেলে তিন চারটি পুরিয়া করে দিতেন। খেতে ভালোও লাগতো না, মন্দও লাগতো না। কখনো কখনো

আবার স্রেফ টিউবওয়েলের পানিতে দু'তিন ফোটা স্পিরিট মিশিয়ে দিয়ে বলতেন, যা খাগে যা।

ওষুধ হাতে নিয়ে, আমি হয়তো ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসতাম, ডাক্তারবাবু ভালো হবে তো? অঘোর ডাক্তার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠতেন, ভালো হবে না মানে? ভালো হয়ে উপচে' পড়বে। যা, ওষুধ খাগে।

আমি বলতাম, পেটের মধ্যে যে কেমন করে সব সময়।

করবে না? যা, আরো বেশি করে কাঁচা আম খাগে নুন মরিচ মাখিয়ে।

আমি বলতাম, পেটের ভেতর গরগর করে।

ও কিছু না, ব্যাঙ হয়েছে তোর পেটে।

ওরে বাবা ব্যাঙ হয়েছে আমার পেটে! গোঁগোঁ শব্দ হয় যে ডাক্তারবাবু।

ও কিছু না—ব্যাঙ ডাকে গোঁগোঁ করে। আমার ওষুধ যেই এক পুরিয়া খাবি, দেখবি তখন ব্যাঙের লাফানি।

কি করে দেখবো? ব্যাঙ যে পেটের ভেতরে।

অঘোর ডাক্তার তখন বলতেন, ওরে বাবা, দেখবি মানে বুঝবি। বুঝবি ঠেলা।

এই হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের এক নম্বর ডাক্তার অঘোরবাবুর কথা।

এই বার দুই নম্বর তোরাপ ডাক্তারের কথা বলি। আগেই বলেছি, ইনি ছিলেন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। কি করে যে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন, কেউ জানে না শোনা যায় বাল্যকালে তিনি নাকি এক বড়ো ডাক্তারের হুঁকো সাফ করতেন। সে যাই হোক, তোরাপ ডাক্তারের একটা ছোট্ট শেয়ালে রঙের বেতো ঘোড়া ছিল। তার সামনের পা দুটি ছাঁদনা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো প্রায় সময়। এই বাঁধা পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গাঁয়ের আশে পাশে চরে বেড়াতো ঘোড়াটা। কারো ক্ষতি করতে দেখিনি কোনদিন।

বাইরের গাঁয়ে 'কল' থাকলে তোরাপ ডাক্তার ঘোড়াটার পিঠে একটা চটের বস্তা চাপিয়ে তার ওপর বেশ জুৎ করে বসতেন। তিনি নিজে জুৎ করে বসতেন বটে, কিন্তু ডাক্তারের দেহের চাপে ঘোড়াটার শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যেত। তারপর হটর হটর করে সেই বেতো ঘোড়া মাঠের মধ্যে দিয়ে আলপথ ধরে রুগীর গাঁয়ের দিকে এগোত।

তোরাপ ডাক্তারের দেহের কাঠামো ছিলো বিরাট—কিন্তু কেমন যেন লোনা ধরা পুরানো ইটের বাড়ির মতো। সারা দেহটা তাঁর হলবল নড়বড় করছে। ইয়ামোটা চওড়া হাতের কব্জি—এই চওড়া মুখ; গালের উপরের দিকে দুই উঁচু হাড় যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। তাঁর গায়ের চামড়া ছিলো খসখসে,

চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, ধ্যবড়া পা জোড়া ছিলো ফাটা। লোহার ডান্ডার মতো শক্ত কালো কালো মোটা মোটা আঙুল। দেখলেই পিলে চমকে যেত। লোকে বলতো, তোরাপ ডাক্তারকে দেখলেই রোগ পালায়। তা ঐ রকম চেহারা দেখলে কি আর রোগ থাকতে পারে?

তোরাপ ডাক্তার খালি ডাক্তারিই করতেন না কিন্তু। নিজের হাতে হালচাষ করতেন। বর্ষা আর শীতের সময় ডাক্তারির ধার ধারতেন না তিনি। বর্ষাটা হচ্ছে চাষবাসের সময় আর শীতকালটা হচ্ছে ফসল কাটার মরশুম। এই দুই মরশুমে তোরাপ ডাক্তার সারাদিনই থাকতেন মাঠে। নিজের একজোড়া রোগা বুড়ো বলদ দিয়ে জমি চষছেন, না হয় নিজের হাতে ধান রুইছেন। এই সময় রুগী মরে গেলেও তোরাপ ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না।

বর্ষা আর শীতে গাঁয়ের লোকদের রুগী হয়ে শুয়ে থাকার কোন উপায় নেই। ওই দুই সময়ে কাজ করতে না পারলে পেটে ভাত জুটবে না। কাজেই রোগটোগ সব শিকেয় তুলে রেখে দিতে হতো তাদের বাধ্য হয়ে। তারপর শরৎকাল এলে তোরাপ ডাক্তারের মোটামুটি অবসর হতো আর গাঁয়ের লোকদেরও রুগী হয়ে শুয়ে থাকার একটু- আধটু মওকা মিলতো

এই সময়ের জন্যই যে ওৎ পেতে থাকতো ম্যালেরিয়া জ্বর। বাঘ যেমন গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের টুটি কামড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে ম্যালেরিয়া জ্বর এসে গাঁয়ের গরীব লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এটা ঘটতো আশ্বিন মাস থেকে। ম্যালেরিয়ার মতো বাঘা জ্বর তখন আর কিছু ছিল না। ঘরে ঘরে মানুষ ছেঁড়া কাঁথা, ন্যাকড়া, ত্যানা গায়ে চাপিয়ে কোঁকাতো। আর সে কি কাঁপুনি। কাঁপুনি থামাবার জন্যে পাথরের জাঁতা পর্যন্ত গায়ে চাপাতে দেখেছি।

এই সময়টায় ছিলো তোরাপ ডাক্তারের মজা। ঘরে ঘরে লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে ধুঁকছে। চিকিৎসার জন্যে তোরাপ ডাক্তার ছাড়া গতি নেই। ম্যালেরিয়া পুরনো হয়ে গেলে কিছুতেই সারতে চায় না। পেটের মধ্যে পিলে উঁচু হয়ে ওঠে, হাত পা হয়ে যায় প্যাঁকাটির মতো সরু। তোরাপ ডাক্তারের এই রকম অনেক পিলে ওঠা পুরনো ম্যালেরিয়া রুগী ছিলো।

রোগের আর একটা সময় ছিলো চোত বোশেখ মাস। এই সময়টায় কলেরা আর বসন্ত হয়ে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত। গাঁয়ে কলেরা লেগেছে শুনলে আনন্দে তোরাপ ডাক্তারের চোখ চকচক করে উঠতো। ম্যালেরিয়া আর কলেরার সব রুগী তোরাপ ডাক্তারের। এখানে অঘোর ডাক্তারের কোন ভাগ ছিলো না। জ্বর হলে, সর্দি হলে, বেশি খেয়ে বা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পেট ছেড়ে

দিলে লোক অঘোর ডাক্তারের কাছে যেত। আনা দুই পয়সা দিলেই তিনি দিয়ে দিতেন দুই তিন পুরিয়া ওষুধ। পয়সা দিতে না পারলে ধারেও দিতেন। এমন কি একটা লাউ বা দুটো শশা নিয়ে গেলেও তিনি রুগী ফেরাতেন না।

অঘোর ডাক্তারের চাষবাসও ছিল না, ভিনগাঁয়ে কলে যাবার ঘোড়াও ছিল না। হোমিওপ্যাথি ওষুধ রাখার জন্য একটা কাঠের বাক্স ছাড়া চিকিৎসার সরঞ্জাম বলতে আর কিছুই ছিল না তাঁর। তবে ও রকম বাক্যবাগীশ লোক লাখে একটা মিলবে কি না সন্দেহ।

বেলা আটটার সময় তিনি ঝকঝকে একটা পেতলের গাড়ু হাতে মাঠ থেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে রুগীদের বসিয়ে রেখেই তাঁর বৈঠকখানার উঁচু দাওয়ার একদিকে বসে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতেন, আর হাক থু হাক থু করে গলা জিভ পরিষ্কার করতেন। সারা গাঁয়ের লোক টের পেত অঘোর ডাক্তার মুখ হাত ধুচ্ছেন। একদিকে হাত মুখ ধোয়া চলছে, অন্যদিকে কথার তুবড়ি ছুটছে তাঁর মুখ দিয়ে।

তিনি বলতেন, বলি, মরতে তোরা আমার কাছে আসিস কেন বল দিকিনি। তোরাপের কাছে যা না। তা তো যাবি না— গেলে যে ব্যাটা কসাই ঘাড়টি মটকে তাজা রক্ত খাবে তোদের। বলি, একি ডাক্তারি বল দিকিনি তোরা? তুই বললি, আমার অসুখ করেছে, আর অমনি তোরাপ হয় ছুরি বার করবে, না হয় কোদাল বার করবে, না হয় কুড়াল বার করবে...

একজন রুগী হয়তো বাধা দিয়ে বললো, না না ডাক্তারবাবু, তোরাপ ডাক্তার আবার কোদাল কুড়ুল কবে বার করলে।

ঐ হলো, লাঙলের ফালের মতো ছুঁ-ওয়ালা একটা বোতল বার করলে। কি? না ইঞ্জেকশন দোব, গলা কাটবো, মারবো, ধরবো। তারপর ওষুধ চাও, দেবে তোমাকে এক বোতল পিশেচের রক্ত— ওয়াক থুঃ! যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি বিচ্ছিরি সোয়াদ— ছ্যা ছ্যা ছ্যা! আর আমাদের হোমিওপ্যাথ কি করছে? বাঘ যেমন ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে একটি পুরিয়ার আমার এই ওষুধ তোমার পায়ের আঙুলের ডগা থেকে বীজাণু বাবাজীদের খেদাতে খেদাতে মাথার চুলের ডগা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। অথচ তুমি জানতেও পারছোনা।

এই রকম জোড়ে বক্তৃতা করতেন অঘোর ডাক্তার। পয়সা কম লাগে বলেই হোক, আর বক্তৃতার জন্যেই হোক, সারা বছরই দু চারটি রুগী অঘোর ডাক্তারের কাছে যাতায়াত করতো। রুগী না পেলে তোরাপ ডাক্তার রাগে

গজ গজ করতেন, ও ব্যাটা অঘোরের সব ওষুধ আমি একবারে খাবো, আমার কিছুই হবে না, আর ও খাক দিকিনি আমার একশিশি ওষুধ, দ্যাখ কি হয়!

কেউ হয়তো জিগগ্যেস করলো, কি হবে ডাক্তার সাহেব?

একশিশি খেলে? তোরাপ ডাক্তার জিগগেস করতেন, তারপর নিজেই জবাব দিতেন, জামা কাপড় খারাপ হয়ে যাবে— গাড়ু হাতে ঘর বার করতে করতে জান নিকলে যাবে।

আপনার ওষুধে বিষ আছে সবাই জানে।

এই কথা শুনে রাগে তোরাপ ডাক্তারের মুখের চেহারা একেবারে গরিলার মতো ভয়ংকর হয়ে উঠতো। জ্ঞানহারা হয়ে চিৎকার করতেন তিনি গলা ফাটিয়ে, বিষ আছে? আছেই তো। বিষ ছাড়া ওষুধ হয় ইগনোরাণ্ট কোথাকার? নিয়ে আয় তোদের অঘোর ডাক্তারকে, একটি ডোজে তাকে চৌদ্দভুবন দেখিয়ে দেব।

সে বছর শরৎকালে ধান কেবল ডাঁসিয়ে উঠছে, ধানের ভেতর শাদা দুধ জমে চাল বাঁধছে, বেশ ঝরঝরে আবহাওয়া, আকাশ ভর্তি রোদ, একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে— এমনি সময়ে হুড়মুড়িয়ে চলে এলো ম্যালেরিয়া জ্বর। ঠিক যেন পাহাড় বেয়ে একটা পেল্লাই ভালুক নেমে এলো।

ব্যাস, ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক দমাদম বিছানা নিতে লাগলো। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় না। ম্যালেরিয়া যাদের পুরনো হয়ে গেছে তাদের তো খুব মজা। ঠিক বেলা দশটার সময় চোখে সূর্যটা একটু হলুদ হলুদ ঠেকে, তারপর গা একটু গরম হয়, চোখ দুটি সামান্য জ্বালা করে তবে তারপর হুড় হুড় করে এসে পড়ে জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে কি পিপাসা। ঘটি ঘটি পানি খেয়ে পিপাসা কমে না। পানি পেটে গিয়ে গরম হয়ে যায়, তারপর গা টা গুলিয়ে ওঠে, তারপরেই বমি। বমি হয়ে গেলেই আবার পিপাসা। আবার ঘটি ঘটি পানি খাওয়া তারপর আবার বমি। এই করতে করতে বিকেল হয়ে যায়, নীল আকাশে একটা অদ্ভুত সুন্দর আলোর আভা রেখে সূর্য ডুবে যায়। জ্বর কমে আসে আস্তে আস্তে। রাত দশটার দিকে একদম জ্বর চলে গিয়ে গা ঠাণ্ডা।

পরের দিনে আবার বেলা ঠিক দশটার সময় জ্বর-ভালুক গুঁড়ি মেরে লোকের বাড়ি বাড়ি চলে আসে। গাঁয়ের অর্ধেকের বেশি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়লো। তোরাপ ডাক্তারের আনন্দ আর ধরে না। হলুদ রঙের মতো বড়ো বিকট দাঁত বের করে এ্যাই-বড়ো সিরিঞ্জ নিয়ে, রুগীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন

তিনি। দুই পকেট ভর্তি ম্যাপাক্রিন বড়ি। সে যে কি ভয়ানক বড়ি ভাবা যায় না। রুগী যেখানেই হোক, সে মাটির দাওয়াতেই হোক আর খোলা আকাশের নীচে উঠানেই হোক বা ঘরের ভেতরেই হোক, গলায় স্টেথোটি ঝুলিয়ে ইনজেকশনের বাক্সটি হাতে নিয়ে তোরাপ ডাক্তার ঠিক হাজির। লোকেই বা আর কি করে— যেমন তেমন করে সুস্থ হয়ে না উঠলেও তো পেট চলে না। ছেলেমেয়ে খাবে কি? কষ্টে সৃষ্টে চাষবাস করে বা জন মজুর খেটেই তো সবাই কোনরকমে সংসার চালায়। কাজেই বাধ্য হয়ে তোরাপ ডাক্তারকে ডাকতেই হয়। বেচারা অঘোর ডাক্তারের গুঁড়োতে যে কোন কাজই হয় না।

সে যাই হোক, ঘরে ঘরে ঢুকেই গোদা গোদা এ্যাঁকাব্যাঁকা আঙুল দিয়ে তোরাপ ডাক্তার রুগীর কব্জী চেপে ধরে কিছুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করতেন। মুগুরের মতো সেই ধ্যাবড়া আঙুলের চাপেই রুগীর নাড়ী ছেড়ে যাবার দশা হতো। নাড়ী দেখা হলে তোরাপ ডাক্তার রুগীকে বলতেন, জিভ বার কর। তারপর সেই জিভ বার করা অবস্থাতেই আদ্যিকালের স্টেথোটা গলা থেকে খুলে খানিকক্ষণ বুক পেট দেখে বলতেন, হয়েছে, আর জিভ বার করে থাকতে হবে না, আমার বোঝা হয়ে গেছে।

রুগীর সব বলাই সাধু। হয়তো জিগগেস করলো, তবে কি ম্যালোরি' জ্বর ডাক্তার সাহেব?

তোরাপ ডাক্তার দাঁত কড়মড়িয়ে বলতেন, তাছাড়া আর কি হবে? এই যে দ্যাখাচ্ছি মজা, একটি ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার ভূত ছাড়াবো— এই বলে আশেপাশের লোকদের আদেশ দিতেন ধরোতো এটাকে চেপে, সুঁইটা দিয়ে দিই একবার। আর দুটো টাকা রাখো এখানে আমার সামনে, আমার ফি আর ওষুধের দাম। উঁহু আগে টাকা রাখো, তারপর অন্য কাজ।

এই বলে তোরাপ ডাক্তার একদিকের পকেটে টাকা দুটো ভরতেন, পকেট থেকে বের করতেন ইঞ্জেকশন দেবার সিরিঞ্জ। কি প্রচণ্ড সিরিঞ্জ আর তার ছুঁচ তো নয়, ঠিক যেন মোষের লাঙলের ফলা। লোকের গায়ে ফুঁড়তে ফুঁড়তে ছুঁচের মাথা গিয়েছে ভোতা হয়ে। সেই ভয়ানক যন্ত্র দেখেই তো রুগী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করতো। তোরাপ ডাক্তার চিৎকার করতেন, ধর ধর, ঠেসে, চেপে ধর— সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন ষণ্ডাগোছের লোক গিয়ে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরতো রুগীকে। তারপর কোমরের কাপড়ের কষিটা খুলে তোরাপ ডাক্তার মাংসের মধ্যে প্যাঁট করে ঢুকিয়ে দিতেন সেই মোটা ছুঁচ। সাথে সাথে রুগীর সমস্ত পা টা যেত অবশ হয়ে।

এই রকম করে ইঞ্জেকশন দিয়ে সে বছর শরৎকালে তোরাপ ডাক্তার দু হাতে টাকা রোজগার করতে লাগলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যত বাড়ে ততোই বাড়ে তাঁর রোজগার। ইঞ্জেকশন দিয়ে তিনি দু তিনটি লোককে তো চিরদিনের জন্য খোঁড়া করে দিলেন। তাঁর ম্যাপাক্রিন বড়ি খেয়ে কয়েকজনতো চিরকালের জন্য কালা হয়ে গেল। তবু লোকে বাধ্য হয়ে তার কাছে যেতে লাগলো। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ম্যালেরিয়ার মতো দুর্দান্ত জ্বর ঠেকানোর সাধ্য ছিল না অঘোর ডাক্তারের। তাঁর কাছে আর কেউ যায় না। এদিকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে সর্দি কাশি, হাঁপানি, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা— এইসব রোগ কোথায় যে পালালো। অঘোর ডাক্তার সকাল বেলায় বৈঠকখানার ফাঁকা দাওয়ায় বসে হক থু হক থু করে গলা পরিষ্কার করেন আর তোরাপ ডাক্তারের মুণ্ডপাত করে গালাগালি দিতে থাকেন। এক পয়সা উপার্জন নেই— একটা রুগীও এদিকে মাড়ায় না। তাঁর সংসার চলাই দায় হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কি আর করেন তিনি।

একদিন অঘোর ডাক্তার চুপিচুপি জেলা শহরে গিয়ে একটা সিরিঞ্জ আর কিছু কুইনাইন ইঞ্জেকশন কিনে আনলেন। মনে মনে বললেন, তোরাপটার বড্ড বাড় বেড়েছে। খুব দু পয়সা করে নিচ্ছিস না ? কিন্তু আমি হচ্ছি সব্যসাচী, সে খবরটা তো জানিস না তোরাপ। আমি দুই হাতে তীর ছুঁড়তে পারি। ইচ্ছে হলে হোমিওপ্যাথি করবো আবার ইচ্ছে হলে এ্যালোপ্যাথি ইঞ্জেকশন দেব। মনে মনে এইসব কথা ভেবে তিনি সিরিঞ্জের ছুঁচ কিনলেন খুব মিহি দেখে। কাউকে কোন কথা না বলে সরঞ্জাম সব কিনে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এলেন সন্ধেবেলা।

পরের দিন সকাল বেলায় মুখটি ধুয়ে দাওয়ায় কাঠের টুল পেতে কেবল বসেছেন তিনি— এমন সময় ইদরিস আলীর বাড়ি থেকে লোক এলো। ইদরিস আর তার পুরো পরিবার অনেকদিন থেকে তাঁর রুগী। শত অসুখ বিসুখে তারা কোনদিন তোরাপ ডাক্তারের কাছে যায় না, বলে হেমাপ্যাথির ওপর ওষুধ আছে নাকি ডাক্তারবাবু ? মরলে আপনার হেমাপ্যাথি খেয়েই মরবো, তবু তোরাপ ডাক্তারের হাতে জান দিতে পারবো না।

ইদরিস আলির বাড়ির লোকের কাছ থেকে অঘোর ডাক্তার শুনলেন যে গত পাঁচ সাত দিন থেকে ইদরিস নিদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ। কিন্তু তোরাপ ডাক্তারের নাম করলেই তার হুঁশ ফিরে আসছে আর তখন সে বলছে, আমি অঘোর ডাক্তারের হেমাপ্যাথি খেয়ে মরবো, কিছুতেই এ্যালোপ্যাথি চিকিচ্ছে করাবো না।

কথা শুনে অঘোর ডাক্তার মিটিমিটি হেসে বললেন, কেন রে, এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছেটা খারাপ হলো কোথায়? তোরাপ হলো ডাকাত, ও আবার ডাক্তার হলো কবে? এখন থেকে আমিই এক আধটু এ্যালোপ্যাথি করবো ভাবছি।

ইদরিসের বাড়ির লোকটা অবাক হয়ে বললো, তুমি এ্যালোপ্যাথি করবে কি গো? তুমি আবার সুঁই দেবে নাকি?

অঘোর ডাক্তার রেগে বললেন, কেন দেব না কেন? সব বিদ্যাই জানা আছে আমার বুঝলি? চিকিচ্ছেটা তোরাপের লাঙল চালানো নয়। কেমন মিহি সুঁই কিনেছি দেখবি। ইদরিসকে আজ ফুঁড়বো। তুই যা, আমি আসছি। আর শোন বাবা, দুটো টাকা আগে জোগাড় করে রাখিস। তোরাপও দু টাকা করে নেয়, আমাকে দিবি না কেন?

অঘোর ডাক্তার কুইনাইন ইঞ্জেকশন দেবেন এই খবর দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে চাউড় হয়ে গেল। গাঁয়ের যত সুস্থ মানুষ ছিলো, সব ছুটলো ইদরিসের বাড়ির দিকে। ইদরিসের মেটে বাড়ির ছোট্ট ঘরে আর তিল ধারণের জায়গা নেই— একটা লোক কোমরে চাদর জড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচাতে লাগল, এই, এই সব বাতাস ছেড়ে দাও, বাতাস আসতে দাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে। অঘোর ডাক্তার হেমাপ্যাথি ছেড়ে ইঞ্জেকশন দেবে— একি সোজা কথা!

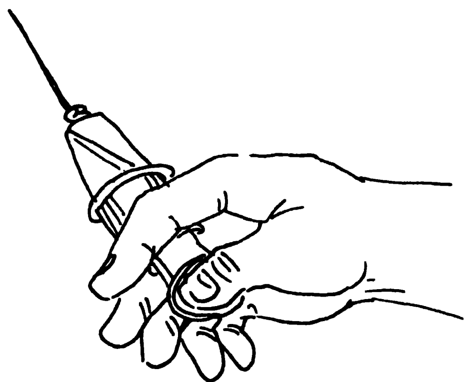
রোগা অঘোর ডাক্তার বহু কষ্টে ঘরে ঢুকে ট্যাক থেকে সিরিঞ্জ, ওষুধ এইসব বের করলেন। লোকজনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুই হাঁটু থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মুখে অবশ্য তম্বি করলেন, ভিড় কমাও, আলো আসতে দাও তোমরা।

এই কথা বলে বহু কষ্টে সিরিঞ্জের মাথায় ছুঁচ লাগালেন, তারপর ওষুধ ভরে রুগীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় জ্বরের ঘোর ভেঙ্গে জবা ফুলের মতো গোল দুটো চোখ মেলে ইদরিস বললো, ডাক্তারবাবু শেষে আপনার এই কাজ! এই বলে ইদরিস চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে রইলো। অঘোর ডাক্তার বললেন, ধর বাবা তোরা ইদরিসকে একটু ধর। চোখ না খুলেই ইদরিস বললো, কাউকে ধরতে হবে না ডাক্তারবাবু, আপনি ইঞ্জেকশান দ্যান— বরঞ্চ আপনাকে ধরতে হলে ওদেরকে বলুন।

হঠাৎ কেমন বোকার মতো অঘোর ডাক্তার হাসলেন, তারপর ইদরিসের কোমরের নিচে মাংসে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হেঁ হেঁ বড়ো মিহি কিনেছি ছুঁচটা, এই তুললাম, এই কথা বলে সকলের দিকে চেয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় আবার বললেন, হেঁ হেঁ তোরাপের কম্ম নয়, তোমরা দ্যাখো

একবার, এই তুললাম সিরিঞ্জ, এইবার এইবার— বলেই প্যাট করে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে দিলেন ইদরিসের কোমরের মাংসে। হাত কাঁপতে লাগলো তার, বার বার বলতে লাগলেন গভীর করে ফুঁড়তে হবে, গভীর করে ফুঁড়তে .... এই যা। পট করে একটা আওয়াজ উঠলো আর হাহাকার করে উঠলেন অঘোর ডাক্তার, হায় হায়, ছুঁচ ভেঙ্গে গেছে, গেল গেল, সর্বনাশ হলো হায় হায়...

ছুঁচটা তখন মাংসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অঘোর ডাক্তারের শীর্ণ দুই হাত আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটাকে। তখন কোথা থেকে একটা জোয়ান ছেলে ছুটে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে ফেললো ছুঁচটা ইদরিসের কোমর থেকে। সবাই চুপ করে আছে— ছেলেটা দাঁত থেকে খুলে হাতে নিলো ছুঁচটা, অঘোর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললো, এই যে ডাক্তারবাবু, পেয়েছি। অঘোর ডাক্তার দেখতে পেলেন না। ক্ষোভে দুঃখে তখন তাঁর চোখে অশ্রুর ঢল নেমেছে।





এড়ি ও সোহাগী

রওশন ইজদানী

এড়ি আর সোহাগী ছিল দুই সতীন। এড়ি ছিল খুব সহজ, সরল, নিরীহ। সে কোন কথার মারপ্যাঁচ বুঝত না — কেবল কাজ করত— একাই তাকে সংসারের সব কাজ করতে হতো। তার স্বামী তাকে ভালবাসত না, এড়িয়ে যেত। তাই সকলে তাকে ডাকত 'এড়ি' বলে।

আর সোহাগী ?— সে ছিল ভীষণ চালাক-চতুর ; দুষ্টবুদ্ধিতে তার জুড়ি ছিল না। নানা রকম তুকতাক সে জানত। তার স্বামী তাকে খুব ভালবাসত। লোকে তাই তাকে ডাকত 'সোহাগী' বলে। সে কোন কাজ করত না, বরং

সব সময় এড়ির উপর মাতব্বরী করত-- তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিত। এমন কি সে এড়িকে ভাত-পানি পর্যন্ত দিন না। এড়ি সবই মুখ বুজে সহ্য করত। তবুও এড়ির উপর ছিল তার বুকভরা হিংসা। সে সব সময় এড়িকে শুধু জব্দ করতে চেষ্টা করত।

এড়ি বা সোহাগীর কোনো ছেলে ছিল না--- ছিল শুধু একটি করে মেয়ে। সোহাগী এড়ির মেয়েটিকেও দু'চোখে দেখতে পারত না। তাকে সে সব সময় বাঁদীর মত খাটাত----সময়মত খেতে দিত না---কথায় কথায় মারধোর করত।

এড়ি আর তার মেয়ের উপর এত সব করেও সোহাগীর রাগ কমল না। সে তাই একদিন আদর দেখিয়ে এড়িকে বলল----"আয় বোন, তোর মাথায় বড় উকুন হয়েছে, কিছু দেখে দিই। চুলগুলোতে একটু তেল দিয়ে মাথাটা আঁচড়ে দিই।"

এড়ি শুনে খুশী হয়ে সোহাগীর সামনে এসে বসল। সোহাগী উকুন মারতে শুরু করল। তারপর গোপনে এড়ির মাথার তালুতে একটা অষুধ ঘষে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সে একটা কাছিম হয়ে পুকুরে নেমে গেল।

এদিকে এড়ির মেয়ে তার মাকে আর খুঁজে পায় না। একবার যেই সে পুকুরের ঘাটে গেল, অমনি সেই কাছিমটা উঠে এসে বলল-- আমিই তোর মা। সতীনে আমাকে কাছিম বানিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে তো আমার সতীন তোকে মোটেই খেতে দেবে না; কাজেই তুই এক কাজ করিস্ঃ তুই রোজ এই ঘাটে আসিস্, আমি তখন কয়েকটা ডিম পেড়ে দেব, আর তুই গোপনে সেগুলো ভেজে খেয়ে নিবি। তা হলেই আর ক্ষিদের কষ্ট পাবি নে।

দিন যায়।

কাছিমটা রোজ রোজ গোপনে ডিম পেড়ে দেয় আর এড়ির মেয়ে সেগুলো---ভাঙা পাতিলে সেঁকে সেঁকে খায়। তার শরীর আর মোটেই দুর্বল হয় না---ক্ষিদেও লাগে না।

সোহাগী মনে মনে ভাবে, একি তাজ্জব ব্যাপার! এড়ির মেয়েকে একবারও পেট ভরে খেতে দেই নে, অথচ ওর শরীরটা তো একটুও ভাঙে না! তার সন্দেহ হল----ও নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কোথাও কিছু খায়! না হলে কোন দিন মরে যেত।

সোহাগী তার নিজের মেয়েকে হুকুম দিল দেখবি তো, এড়ির মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খায় কিনা?

এর পরদিনই সব ধরা পড়ল।

সোহাগীর মেয়ে লুকিয়ে দেখল----পুকুর থেকে একটি কাছিম উঠে এসে কটা ডিম পেড়ে দিল। তারপর এড়ির মেয়ে সেগুলোকে একটি ভাঙা হাঁড়িতে ভেজে খেয়ে নিল।

সাথে সাথে সে দৌড়ে এসে তার মাকে সব জানাল। সোহাগীর ভয়ানক রাগ হল---আচ্ছা তোর এ পথও বন্ধ করব।

সোহাগী রাতে তার স্বামীকে বলল----"ঐ পুকুরে একটা মস্ত কাছিম আছে। সেটা পুকুরের সবগুলো মাছ খেয়ে শেষ করছে। কালই শিকারী নামিয়ে ওটাকে মেরে ফেল।"

সোহাগীর এই মতলব এড়ির মেয়ে শুনল এবং সকালে উঠেই গিয়ে সে তার কাছিম মাকে এ কথা জানাল। তখন কাছিমটা দুঃখ করে বল্‌ল.....'আমি আর কি করব, মা! সতীনের সঙ্গে আর পারছি না! তবে তুই এক কাজ করিস্‌। আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের নখটা কেটে নিয়ে হাওরের মাঝখানে পুতে রাখিস্‌, তাহলে সেখানে একটা মেড়া গাছ হবে। তখন তুই রোজ সেই মেড়াগাছ থেকে মেড়া পেড়ে খাবি, তা হলেই আর ক্ষিদেয় কষ্ট পাবি না।"

পর দিনই শিকারীরা পুকুরের সেই কাছিমটাকে মেরে ফেলল! সোহাগীর কি আনন্দ! সে ভাবল....এইবার এড়ির মেয়েকে মজা দেখাব। এখন দেখব কে তার খোরাক যোগায়?

এদিকে এড়ির মেয়ে কাছিম মায়ের কথামত তার কড়ে আঙুলের নখটি কেটে নিল। পরদিন সকাল বেলা ছাগলের পাল নিয়ে সে মাঠে চলে গেল এবং এক জায়গায় সেই নখটি পুততেই দেখতে দেখতে সেখানে গজিয়ে উঠল একটা মেড়া গাছ, আর সেটা সাথে সাথে ফল ধরে বড় হয়ে পেকে গেল। এড়ির মেয়ে সেই ফল পেড়ে খেয়ে পেট ভরাল।

এরপর এমনি ভাবেই দিন যায়।

সোহাগী লক্ষ্য করে---একি ব্যাপার! এড়ির মেয়ে এখনও যে একটুও দুর্বল হচ্ছে না! সে এবারও তার মেয়েকে আগের মত গোপনে লক্ষ্য রাখতে বলল।

সোহাগীর মেয়ে আড়ালে থেকে থেকে একদিন এ ব্যাপারটাও ধরে ফেল্‌ল। সে এসে তার মাকে জানাল----এড়ির মেয়ে মাঠের একটি মেড়া গাছ থেকে রোজ মেড়া পেড়ে খায়, মা!

সোহাগী বলল, আচ্চারে বাছা তার এ চালাকিও খতম করব। তারপর দেখা যাবে কি খায়?

পরদিনই সোহাগী লাকড়ির জন্য সেই মেড়াগাছটিকে কাটিয়ে নিল।

এখন থেকে এড়ির মেয়ের আর কোন উপায় রইল না। শুরু হল তার দুঃখের দিন। সোহাগী যে দিন চারটে বাসী পচা ভাত দেয়, সে খায়; আর যেদিন না দেয়, অনাহারেই সে দিন কাটে।এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতে এঁড়ির মেয়ে শুকিয়ে হাড্ডিসার হল। আর এদিকে সোহাগীর আনন্দ দেখে কে!

এড়ির মেয়ের কাজ হলো সারাদিন মাঠে মাঠে ছাগলের পাল চরানো। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, এড়ির মেয়ের শুধু কাজ আর কাজ। রোজ সকালে ছাগলের পাল নিয়ে মাঠে যায় সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। দুই একদিন পর কোন বেলা বাসি পচা ভাত থাকলে তার কপালে জোটে, না থাকলে নেই। তার উপর কথায় কথায় কিল-চড়-থাপ্পড়। তার দুঃখের আর শেষ নেই।

এমনিভাবে দিন যায়।

রোজকার মত একদিন এড়ির মেয়ে ছাগলের পাল নিয়ে মাঠে গিয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় তার শরীর আর চলছে না। ছাগলগুলোকে দূরে চরতে দিয়ে সে একটা গাছের ছায়ার গিয়ে বসল। অমনি দু'চোখ ভরে আসল ঘুমে। সে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সওদাগর। তিনি দেখলেন, গাছের ছায়ার এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। পরনে ছেঁড়া তালি ময়লা কাপড়, মাথার চুল উসকো ঘুসকো, অনাহারে শরীর গেছে শুকিয়ে----কিন্তু রূপে সে রাজকন্যা। যে হবে রাজরানী, সে সেজেছে ভিখারিনী। হায় রে, কপাল!

সওদাগর ভাবলেন, কে এই মেয়ে? তার কি জগতে কেউ নেই? তিনি তক্ষুনি মেয়েটাকে ডেকে তার পরিচয় জিগ্গেস করলেন। এড়ির মেয়ে তার সকল দুঃখের কথা বলল। সওদাগরের মনে ভারী দয়া হল। তিনি তাকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে গেলেন; তারপর মহা ধুমধামে তাকে বিয়ে করে নিজের বেগম বানালেন।

এড়ির মেয়ের কপাল ফিরল। সে এখন রাজরানী, তার সুখের অন্ত নেই।

কিছুদিন পর সোহাগীর কাছেও এ খবর গেল। সে শুনল, এড়ির মেয়ে আজ রাজরানী। সে আজ পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে। শুনে সোহাগী হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। এড়ির মেয়ের এত সুখের খবর কেমন করে তার প্রাণে সইবে। সে তাই মনে মনে ফন্দি আঁটলঃ এড়ির মেয়ের এই সুখের ঘর ভাঙতে হবে; তার জায়গায় এই সুখের ঘরে দিতে হবে তার নিজের মেয়েকে।

এরপর সোহাগী তার স্বামীকে ধরে বসলঃ এড়ির মেয়ে আর জামাইকে একদিন বাড়ীতে আন, না হলে মানুষের কাছে মুখ থাকে না। শত হোক আমাদেরই তো মেয়ে! তার উপর আবার উপযুক্ত জামাই। তাকে দাওয়াত করে আনলে আমাদেরই গৌরব বাড়বে।

সোহাগীর কথায় তার স্বামী রাজী হলো। তখন একদিন এড়ির মেয়ে ও জামাইকে দাওয়াত দিয়ে আনা হলো। সকলেই দেখলঃ এড়ির মেয়ে না-তো যেন সাক্ষাৎ রাজরানী। সকলে তার তারিফ করল। সোহাগীও আজ এড়ির মেয়েকে নিজের মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসা দেখাতে লাগল। সৎমার আদর-যত্নে এড়ির মেয়েও আগেকার সব কথা ভুলে গেল। সোহাগী আদর করে এড়ির মেয়েকে বলল----'আয় মা, তোর মাথায় একটু তেল মাখিয়ে দি।" অমনি এড়ির মেয়ে তার সম্মুখে গিয়ে বসল। সোহাগী তখন তেল দেবার নাম করে তার মাথার তালুতে একটা 'অষুধ' ঘষে দিল, আর সাথে সাথে এড়ির মেয়ে একটা হলদে পাখী হয়ে উড়ে গেল।

সোহাগীর এই সুযোগে নিজের মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে পালকীতে তুলে দিল। সওদাগর-জামাই সে খবর জানতে পারলেন না। সোহাগীর আনন্দ দেখে কে! এখন রাজরানী তো তার মেয়েই।

সওদাগর পালকি নিয়ে দেশে চল্‌লেন। পথে যেতে যেতে একটা হল্‌দে পাখী তার মাথার উপর উড়ে উড়ে কেবলই বলতে লাগলঃ

"এল গাছের বেল
বৌ থুইয়া বইনি লইয়া গেল্‌।"

সওদাগর পাখীটার কথা শুনলেন, কিন্তু কথার রহস্য বুঝতে পারলেন না।

সওদাগর পালকি নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছলেন----পাখীটাও সওদাগরের সাথে সাথে তাঁর ঘরে গেল। তারপর সওদাগর পালঙ্কে বসতেই পাখীটা কখনও তাঁর কাঁধে----কখনও তাঁর মাথায় বসে বলতে লাগলঃ

"এল গাছের বেল
বৌ থুইয়া বইনি লইয়া গেল্‌।"

সওদাগর অমনি খপ্‌ করে পাখীটাকে ধরে ফেললেন। আদর করে তার গায় মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন----বাহ্‌, কি সুন্দর পাখী!

এমনি করে হাত বুলাতে বুলাতে সওদাগর যেই একবার পাখীটির মাথার হাত বুলালেন, অমনি তার মাথা থেকে সোহাগীর দেওয়া সেই অষুধটুকু খসে মাটিতে পড়ে গেল, আর সাথে সাথে পাখীটা হয়ে গেল সেই আগের মানুষ---সেই ফট্‌ফটে সুন্দরী কন্যা!

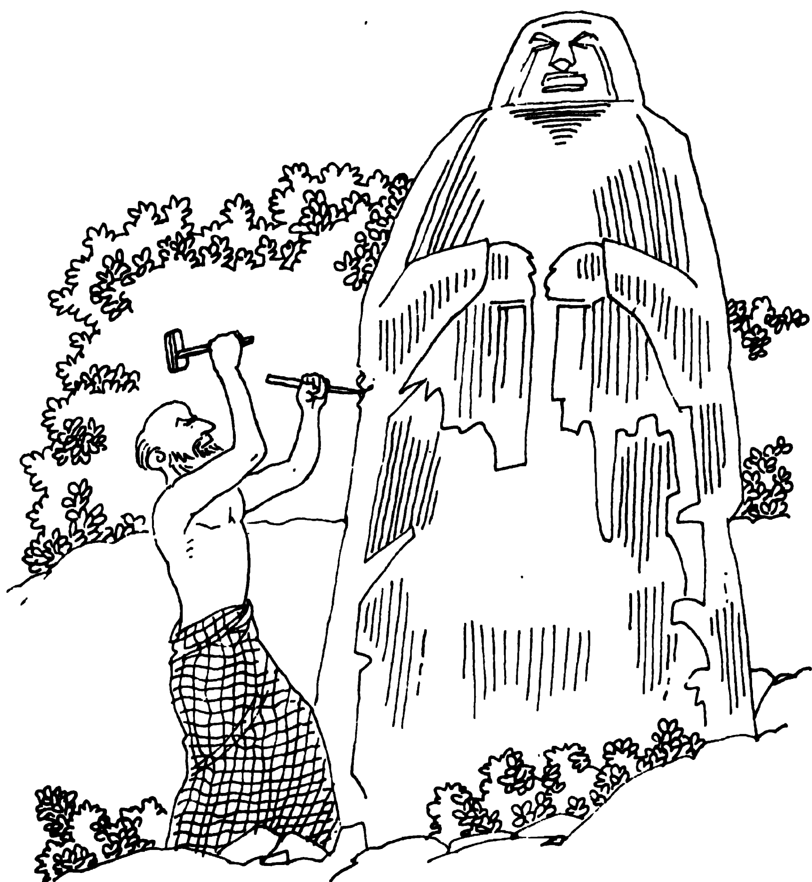
সওদাগর তাজ্জব হয়ে বললেন--একি একি ! আজব ব্যাপার ! এ কেমন করে হল !

এড়ির মেয়ে তখন তার সৎমায়ের কুকর্মের কথা ও চালাকি সব খুলে বলল।

সওদাগর সোহাগীর এই ব্যবহারে ও কুকর্মে খুব রেগে গেলেন। তিনি সোহাগীর মেয়েকে কেটে দু'টুকরো করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এড়ির মেয়ের অনুরোধে তাকে পালকি ক'রে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সোহাগী হিংসায় সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরল। শেষ পর্যন্ত জয় হলো এড়ির আর তার রূপবতী গুণবতী মেয়ের।





ঝরণাধারা

আরুদার রশীদ

বিরাট এক পর্বতের পায়ের কাছে ছোট্ট, সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের নাম রতনপুর। সেই গ্রামে সরল সাদাসিধে মানুষের বাস। পর্বতের একটি ঝরণা থেকে সারা বছর জল নেমে আসে। গাঁয়ের ওপর দিয়ে সেই জল বয়ে যায়। সেই জলে তাদের চাষবাস হয়। আর খাল-বিলের মধ্যে যে সব মাছ বাস করে তাদের প্রাণ বাঁচে।

গ্রামবাসীরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করে। তাই তাদের জীবন বেশ সুখেই কাটে।

সেই রতনপুর গ্রামের একটু দূরেই বাস করতো এক লোভী মহাজন। গ্রামের কৃষকদের ওপর সে বড়ো অত্যাচার করতো। কৃষকদের ঠকিয়ে সে তাদের জমি চুরি করতো আর সেই জমির ফসল থেকে প্রতি বছর তার প্রচুর টাকা-পয়সা হতো। খুব আরামে, বিলাসে দিন কাটতো তার।

একবার সেই মহাজনের খেয়াল হলো, সে এক বিশাল বাগানবাড়ী তৈরী করবে। তাই সে একদিন তার এক পারিষদকে সঙ্গে নিয়ে জায়গা দেখতে বেরুলো।

রতনপুর গ্রামের সেই ঝরণার কাছে এসে পারিষদ বললো, 'হ্যাঁ, এই সেই জায়গা। হুজুর যদি এখানে আপনার বাগানবাড়ী করেন, তা হলে খুবই খাসা হবে।" মহাজনও খুশী হয়ে তক্ষুনি তার লোকজনকে কাজে লাগিয়ে দিলো।

কয়েকদিন পরে পারিষদটির মনে হলো, ঝরণাটা থেকে যদি অবিরত এই রকম জল ঝরতে তাকে, তা'হলে তো মহাজনের বাগানবাড়ী জলেই ভেসে যাবে। কাজেই সে পরামর্শ দিলো ঐ ঝরণাটার মুখে একটা প্রকাণ্ড লোহার মূর্তি স্থাপন করতে হবে। তাতে বাগানবাড়ীর শোভাও বাড়বে আর ঝরণার জলও আটকানো যাবে। মহাজনও সেই পরামর্শ মেনে নিলো। গাঁয়ের লোকের কাছে যত লোহা আর তামা আছে, সব সংগ্রহ করার হুকুম দিলো সে তার চাকর বাকরকে। আর যত কারিগর ছিলো, তাদের সবাইকে লাগিয়ে দিলো মূর্তি তৈরীর কাজে।

বছরখানেক পরে এক বিশাল লোহার মূর্তি তৈরী হলো। ঝরণার জল আর বেরোতে পারে না। খালবিল শুকিয়ে গেল। ক্ষেতের ধান শুকিয়ে যেতে লাগলো। জলার মাছগুলো জলের অভাবে মরতে লাগলো।

রতনপুরের অধিবাসীদের জীবনেও দুঃখ নেমে এলো। এখন আর তাদের মনে সুখ নেই। এখন আর তারা ভাত পায় না। সুস্বাদু মাছের ঝোলও খেতে পায় না। তারাও না খেয়ে শুকোতে লাগলো।

রতনপুরে এক বুড়ো ছিলো। তার চুল দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে। সে দেখলো, ঝরণার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই এই দুরবস্থা হয়েছে। তাই সে তার ছেলেকে ডেকে বললো, "বাবা শোন্, তুই যদি আমার সুপুত্র হোস্ তা হলে ঐ লোহার মূর্তিটাকে টুকেরো টুকরো ক'রে ভেঙে দিয়ে আয়। তবে আবার গাঁয়ের লোকের দুঃখ ঘুচবে।"

বুড়োর ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে ছেনী আর হাতুড়ি নিয়ে মূর্তি ভাঙতে গেল। কিন্তু একশ' দিন চেষ্টা করেও সে সেই লোহার মূর্তি একটুও ভাঙতে পারলো না।

এদিকে সেই মহাজনের কানে যখন মূর্তি ভাঙার কথা গেল, তখন সে রেগে টং হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার লোকজনদের হুকুম দিলো, "এক্ষুনি গিয়ে বুড়োর ছেলেকে বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেল্।"---আর যেমন কথা তেমনি কাজ!

ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বুড়ো কেঁদে আকুল হলো। কিন্তু সে তার গাঁয়ের লোকের মঙ্গলের কথা ভেবেও খুব কাতর হয়ে পড়লো। তাই কয়েকদিন পরে সে এবার তার নাতিকে ডেকে বললো, "তুই যদি রতনপুরের ভালো চাস্, তা হলে ঐ মূর্তিটাকে চুরমার করে দিয়ে আয়। তা হলেই ঝরণা মুক্তি পাবে আর গাঁয়ের লোকেও জল পেয়ে আবার তাদের সুদিন ফিরে পাবে।" এই নাতিটিও ছিলো তার বাপের মতোই সাহসী। কাজেই আরো একশ' দিন ধরে ছেনী হাতুড়ির শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠলো। কিন্তু মহাজনের কানে সে শব্দ যেতেই, বুড়োর নাতিটাকেও সে তার লোকজনকে দিয়ে খুন করালো।

বুড়োর ছেলে গেল, নাতি গেল, কিন্তু লোহার মূর্তি যেমন ছিলো, তেমনি ঝরণার মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েই রইলো। বুড়ো মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলো। নিজে সে একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছে। লোহার মূর্তি ভাঙবার শক্তি সে কোথায় পাবে? কাজেই সে তার বাড়ীর সামনের জমিতে বৃষ্টির জল জমাবে বলে একটা গর্ত করলো।

গর্ত করতেই দেখে একটা বড়ো মাগুর মাছ কাদার মধ্যে নড়াচড়া করছে। বুড়ো বললো, "আহা, বেচারা।' জল না পেয়ে ছট্‌ফট্ করছে।-----চল্ তোকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

সমুদ্রের জলে ছেড়ে দিতেই জলের মধ্যে থেকে মুখ উঁচু করে মাগুরটা বুড়োকে বললো, "সমুদ্রের তলায় পাতাল-রাজার প্রসাদের পাশে একটা বন্দীশালা আছে। সেই বন্দীশালার দরজার ইস্পাতের খিলটা খুলে নিয়ে এসো। তারপর সেই ইস্পাত দিয়ে হাতুড়ি আর ছেনী বানাও। সেই ছেনী আর হাতুড়ির ঘায়ে লোহার মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।"

বুড়ো ভীষণ অবাক হয়ে গেল। আবার খুশীও হলো মাগুরের কথা শুনে। বললো, "কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেমন করে?" মাগুরটা তার মুখের ভেতর থেকে একটা মুক্তো বের করে দিয়ে বললো, "এই মুক্তোটা মুখে রাখলেই তুমিও আমার মতো মাগুর মাছ হয়ে যাবে। তারপর সেই খিলটা নিয়ে যখন ফিরবে, তখন এই জলের ধারে পৌঁছে মুক্তোটা মুখ থেকে বের করে ফেললেই আবার তুমি মানুষ হয়ে যাবে।"

মুক্তোটা তুলে নিয়ে বুড়ো সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো, সমুদ্রের তলায় একবার গেলে আর ফিরে আসা যাবে কি না।

কিন্তু শুকিয়ে-যাওয়া ধানক্ষেত আর গাঁয়ের লোকের ক্ষুধার্ত শুকনো মুখের কথা ভাবতেই সে মন স্থির করে ফেললো। মুক্তোটা মুখে দিতেই মাগুর মাছ হয়ে গিয়ে সে সমুদ্রের তলায় ডুব দিলো।

মাগুররূপী বুড়ো পাতাল-রাজার প্রাসাদ সহজেই খুঁজে বের করলো। দূর থেকেই দেখতে পেলো, পাতাল-রাজার হুকুমে তার পেয়াদারা একটা বড়ো মাছকে আচ্ছা করে পিটাচ্ছে। মাছটার পেটের মধ্যে মুক্তো বা আরো কিছু মূল্যবান পাথর থাকলে সেটা বের করে দেবার জন্য তারা মাছটাকে চাপ দিচ্ছে। দেখে বুড়োর খুব ভয় হলো। ভাবলো পাতাল-রাজার হাতে পড়লে তারও ঐ রকম অবস্থা হবে।

কিন্তু সে যে কাজে এসেছে, তা তো তাকে করতেই হবে! তাই সে সাঁতরে বন্দীশালায় চলে গেল। দেখলো অনেক মাছ সেখানে বন্দী হয়ে আছে। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বন্দীশালার তালাটা ভাঙবার চেষ্টা করলো।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর তার কষ্ট সার্থক হলো। পাতাল-রাজা তার লোকজন নিয়ে মাছের পেট থেকে মুক্তো বের করার কাজে ব্যস্ত। কাজেই তারা কিছুই টের পেলো না। বন্দীশালার দরজা খুলে যেতেই বন্দী মাছেরা মনের আনন্দে বেরিয়ে এলো। তাদের সকলের সাহায্য নিয়ে মাগুররূপী বুড়ো ইস্পাতের খিলটা নিয়ে সমুদ্রের কিনারায় এলো।

কিনারায় পৌঁছে সেই মুক্তোটা মুখ থেকে বের করে ফেলতেই আবার সে বুড়োমানুষ হয়ে গেল। যে সব মাছ তাকে সাহায্য করেছে, তাদের সবাইকেই সে ধন্যবাদ দিলো। মাছরাও বুড়োর সাহায্যেই মুক্তি পেয়েছে, কাজেই তারাও বুড়োকে অনেক ধন্যবাদ জানালো।

সেই ইস্পাতের খিল কাঁধে করে বুড়ো রতনপুরে ফিরে এলো। গ্রাম-বাসীরাও তার সমস্ত কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল।

বুড়ো তার বাড়ীতে একটা হাঁপর বসিয়ে, সেই খিলটা নিয়ে ছেনী আর হাতুড়ি বানাতে বসলো। দিনের পর দিন দুর্বল হাতে, ছানি-পড়া চোখ নিয়ে অবিরাম সে কাজ করতেই থাকে।

ছেনী আর হাতুড়ি তৈরী হতে একশ' দিন লাগলো। তারপর সেই হাতুড়ি কাঁধে ক'রে, ছেনীটা হাতে নিয়ে বুড়ো হন্‌হন্‌ ক'রে চললো ঝরণার দিকে।

সেই বিশাল লোহার মূর্তিটার কাছে গিয়ে বুড়ো বললো, "এইবার শয়তান, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।" এই বলেই মূর্তির গায়ে ছেনী বসিয়ে মারল

হাতুড়ির ঘা। তিন দিন তিন রাত্রি পরে মূর্তির গায়ে একটু ফাটল দেখা গেল।

এদিকে মহাজনও সে সংবাদ শুনেই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঝরণার দিকে চললো। গিয়ে দিখলো, মূর্তিটাতে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে। তক্ষুনি সে হুকুম দিলোঃ বুড়োকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেল্।

গায়ে পাথর লেগে কেটে গেল, রক্ত পড়তে লাগলো, কিন্তু বুড়ো থামল না। মূর্তির গায়ে সে আঘাতের পর আঘাত হানতেই লাগলো।

মহাজন এসব দেখেশুনে একবারে ক্ষেপে গেল। চীৎকার করে হুকুম দিলো, বুড়োকে এক্ষুনি মেরে ফেল্।"—কিন্তু মূর্তির ওপর হাতুড়ির ঠন্ঠন্ শব্দ কিছুতেই থামলো না।

মহাজনের লোকেরা তখন বুড়োকে ধরতে ছুটলো। কিন্তু তারা গিয়ে পৌঁছবার আগেই লোহার মূর্তি ফেটে গেল। আর সেই মুক্ত ঝরণার জল হঠাৎ এমন প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এলো যে, মহাজন আর তার সাঙ্গপাঙ্গকে সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বুড়োও ভেসে গেল সেই সঙ্গে।

সমুদ্রের মাছেরা মহাজন আর তার চেলাদের শরীর খুব্লে খুব্লে খেয়ে ফেললো। কিন্তু যখন তাদের মুক্তিদাতা বুড়োকে দেখলো, তখন বুড়োর শরীরটা তারা টেনে কিনারায় নিয়ে এলো। তারপর যখন দেখলো বুড়ো অজ্ঞান হয়ে আছে, তখন মস্ত একটা লাল মাছ বুড়োর মুখে ফুঁ দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো।

সেই রতনপুরে এক যুবক একদিন এক শহরে তার তরিতরকারী বিক্রী ক'রে শহরটা একটু ঘুরেফিরে দেখছিলো। একটা কামার শালার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা চেনা মুখ দেখে সে চমকে উঠলো। অবিকল সেই রতনপুরের হারানো বুড়োর মতো চেহারা। কিন্তু বুড়োর কাঁচা চুলদাড়ি দেখে সে ভারী অবাক হয়ে গেল।

কামারশালার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে বুড়োকে দেখলো। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বুড়োর কাছে এগিয়ে গেল। দেখলো, হ্যাঁ, সেই বুড়োই বটে! তখন সে বলে উঠলো, "দাদু, তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি!"

তারপর যুবকটি বুড়োকে রতনপুরে ফিরে যাবার জন্য অনেক ক'রে বললো। বুড়ো বললো, "হ্যাঁ ভাই, যাবো বৈ কি! তবে আমার খরিদ্দারদের বায়নার জিনিসগুলো তৈরী করে দিয়েই আমি যাবো। ধরো, আগামী ফাল্গুন মাসে আমি ঠিক যাবো।" এক বলে বুড়ো রতনপুরের লোকদের জন্য উপহার-স্বরূপ অনেকগুলো যন্ত্রপাতি যুবকটির হাতে দিলো।

যুককটি গ্রামে ফিরে গিয়ে এ খবর দিতেই সবাই খুব খুশী হলো। তারা সবাই বলাবলি করতে লাগলো, 'আমাদের জীবনদাতা, মুক্তিদাতা আবার আগামী ফাল্গুনে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে।"

জ্ঞান ফিরে পেয়েই বুড়ো উঠে বসলো। তার পর মাছদের কাছে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললো। তাই শুনে একটা বড়ো রুই মাছ বললো, "দাদু, আপনি আপনার গ্রামবাসীদের জন্য যে কষ্ট করেছেন, তার জন্য আমি আপনাকে এই মুক্তোটা দিলাম। এই মুক্তোটা গিলে ফেললেই আপনার বয়স কমে যাবে।" এই বলে মুখ থেকে একটা মুক্তো বের করে দিলো।

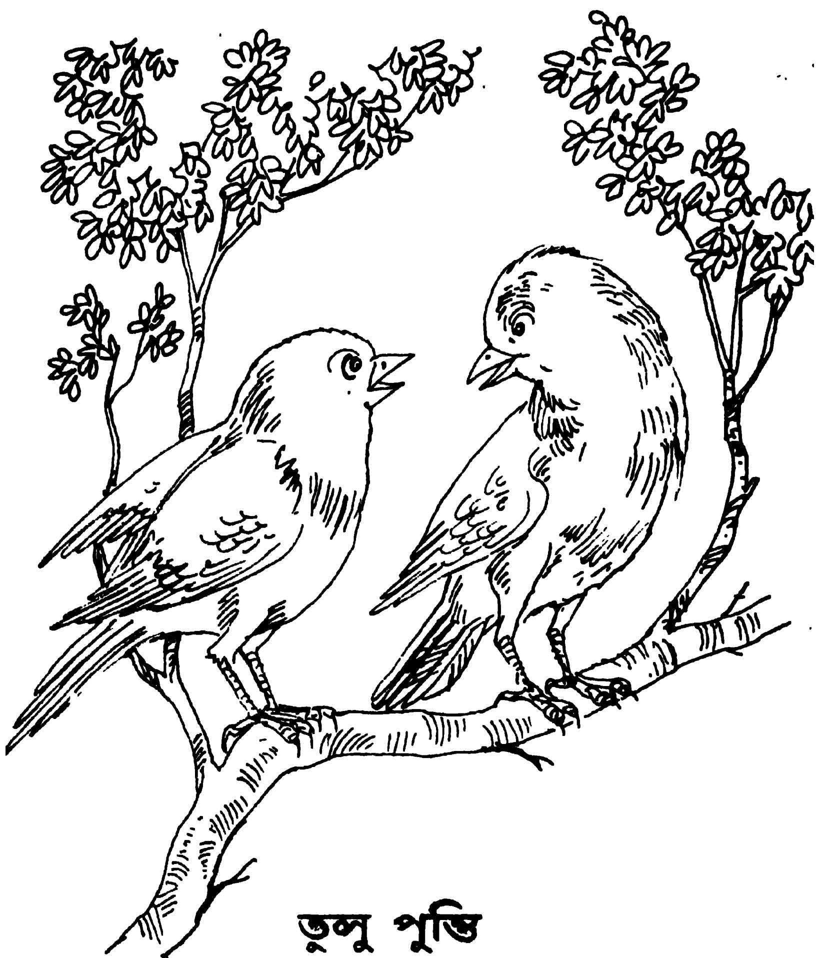
মুক্তোটা মুখে দিয়ে গিলতেই সত্যি সত্যি বুড়োর বয়স কমে গেল। তার সাদা চুল, সাদা দাড়ি সব কুচকুচে কালো হয়ে গেল। সে যাতে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে, তার জন্য সব মাছই তাকে একটা করে মুক্তো উপহার দিলো।

বুড়োর বয়স কমে এখন বছর চল্লিশেক হয়েছে। রতনপুরে ফিরে গিয়ে সে তার ঘরবাড়ী কিছুই আর খুঁজে পেলো না। তখন সে গ্রাম ছেড়ে একটা ছোট শহরে গিয়ে মুক্তোগুলো বেচে দিলো। আর সেই টাকা দিয়ে সে একটা কামারশালা খুললো। কিছুদিন পরে সে আবার বিয়ে করে সংসার পাতলো। বুড়ো এখন কাছের দূরের সকল কিষাণের জন্য কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি বানায়। আর তার বউ তাকে এসব কাজে সাহায্য করে।

এদিকে রতনপুরের অধিবাসীরা বুড়ো ফিরে আসবে বলে অনেক দিন ধরে আশা করে রইলো। কিন্তু সে যখন আর ফিরলোই না, তখন তারা বুড়োর স্মৃতিতে সেই ঝরণাটার নাম দিলো "বুড়োর ঝরণা।"

রতনপুরে আবার আগের সুখের দিন ফিরে এসেছে। গাঁয়ের লোকের এখন আর খাওয়ার অভাব নেই। বরং বাড়তি ফসল, তরিতরকারী তারা আশেপাশের শহরে বিক্রী করতে নিয়ে যায়।





তুলু পুষি

হায়াৎ মামুদ

॥ এক ॥

সকালে সূর্য উঠি-উঠি করছে। রাতের অন্ধকার কেটে গেছে, ফিকে আলোয় ভূবন ভরা। একটু পরেই হয়তো বা মাঠের ওপারে ঐ তেঁতুল গাছটার আড়াল থেকে টুকটুকে লাল থালার মতো প্রভাতী সূর্য উঁকি দেবে। কিন্তু এখনো সে-সময় হয় নি, দেরি আছে, বেশ কিছুক্ষণ দেরি আছে সে-সবের। এখন কেবল হালকা আলো, দিগন্তের ওপার থেকে একটু একটু করে উজ্জ্বলতা আসছে, আর ঝিরঝিরে হাওয়া। বাতাসে কী-রকম যেন অন্য গন্ধ, ঠিক

অন্য দিনকার মতো নয়। গা একটু শিরশির করে; কিন্তু না, শীত করে না। তাহলে কি শীতের আমেজ? হ্যাঁ, তাই। বেশী দূরে নয়, শীত এসে গেল বলে। হাওয়ায় তার জানানি, গাছের ডালপালায় তার নিঃশব্দ পদচারণ, ঘাসে পত্রে গুল্মে তার কানাকানি।

এই রকম সময়ে, যখন সুয্যিমামা এসে পৌঁছোন নি, বাতাসে আর লতাপাতায় কিসের গুঞ্জরন, শিরশিরে হাওয়া, আর কোনো লোকেরই যখন ঘুম ভাঙে নি—এই রকম সময়ে, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। অন্য কোনো দিন ভাঙে না, আজকেই ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে এখনো আঁধার; সেই আঁধারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। ভাবতে চেষ্টা করলো, এমন মজার স্বপ্নটাই ভেঙে গেল, যাঃ! কে যেন তার নাম ধরে ডাকলো না? আর তাই না অমন বেড়ে ঘুমটা চট্ করে চটে গেল। কেউ ডেকেছে না কি তাকে? কে ডাকবে? কে ডাকতে পারে? ভেবেই পাচ্ছে না সে। কোথাও তো কোনো সাড়াশব্দ নেই আর। আবার চোখ বন্ধ করলো সে, ভাঙা ঘুম ফের জোড়া লাগাবার চেষ্টা।

নাঃ—, দরজায় কে যেন সত্যিই টুকটুক্ করে টোকা দিচ্ছে। উঠতেই হলো তবে।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো সে, তারপর ক্রক্‌ক্রক্ করে হেঁটে গেল। দরজাটা একটু ফাঁক করে ধরলো, তার তারপরেই—"আরে তুমি? এই এ্যাত্তো সকালে?" চোখে মুখে কণ্ঠে তার একরাশ বিস্ময়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক খবর। জল্‌দি এসো; পেটে বুড়বুড়ি কাটছে, সারা রাত একদম ঘুমোতে পারি নি। এসো, জল্‌দি এসো।"

।। দুই ।।

এরপর তারা দু'জনে সামনের ডালিম গাছটায় ফুড়ৎ করে উড়ে গিয়ে বসলো। তুলু আর পুন্তি। দুটো চড়ুই। পূর্ব দিগন্ত আলোকে আরো আলোকময়। গায়ের মেটে পালক ঐ সকালী আলোর আভায় ঝিকমিক করছে। বড়ো বড়ো চোখ করে পুন্তি বললো, "কী হয়েছে ভাই? বলো, এখন বলো।" তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব করে পুন্তি বলে উঠলো, "ঐ যাঃ, এক্কেবারে ভুলে গেছি। মুখটাই ধোওয়া হয় নি যে! এক মিনিট সবুর করো, একটা কুলকুচো করে আসি।" বলেই আবার ক্রকুক্রক করে লাফাতে লাফাতে উঠোনের এক কোণে চলে গেল। পানির ট্যাপ থেকে টুপ্-টাপ্ টুপ্-টাপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তার নিচে গিয়ে হাঁ করে

দাঁড়িয়ে পড়লো পুস্তি। টুপ্ করে মুখের মধ্যে যেই এক ফোঁটা পড়েছে, অমনি সে সেটা কুলকুচো করে ফেলে দিলো। তারপর আবার দাঁড়ালো মুখ হাঁ করে ; এবারে যেই না ফোঁটাটা পড়েছে পুস্তি টুক্ করে গিলে নিলো। এরপর মনের আনন্দে আর তুলু কী খবর এনেছে তা শোনবার জন্যে ফুড়ুৎ করে ডালিম গাছটার ডালে গিয়ে বসলো।

ডালিম-ডালে পুস্তি বসা মাত্রই তুলু আরম্ভ করলো, "সন্ধের সময় তো তুমি কাল চলে এলে। আমিও ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। ঐ বুড়ো জামরুল গাছটার কাছে যেতেই না কী-যেন একটা শব্দ হলো।"

দম বন্ধ করে শুনছিল পুস্তি। ফোঁস করে একটু হাঁফ ছেড়ে বললো, "তারপর ?"

পুস্তিটার এই এক বদ্ অভ্যেস। কথার মাঝখানে বেতাল জায়গায় কথা বলবেই। অবাক হয়ে গেলে চোখ দুটো বড়ো-বড়ো করে দম বন্ধ করে শুনতে থাকে। কিন্তু দম আর কতক্ষণ বন্ধ করে রাখা যায় ! নিঃশ্বেস না নিলে তো মরেই যাবে। তাই, একটু পরে ফোঁস করে একটু দম ফ্যালে আর তক্ষুণি না-হক একটা টিপ্পনি কেটে বসে।

এই ফোঁস আর 'তারপর ?' শুনেই ভারি ব্যাজার হয়ে গেল তুলু। সে চুপ করে রইলো।

পুস্তি তার ছোট্টো ডানাটার একটা ঠ্যালা মেরে বললো, "চুপ করলে যে, বলো না ভাই।"

তুলু দেখলো, সে যে রাগ করেছে পুস্তি তা মোটেই বোঝে নি। রাগ করলে যদি নাই বুঝলো কেউ, তাহলে আর রাগ করে লাভ কি ? আর পুস্তি এমন আহ্লাদ করে কথা বলে---মায়া লাগে।

সে আরম্ভ করলো : "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জামরুল গাছটার কাছে যেতেই কী-রকম যেন একটা আওয়াজ কানে এলো। আমি থেমে গেলাম। আস্তে আস্তে চুপচাপ একটা ডালে বসে পড়তেই শুনি—ইশ্ পিংচুস্কা কোঁৎ,ইশ্ পিংচুস্কা কোঁৎ। এই রকম খুব চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে। তবে যা মনে হলো—গলাটা ঠিক আমাদের মতো মিহি নয়, একটু ভারি, বুঝলে পুস্তি।"

পুস্তি বহু কষ্টে চুপ করে ছিল এতক্ষণ তুলুর ধমকের ভয়ে। আর থাকতে পারলো না। এ-সব শুনে সে তো একেবারে হাঁ। বলে উঠলো, "এ্যাঁ, সে আবার কি ?"

"হ্যাঁ, শোনোই না", তুলু বলতে থাকে, "আমিও তো অবাক। এমন

ভাষা তো বাপের জন্মেও শুনি নি। আর গা-টাও কেমন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করতে লাগলো। ভর সন্ধেবেলা, এ-সব আবার কি? আল্লার নাম করে বুকে একটা ফুঁ দিতেই ভয় চলে গেল। তখন ভালো করে চার পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।"

"তারপর?"

"তাকাতেই দেখি, কয়েকটা ডাল দূরে চারটে চোখ ড্যাব্ ড্যাব্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু, কী সুন্দর জানো? এক্কেবারে নীল টল্‌টল্ করছে। আমার খুউব ভালো লাগলো, একটুও ভয় লাগলো না।"

"এ্যাতো সুন্দর চোখ, এ্যা?" পুস্তি আবার অবাক।

"হ্যাঁ, না হলে আর বলেছি কী? সে যাই হোক, যেই না আমার চোখ ঐ চোখগুলোর ওপর পড়েছে, অমনি সেই চোখের মালিকরা চক্ষের পলকে আমার পাশে এসে বসলো। তখন দেখি, বুঝলে পুস্তি, উঃ কী সুন্দর দেখতে তারা! আমাদের চেয়ে কিন্তু বড়ো নয়, গায়ের রং বেশ গাঢ় খয়েরির দিকে, ঠোঁটও ঠিক আমাদের মতো ছোটো সূঁচালো। আবার জানো, চোখের কোণ থেকে ঘাড় অবধি আরো গাঢ় রঙের টানা এক পোঁছ, অবিকল যেন স্কার্ফ বেঁধেছে। আমার সামনে দু'জন বসে পড়েই বলে উঠলো : বন্ধু, ভালো আছ তো?"

"তারপর? তুমি কী বললে?" উত্তেজনায় আবার দম বন্ধ হয়ে আসছে পুস্তির।

"আমি আর কী বলব? স্রেফ অবাক হয়ে গেছি। একটু আগেই তারা বলছিল : ইশ্ পিংচুস্কা কোঁৎ, ইশ্ পিংচুস্কা কোঁৎ, আর এখন কিনা দিব্যি আমাদের ভাষায় কথা বললো। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললো—খুব তাজ্জব হয়ে গেছ, না? আমি বললাম—হ্যাঁ, তোমরা কে? তখন কী জবাব দিল জানো পুস্তি?" জিজ্ঞেস করে তুলু।

"না ভাই, কী জবাব দিলো ভাই?"

"বললো—বলছি, ভাই। একটু জিরোতে দাও। বাব্বাঃ, দু'শো মাইল এক দৌড়ে চলে আসা কি চাট্টিখানি কথা?"

"এ্যাঁ, দু'শো মাইল? তুমি বলছো কী!" অবাক হয়ে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো পুস্তি যে আরেকটু হলেই ডালিমের ডাল থেকে পড়ে যাচ্ছিল সে।

তুলু জবাব দ্যায়, "হ্যাঁ পুস্তি, ওরা তো তাই বললো। দু'শো মাইল শুনে আমিও তো বোকা বনে গেছি। আমি তো তবু রোজ সকাল বিকেল একটু হাওয়া খেতে বেরুই; তুমি পুস্তি এমন যে, বলে-বলে আজ পর্যন্ত ঐ নদীর

ধারে বাবলা গাছটার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারলাম না।" তুলুর মনে পুরনো দুঃখ ফের উথলে উঠলো, সে চুপ করে রইলো।

তাড়াতাড়ি পুন্তি বলে ওঠে, "রাগ ক'রো না ভাই। ঠিক দেখো, আজ বিকেলে যাব।"

"ঠিক তো? নড়চড় হবে না কথার?" তুলু যাচাই করে নেয় আবার।

"ঠিক, ঠিক, ঠিক। তিন সত্যি। বিশ্বেস হলো তো? নাও, এখন বলো যা বলছিলে।" খুশিতে চোখ-মুখ চকচক করছে তার।

তুলু তখন পুরনো কথায় ফিরে আসে। "হ্যাঁ, শোনো। তারপর ওরা দু'জন যা বললো। ওরা যে এদেশের বাসিন্দা নয়, তা ওদের দেখেই বুঝেছিলাম। ওদের দেশ অনেক অ-নে-ক দূরে, সে নাকি উত্তর মেরুতে। জানো, সে-দেশ কোথায়?"

"না।"

"আমিও জানি না", তুলু বলে। "যাক গে, ওরা সে-দেশ থেকে বেরিয়েছে মাস দুই কি মাস দেড়েক আগে। কত দেশ নদী জঙ্গল সমুদ্র পাহাড় সব পার হয়ে এসেছে। ওদের না কি যাবার কথা ছিল শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা—ঐ সব দেশে।"

"সে-সব আবার কোথায় তুলু?" ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে খোঁজ নেয় পুন্তি।

"এও জানো না?" তাকে বড়োই লজ্জায় ফেলে দিলো তুলু। "জানবেই বা কেমন করে? নদীটার ধারে বাবলা গাছটাতেই কখনো গিয়ে বসলে না! আমাদের দেশের অনেক, অ-নে-ক দক্ষিণে; না, ঠিক দক্ষিণেও নয়, দক্ষিণ-পূর্বে ঐ সব দেশ আছে। খু-উ-ব সুন্দর না কি!"

"ও-ও!" যেন এ-সব খোঁজ রেখে কিছুমাত্র লাভ নেই, এ-রকম ভাব করলো পুন্তি। "তা-এখানে এলো কেন?" লজ্জার মাথা খেয়ে পুন্তিই জিজ্ঞেস করে।

"এখানে এলো কেন? পথ ভুলে। স্রেফ পথ ভুলে। ওরা মাত্তর দু'জন তো আর দেশ থেকে বেরোয় নি। ওদের সঙ্গে আরো অনেক সঙ্গীসাথী ছিল। তিব্বতের উপর দিয়ে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে উড়ে যেতে-যেতে একদিন রাত হয়ে গেল। কী আর করে? মানস সরোবরের কাছে সুন্দর একটা উপত্যকায় সে রাতটার মতো ঝুপঝুপ করে নেমে পড়লো সবাই! সকালে ঘুম ভেঙে এরা দেখে যে, সঙ্গীসাথী কেউ কোথাও নেই। ভোরবেলা ওড়বার আগে যখন ডেকেছে তখনই হয়তো ঘুমটা আরো নেমেছে এদের চোখের ওপর,

তারাও আর ততটা খেয়াল করে নি কেউ পড়ে রইলো কিনা। ভুল করে এদের ফেলে রেখে চলে গেছে সবাই।"

"আহা!" নিজের অজান্তেই বুকের মধ্যে কেমন কষ্ট হয় পুন্তির।

"তারপর ওরা উড়তে শুরু করে, হাওয়া কেটে সাঁই সাঁই ক'রে। কিন্তু দলের লোকজনের আর টিকিটিও দেখতে পেলো না। শুধু তাই না, দু'দিন পরে বুঝতে পারলো যে ওরা ভুল পথে চলে এসেছে। ভাবনা-চিন্তায় মাথা ঠিক রাখতে পারে নি তখন, বুঝলে না? তা ভুল রাস্তায় চলে যখন একবার এসেইছে তখন ভাবলে, নতুন দেশটা একটু ঘুরেই যাই। এইভাবে উড়তে-উড়তে শেষকালে এখানে, এই আমাদের চাটগাঁ শহরে চলে এসেছে।"

"কিন্তু—" কি যেন বলতে যাচ্ছিল পুন্তি। তার কথাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই তুলু বলে উঠলো, "আর ওদের মাথা কী-রকম দেখলে পুন্তি! এই তিন-চার দিনেই ওরা বাংলা ভাষা পর্যন্ত শিখে ফেলেছে।"

"তাই তো! তা ওরা এখন কোথায় তুলু?"

"ওহ্-হো, ভুলেই গেছি। আমি তারপর কথাটথা বলে ওদেরকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে বাসায় চলে গেলাম। ওরাও খুব কাহিল হয়ে গিয়েছিল, দু'শো মাইল উড়ে এলে হবেই তো। কিন্তু বাসায় তো নিয়ে গেলাম, এখন খেতে দিই কী? ঘরে তো বেশি কিছু থাকে না। যা ছিল ক্ষুদকুঁড়ো, তাই দিলাম।"

"পেট ভরে খেলো?" পুন্তির জানা যেন কিছুতেই হচ্ছে না।

" কি জানি ভাই! খেলো তো সব, কিন্তু পেট ভরলো কি না বলতে পারবো না। তবে ওরা কত ভালো ভালো জিনিস, ফল-মূল খেয়ে মানুষ, আমাদের এই গরিবের ভাত কি মুখে রুচবে?"

"নাহ্, খেয়েছে যখন তখন নিশ্চয় খারাপ লাগে নি।" তুলুকে ভরসা দিলো পুন্তি।

তুলু বললো, "ওরা এখনো ঘুমুচ্ছে দেখে এসেছি। আমি পা টিপে-টিপে ঘরের বার হয়েই এক দৌড়ে তোমাকে ডাকতে এসেছি। চলো, আলাপ করবে; খুব ভালো লাগবে।"

পুন্তির খুশি আর ধরে না, পরিচয় করার আগেই। "আমার ভাই এখনি যা খুশি লাগছে; কী মজা, এ্যাঁ"—আনন্দে পুন্তির নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

।। তিন ।।

যা হোক, উত্তর মেরুর বন্ধু দু'জন থেকে গেল। রোজ পুন্তি আর তুলুর সঙ্গে ওদের প্রোগ্রাম। আজ এই জায়গায় যাব, কাল ঐ জায়গায়। পুন্তি-তুলু দু'জন মিলে একটা ঘর বেঁধে দিলো ওদের থাকবার জন্যে। এরই মধ্যে যত ভালো ভালো খাবার আছে সব ওরা ভিন্‌দেশী বন্ধুদের খাইয়েছে। তারা নিজেরা মাছ খায় না, কিন্তু বন্ধুদের জন্যে একটা কুঁড়ো বককে ঠকিয়ে মাছ নিয়ে এসে বন্ধুদের খাওয়ালো একদিন। আরেক দিন একটা বাজপাখি, এক নম্বর শয়তান, তাড়া করেছিল ওদের। চার বন্ধু আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেত। কিন্তু পাজি বাজপাখিটা ধরতে পারে নি, তাড়াতাড়ি একটা বাঁশ-ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাঁশপাতার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল তারা।

পুশুৎকা-খুরোস্তি দু'জনেই তাদের দেশের অজস্র গল্প করেছে। নীল বরফের কাহিনী, বল্‌গা হরিণ আর শ্লেজ গাড়ি, এস্কিমো আর তাদের কুল্‌পি-ঘর 'ইগলু'র কথা, শ্বেত ভল্লুকের গল্প—এ-সব একবার দু'বার নয়, হাজার বার করে শুনিয়েছে তারা তুলু আর পুন্তিকে। তবু তুলু আর পুন্তির শুনে-শুনে যেন আশ মেটে না। সমুদ্রের ওপর জমে আছে বরফের পুরু আস্তরণ, তার নিচে চলাফেরা করে মাছের ঝাঁক। বরফের চ্যাঙড় ফেটে যায়, সেই সব ফাটলের মধ্যে থাকে মাছ। পুশুৎকা-খুরোস্তির দল সেই সব মাছ খায়। সাগরের ঢেউ কেমন ধারা বড়ো-বড়ো আর বদরাগী, সর্বদাই গোঁ-গোঁ শোঁ-শোঁ করে, যেন একটা বিরাট দৈত্য; একবার একটা সাপ তাদের গোটা দলটাকেই কী ভাবে গিলে ফেলতে চেয়েছিল ও-সব কাহিনীও শুনিয়েছে পুশুৎকা আর খুরোস্তি। হাওয়া কেটে-কেটে ছুরির ফলার মতো তীব্র বেগে তারা উড়ে চলে, দেশের পর দেশ পার হয়ে যায়, মহাসাগর পার হয়, ছোটো ছোটো পাহাড় বন জঙ্গল—তখন সে যে কী আনন্দ! শুনতে-শুনতে পুন্তির চোখে, তুলুর চোখেও সে—আনন্দের রং লেগেছে।

এইভাবে আনন্দে আহ্লাদে, নেচে-গেয়ে, দাপাদাপি-মাতামাতি করে সময় কেটে চললো। এরি মধ্যে প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। এখন বেশ শীত পড়েছে এখানে, বাংলাদেশে। শিউলি ফুল ফুটছে, ছাতিম ফুল, আরো কত কি ফুল! পুন্তি-তুলু তাদের নাম জানে না। একদিন পুন্তি একটা মালা তৈরি করলো শিউলি ফুল দিয়ে, পুশুৎকার গলায় পরিয়ে দিলে বললো, "তুমি আমার বন্ধু; বলো, দেশে ফিরে আমাকে ভুলে যাবে না?" পুশুৎকা বললো, "না। ভুলতে কি পারি?" হেনা ফুলের মালা গেঁথে তুলু একদিন খুরোস্তির গলায়

পরিয়ে দিলো; বললো, "আমরা বন্ধু। ঘরে ফিরে আমাকে ভুলো না।" সেদিন দুপুরে খেয়ে-দেয়ে চার বন্ধু মিলে ফাঁকা উঠোনে ডালিমতলায় খুব খানিকক্ষণ নেচে নিলো।

॥ চার ॥

পুশুৎকা গল্প বলে: "একবার হয়েছিল কী, জানো? সে ভারি মজার! আমাদের তখন বয়েস আরো কম। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তে হবে। সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে আমাদের সবার মধ্যে। প্রত্যেক বছরেই তো আমরা বেড়াতে বেরুই, এই যেমন এবারে। ঠিক আছে, বেরিয়ে তো পড়লাম—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি। খাল বিল পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম নিচে ফেলে, বনের উপর দিয়ে। সন্ধে হয়ে গেলেই ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ি, মাঠে কি নদীর ধারে, নয়তো বা কোনো দ্বীপে। একবার এরকম একটা দ্বীপে রাত কাটালাম। পরদিন খুব ভোরে, তখনো সুয্যি ওঠে নি, কেবল চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে, আমাদের পুরো দলটাই ডানা মেললো বাতাসে। চমৎকার আবহাওয়া। নিচে দরিয়ার নীল জল, উপরে আকাশের নীল সামিয়ানা, মাঝেমধ্যে সেই নীলের ফাঁকে-ফাকে সাদা মেঘের ফুলঝুরি। সন্ধের ভিতরে সাগর পেরুনো চাই, ডাঙা নইলে রাত কাটাবো কোথায়? উড়ছি তো উড়ছিই। খারাপ লাগছে না। উড়তে-উড়তে গপ্পো করতে-করতে সময় কাটছে বেশ। হঠাৎ এক সময় খুরোস্তি বলে কিনা তার ডানা ভেরে যাচ্ছে।"

পুস্তি বলে, " সে কি, নিচে না সমুদ্দুর?" খুরোস্তি হাসি হাসে লজ্জার, মুখ টিপে। তুলু অবাক, বলে—"সব্বোনাশ! তারপর?"

"হ্যাঁ, শোনোই না।" পুশুৎকা বলে চলে। "সত্যিই তো নিচে অথই জল। ডানা ভেরে যাওয়া মানে তো—এক সময় ও আর উড়তে পারবে না, তারপরে পড়ে যাবে নিচেয়, আর নিচে মানেই তো—। সর্বনাশ! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। এখন কি করা যায়? ভাগ্য ভালো বলতে হবে, দেখি কিনা এক পাখি....।"

বাধা দেয় খুরোস্তি, "যাঃ, মাঝখানে ঐ ঘটনাটা বললে না যে!"

"কোন্‌টা?" বুঝতে পারে না পুশুৎকা।

"বা রে! ঐ যে সেইটা। ভুলে গেছ বুঝি?"

এবারে বিরক্ত না হয়ে পারে না পুশুৎকা। বলে,"আহ্‌হা, ভুলে গেছি তো মনে করিয়ে দাও না। কী জ্বালা!" খুরোস্তি তুলু-পুস্তির দিকে তাকায়

একবার আড়-চোখে। "হু , মেয়ের আবার লজ্জা দ্যাখো!" রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে সে, "কই, কী ভুলে গেছি, বলো।"

মুখ কাঁচুমাচু, চুপ করে থাকে খুরোন্তি। প্রায় মিনিট খানেক। তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে, প্রায় কানে-কানে—যেন তুলু-পুন্তি না শোনে, বলে ওঠে সে, "ঐ যে ছাই, গোঁ গোঁ আওয়াজ করে সাংঘাতিক বিরাট একটা পাখি যাচ্ছিল যে, আকাশের এক কোণ দিয়ে----। বলো না বাপু!"

থমকে রইলো কিছুক্ষণ পুশুৎকা, যেন কোনো কিছু মনে আনার চেষ্টা করছে। তারপর মনে পড়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলো, "ওহ্-হো। তাই তো! বেড়ে জায়গাটাই তো ছেড়ে যাচ্ছিলাম!"

হাসতে থাকে পুশুৎকা। "না, মাইরি, বুদ্ধি বটে তোমার খুরোন্তি!" পুরনো কথা মনে পড়ে যায়, হাসি তার আর থামতে চায় না। তুলু-পুন্তি অবাক। দ্যাখো দেখি! বলি, এত হাসির কী আছে? ব্যাপারটা তাহলে হয়েছিল কী?

" ও খুরোন্তি, বলো না ভাই, কী হয়েছিল? পশুৎকা যে হেসেই থই পাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও-ই বরং বলুক।" ফের হেসে গড়িয়ে পড়ে পুশুৎকা।

পুন্তি আর তুলু দু'জনেই চাপ দেয় খুরোন্তিকে, "ও ভাই খুরোন্তি, বলো না। প্লিজ!"

খুরোন্তি হাসে, ঠোঁটের আড়ালে, লাজুক হাসি। বলে, "না, মানে---ঘটনাটা এমন কিছু নয়।"

"না, না, ঘটনাটা তেমন কিছু নয়। তবে ওর, মানে---মরতে বেশ একটু শখটখ গিয়েছিল, এই আর কি! আর সেটা বেশ একটু তাড়াতাড়িই। তাই না খুরোন্তি? হ্যাঁ, খু-উ-ব তাড়াতাড়ি, মানে সাগরে পড়ে মরার চাইতেও।" হেসে কুটিকুটি হয় পুশুৎকা।

"ভালো হচ্ছে না কিন্তু। রাগ করবো, বলো দিচ্ছি।" অভিমানে ধমক দ্যায় খুরোন্তি। অনেক কষ্টে হাসি থামায় পুশুৎকা। বলে, "তুমিই বলো বাবা নিজের কীর্তি, আমি বাপু ও-সবের মধ্যে নেই।"

কী আর করে খুরোন্তি? গল্পের সুতো জোড়া দ্যায়। পুরনো কথার খেই ধরে সে বলে ওঠে, "আমি যখন বললাম—ডানা ভেরে যাচ্ছে, পুশুৎকা তো ভয়েই সারা।"

"বাঃ, সারা হবো না? ওর মতো আমার আর বন্ধু আছে নাকি--এমন

ভালো, এমন মিষ্টি, এমন মন-খোলা?" পুশুৎকা নিজেই কাহিনীর মধ্যে ফের ঢুকে পড়ে।

তুলু আর পুস্তি দু'জনেই হাসে। হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দেয় যে, ওরা বুঝেছে, ওরা সম্পূর্ণ একমত। ভিতর-ভিতর দু'জনেই বলে নিজে নিজে: সে কি আর আমরা জানি না? আমরা তো জানি, কাকে বলে বন্ধুত্ব, কাকে বলে ভালবাসা।

হাসে খুরোস্তিও। পুনরায় সে বলে চলে, "যা বলছিলাম। ভয় তো আমাদের দু'জনারই। যাই হোক, উড়ছি, একটু কষ্টই হচ্ছে। হঠাৎ দেখি কিনা দূরে কী একটা উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে মানে তো পাখিই। পাখি ছাড়া আর কী ওড়ে? সঙ্গে ক্ষীণ একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। যেই না দেখা বলা নেই কওয়া নেই, অমনি ওদিক পানে দে ছুট। মনে হয়েছিল বিরাট পাখি, ওর ডানায় চড়ে নিশ্চিন্তে সাগরটা পাড়ি দেবো। পুশুৎকা তো প্রথমে বুঝতেই পারে নি যে, ওর পাশ থেকে আমি কেটে পড়েছি।"

"বুঝবো কী করে?" বলে পুশুৎকা। "গপ্পো করতে-করতে যাচ্ছি, এক সময় খেয়াল হলো কই খুরোস্তি জবাব দিচ্ছে না তো! ওমা, পাশে তাকিয়ে দেখি—ও নেই।"

খুক্‌খুক্ করে হেসে ফেলে খুরোস্তি, যেন সে ভারি একটা মজা হয়েছিল। তুলু আর পুস্তি হাসে না; গম্ভীর হয়ে ভয়ানক উদ্বেগে তারা গল্প শুনে যাচ্ছে। চাপা গলায় প্রায় একসঙ্গেই তারা বলে ওঠে, "তারপর?"

পুশুৎকা বলে, গলায় অভিমান, "হয়েছে, আর হাসতে হবে না। কী ভয়ই না পেয়েছিলাম। 'খুরোস্তি নেই, খুরোস্তি নেই' বলে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, নিচের দিকে তাকিয়ে আমরা কেউ কিছু দেখতে পেলাম না। দরিয়ার পানি তেমনি নেচে-নেচে খেলা করছে, কোথাও খুরোস্তির কোনো পাত্তা নেই। ওকে দেখতে পেলাম আমি প্রথম। সবাই তখন সমুদ্র নিয়ে ব্যস্ত, পড়লে ও কোন্‌খানে পড়েছে---দেখা যায় কি না। আমার মনে হলো, আসমানটা একটু ঢুঁড়ে দেখি তো! ভালো করে চারদিকে চোখ মেলে চাইতেই দেখি ঐতো আমাদের শ্রীমতী খুরোস্তি দূরে, আরো দূরে চলে যাচ্ছে।"

আর থাকতে পারে না পুস্তি। ফোঁস করে দম ফেলেই জিজ্ঞেস করে ওঠে, "কোথায় যাচ্ছিলে তুমি খুরোস্তি?" ভীষণ সিরিয়াস সে। খুরোস্তি শুধু হাসে।

গল্পের লেজ ধরে পুশুৎকা উত্তর দেয়, "যাচ্ছিল আর কোথায়? উনি যাচ্ছিলেন উড়োজাহাজে চাপতে। ব্যাপারটা বোঝো একবার! সাগরে পড়লে কিছুক্ষণ ডানা ঝটপট করতে করতেও তো বেঁচে থাকতো, আর এখন এক লহমাতেই তো শেষ হতো ও।"

তুলু ফোড়ন কাটে, "বাব্বাঃ, সাহস তো কম নয়!"

হাসে খুরোন্তি, সরল মনে বলে, "সাহস না ছাই! আমি জানলে বুঝি ওদিকে যেতাম? তুমিই বা পুশু কোন্ সাবধানটা করেছিলে আমাকে?" এবারে বন্ধুর ঘাড়ে দোষ চাপায় সে।

"বারে, আমি জানবো কী করে? বুঝলে তুলু-পুন্তি, উড়োজাহাজ যে কী সাংঘাতিক জীব সে তো সারা পিত্থিমি জানে। আমরা সবাই তার হাজারটা গপ্পো শুনেছি। আর ও যে জানেই না, কী করে জানবো? বড়োরা তো সব সময়েই আমাদের উড়োজাহাজ থেকে সাবধানে থাকতে বলতো।" এইটুকু পর্যন্ত বলে এক্টু থামে পুশুৎকা। তারপর জিজ্ঞেস করে, "আসলে ওটা যে উড়োজাহাজ তা তুমি মোটেই ভাবো নি। তাই না, খুরোন্তি?"

"ভাববো কেমন করে? আগে দেখেছি না কি কখনো?" ছোট্ট জবাব তার। একটুখানি ভেবে নিয়ে ফের জুড়ে দেয়, "হ্যাঁ, তা-ই। সেবারই আমার প্রথম উড়োজাহাজ দেখা।"

"হুঁ, বললো বটে একটা কথা। আমিও তো সেই প্রথম দেখেছিলাম। আসলে বুঝলে---ঐ যে গোঁ গোঁ আওয়াজ। পাখির কখনো অমন আওয়াজ হয়? ঐতেই আমি আন্দাজ করেছিলাম।"

তুলু বলে, "সে না হয় হলো। কিন্তু তার পরেতে ঘটলো কী?"

"কী আর?" পুশুৎকা উত্তর করে, "আমি পড়িমরি করে ছুটলাম, আমার সাথে সাথে আরো কয়েকজন। পিছন-পিছন ছুটে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে এলাম।"

"কিন্তু ঐ যে তখন বলেছিলে: ডানা ভেরে যাচ্ছিল---" আসল প্রশ্নের মীমাংসা চাই-ই চাই পুন্তির।

"ঠিক বলেছো।" পুরনো কথার নাগাল পায় পুশুৎকা। "এইসব দৌড়াদৌড়ির ফলে খুরোন্তির অবস্থা তখন আরো কাহিল। ওর ডানা আর চলতে চায় না। দলের সবাই ওদিকে মহা মুশকিলে পড়ে গেছে। ওকে ফেলে চলেও যেতে পারে না, অথচ ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উড়তে গিয়ে দেরি করে ফেলছে। সঁন্ধে হতে মোটে ঘন্টা তিনেক বাকি। শেষ পর্যন্ত কী যে

হতো বলা যায় না। উদ্বেগে ভাবনায় সবায়ের মুখ চুন। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। দেখা গেল তিনি আসছেন।"

"তিনি? 'তিনি' আবার কে?" তুলু-পুন্তি দুজনেই এক সাথে বলে ওঠে।

"আমরা তাকে 'তিনি' বলি, সম্মান ক'রে। দরিয়ার রাজা, দত্যিপাখিও বলতে পারো তোমরা।" শ্রদ্ধায় মাথা নোওয়ায় ওরা।

তুলু আর পুন্তি তো ভেবেই পায় না, কে তিনি যাঁর সম্বন্ধে এত গদগদ ভাব! আত্মমগ্নভাবে বলে যায় খুরোস্তি, "তিনি না এসে পড়লে সে-যাত্রা কি আর বাঁচতাম? সাগরের বুকেই তাঁর বাসা, সেটাই তাঁর রাজ্য। আর চেহারাটাই বা কী! আকাশে যখন ডানা মেলে দেন,--হ্যাঁ তাকিয়ে দু'দণ্ড থির হয়ে দেখতে হয়, সে যে কী সুন্দর বলে বোঝাতে পারবো না ভাই।"

"কিন্তু কে সে? কে তিনি?" সন্ত্রম আর বিস্ময় ফুটে বেরোয় তুলু পুন্তির কণ্ঠে।

"কেন, জানো না? তিনি অ্যাল্‌বাট্রস্‌। এ তো সবাই জানে। ভবঘুরে দরাজদিল্‌ রাজা আমাদের অ্যাল্‌বাট্রস্‌। আমরা তাঁকে দাদু বলে ডাকি সবাই।" পুশুৎকা আরো বিশদ হয়, "তিনিই তো খুরোস্তিকে পিঠে চাপিয়ে পার করে দিলেন সেবার।"

"আর যেতে-যেতে সে যে কত্তো গপ্পো মজার-মজার! সবাই তো ভেবেছিল—আমাকে বেশ এক হাত নেবে। কিন্তু ঐ সব কথায় কোথায় সব রাগ দুঃখু ধুয়ে গেল।" বলে খুরোস্তি।

"সত্যিই, তাঁর কাছে আমাদের সারা দলটাই চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছে।" পুশুৎকার মন্তব্য।

এই রকম সব গল্প। একটা-দুটো নয়, অজস্র, হাজারটা। ক্ষান্তি নেই বলার, পুশুৎকা আর খুরোস্তির। ক্লান্তি নেই শোনারও, তুলু আর পুন্তির। এইভাবে কেটে চললো সময়, একদিন-দু'দিন করে পুরো দুটো মাস। তুলু পুন্তিও গল্প শোনায় তাদের, চেনায় গাছগাছড়া, চেনায় খালবিল, আলাপ করিয়ে দেয় ফটিকজলের সঙ্গে, নেমন্তন্ন করে ডেকে আনে বৌ কথা কও পাখি, তারপর ভাব করিয়ে দেয় পুশুৎকা আর খুরোস্তির সাথে। এভাবেই হাসিতে-গল্পেতে নাচে-আনন্দে গড়িয়ে গেল দিনের পর দিন, যেন সবার অলক্ষ্যে অগোচরে।

।। পাঁচ ।।

একদিন তারা বললো, "ভাই তুলু, ভাই পুস্তি, আমরা এবার চলে যাবো।" কঁকিয়ে ওঠে ওরা, "এ্যাঁ,সে কি? কেন?"

"মন কেমন করছে, ভাই। কত দি-ন হলো দেশ থেকে বেরিয়েছি। এখান থেকে এখন যদি বেরোই তবে রাস্তায় আমাদের দলটাকে ধরতে পারবো বলে মনে হয়। ওরাও এদ্দিনে ঘরে ফেরার তোড়জোড় করছে।"

"তাদের নাগাল নাই বা পেলে?" পুস্তি জিজ্ঞেস করলো।

"তা কি হয় ভাই? অমন কথা বলতে নেই", খুরোস্তি জবাব দেয়। "এত লম্বা রাস্তা, তারপর পাহাড় নদী সমুদ্র জঙ্গল----কত্তো কি চারপাশে, রাস্তা যদি গুলিয়ে ফেলি?"

"ঠিকই তো", বন্ধুর মুখের কথা কেড়ে নেয় পুশুৎকা বলে: "বাঃ, এখানে যে এসে পড়লাম, সে তো রাস্তা ভুল করার ফলেই। তাই না?"

"আর কেবল কি তাই? মেরেও তো ফেলতে পারে ভাই!"মুখটা করুণ হয়ে যায় খুরোস্তির, "কত ঈগল, বাজ আকাশে সাঁই সাঁই চক্কোর দেয়। একবার দেখে ফেললে আর রক্ষে নেই।"

ভয়ে তুলু আর পুস্তির বুক কেঁপে ওঠে। এক সঙ্গে বলে উঠলো, "না, না, ভাই। তাহলে চলেই যাও। পথে কষ্ট হওয়া ভালো নয়।"

"হ্যাঁ, তাই-ই তো। আমরা তো সে-জন্যেই ভাই যেতে চাইছি। যেতে কি আমাদেরই খুব মন চাইছে না কি?" পুশুৎকা আর খরোস্তি দু'জনেই খুব গম্ভীর হয়ে ওঠে। চলে যেতে হবে বলে মনটা ওদের সত্যিই খারাপ হয়ে আছে।

কিন্তু ঐ ক'টা কথা শুনে খুশি হয়ে ওঠে তুলু আর পুস্তি। দরকারের তাগিদে থাকতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু থাকতে তো ওদের মন চাইছে! ওটাই বড়ো কথা।

বাংলাদেশের বন্ধুদের তো ওরা ভুল বুঝে ফিরে যাচ্ছে না—এটাই বা কি কম আনন্দের?

আরো দিন দশেক পরে পুশুৎকা আর খুরোস্তি উপরে উড়লো। বিদায় নিতে গিয়ে বারবার ওদের চারজনের গলা ভেঙে এলো। ডানার পালকে চোখ মুছলো বারবার।

ডালিম গাছটার ডালে বসে দুটো রাঙা ডালিম ফুল নেড়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানালো তুলু আর পুস্তি। ওরা বারবার করে যেতে বলে গেল। রাস্তার ম্যাপ

দিয়ে গেল--কেমন করে কোথা দিয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলো মিনতির
ক'রে, "যাবে তো ভাই তোমরা? একটুও অসুবিধে হবে না। ভয় পা
কিচ্ছুটি নেই। দ্যাখো না--আমরা তো ফি বছর হাজার-হাজার মাইল উজি
চলে আসি খানা-খন্দ পাহাড়-সাগর পার হয়ে। আমাদের তো খু-উ-ব ভালো লাগে। তোমাদেরও ভালো লাগবে। ভ্রমণের চেয়ে, ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে ভাই?"

তুলু বললো, "যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। গরমের সময়। এখানে ভাই বড়ো গরম পড়ে। দু'বেলা গোসল না করলে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। তোমাদের ঠান্
দেশে একটু ঘুরে আসবো।"

পুন্তি চেঁচিয়ে বললো, "হ্যাঁ, আমিও যাবো। একই সঙ্গে, গরমে।"

তুলু আর পুন্তির চোখে ওরা স্বপ্নের ঘোর লাগিয়ে সাঁই সাঁই করে চ
পার হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

